



পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর নতুন পরিবর্তিত পাঠক্রম অনুসারে লিখিত পাঠ্যপুস্তক

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহজপাঠ

উচ্চ-মাধ্যমিকের প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

ডঃ অমল কুমার মুখোপাধ্যায়
এম·এ·এল·এল·বি (কলিকাতা),
পি-এইচ· ডি (লণ্ডন), ডিপ্ ইন্ জার্নালিজম (লণ্ডন)
ডাবলিউ· বি· এস· ই· এস
বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা
ভিজিটিং প্রফেসর, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক অনুপ চক্রবর্তী এম· এ· (কলিকাতা)
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা

এ· মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
কলকাতা • বম্বে • দিল্লী • হায়দ্রাবাদ

প্রকাশক
রাজীব নিয়োগী
এ· মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ— আষাঢ় ১৩৯২
জুলাই ১৯৮৫

মূল্য—৩০·০০ টাকা মাত্র পেপারব্যাক)
মূল্য—৪০·০০ টাকা মাত্র (বোর্ড বাঁধাই)

সরকার প্রদত্ত কাগজে মুদ্রিত

ফটো টাইপসেটিং
প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা

মুদ্রাকর ঃ
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৫২, রাজা রামমোহন সরণী,
কলিকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ

যাঁদের সাহায্য করাই এই গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গের সেই উচ্চ-মাধ্যমিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে

ভূমিকা

বর্তমান বছর থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিবর্তিত পাঠক্রম প্রবর্তিত হওয়ায় স্বভাবতই নতুন পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এ· মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে আমরা এই গ্রন্থ রচনা করেছি। আপাতদৃষ্টিতে তরুণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজটি সহজ বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি কঠিন কাজ। কারণ পাঠ্যপুস্তকের লেখক যদি নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির তথাকথিত উচ্চ চূড়া থেকে নিজেকে নামিয়ে নিয়ে এসে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুভব করতে না পারেন তাহলে পাঠ্যপুস্তক কখনই যথোপযোগী হয়ে উঠতে পারে না। এই কথা মনে রেখে এই গ্রন্থরচনার পূর্বে আমরা উচ্চ-মাধ্যমিকস্তরের শিক্ষকশিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রী বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং জানতে পারি যে ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন এইরকম : প্রথমত, তাঁরা বিষয়টিকে বুঝতে চান এবং তার সম্পর্কে একটা স্পষ্ট সামগ্রিক ধারণা লাভ করতে চান। এর জন্য প্রয়োজন যথাসম্ভব গোছানো, যুক্তিনিষ্ঠ ও তীক্ষ্ণ বক্তব্যের যা সরাসরি তাঁদের নিয়ে যেতে পারে বিষয়ের মর্মে। দ্বিতীয়ত, প্রদত্ত পাঠক্রমের বহির্ভূত কোনও আলোচনায় অথবা এই পাঠক্রমের অত্যুৎসাহী সম্প্রসারণে স্বভাবতই তাঁরা অনাগ্রহী। বস্তুত, যেখানে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত পাঠক্রম দেওয়া আছে (যা উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রণয়ন করে খুবই সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন) সেখানে তার সুনির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রমের চেষ্টা করলে ছাত্রছাত্রীদের কাছে তা এক অনাবশ্যক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তৃতীয়ত, গ্রন্থের আয়তন বিপুল হলে ছাত্রছাত্রীরা অস্বস্তি অনুভব করেন। বিষয়ের গুরুত্বের প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা দেখিয়ে রচনাশৈলীর দক্ষতায় আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত ও সন্নিবদ্ধ করতে পারলে তরুণ ছাত্রছাত্রীরা স্বভাবতই আশ্বস্ত হন।

এই তিনটি প্রয়োজনের কথা সদাসর্বদা মনে রেখেই আমরা এই গ্রন্থ রচনা করেছি। নিছক মামুলী একটি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত সাহায্য করা, পঠিতব্য বিষয় সম্পর্কে তাঁদের ভয় ভাঙ্গানো এবং পাঠ্যপুস্তকের সীমিত পরিধির মধ্যেও স্থানে স্থানে মৌলিকতার সন্ধান দিয়ে তাঁদের মনে জিজ্ঞাসার আলো জ্বালিয়ে তোলা। আমরা একাজে কতদূর সফল হয়েছি তার বিচার করবেন সহৃদয় শিক্ষকশিক্ষিকাবৃন্দ এবং অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ-মাধ্যমিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠরত অসংখ্য ছাত্রছাত্রীরা। আমরা গ্রন্থটিকে যথাসম্ভব নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি। তবু যদি অনবধানতাবশত কোনও ভুল থেকে গিয়ে থাকে তার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী এবং এই ভুল সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলেরই সাহায্যপ্রার্থী।

পরিশেষে আমরা নিজ নিজ পরিবারস্থ সকলকেই ধন্যবাদ জানাই যাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় আমাদের পক্ষে অতি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থরচনার কাজ শেষ করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ এ· মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানির কর্ণধারদের কাছে যাঁদের বিদ্যোৎসাহ ও সাংগঠনিক তৎপরতা আমাদের মুগ্ধ করেছে।

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা
অনুপ চক্রবর্তী
বিদ্যাসাগর কলেজ, কলকাতা

West Bengal Council of Higher Secondary Education
Syllabus of POLITICAL SCIENCE
PAPER-I (Marks-100).
External Assessment = 90
Internal Assessment = 10

1. What is Political Science? Definition, Nature and Scope—Relation with other Social Sciences : History, Economics, Sociology, Psychology and Ethics.
2. The State—Definition of the State : Characteristics of the State.
3. Sovereignty; its characteristics.
4. Theories of State Origin :
   (a) Divine Origin Theory.
   (b) Force Theory.
   (c) Social Contract Theory.
   (d) Evolutionary Theory.
5. Nationality, Nation and Nationalism: Right of self-determination, Nationalism and Internationalism.
6. The United Nations—Objects, structure and functions.
7. Citizenship—Definition of a citizen—Acquisition and loss of citizenship : Rights and Duties of a citizen—Civil and Political Rights; Fundamental Rights and duties of an Indian Citizen — Economic and Social Rights; Directive principles in the Indian Constitution.
8. Some Major Political Theories : Liberalism, Marxism, Democratic Socialism—Basic principles.

PAPER-II (Marks-100)
External Assessment = 90
Internal Assessment = 10

1. Constitution—Classification—Nature of the Indian Constitution : Salient features of the Indian Constitution.
2. Forms of Government—Unitary and Federal; Nature of the Indian Federation—Presidential and Parliamentary; Nature of the Indian Government—Presidential or Parliamentary? Monarchy—Republic—India as a Republic.
3. Democracy—Its different forms—Merits and Demerits—Conditions for the success of Democracy—Dictatorship—Merits and Defects.
4. Organs of Government; Functions of the different Organs of Government—Theory of Separation of powers—Executive—Functions of Political Executive—Union and State Executives in India—President of India: powers and position—Prime Minister—powers and position of the Prime Minister—Legislature : Unicameral and Bicameral Union Legislature of India : its

composition and functions—West Bengal Legislature—its composition and functions—Processes of Law Making—Judiciary. Independence of the Judiciary—The Indian Judiciary.

5. Public Opinion; Its importance in a Democracy—Different Organs of Public Opinion—Party System—types of Multi-party System—Importance of the Party System in Democracy.
6. Adult Franchise; Arguments for and against.

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহজ পাঠ

সূচীপত্র

প্রথম পত্র

দ্বিতীয় পত্র

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহজপাঠ

প্রথম পত্র

অধ্যায় ১

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও আলোচনার পরিধি

১। গোড়ার কথা (Introduction)

মানবজীবনের সরল সত্য এই যে একের মহিমা সবসময়েই ব্যক্ত হয় অনেকের সাযুজ্যে। মানুষ একাকী বড়ই অসহায়, দুর্বল ও গতিহীন। যখন সে আরও পাঁচজনের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে যোগ করে দিতে পারে তখন উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে তার আত্মবিশ্বাস ও কর্মশক্তি। অন্যের মনের মুকুরে নিজেকে যতই সে প্রত্যক্ষ করে ততই তার আশা-আকাঙ্ক্ষার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা পল্লবিত হয়ে ওঠে এবং এই আশা-আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় সে আত্মনিয়োগ করে নিত্য নতুন সৃষ্টিশীল কর্মে। সভ্যতার আদিপর্বে স্বাভাবিক মানবিক বোধ জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিল বলেই অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ মেনে নিয়েছে সমাজবদ্ধ জীবন। বস্তুত, সমাজবদ্ধ জীবনের প্রতি মানুষের অটুট ও নিরবচ্ছিন্ন অঙ্গীকারের ফলেই মানবসভ্যতা আজ এত ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করতে পেরেছে।

কিন্তু এইভাবে নিজেকে সমাজের সঙ্গে যুক্ত করতে গিয়ে মানুষকে কিছু মূল্যও দিতে হয়েছে। একাকী মানুষ নিজের অধীশ্বর। কিন্তু যে মুহূর্তে মানুষ সমাজকে স্বীকার করে নেয় তখনই এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। দুটি মানুষ কখনই অভিন্ন নয়। প্রতিটি ব্যক্তিরই কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। এইসব ব্যক্তিমানুষের সম্মিলনে যখন সমাজ গড়ে ওঠে তখন প্রতিটি ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য খর্ব করতে হয়। অন্যথায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পারস্পরিক সংঘাতে এমনই এক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের অবস্থা দেখা দেবে যাতে সমাজের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। অর্থাৎ সমাজের অর্থ হল এমন এক ব্যবস্থা যেখানে সাধারণ শৃঙ্খলার স্বার্থে সমাজবদ্ধ ব্যক্তিবর্গ কিছু নিয়ম-কানুন, আইন ও অনুশাসন মেনে চলতে সততই ইচ্ছুক, যেখানে ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যে আরোপিত হয় এক অমোঘ নিয়ন্ত্রণ। হাজার হাজার বছর ধরে নিরন্তর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানবসমাজের চরিত্রে ও গঠনে নানা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। কিন্তু সমাজজীবনের মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে এই নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত থেকেছে। সমাজ-ঐতিহাসিক ও সমাজচিন্তাবিদদের মধ্যে কেউই এই নিয়ন্ত্রণের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নি। অবশ্য এই নিয়ন্ত্রণের কারণ অনুসন্ধানে তাঁরা একমত হতে পারেন নি। যেমন, অনেকে এই নিয়ন্ত্রণকে নিতান্ত স্বাভাবিক বলে ব্যাখ্যা করেছেন ; কিন্তু যাঁরা মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী তাঁরা এই নিয়ন্ত্রণকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁদের মতে উৎপাদন-উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা যে শ্রেণীর কুক্ষিগত সেই শ্রেণীর স্বার্থেই প্রচলিত হয় এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা।

সমাজে যে কোনও কারণেই নিয়ন্ত্রণ উদ্ভূত হক না কেন, একথা কেউই অস্বীকার করেন না যে নিয়ন্ত্রণের অর্থ হল আইন-কানুনের কঠোর প্রয়োগ এবং সকলকে এই আইন-কানুনের প্রতি অনুগত রাখার জন্য আইন ভঙ্গের ক্ষেত্রে দণ্ডদানের ব্যবস্থা। এই দুটি কাজ নিষ্পন্ন করার জন্য অনিবার্যভাবেই সমাজে আবির্ভাব ঘটে সর্বোচ্চ ক্ষমতাধারী শাসকের। ভিন্ন ভিন্ন সমাজে এই শাসকের চরিত্র ও সংগঠন দেখা দিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে। কখনও একজন মাত্র ব্যক্তি, কখনও বা কয়েকজন ব্যক্তিকে দেখা গেছে শাসকের ভূমিকায়। আবার কখনও অনেকে মিলে জন্ম দিয়েছে একটি শাসকগোষ্ঠীর। যে মুহূর্তে সমাজে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও তাকে কার্যকর করার জন্য শাসকের কার্যকলাপ স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় সেই মুহূর্তেই সমাজজীবনে প্রত্যক্ষ করা যায় এক স্বতন্ত্র কর্মধারা। একেই বলা হয় রাজনীতি। এই রাজনীতির নির্দিষ্ট চৌহদ্দি চিহ্নিত করার জন্য এবং সমাজের নিরন্তর ভাঙাগড়া ও পরিবর্তনের মধ্যেও রাজনৈতিক কর্মপ্রবাহের চিরন্তন অবস্থিতির কথা স্মরণ

করিয়ে দেওয়ার জন্য সমাজের পাশাপাশি এক স্বতন্ত্র শক্তিশালী সংগঠনের অস্তিত্ব ধারণা করে নেওয়া হয়েছে। এই সংগঠনের নাম রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে কেন্দ্র করে যে বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলী সমাজজীবনকে আলোড়িত করে তাকে বিশ্লেষণ করার জন্য তাত্ত্বিক মহলে উদ্ভব হয়েছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের।

স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা, তবে অতি প্রাচীন শাখা। ইয়োরোপে এর জন্ম হয়েছিল প্রায় ২৪০০ বছর আগে যখন গ্রীক নগররাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (Plato) ও অ্যারিস্টটল (Aristotle) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মৌল সূত্র প্রণয়ন করেন। উল্লেখ্য যে এ বিষয়ে অ্যারিস্টটলের অবদান ছিল সর্বাধিক। তিনি তাঁর 'পলিটিক্স' (Politics) নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পূর্ণাঙ্গ আকৃতি দেওয়ার চেষ্টা করেন। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রচলিত ইংরাজি নাম Political Science তাঁরই গ্রন্থের শিরোনাম থেকে আহৃত। অ্যারিস্টটল এই শিরোনাম ব্যবহার করেছিলেন তাঁর সমকালীন গ্রীক নগর রাষ্ট্রের কথা ভেবে যাকে অভিহিত করা হত 'Polis' নামে। তৃতীয়ত, অ্যারিস্টটলই প্রথম চিন্তাবিদ যিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন।

এইসব তথ্যের ভিত্তিতে পশ্চিমী পণ্ডিতেরা দাবি করে থাকেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল ইয়োরোপেই। কিন্তু এই দাবি সঠিক নয়। মহাভারতের শান্তিপর্ব ও কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে ভারতবর্ষে মৌর্য সাম্রাজ্য স্থাপনের বহু পূর্বে রাজনীতি বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হয়েছিল। বস্তুত, 'শুক্রনীতি' ও 'অর্থশাস্ত্র' ভারতবর্ষের দুখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ যাতে সবিশেষ গুরুত্ব সহ রাজনীতির বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। অবশ্য প্রাচীন ভারতে রাজনীতি পরিচিত ছিল দণ্ডনীতি নামে।

ইয়োরোপে মধ্যযুগের পর থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। বিশেষ করে ষোড়শ শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত দীর্ঘসময় জুড়ে ইতিহাসখ্যাত চিন্তাবিদদের নিরলস চেষ্টায় পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। তবে বিদ্যায়তনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিদ্যার আনুষ্ঠানিক পঠন-পাঠনের ইতিহাস খুব দীর্ঘদিনের নয়। তিনশ বছর আগে সুইডেনে সর্বপ্রথম রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হলেও ইয়োরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন শুরু হয় মাত্র একশ বছরের কিছু বেশি সময় আগে। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা লাভের পর রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্বতন্ত্র বিদ্যা হিসাবে স্বীকৃতি পায় এবং বর্তমানে ভারতবর্ষের সর্বত্র উচ্চমাধ্যমিক স্তরেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি গুরুত্বপূর্ণ পঠিতব্য বিষয়। আশা করা অন্যায় হবে না যে ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের সুযোগ গ্রহণ করে ভারতীয় রাজনীতি বিশ্লেষণে দক্ষ হয়ে উঠবে এবং এই দক্ষতার ভিত্তিতে তারা ভারতীয় রাষ্ট্র ও রাজনীতির যাবতীয় ত্রুটি, বিচ্যুতি ও ব্যর্থতা দূর করে নতুন ভারতবর্ষ গড়ার কাজে অগ্রণী হবে।

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Political Science)

কোনও বিষয়কে জানতে গেলে তার সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করতে হয়। কাজেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিরূপণ জরুরী কাজ। তবে কাজটি সহজ নয়। কারণ সংজ্ঞার ব্যাপারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে কোনও ঐকমত্য নেই, বিভিন্ন জন সংজ্ঞা দিয়েছেন বিভিন্নভাবে। এই বিভিন্নতার মূল কারণ এই যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে দেখার চেষ্টা করেছেন। সন্দেহ নেই, এর ফলে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এর একটি আশাব্যঞ্জক দিকও আছে। একটি বিষয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচারের চেষ্টা করলে তাতে তার জৌলুস বাড়ে এবং স্বভাবতই বিষয়টি হয়ে ওঠে আরও বৈচিত্র্যময়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রচলিত সংজ্ঞাগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের পটভূমিকায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিচারের পক্ষপাতী। তাই, তাঁদের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান মূলত রাষ্ট্রবিশ্লেষণের বিদ্যা। এই মতের প্রবক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ব্লুণ্টস্লি (Bluntschlli) ও গার্নার (Garner)। এঁদের দেওয়া সংজ্ঞাকেই আরও একটু বিশদ ও সম্প্রসারিত করে গ্রহণ করেছেন দ্বিতীয় একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সিলী (Seeley), পল জানে (Paul Janet) প্রভৃতি। এঁদের মতে, রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত সরকার, আইনব্যবস্থা প্রমুখ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক সংগঠন ও ব্যবস্থা বিশ্লেষণের মাধ্যম হল রাষ্ট্রবিজ্ঞান। এই দুই ধরনের সংজ্ঞাকেই সাধারণত সাবেকী সংজ্ঞা বলা হয়ে থাকে। আধুনিক কালে, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে, পশ্চিমী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে রাষ্ট্রের কোনরূপ উল্লেখ না করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞানির্দেশের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এঁদের দেওয়া রাষ্ট্রনিরপেক্ষ সংজ্ঞাকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে। অবশ্য এই আধুনিক সংজ্ঞার অনেক প্রকারভেদ আছে। যেমন ডেভিড ট্রুম্যান (David B. Truman)-এর মতে সমাজে কার্যরত যাবতীয় গোষ্ঠীর কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান। ল্যাসওয়েল ও কাপলান (Lasswell and Kaplan)- এর মতে, ক্ষমতার গড়ন ও বণ্টনের বিশ্লেষণ করা হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মাধ্যমে। চার্লস্ মেরিয়াম (Charles E. Merriam)-এর উদ্ভাবিত সূত্র অনুসরণ করে অনেকে বলে থাকেন যে যেকোনও রাজনৈতিক আচরণ অনুধাবন করাই হল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ। অন্যদিকে ডেভিড ইস্টন (David Easton)-এর মতে সমাজে প্রার্থিত বস্তু ও বিষয়গুলি সকলের মধ্যে সুচারুরূপে বণ্টন করে দেওয়ার জন্য চূড়ান্ত প্রাধিকার (authority) প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় এবং এই প্রাধিকারিক সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া (authoritative decision-making) বিশ্লেষণ করে যে বিদ্যা তাকেই বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান। এইসব সাবেকী ও আধুনিক সংজ্ঞা ছাড়া আরও একটি সংজ্ঞা আছে যেটিকে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে ফেলা যায়। এটি হল মার্ক্সবাদী সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী সমাজের অভ্যন্তরে সংঘটিত শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় কর্মপ্রক্রিয়ার বিচার ও বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

ওপরে উল্লেখিত সংজ্ঞাগুলির প্রতিটিতেই কিছু না কিছু সত্য নিহিত আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সংজ্ঞাগুলির কোনটিই সম্পূর্ণ নয়। একথা অনস্বীকার্য যে আধুনিক কালে রাজনীতি শুধুমাত্র রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় না, রাষ্ট্রের চৌহদ্দির বাইরেও রাজনীতির অনেক শক্তিশালী উপকেন্দ্র বিদ্যমান। কিন্তু আবার একথাও সত্য যে রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেও রাজনীতি অনুধাবন করা যায় না। কারণ এখনও পর্যন্ত প্রতিদেশেই রাষ্ট্রের বিপুল অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। অন্যদিকে মার্ক্সবাদী সংজ্ঞা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বাস্তব অসুবিধা দেখা দেয়। কারণ শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র হয়ে না উঠলে তার সঙ্গে যুক্ত কর্মকাণ্ড যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠে না এবং পৃথিবীর সব দেশে শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতাও একরকমের নয়। কাজেই সামগ্রিক বিচারে এই সংজ্ঞাগুলির কোনটিই নিখুঁত নয়।

অবশ্য এই সংজ্ঞাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা গড়ে তোলা যেতে পারে। এই কাজ সম্ভব হবে যদি আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ করি এইভাবে : রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল সমাজবিজ্ঞানের এক বিশিষ্ট শাখা যা সমাজের যাবতীয় রাজনৈতিক আচরণ ও সংগঠনের ক্রিয়াশীলতায় সংঘটিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিচার-বিশ্লেষণ করে। লক্ষণীয় যে এই সংজ্ঞায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আচরণবাদী সংজ্ঞাকে যথোপযুক্ত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আবার মনে রাখা দরকার যে রাজনৈতিক সংগঠন বলতে শুধুমাত্র রাষ্ট্র এবং তার আনুষ্ঠানিক ও আইনানুগ সংগঠনকেই বোঝায় না, কারণ সমাজে কার্যরত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীও রাজনৈতিক সংগঠন বলে বিবেচিত হতে পারে। কাজেই আমাদের নির্মিত সংজ্ঞায় 'রাজনৈতিক সংগঠন' এই কথাটির অন্তর্ভুক্তির দ্বারা

যাঁরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সংজ্ঞাদানের পক্ষপাতী এবং যাঁরা রাষ্ট্রনিরপেক্ষ সংজ্ঞায় বিশ্বাসী তাঁদের সকলের মতবাদকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। একইভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া কথাটির তাৎপর্য ব্যাপক। এর দ্বারা শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মধারাকেই বোঝায় না, ক্ষমতার ক্রিয়াকলাপ, প্রাধিকারিক সিদ্ধান্তকরণ ইত্যাদিও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। আবার শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত কর্মপ্রক্রিয়াও চূড়ান্ত বিচারে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। কাজেই সর্বশেষে উল্লেখিত সংজ্ঞাটি গ্রহণ করলে সাবেকী, আধুনিক ও মার্ক্সবাদী—এই তিনশ্রেণীর সংজ্ঞার কোনটিই উপেক্ষিত হয় না।

৩। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি এবং পরিধি বা আলোচ্য বিষয় (Nature and Scope of Political Science)

কোনও বিষয়ের সংজ্ঞা হল তার প্রকৃতির সংক্ষিপ্ততম বিবরণ। কাজেই কোনও বিষয়কে ভালভাবে জানতে গেলে তার সংজ্ঞা নিরূপণই যথেষ্ট নয়, বিশদ আলোচনার মাধ্যমে তার প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবহিত হওয়া দরকার। এই কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের শুরুতেই অনিবার্যভাবে এসে পড়ে তার প্রকৃতির আলোচনা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি স্বভাবতই প্রতিভাত হয় তার পরিধিতে। অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি বা আলোচনাক্ষেত্র কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত, তার আলোচ্য বস্তু কী কী—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করা যায়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাচীনতা প্রায় আড়াই হাজার বছরের। এই দীর্ঘ সময় ধরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধি ক্রমাগত বিস্তৃত হয়েছে, নিত্যনতুন আলোচ্য বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সংযোজিত হয়ে তার গুরুত্ব ও বৈচিত্র্য বাড়িয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে বহু শতাব্দী ধরে রাষ্ট্রই ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয়। অ্যারিস্টটলের সময় থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের প্রবল ক্ষমতার সমর্থনে বিমূর্ত স্তরে অসংখ্য রাষ্ট্রতত্ত্ব রচিত হয়। সপ্তদশ শতকের ইংরাজ দার্শনিক জন লক (John Locke) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করেন। রাষ্ট্রীয় প্রাধিকার (authority)-এর পাশাপাশি ব্যক্তির স্বাধীনতা (liberty) ও অধিকার (rights)-এর প্রশ্নটিকে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্যবিষয় রূপে স্বীকৃতি দেন। অষ্টাদশ শতকে ফরাসী চিন্তানায়ক মন্তেস্কু (Montesquieu)-এর প্রেরণায় সরকার ও সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্যবিষয় রূপে বিবেচিত হতে থাকে। উনবিংশ শতকে জনপ্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী প্রতিষ্ঠানের আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করতে থাকে এবং স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক দল, জনমত ও ভোটদান পদ্ধতি প্রভৃতি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় স্থান পেতে থাকে। অবশ্য মূলত সাংবিধানিক ও আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়গুলি আলোচিত হতে থাকে।

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকেই এই সাবেকী ধারায় পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। ১৯০৮ সনে ইংরাজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গ্রাহাম ওয়ালাস (Graham Wallas) এবং মার্কিনী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আর্থার বেন্টলে (Arthur F. Bentley) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নতুন আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতিতে আধুনিকতার সঞ্চার করেন। ওয়ালাস গুরুত্ব দেন রাজনীতির মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের ওপর এবং বেন্টলে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর কার্যকলাপকে নিয়ে আসতে চান রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার আঙিনায়। বিশের দশকে প্রকাশিত এক গ্রন্থে চার্লস্ মেরিয়াম এই অভিমত প্রকাশ করেন যে সবরকমের রাজনৈতিক আচরণই হল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় এবং তাঁর অনুপ্রেরণায় পশ্চিমী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনতিকালের মধ্যেই রাজনৈতিক আচরণবাদ নামে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি জনপ্রিয় হতে থাকে। অধ্যাপক ল্যাসওয়েল তিরিশের দশকে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থে সমাজে

ক্রিয়ারত যেকোনও ধরনের প্রভাব (influence)-ই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বলে দাবি করেন। পঞ্চাশের দশকে ডেভিড ট্রুম্যান আর্থার বেণ্ট্‌লের মতবাদ অনুসরণ করে গোষ্ঠীরাজনীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অন্যদিকে ডেভিড ইস্টন তাঁর দ্য পোলিটিক্যাল সিস্টেম (The Political System) নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে সমাজের সর্বস্তরে সতত দৃশ্যমান সকল প্রাধিকারিক সিদ্ধান্তকরণ প্রক্রিয়াকেই নিয়ে আসতে চান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আওতায়। ষাটের দশকে জুভেনেল (Bertrand de Jouvenel) ও ডল (Robert Dahl) এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, যে কোনও ক্ষমতাসংক্রান্ত কার্যকলাপই হল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। অন্যদিকে অধ্যাপক মিলার (J.D.B. Miller) রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে অতি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, যে কোনও প্রকারের বিরোধ—তা পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় স্তরেই হক না কেন—এবং তার নিষ্পত্তিই হল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিচার্য বিষয়। আধুনিক কালে এইসব মতবাদের পাশাপাশি মার্ক্সীয় মতবাদও ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী মার্ক্সবাদীরা মনে করে থাকেন যে একমাত্র সামাজিক প্রেক্ষাপটেই রাজনীতি অনুধাবন করা যায় এবং যেহেতু সমাজচরিত্র নিয়ন্ত্রিত হয় প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা সেইহেতু অর্থনৈতিক উপাদানকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোনও আলোচনাই অর্থবহ হতে পারে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আধুনিককালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতিতে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। দীর্ঘকাল ধরে একমাত্র রাষ্ট্রসম্পর্কিত বিষয়সমূহ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপজীব্য বিষয় বলে বিবেচিত হলেও আজকের দিনে একমাত্র রাষ্ট্রই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় নয়। আজ আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু রাষ্ট্র ও তার সংগঠনাদি বিষয়ের আলোচনার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না, সমগ্র সমাজ অর্থাৎ সামাজিক জীবনধারা ও বিবিধ সামাজিক সংগঠনের ওপর অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলছে আজকের রাষ্ট্রবিজ্ঞান। অর্থাৎ বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। রাষ্ট্রের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সে আজ স্থান করে নিয়েছে সমাজের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে। এইভাবে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতিতে এসেছে বৈপ্লবিক রূপান্তর।

এই রূপান্তরের কথা মনে রেখে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলিকে এইভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে : ১। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার পদ্ধতিগত বিষয়, ২। রাষ্ট্রচরিত্র এবং রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সম্পর্ক বিষয়ে তত্ত্বগত প্রশ্ন, ৩। ক্ষমতার স্বরূপ ও প্রয়োগ, ৪। শাসন, আইন ও বিচার সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার আইনগত ও আচরণবাদী বিশ্লেষণ, ৫। রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সামাজিকীকরণ এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের স্বরূপ বিশ্লেষণ, ৬। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠীর কার্যকলাপ, ৭। ভোটাচরণ ও জনমত, ৮। তুলনামূলক রাজনীতি, ৯। রাজনীতির অর্থনৈতিক বনিয়াদ, ১০। রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং ১১। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সংগঠন।

৪। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কি বিজ্ঞান বলা যায়? (Is Political Science a Science?)

দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞানরূপে অভিহিত হয়ে আসছে। কিন্তু সত্যই কি রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া যায়? রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে তার প্রকৃতি ও পদ্ধতি কতদূর বিজ্ঞানসম্মত এবং যে উপাদানগুলি নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কারবার সেগুলিকে কি অনায়াসে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের আওতায় আনা সম্ভব? এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা হওয়া দরকার কারণ এগুলিরই ওপর নির্ভর করছে বিষয় হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্বাসযোগ্যতা।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগাযোগ দীর্ঘদিনের। এই যোগাযোগের সূচনা করেন সপ্তদশ শতকের ইংরাজ রাষ্ট্রতাত্ত্বিক টমাস হব্‌স। গ্যালিলিও (Galileo)-এর ভৌতবিজ্ঞানের পূর্বানুমান ব্যবহার করে তিনি গতি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক সূত্রের ভিত্তিতে গড়ে তোলেন তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্ব।

পরবর্তীকালে ফরাসী চিন্তানায়ক ভলটেয়ার (Voltaire) এবং ইংরাজ চিন্তাবিদ জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham) ও হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) সমস্যা বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ পদ্ধতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। আধুনিককালেও অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রাকৃত বিজ্ঞানের মূল ধারা অনুসরণ করে এবং প্রাকৃত বিজ্ঞানের প্রচলিত পারিভাষিক শব্দের বহুল ব্যবহার করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক চরিত্র প্রমাণে তৎপর। এছাড়া বিজ্ঞানের মতই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সর্বাধুনিক গবেষণাও এখন বহুলাংশে নির্ভেজাল বাস্তব ও পরিমাপযোগ্য তথ্যের ওপর নির্ভরশীল।

কিন্তু এর দ্বারা অবশ্যই রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের অভিন্নতা প্রমাণিত হয় না। বস্তুত, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের কর্মপ্রণালী পর্যালোচনা করলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে এর বিপুল পার্থক্য অতি সহজেই বোঝা যায়। বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় গুণ হল তার সঠিকতা ও নির্ভুলতা। এই গুণ অর্জনের জন্য বিজ্ঞান নির্ভর করে এক ব্যাপক ও কঠোর পদ্ধতির ওপর। বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের প্রথম ধাপ হল পর্যবেক্ষণ। শুধুমাত্র দেখাই পর্যবেক্ষণ নয়। এ হল পর্যবেক্ষিত বস্তুর সমস্ত উপাদানের নিবিড় অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধানকে সফল করে তোলার জন্য বিজ্ঞান ব্যবহার করে উন্নততর কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতি। এইভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বস্তুর প্রকৃতি ও চরিত্র সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা লাভ করার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ। কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক ফল লাভ এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্য নয়। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলতেই থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না এর থেকে লব্ধ সিদ্ধান্ত সর্বজনীন বলে প্রতিভাত হয়। এইভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে সাফল্য লাভ করতে পারলে বিজ্ঞানী তখন পৌঁছে যান তাঁর কাজের শেষ পর্যায়ে। এই পর্যায়ে তিনি নির্মাণ করেন তাঁর সর্বজনীন বৈজ্ঞানিক সূত্র যার প্রয়োগ দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ। এইভাবেই বিজ্ঞান আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটন করে চলেছে মৌল সত্যের স্বরূপ। অবশ্য আজকের দিনে বিজ্ঞান আর এ দাবি করে না যে বিজ্ঞানলব্ধ সত্য অমোঘ ও অপরিবর্তনীয়। সর্বজনীন বৈজ্ঞানিক সূত্র অবশ্যই পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু এই পরিবর্তনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানী অসহায় ও বিব্রত বোধ করেন না। পরিবর্তনকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আবার তিনি তাঁর চিরাচরিত পদ্ধতি প্রয়োগ করে নতুন সর্বজনীন সূত্র আবিষ্কারের লক্ষ্যে ধাবিত হন।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে বিজ্ঞানীর মত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরও পর্যবেক্ষণের সুযোগ আছে এবং সাধ্যমত তিনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে থাকেন। তবে এই পর্যবেক্ষণ বড়ই সীমিত। কারণ বিজ্ঞানীর মত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পর্যাপ্ত সুযোগ নেই। আবার এই সুযোগ থাকলেও তা কতটা কার্যকর হত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ মানুষই হল রাজনীতির কারক ও চালক। অতএব রাজনীতির আঙিনায় পর্যবেক্ষণ চালাতে গিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে শেষ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করতে হয় মানুষকেই। কিন্তু মানুষ এক দুর্জ্ঞেয় প্রাণী। তার কার্যাবলী ও আচরণের বাহ্যিক বিশ্লেষণ করা যায় বটে। কিন্তু এই সবের অন্তরালে লুকিয়ে থাকে যে সূক্ষ্ম চিন্তা, অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য তাকে বিশ্লেষণ করার মত যন্ত্র আজও আবিষ্কৃত হয় নি। কাজেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণ কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে সম্প্রতি ভোটাচরণ পর্যবেক্ষণের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অত্যাধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও একজন ভোটদাতা ঠিক কোন্ চিন্তা মাথায় রেখে তাঁর ভোটদান করছেন তার সঠিক উত্তর দেওয়ার সাধ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর নেই।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অক্ষমতা আরও স্পষ্ট। বস্তুত, বৈজ্ঞানিক অর্থে পরীক্ষা-নিরীক্ষা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আদৌ সম্ভব নয়। বিজ্ঞানী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন ইতিবাচক ও নেতিবাচক এই উভয় পদ্ধতিতেই। অর্থাৎ একটি উপাদানের সঙ্গে আর একটি উপাদানকে যোগ করে অথবা একটি উপাদান থেকে আর একটি উপাদানকে বিযুক্ত করে তিনি এই প্রক্রিয়ার ফলাফল

বিশ্লেষণ করেন এবং সেই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তিনি পৌঁছান তাঁর সিদ্ধান্তে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতন্ত্র বিলুপ্ত হলে ব্যক্তির উন্নতির পক্ষে তার ফলাফল কি হবে শুধুমাত্র তাই পরীক্ষা করে দেখার জন্য কোনও ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই সংসদীয় গণতন্ত্র বিলোপ করে দেওয়ার কথা বলতে পারেন না অথবা এই বিলোপ সাধনের ক্ষমতাও তাঁর হাতে নেই। অবশ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেষ্টা করা হয় সুদূর অথবা অনতিদূর ইতিহাসের ঘটনাবলীর মাধ্যমে। যেমন সামরিক স্বৈরতন্ত্র ভারতীয় নাগরিকের পক্ষে কতটা বিপজ্জনক হবে একথা বোঝাবার জন্য একজন ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পাকিস্তানের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উল্লেখ করতে পারেন। কিন্তু যথার্থ বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডের বিচারে একে সার্থক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বলা চলে না, কারণ এর থেকে উৎপাদিত সিদ্ধান্ত সর্বজনীনতার দাবি করতে পারে না, চূড়ান্ত বিচারে এই সিদ্ধান্তকে বলা চলে ভ্রান্ত সামান্যীকরণ (false generalisation)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি এমনই যে এখানে নির্ভেজাল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কাজেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্বভাবতই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সঙ্গে একই আসন দাবি করতে পারে না। যাঁরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান আখ্যায় ভূষিত করেছেন তাঁরা অবশ্যই এই পার্থক্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তবু তাঁরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন এবং এর পিছনে এক বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। সেই উদ্দেশ্য যথাযথভাবে অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান নাম দেওয়ার সার্থকতা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে যাঁরা বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তাঁরা প্রকৃতপক্ষে এই কথাটিই বলতে চান যে বিজ্ঞান না হলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেন বিজ্ঞানের মতই বিচার-বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত প্রণয়নে যুক্তিনিষ্ঠ, তথ্য ও সত্য নির্ভর এবং অভ্রান্ত হয়ে ওঠে। তাঁদের এই সদিচ্ছার তাৎপর্য গভীর। কারণ রাজনীতি হল সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মপ্রক্রিয়া যার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্য জড়িত। যদি এই রাজনীতির বিশ্লেষণ নির্ভুল না হয়, যদি রাজনীতি সম্পর্কিত সূত্রাবলীর প্রয়োগ বিশ্বজনীন না হয় তাহলে সমাজে রাজনীতি সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তি দেখা দেবে এবং এই বিভ্রান্তির সুযোগ গ্রহণ করে রাজনীতি অনেক সময় বিপথগামী ও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে অভিহিত করার আসল উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে তাঁর গুরু দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া, তাঁকে নিরন্তর স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চায় নিয়ে আসতে হবে বিজ্ঞান সাধনার বিশুদ্ধ আবহাওয়া। তবে এ বিষয়ে শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে দায়িত্ব দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যাঁরা রাজনীতির কারক এবং পালক সেই রাজনীতিবিদ (politician)-দেরও এ ব্যাপারে যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। রাজনীতিবিদরা যদি সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ বিস্মৃত হয়ে ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত অথবা দলীয় স্বার্থ সিদ্ধির সর্বনাশা খেলায় প্রবৃত্ত হন তাহলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অকৃত্রিম বৈজ্ঞানিক চিন্তাও নিষ্ফল হয়ে যায়। অর্থাৎ, এক কথায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান না হলেও তাকে বৈজ্ঞানিক চরিত্র দেওয়া সম্ভব, তবে এ বিষয়ে দায়িত্ব শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর একার নয়, এ দায়িত্ব সকলের।

৫। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক (Relation of Political Science with other Social Sciences)

ক) সম্পর্ক নির্ণয়ের গুরুত্ব (Significance of the Relation)

বৈচিত্র্যময় সমাজজীবনের কর্মধারা স্বভাবতই বহুমুখী। এইসব ভিন্ন ভিন্ন কর্মধারা সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই শাখাগুলির মধ্যে অন্যতম। সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের পথ পার হয়ে এসে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আজ এক পরিণত বিদ্যা এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বভাবতই সমুজ্জ্বল। তবুও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অস্বীকার করতে পারে না। মানুষের জীবন বিচ্ছিন্ন কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের

সমাবেশ নয়, এই বৈশিষ্ট্যগুলির নিবিড় পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়েই প্রতিভাত হয় মানুষের জীবনের সমগ্রতা। যেহেতু সমাজজীবন এই ধরনের মানব জীবনেরই সমষ্টি সেই কারণে সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠকে অর্থবহ করে তুলতে গেলে এর সাথে সমাজ বিজ্ঞানের কয়েকটি প্রধান শাখার নিবিড় সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সাম্প্রতিককালে পশ্চিমের দেশগুলিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সহ সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলির মধ্যে নৈকট্য স্থাপন করে এক ঐক্যবদ্ধ সমাজ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলেছে। ভারতবর্ষেও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ (Indian Council of Social Science Research) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সংগঠন ও কর্মসূচীর পিছনে একই ধরনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

খ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস (Political Science and History)

আপাতদৃষ্টিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিশ্লেষণের বিষয় হল বর্তমানে ঘটমান রাজনীতি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আগ্রহ শুধুমাত্র বর্তমানে। বস্তুত, অতীতকে অস্বীকার করলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। কারণ রাজনীতি চূড়ান্ত বিচারে কোনও তাৎক্ষণিক বুদ্বুদ বা বিস্ফোরণ নয়। রাজনীতি প্রকৃতপক্ষে এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে এবং এই নিয়ত বহতা রাজনীতির একমাত্র সাক্ষী হল ইতিহাস। এই কারণেই ইতিহাসের কাছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় ঋণ। অসংখ্য রাজনৈতিক ঘটনার এবং নানাবিধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও ব্যবস্থার বিশ্লেষণে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আজ ব্যস্ত। অন্যদিকে বিবিধ ধারণা ও তত্ত্বে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আজ সমৃদ্ধ। মনে রাখা দরকার যে এসব কিছুরই জন্ম হয়েছিল ইতিহাসের ছত্রছায়ায়। যে আইন ব্যবস্থা আজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম বিচার্য বিষয় তার উৎস সন্ধানে দৃষ্টি ফেরাতে হয় রোমের অতীত ইতিহাসের দিকে। দিব্যাধিকার তত্ত্ব (Theory of Divine Rights) বিশ্লেষণ করতে গেলে নির্ভর করতে হয় ইয়োরোপের ষোড়শ শতকের এবং সপ্তদশ শতকের প্রথম পর্বের ইতিহাসের ওপর। মানুষের অধিকারের প্রশ্ন আলোচনা করতে গিয়ে ফরাসী বিদ্রোহের ঘটনাবলী উপেক্ষা করা যায় না। সমাজবাদ (Socialism)-এর আলোচনায় অনিবার্যভাবে এসে পড়ে উনিশ শতকীয় ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সামাজিক ইতিহাস। ভারতবর্ষের বর্তমান সংবিধানের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস জানাটা জরুরী হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানও কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে ইতিহাসের ধারাকে। গ্রীক রাষ্ট্রতাত্ত্বিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের চিন্তা রেনেসাঁস পর্বের পরে ইয়োরোপের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে সাধারণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। আধুনিক ইয়োরোপের উদারনীতিবাদী গণতন্ত্রের ইতিহাসকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল জন লকের রাষ্ট্রচিন্তা। রুশো (Rousseau) ও ভল্টেয়ারের তত্ত্ব ছিল ফরাসী বিদ্রোহের মূল প্রেরণা। মার্ক্স (Marx) ও এঙ্গেলস্ (Engels) -এর তত্ত্বের ভিত্তিতেই সংঘটিত হয়েছিল রুশীয় অক্টোবর বিপ্লব।

এইসব তথ্য স্বভাবতই ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিবিড় সম্পর্কের প্রমাণ বহন করে। তবে মনে রাখা দরকার যে ইতিহাসকে কী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হবে তার ওপরেই অনেকাংশে নির্ভর করে এই সম্পর্কের স্থায়িত্ব। ইতিহাসকে যদি কতকগুলি আকস্মিক ঘটনার সমষ্টি বলে গ্রহণ করা হয় অথবা ইতিহাস বলতে আমরা যদি বুঝি কিছু বিশেষ গুণ সম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ব্যক্তিগত সাফল্য ও ব্যর্থতার বিবরণ তাহলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাসের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যায়। কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তিম লক্ষ্য হল কতকগুলি সাধারণ সূত্র প্রণয়ন। কিন্তু আকস্মিক ঘটনাবলীর ভিত্তিতে সাধারণ সূত্রে পৌঁছানো যায় না। আবার সাধারণ বিচারে অসামান্য বলে চিহ্নিত কিছু উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তির কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে তারই ভিত্তিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাধারণ সূত্র নির্মাণের চেষ্টা করলে তা হবে একপেশে এবং স্বভাবতই তার বিশ্বাসযোগ্যতা থাকবে না।

প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস হল সমগ্র সমাজের ইতিহাস, অর্থাৎ, সমাজে বসবাসকারী সকল মানুষের জীবনধারার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। দ্বিতীয়ত, ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট গতিপথ আছে, সেই পথ ধরে সে এগিয়ে চলেছে এক সম্ভাবনা থেকে আর এক সম্ভাবনায়। ইতিহাসকে এই অর্থে গ্রহণ করলে অর্থাৎ ইতিহাসের সমগ্রতা ও সুসম্বদ্ধতা স্বীকার করে নিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাসের বড় কাছাকাছি এসে যায়। কারণ সেক্ষেত্রে একদিকে ইতিহাস পরিবেশন করে চলে ধারাবাহিক সামাজিক প্রক্রিয়ার নির্ভরযোগ্য বিবরণী, অন্যদিকে এই বিবরণী থেকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উপাদানগুলিকে বাছাই করে নিয়ে এই বিবরণীর ভিত্তিতেই তাদের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসিদ্ধ পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অবশেষে প্রণয়ন করে সাধারণ সূত্র।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান অভিন্ন। দুটিই হল সমাজবিজ্ঞানের দুটি স্বতন্ত্র শাখা এবং দুটিরই কাজ আলাদা। ইতিহাস মূলত সরবরাহ করে তথ্য, এই তথ্য বিশ্লেষণের কাজ ইতিহাসের নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই তথ্য বিশ্লেষণ করে এবং তারই ভিত্তিতে নানা তত্ত্ব ও ধারণার জন্ম দেয়। দ্বিতীয়ত, ইতিহাসের দেওয়া সব তথ্যই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিচার্য বিষয় নয়। অর্থাৎ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তুলনায় ইতিহাসের আলোচনার পরিধি অনেক বড়। তৃতীয়ত, ক্রমাগত পরিবর্তন ইতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, কিন্তু কাম্য কোনও অন্তিম লক্ষ্যের দ্বারা এই পরিবর্তন নিয়ন্ত্রিত হয় না। ইতিহাসের পরিবর্তন ঘটে সামাজিক শক্তিসমূহের মিথস্ক্রিয়ায় (interaction)। অন্যদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিবর্তনে বিশ্বাসী হলেও অনেক সময় তার এই পরিবর্তন নিয়ন্ত্রিত হয় পূর্ব নির্ধারিত প্রার্থিত লক্ষ্যের দ্বারা। এই বিচারে রাষ্ট্রবিজ্ঞান কখনও কখনও নীতিবাচক (normative)। কিন্তু ইতিহাস কখনই নীতিবাচক নয়।

গ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যা বা ধনবিজ্ঞান (Political Science and Economics)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে ধনবিজ্ঞানের নিবিড় সম্পর্ক অতি প্রাচীন কাল থেকেই স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে বার্তা বা অর্থনীতির পাশাপাশি সমান গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছিলেন দণ্ডনীতি বা রাজনীতি। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাঁর 'পলিটিক্স' গ্রন্থে অর্থনীতি আলোচনা করেছিলেন রাষ্ট্রনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে। অষ্টাদশ শতকের ইংরাজ চিন্তানায়ক অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) তাঁর অর্থনীতি সম্বন্ধীয় ওয়েল্‌থ অভ নেশন্‌স (Wealth of Nations) গ্রন্থে অর্থনীতির ওপর নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী বিষয়ে সূত্র রচনা করেছিলেন। ঊনবিংশ শতকে ইংল্যাণ্ডে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের নিবিড় সম্পর্ক এত প্রবলভাবে স্বীকৃতি লাভ করে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পঠিতব্য বিষয় হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ক্রমশ পরিচিত হতে থাকে Political Economy বা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি নামে। বিংশ শতাব্দীতে অর্থবিজ্ঞান ধীরে ধীরে গণিতের ওপর নির্ভরশীল হতে থাকে। অন্যদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নতুন বৈজ্ঞানিক চরিত্র লাভের মানসে ক্রমশ প্রাকৃত বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি ফেরায়। এর ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিজ্ঞানের মধ্যে একটা ব্যবধান গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু অতি সম্প্রতি আবার নতুন করে যোগাযোগের সেতু রচিত হচ্ছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের মধ্যে। এ বিষয়ে কোনও কোনও মহলে উৎসাহ এত প্রবল যে আবার নতুন করে Political Economy বা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি নামটি প্রচলনের প্রস্তাবও উঠেছে।

যাঁরা মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism)-এ বিশ্বাসী তাঁরা সমাজের অর্থব্যবস্থাকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌল ভিত্তি বলে গণ্য করেন। তাঁদের মতে প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োজন অনুসারে রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাজনৈতিক সংগঠনাদি নির্মিত হয়। তাই তাঁদের চোখে রাজনীতির স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রধান মাধ্যম হল অর্থনীতি। এককথায়, মার্ক্সবাদী মাপকাঠিতে ধনবিজ্ঞান হল রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনুধাবনের প্রাথমিক ধাপ।

অবশ্য মার্ক্সবাদ বর্জন করলেও আজকের দিনে ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অস্বীকার করা যায় না। আধুনিককালে প্রাগ্রসর (advanced) দেশগুলিতে রাষ্ট্র কল্যাণরাষ্ট্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ। এর ফলে এইসব দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় সংগঠন নানাবিধ অর্থনৈতিক কর্মোদ্যোগের সঙ্গে জড়িত। অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে বাদ দিয়ে কোনও অর্থবহ রাজনৈতিক আলোচনা বা বিশ্লেষণ হতে পারে না। এছাড়া জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টনের স্বার্থে এই কল্যাণরাষ্ট্রগুলিকে অনেক সময় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বা নীতির পুনর্বিন্যাস করতে হয়। এইভাবে অর্থনীতি প্রভাবিত করে রাজনীতিকে। অন্যদিকে কল্যাণরাষ্ট্রের ধারণাটি মূলত রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকেই আহৃত। কাজেই কল্যাণরাষ্ট্রের লক্ষ্য সামনে রেখে যখন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয় তখন অর্থনীতির ওপর রাজনীতির প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবার ভারতবর্ষের মত অনগ্রসর (under-developed) দেশে দ্রুত জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে জাতীয় স্তরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মত ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এই পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে একদিকে যেমন জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয় অন্যদিকে তেমনই সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও অধিকতর সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ, এক কথায় বলা যেতে পারে যে এই পরিকল্পনাগুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

অবশ্যই ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান দুটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র। তাদের প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। তবে বাস্তব সামাজিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের পরিধি প্রায়শই মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। এই মেলবন্ধন যত দৃঢ় হবে ততই বিষয়দুটি আরও পূর্ণ হয়ে উঠবে। সম্ভবত এই কথা মনে রেখেই কয়েক বছর আগে অর্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এমন এক অধ্যাপককে যিনি পেশায় একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী।

ঘ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যা (Political Science and Sociology)

জন্মের বিচারে সমাজবিদ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তুলনায় নিতান্তই নবীন। স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে সমাজবিদ্যার উদ্ভব হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন বহু শত বছরের উত্তরাধিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে অন্যতম প্রবীণ বিদ্যা হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ঊনিশ শতকের ইয়োরোপে শিল্পবিপ্লব (Industrial Revolution)-এর পরিপ্রেক্ষিতে সমাজজীবন এত বিস্তীর্ণ ও জটিল হয়ে ওঠে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের বহুবিধ ঘটনা ও বিষয় বিশ্লেষণ করা আর সম্ভব ছিল না। এই সম্প্রসারিত সমাজজীবনে দৃষ্টিপাতের উদ্দেশ্যেই সমাজবিদ্যার উদ্ভব হয়। সমাজবিদ্যার প্রবক্তারা বলতে থাকেন যে একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে সামাজিক প্রক্রিয়া অনুধাবনের বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে তাঁরা সামাজিক জীবনধারার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে উদ্যোগী হন।

যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা শুধুমাত্র রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ছিল ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিদ্যার সম্পর্ক বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে নি। অর্থাৎ সাবেকী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিদ্যার যোগসূত্র ছিল নিতান্তই ক্ষীণ। কিন্তু আধুনিককালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি আর রাষ্ট্রের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ ও আলোচনা চলে সমাজের বৃহত্তর পটভূমিতে। এই পরিস্থিতিতে আজকের দিনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক সর্বস্বীকৃত। বস্তুত, এই সম্পর্ক আজ এত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে রাষ্ট্রসমাজতত্ত্ব (Political Sociology) নামে নতুন একটি বিষয়ের চর্চা চলছে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র।

নিয়ন্ত্রণই হল রাজনীতির উৎস। এই নিয়ন্ত্রণ কেমন করে সর্বপ্রথম সমাজে দেখা দিয়েছিল তা জানতে গেলে সমাজ-বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার। অর্থাৎ নিজের জন্মসূত্র

নিরূপণের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমাজবিদ্যার সাহায্য নিতে হয়। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির যথার্থ সম্পর্ক নির্ণয় করতে গেলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নির্ভর করতে হয় সমাজবিদ্যার ওপর। কারণ ব্যক্তির প্রকৃতি এবং তার প্রয়োজন ও দাবি সম্পর্কে অবহিত হতে গেলে ব্যক্তির পরিবারের প্রকৃতি ও গঠন, তার পারিবারিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি, নানাবিধ সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে তার সম্পর্ক, সামগ্রিক সামাজিক সংস্কৃতি ও পরিবেশ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় ভাল করে জানতে হয় এবং এই জানার একমাত্র মাধ্যম হল সমাজবিদ্যা। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক ক্ষমতার গড়ন ও প্রয়োগ বোঝার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমাজবিদ্যার সাহায্যে সমাজের সর্বস্তরে ক্ষমতার সক্রিয়তার স্বরূপ বুঝে নিতে হয়। চতুর্থত, রাজনৈতিক আচরণ বিশ্লেষণ করতে গেলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমাজবিদ্যার দ্বারস্থ হতে হয়। কারণ বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশের প্রকৃতি না বুঝে কোনপ্রকার আচরণেরই বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

অন্যদিকে একইভাবে সমাজবিদ্যাও অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। সামাজিক সম্পর্কের চরিত্র বিচার করতে গিয়ে সমাজবিদ্যায় নানাবিধ সামাজিক সংগঠনের প্রকৃতি ও কার্যকলাপ আলোচিত হয়। মনে রাখা দরকার যে রাষ্ট্রও হল সমাজের এক অতি শক্তিশালী সংগঠন। কাজেই রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে সমাজবিদ্যার আলোচনা কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না এবং এই কারণেই সমাজবিদ্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, সামাজিক প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দুটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ধারা নয়। ফলত অনেক সময়েই দেখা যায় যে রাজনৈতিক উপাদান সমাজজীবন ধারায় উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারতবর্ষের আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা সনাতনী ভারতীয় জীবনধারায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহায়তা ছাড়া সমাজবিদ্যার আলোচনা অর্থবহ হতে পারে না।

যদিও অতি সম্প্রতি রাষ্ট্রসমাজতত্ত্বের উদ্ভবের ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার মধ্যে ব্যবধান অনেকটা ক্ষীণ হয়ে পড়েছে তবুও এখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সবাই স্বীকার করে নেন। বস্তুত, এই দুই বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য মেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ রাষ্ট্র ও সমাজ প্রকৃতপক্ষে দুটি আলাদা ক্ষেত্র। এ দুটিকে অভিন্ন বলে মেনে নিলে অতি বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখা দেবে। কারণ রাষ্ট্র সেক্ষেত্রে সমাজের সর্বস্তরে তার নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করে এক সর্বগ্রাসী মূর্তি ধারণ করবে। অতএব রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে পার্থক্যও মেনে নেওয়া উচিত। আরও মনে রাখা দরকার যে রাষ্ট্রের তুলনায় সমাজের পরিধি অনেক প্রসারিত এবং এই কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তুলনায় সমাজবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্র ব্যাপকতর।

ঙ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান (Political Science and Psychology)

একশ বছরের কিছু বেশী সময় আগে ইংরাজ লেখক ওয়াল্টার বেজহট (Walter Bagehot) তাঁর 'Physics and Politics' নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। এর চল্লিশ বছর পরে ইংরাজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গ্র্যাহাম ওয়ালাস রাজনীতিতে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের ক্রিয়াশীলতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ফ্রান্সের লেবঁ (Lebon), ইংল্যাণ্ডের ম্যাক্‌ডুগ্যাল (Macdougall), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ল্যাস্‌ওয়েল (Lasswell) প্রভৃতি লেখকেরাও রাজনীতির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে উদ্যোগী হন। আধুনিককালের রাজনীতির আচরণবাদী বিশ্লেষণও এক অর্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্কের স্বীকৃতি, কারণ মানবিক আচরণ মূলত মনোবিজ্ঞানেরই বিচার্য বিষয়। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে আধুনিক কালে প্রগতিশীল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিসাবে সুপরিচিত হার্বার্ট মার্কিয়ুস্ (Herbert Marcuse) তাঁর 'Eros and Civilisation' নামক গ্রন্থে ঘোষণা করেছিলেন যে "বর্তমান যুগে মানুষের

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মনোবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্র ও সমাজ দর্শনের মধ্যে সনাতনী সীমান্তরেখা অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে" (The traditional borderlines between psychology on the one hand and political and social philosophy on the other have been made obsolete by the condition of man in the present era)।

ব্রাইস (Bryce) বলেছিলেন যে মনোবিজ্ঞানের মধ্যেই নিহিত আছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল। কেউ কেউ এই উক্তিটিকে অতিশয়োক্তি বলে মনে করলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান যতই আধুনিক হচ্ছে এবং যতই বিজ্ঞানভিত্তিক হওয়ার চেষ্টা করছে ততই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা ও গবেষণায় মনোবিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করা হচ্ছে। যেমন ক্ষমতা বিশ্লেষণ করার সময় আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান জানতে চায় মানুষ কোন্ মানসিকতার ভিত্তিতে ক্ষমতায় আগ্রহী হয়, ক্ষমতা প্রয়োগ করে কোন্ ধরনের মানসিক চাহিদা পূরণ করতে চায়, ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দ্রুত প্রসারের ফলে বর্তমানে এমন অনেক বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিচারাধীন যেগুলির বিশ্লেষণে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। যেহেতু জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের ওপর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্ব নির্ভরশীল সেইহেতু জনসাধারণ কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে দেখে, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তাদের নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতা কী ভূমিকা পালন করে, রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপে তাদের কোন্ ধরনের মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় এবং ভোটদানের সময় তারা কতটা যুক্তিনির্ভর বা আবেগনির্ভর ইত্যাদি বিষয়ের বিচার বিশেষ প্রয়োজন এবং এখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সহায়তা করে মনোবিজ্ঞান। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান যখন গোষ্ঠীর কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে তখনও মনোবিজ্ঞানের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কারণ ব্যক্তির মানসিকতা কীভাবে গোষ্ঠী মানসিকতায় রূপান্তরিত হয়, গোষ্ঠীর আশ্রয় লাভ করে ব্যক্তি অধিক দায়িত্বশীল অথবা দায়িত্বহীন হয়ে পড়ে কিনা—এই সব প্রশ্নগুলি জরুরী হয়ে দেখা দেয় এবং এগুলির মীমাংসায় মনোবিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক প্রকৃতার্থে দ্বিমুখী নয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের ওপর অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করলেও মনোবিজ্ঞান কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়। এর ফলে দুটি বিষয়ের মধ্যে ব্যবধানও যথেষ্ট ব্যাপক। বস্তুত, মনোবিজ্ঞান হল দৃষ্টবাদী (positive) বিজ্ঞান, এতে মূল্যবোধের কোনও অবকাশ নেই। অন্যদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান যতই ব্যবহারিক (practical) হওয়ার চেষ্টা করুক না কেন আজও পর্যন্ত মূল্যবোধকে সে বর্জন করতে পারে নি।

চ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিবিদ্যা বা নীতিশাস্ত্র (Political Science and Ethics)

জন্মলগ্নে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গভীর আত্মীয়তা ছিল নীতিবিদ্যার সঙ্গে। কারণ গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংহত রূপ দান করেন তাঁর 'পলিটিক্স' গ্রন্থে এবং এই গ্রন্থে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করেন সম্পূর্ণভাবে নীতিশাস্ত্রের ভিত্তিতে। তিনি রাষ্ট্রীয় প্রাধিকারের নৈতিক ব্যাখ্যা দেন এবং বলেন যে ব্যক্তির সর্বোত্তম নৈতিক মঙ্গল সাধিত হয় রাষ্ট্রের দ্বারা, কাজেই রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য মূলত এক নৈতিক কর্তব্য। অ্যারিস্টটল প্রবর্তিত রাজনীতির প্রতি এই নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ষোড়শ শতাব্দীতে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেন ইতালিয় চিন্তানায়ক ম্যাকিয়াভেলি (Machiavelli)। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের সমস্ত সম্পর্ক অস্বীকার করেন এবং রাজনীতিকে বর্ণনা করেন পাশব শক্তির এক নির্দয় খেলা রূপে। ম্যাকিয়াভেলির পর থেকে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল ক্রমশই রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিমূল্য নিরপেক্ষ করে তোলার চেষ্টা করতে থাকেন। আর এক দল অ্যারিস্টটলের ঐতিহ্য অনুসরণ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজে প্রয়াসী হন। এই

দ্বিতীয় দলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি ছিলেন টি· এইচ· গ্রীণ (T.H. Green) যিনি নৈতিকতার সঙ্গে রাজনীতিকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করে ভিক্টোরীয় যুগের ইংল্যাণ্ডে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেন। টি· এইচ· গ্রীণের প্রভাব বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিবিদ্যাকে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে, দ্রুত রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর গড়ে উঠতে থাকে। অতি সম্প্রতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রবণতাই হল নীতিশাস্ত্রকে অস্বীকার করা। বস্তুত, আজকের দিনের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকেই মনে করে থাকেন যে নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে সংযোগ রাখার চেষ্টা করলে তা হবে আধুনিকতার পরিপন্থী।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে শুভবুদ্ধি ও ঔচিত্যবোধকে সদাজাগ্রত রাখাই নীতিশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নীতিশাস্ত্র বিশুদ্ধ উন্নয়ন ও কল্যাণের মাপকাঠিতে মানুষের ভাল ও মন্দ আচরণের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করে যা মানুষকে উচ্চতর ও মহত্তর মহিমা দিতে পারে তারই দিকে ধাবিত হতে অনুপ্রাণিত করে ব্যক্তিমানুষকে। এই কারণেই যা করা হয় তার চেয়ে যা করা উচিত তারই ওপর গুরুত্ব আরোপ করে নীতিশাস্ত্র। নীতিশাস্ত্রের এই মূল ধর্মের কথা মনে রাখলে স্বভাবতই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। মনে রাখা দরকার যে ব্যক্তির জীবনে যেমন আদর্শের প্রয়োজন আছে তেমনই রাষ্ট্রজীবনেও কতকগুলি আদর্শ নিয়মনীতি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই আদর্শের অবর্তমানে রাজনীতি বিপথগামী হলে তাকে বাধা দেওয়ার উপায় থাকে না। এই আদর্শ নিরূপণের জন্য রাজনীতির ক্ষেত্রেও ভাল ও মন্দ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার এবং এই ধারণা গড়ে উঠতে পারে একমাত্র নীতিশাস্ত্রের সহায়তায়।

যাঁরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জগৎ থেকে নীতিশাস্ত্রকে বিতাড়নের পক্ষপাতী তাঁরা মনে করে থাকেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ হল কেবলমাত্র রাজনৈতিক ঘটনা ও অবস্থার নির্ভুল বিশ্লেষণ, রাজনীতির উন্নতি সাধন নয়। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক। মানুষ যেমন গতিশীল, তেমনই তার রাষ্ট্র ও রাজনীতিও গতিশীল। কিন্তু গতিশীলতার অর্থ লক্ষ্যহীন পথচলা নয়। মহত্তর এক কল্যাণময় লক্ষ্য সামনে রেখে না এগোতে পারলে কোনও প্রগতিশীল পরিবর্তন সম্ভব নয় রাজনীতির ক্ষেত্রে। অতএব রাষ্ট্রবিজ্ঞান মূল্যবোধ নিরপেক্ষ (Value-free) হতে পারে না এবং এইজন্যই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের এক নিবিড় সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না।

অবশ্য নীতিশাস্ত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাঠামো একান্তই তার নিজস্ব, সেখানে নীতিশাস্ত্রের প্রত্যক্ষ কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য একটি নৈতিক কর্তব্য বলে বিবেচিত হলেও রাষ্ট্র এই আইন বলবৎ করার জন্য শুধুমাত্র ব্যক্তির নৈতিক বিবেচনার ওপর নির্ভর করতে পারে না, তাকে নির্ভর করতে হয় নির্ভেজাল আইনগত ব্যবস্থার ওপর। অর্থাৎ আইনরক্ষার স্বার্থে রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ ও প্রয়োজনে দণ্ডদানের অধিকারী। এর সরল অর্থ এই যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় যে নীতিশাস্ত্রের সাহচর্য যেন কখনই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট না করে।

অধ্যায় ২

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

১। রাষ্ট্র শব্দটির উদ্ভব ও তাৎপর্য (Origin and implications of the term)

রাষ্ট্র শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। অবশ্য অধিকৃত ভূখণ্ড এই অর্থে সেখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। ইয়োরোপে State বা রাষ্ট্র শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে ইতালিয় চিন্তানায়ক ম্যাকিয়াভেলি। অবশ্য রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায় সেকথা সবিস্তারে বর্ণনা করার চেষ্টা তিনি করেন নি। রাষ্ট্রের স্বরূপ সর্বপ্রথম বিশ্লেষণ করেন ষোড়শ শতকের শেষের দিকে ফরাসী চিন্তাবিদ বদাঁ (Jean Bodin)। সুবিন্যস্ত এক তত্ত্বের মাধ্যমে বদাঁ রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন এবং আজও রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার সময় বদাঁর অবদান উপেক্ষা করা যায় না।

মনে রাখা দরকার যে আমরা রাষ্ট্রসম্পর্কে আলোচনা করি, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অনুভব করি, কিন্তু রাষ্ট্রকে চোখে দেখতে পাইনে। অর্থাৎ, রাষ্ট্র মূলত একটি বিমূর্ত ধারণা, যদিও এই ধারণার গুরুত্ব অসীম। কেন এই ধারণার উদ্ভব হল সেই ব্যাপারটি আগে স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার। অন্যথায় রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্পর্কিত কোনও আলোচনাই অর্থবহ হবে না। ব্যক্তিমানুষ সমাজ ছাড়া বাঁচতে পারে না। কিন্তু যে মুহূর্তে সে সমাজের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয় সেই মুহূর্তে তাকে মেনে নিতে হয় এক ধরনের বন্ধন। কারণ ব্যক্তি তার অবাধ স্বাধীনতা হারায় সমাজবদ্ধতায়। একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ককে দৃঢ় শৃঙ্খলার মধ্যে রাখার জন্য প্রয়োজন হয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই হল সমাজের প্রাণ, একে বাদ দিলে সমাজের অস্তিত্ব থাকে না। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কালক্রমে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক শাসনের রূপ ধারণ করে। এই প্রাতিষ্ঠানিক শাসন ও নিয়ন্ত্রণ সমাজজীবনের অপরিহার্য ও চিরন্তন অঙ্গ। সমাজে ভাঙাগড়ার খেলা চলে, কিন্তু এই প্রাতিষ্ঠানিক শাসনব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। এই শাসনব্যবস্থার বহিরঙ্গে পরিবর্তন ঘটে এবং এর চালকও পরিবর্তিত হয়। কিন্তু মৌল শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চিরন্তন। সমাজজীবনের এই চিরন্তন সত্যটিকে ব্যক্ত করার জন্যই রাষ্ট্র এই ধারণার উৎপত্তি হয়েছে।

২। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা (Definition of State)

বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন বিভিন্নভাবে। তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় এই বিভিন্নতা। এদের মধ্যে একটি উপযুক্ত সংজ্ঞা বেছে নেওয়া দরকার। কারণ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশই হল রাষ্ট্রের স্বরূপ আলোচনার প্রাথমিক ধাপ। যেহেতু কোনও বিষয়ের সংজ্ঞা হল তার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহের সংক্ষিপ্ততম বিবরণী সেইজন্য রাষ্ট্রের উপযুক্ত সংজ্ঞা বাছাই করতে গিয়ে দেখা দরকার কোন্ সংজ্ঞাটির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যক্ত। এই মাপকাঠির বিচারে অধ্যাপক গার্নারের দেওয়া সংজ্ঞাটিই সর্বোৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে। গার্নারের মতে রাষ্ট্র বলতে বোঝায় "নির্দিষ্ট এক ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে নিবাসী এমন এক সংখ্যাল্প বা সংখ্যাধিক জনসমাজ যা বহির্নিয়ন্ত্রণ থেকে প্রায় বা সম্পূর্ণ মুক্ত এবং যার একটি সুসংগঠিত সরকার আছে যার প্রতি অধিবাসীদের প্রায় সকলেই স্বভাবত আনুগত্য স্বীকার করে" (The State... is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent, or nearly so, of external control and possessing an organised government to

which the great body of inhabitants render habitual obedience.)। গার্নারের সংজ্ঞাটি যথেষ্ট বিশদ সন্দেহ নেই, তবে এটি বড় দীর্ঘ। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম সংজ্ঞাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সংজ্ঞা দিয়েছিলেন ল্যাসওয়েল ও কাপলান তাঁদের 'Power and Society' নামক গ্রন্থে। তাঁদের মতে রাষ্ট্র হল একটি "সার্বভৌম ভৌগোলিক গোষ্ঠী" (Sovereign territorial group)। সংজ্ঞাটির ক্ষুদ্রায়তন আকর্ষণীয় সন্দেহ নেই, তবে এর মধ্যে রাষ্ট্রের সব বৈশিষ্ট্যগুলির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে গার্নারের সংজ্ঞাটি রাষ্ট্রের সব বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করে বটে, কিন্তু দীর্ঘায়তনের জন্য এটি ব্যবহারে অসুবিধা দেখা দেয়। সংজ্ঞা কোনও ক্ষেত্রেই দীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এমতাবস্থায় উল্লিখিত দুটি সংজ্ঞার সাহায্য নিয়ে ব্যবহারযোগ্য একটি নতুন সংজ্ঞা প্রণয়ন করা যেতে পারে। এই সংজ্ঞাটি হবে এইরূপ : রাষ্ট্র হল এক সুসংগঠিত সরকারের শাসনে অভ্যস্ত এক সার্বভৌম ভৌগোলিক জনগোষ্ঠী।

৩। রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ (Main characteristics of the State)

চারটি মৌল উপাদানের উপস্থিতি ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। অতএব বলা যেতে পারে যে রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চারটি। এগুলি হল : ১) জনসমষ্টি (Population), ২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (Definite Territory), ৩) সরকার (Government) এবং ৪) সার্বভৌমিকতা (Sovereignty)।

মানুষের সমাজজীবনে সংহতি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা। কাজেই একমাত্র সমাজের প্রেক্ষাপটেই চলে রাষ্ট্রের কার্যকলাপ। আবার সমাজের অর্থ হল একদল সংঘবদ্ধ মানুষ। অতএব জনসমাজ বা জনসমষ্টি ছাড়া রাষ্ট্র দেখা দিতে পারে না। এই জনসমষ্টির আয়তন সম্পর্কে কোনও ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। প্রাচীনকালে যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অনুন্নত এবং যখন উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদকে যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগিয়ে জাতীয় সম্পদের ক্রমাগত বৃদ্ধির সুযোগ ছিল না তখন স্বাভাবিক কারণেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা স্বল্প জনসংখ্যাকে রাষ্ট্রগঠনের উপযুক্ত উপাদান বলে মনে করতেন। কিন্তু আধুনিক কালের উন্নত পরিস্থিতিতে বিপুল জনসংখ্যা রাষ্ট্রগঠনের পক্ষে কোনও বাধার সৃষ্টি করে না। অবশ্য কোনও রাষ্ট্রে জনসমষ্টির তুলনায় জাতীয় উৎপাদন যথেষ্ট না হলে নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়। আবার জনসমষ্টির সামগ্রিক গুণগত উৎকর্ষ ও সৃজনধর্মী কাজে দক্ষতার ওপর রাষ্ট্রের শক্তি অনেকাংশে নির্ভরশীল। কাজেই জনসংখ্যা বিপুল হলেই একটি রাষ্ট্র উন্নত ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে আধুনিক রাষ্ট্রের জনসংখ্যার একাংশ হন বিদেশী অর্থাৎ অন্য কোনও রাষ্ট্রের নাগরিক এবং প্রজা অর্থাৎ পরাধীন কোনও দেশের প্রতিনিধি। এঁরা অবশ্যই সেই রাষ্ট্রের অংশ বলে বিবেচিত হন না।

জনসমষ্টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা তখনই সম্ভব যখন এই জনসমষ্টি নির্দিষ্ট কোনও ভূখণ্ডে অর্থাৎ ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ নির্দিষ্ট কোনও স্থানে স্থায়ীভাবে বাস করে। এইজন্যই নির্দিষ্ট ভূখণ্ড হল রাষ্ট্রের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যে জনসমষ্টি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ায় তাদের কোনও রাষ্ট্র থাকতে পারে না। ইহুদীদের জাতীয়ভাব প্রবল হওয়া সত্ত্বেও ১৯৪৮ সনের আগে তাদের বসবাসের কোনও নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ছিল না বলে তারা কোনও রাষ্ট্রগঠন করতে পারে নি। রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের আয়তন বড় হবে না ছোট হবে—এ বিষয়ে একসময় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হতেন। যেমন অষ্টাদশ শতকের ফরাসী চিন্তানায়ক রুশো মনে করতেন যে, যে রাষ্ট্র আয়তনে যত বেশী ক্ষুদ্র হবে সেই রাষ্ট্র তত বেশী শক্তিশালী হবে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে এইসব যুক্তির কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। জাপান ভারতবর্ষের তুলনায় আয়তনে অনেক ক্ষুদ্র হলেও তার শক্তি ভারতের তুলনায় কিছু কম নয়। রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড কেবলমাত্র রাষ্ট্রের অন্তর্গত

ভূপৃষ্ঠকেই বোঝায় না। ভূখণ্ডের অভ্যন্তরস্থ যাবতীয় খনিজ সম্পদ, সীমানার মধ্যে প্রবাহিত সকল নদ-নদী এবং নিকটবর্তী সামুদ্রিক জলরাশিকেও বোঝায়। পূর্বে সমুদ্রের বেলাভূমি থেকে তিন মাইল পর্যন্ত জলরাশি নিকটবর্তী রাষ্ট্রের অন্তর্গত বলে ধরা হত। বর্তমানে সব রাষ্ট্রই এই সীমারেখা বাড়ানোর পক্ষপাতী। ভারতবর্ষের বর্তমানে প্রচলিত আইন অনুযায়ী সমুদ্রোপকূল থেকে বারো মাইল পর্যন্ত সামুদ্রিক জলরাশি ভারতের ভৌগোলিক জলসীমা বলে বিবেচিত হয়। রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের উপরিস্থিত আকাশও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন। এই রাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়া অন্য দেশের বিমান এই অংশ আকাশ পথ হিসাবে ব্যবহার করতে পারে না।

জনসমষ্টি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করেও যদি অবস্থাটা এমন দাঁড়ায় যে এই জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী চলছে তাহলে সংগঠিত জনসমষ্টি রূপান্তরিত হয় উচ্ছৃঙ্খল জনতায়। তাই জনসমষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হয় সরকারের। এই কারণেই সরকার হল রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাষ্ট্রের পরিচালকমণ্ডলীই সরকার নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। সরকার হল রাষ্ট্রের সম্মিলিত সাধারণ ইচ্ছার প্রতীক। বস্তুত, রাষ্ট্রকে প্রত্যক্ষ করার একমাত্র মাধ্যম হল সরকার। রাষ্ট্রের সমগ্র নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাকে বজায় রাখে সরকার। কাজেই আইন প্রণয়ন, আইনের প্রয়োগ এবং আইনকে বলবৎ রাখার জন্য প্রয়োজনে দণ্ডবিধান—এইসব কাজই চলে সরকারের কর্তৃত্বাধীনে। এইজন্য সরকার বলতে শুধুমাত্র শাসনবিভাগকেই বোঝায় না ; আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ—এই তিনটি স্তরেই সরকার কার্যরত থাকে। সরকারের অবর্তমানে রাষ্ট্রীয় কর্মধারা অচল হয়ে পড়ে। এইজন্যই অনেকে সরকারকে রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক বলে অভিহিত করেছেন।

রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সার্বভৌমিকতা। অন্যান্য সব উপাদান থাকলেও যদি সার্বভৌমিকতার লক্ষণ দেখতে না পাওয়া যায় তাহলে রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সার্বভৌমিকতা যে রাষ্ট্রের নিশ্চিত লক্ষণ একথা সর্বপ্রথম বলেছিলেন ষোড়শ শতকের ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বঁদা। সার্বভৌমিকতার অর্থ হল চরম ক্ষমতা। রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। এই ক্ষমতা মূর্ত হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের আইনের মাধ্যমে। রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং সরকারও এই আইন মেনে চলতে বাধ্য। এছাড়া বহির্দেশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র বজায় রাখে তার সার্বভৌমিকতা। অর্থাৎ একটি রাষ্ট্র বিদেশী কোনও রাষ্ট্র বা শক্তির অধীন নয়। তার সমস্ত নীতি ও সিদ্ধান্তই বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতার পরিচায়ক হলেও আধুনিক কালে বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতাকে কিছুটা সীমাবদ্ধ হতে দেখা যায়। আজকের দিনে প্রতিটি রাষ্ট্রেই জাতীয় ভাবধারা ও সংস্কৃতি, প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতি এবং সংগঠিত জনমত রাষ্ট্রের আইনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে এবং এই অর্থে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়। একইভাবে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতার স্বার্থে এবং কখনও কখনও নিছক বাণিজ্যিক স্বার্থে আধুনিক রাষ্ট্রকে কিছু কিছু বাধানিষেধ মেনে নিতে হয়। এইভাবে বহির্বিষয়ক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা কতকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়। এছাড়া আধুনিক কালে একটি রাষ্ট্র যখনই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (The United Nations)-এর সদস্য হয় তখনই এই বিশ্বসংস্থার নীতি ও আদর্শের প্রতি আনুগত্য তাকে মেনে নিতে হয়। এই আনুগত্য তার অবাধ সার্বভৌমিকতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে কিছুটা বাধার সৃষ্টি করে।

ওপরে আলোচিত চারটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও কেউ কেউ আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। যেমন অনেকে স্থায়িত্ব (permanence)-কে রাষ্ট্রের একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এঁরা মনে করেন যে স্থায়িত্ব না থাকলে একটি রাষ্ট্রকে রাষ্ট্ররূপে অভিহিত করা যায় না। তবে বলা যেতে পারে যে মূল চারটি উপাদান নিশ্চিতভাবে উপস্থিত থাকলে একটি রাষ্ট্র স্থায়ী হবে এটাই স্বাভাবিক। কাজেই স্থায়িত্ব একটি নতুন বৈশিষ্ট্য নয়, এটি প্রকৃতপক্ষে মূল চারটি উপাদানেরই

সম্মিলিত স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। অনেকে আবার অন্যান্য রাষ্ট্র প্রদত্ত স্বীকৃতি (recognition by other states)-কে রাষ্ট্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বলে মনে করে থাকেন। মনে রাখা দরকার যে আন্তর্জাতিক আইনের চোখে অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি না পেলে একটি রাষ্ট্র রাষ্ট্ররূপে গণ্য হয় না। তবে আজকের দিনে স্বীকৃতির প্রশ্নটি প্রায়শই আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংকীর্ণতার দ্বারা কলুষিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ সর্ববিধ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়ে একটি রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করলেও অনেক সময় কোনও কোনও রাষ্ট্র সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে স্বীকৃতিদানে বিরত থাকে। যেমন গণপ্রজাতন্ত্রী চীন দীর্ঘকাল ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত বিশাল রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পায় নি শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে। সেইজন্য স্বীকৃতিকে রাষ্ট্রের আবশ্যিক উপাদান হিসাবে গণ্য করা সমীচীন নয়। কেউ কেউ পরিণত জাতীয়তাবাদ (nationalism)-কে রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন। তাঁদের মতে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে নিবাসী জনসমষ্টি যদি নিজেদের জাতি, দেশ, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে পরম অনুরাগের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয়তাবাদের জন্ম না দেয় তাহলে রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে নানা ঐতিহাসিক কারণের সমাবেশে। যেহেতু প্রতিটি রাষ্ট্রের জাতীয় ইতিহাসের ধারা স্বতন্ত্র সে কারণে সব রাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদের বিকাশ সমহারে হতে পারে না। এই কারণেই জাতীয়তাবাদী আবেগকে রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান বলে ভাবা উচিত নয়।

৪। ইংরাজিতে রাষ্ট্র শব্দের অপব্যবহারের উদাহরণ (Examples of the misuse of the term 'State' in English)

রাষ্ট্র শব্দটির ইংরাজি প্রতিশব্দ হল State। কখনও কখনও এই স্টেট শব্দটির অপব্যবহার চোখে পড়ে। অর্থাৎ স্টেট শব্দটি ব্যবহৃত হলেও তা রাষ্ট্রকে বোঝায় না। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলিকে স্টেট বলা হয়। কিন্তু অবশ্যই এই অঙ্গরাজ্যগুলি রাষ্ট্র নয়। একইভাবে ভারতীয় সংবিধানের প্রথম তপসিলে দ্য স্টেটস্ (The States) এই শিরোনাম দিয়ে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের বাইশটি অঙ্গরাজ্যের নাম দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধান পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি অঙ্গরাজ্যগুলিকে স্টেট বলে অভিহিত করেছে। কিন্তু স্টেট নামে ভূষিত হলেও এরা অবশ্যই কেউ রাষ্ট্র নয়।

পশ্চিমবঙ্গ বা সিকিম বা উত্তর প্রদেশ রাষ্ট্র নয় এই কারণে যে যদিও এদের মধ্যে জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং সরকার—এই তিনটি রাষ্ট্রীয় উপাদান বিদ্যমান তবুও এদের কারুরই সার্বভৌমিকতা নেই। ভারতীয় সংবিধান প্রদত্ত নির্দিষ্ট ক্ষমতাসীমানার মধ্যে এদের কাজ করতে হয় এবং এই সীমিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও কোনও কোনও সময় এদের ওপর আরোপিত হয় বাধানিষেধ। তাছাড়া বহির্বিষয়ক ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বা সিকিম বা উত্তর প্রদেশের কোনও স্বাধীন ও চূড়ান্ত ক্ষমতা নেই। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাধীনভাবে সম্পর্ক স্থাপনের কোনও অধিকার এদের নেই। অতএব পশ্চিমবঙ্গ বা সিকিম বা উত্তর প্রদেশ কাগজে কলমে স্টেট বলে অভিহিত হলেও এরা কেউই রাষ্ট্র নয়।

৫। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা রাষ্ট্রসংঘ কি একটি রাষ্ট্র ? (Is the United Nations a State?)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা রাষ্ট্রসংঘ যদিও অনেকগুলি রাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত একটি সংস্থা তবুও এটি রাষ্ট্র নয়। অবশ্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে একটি রাষ্ট্রীয় উপাদানের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এই উপাদানটি হল সরকার। জাতিপুঞ্জের অধীনস্থ সাধারণসভা, নিরাপত্তা পরিষদ ও আন্তর্জাতিক বিচারালয় রাষ্ট্রীয় আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগেরই প্রায় সমান্তরাল প্রতিষ্ঠান। তবে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য জাতিপুঞ্জে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যেমন জাতিপুঞ্জের কোনও জনসমষ্টি নেই কারণ রাষ্ট্রগুলিই এর সদস্য, রাষ্ট্রীয় জনসাধারণ এর সদস্য নয়। দ্বিতীয়ত, জাতিপুঞ্জের কোনও

নিজস্ব নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নেই। তৃতীয়ত, চূড়ান্ত বিচারে জাতিপুঞ্জ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয় কারণ জাতিপুঞ্জ স্বপ্রণীত আইন বলবৎ করার জন্য সবসময়ে যথাযোগ্য আইনগত ও নিগ্রহমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। অতএব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোনও বিচারেই রাষ্ট্র বলে বিবেচিত হতে পারে না।

৬। রাষ্ট্র ও সমাজ (State and Society)

প্রাচীন ইয়োরোপে রাষ্ট্র ছিল ক্ষুদ্রায়তন এবং সমাজজীবনও ছিল নিতান্ত সরল। এই কারণে সেই সময় রাষ্ট্র ও সমাজের সীমানা প্রায়ই মিলে মিশে একাকার হয়ে যেত। এইজন্যই গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় সমাজ ও রাষ্ট্রকে সমার্থক বলে মনে করেছিলেন যেহেতু তাঁর সমকালীন গ্রীক নগররাষ্ট্রে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনও ব্যবধান ছিল না। কালক্রমে ইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজজীবনে দ্রুত জটিলতা বাড়তে থাকে এবং বহু বৈচিত্র্যময় কর্মধারায় সমাজ আলোড়িত হতে থাকে। এই ব্যাপক সামাজিক কর্মযজ্ঞকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনা রাষ্ট্রের পক্ষে ছিল অসম্ভব। ফলত সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবধান স্পষ্ট হতে থাকে এবং এই ঐতিহাসিক সত্যের আলোকে রাষ্ট্রতত্ত্বের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে সমাজ থেকে আলাদা করে সর্বপ্রথম দেখেন ত্রয়োদশ শতকের ইয়োরোপীয় চিন্তানায়ক সেন্ট্ টমাস অ্যাকুইনাস (St. Thomas Aquinas)। তত্ত্বগত দিক থেকে এই ব্যবধানকে আরও স্পষ্ট করে তোলেন সপ্তদশ শতকের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন লক। লকের পর থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সমাজ ও রাষ্ট্রের পার্থক্য সবসময়েই স্বীকৃতি লাভ করে এসেছে।

আধুনিক কালে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য এত স্পষ্ট যে এ নিয়ে আজকের দিনে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আর তর্কে প্রবৃত্ত হন না। মানুষের প্রাচীনতম ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সমাজের উদ্ভব হয়েছিল রাষ্ট্রের জন্মের অনেক আগে। মানুষ নিজের প্রয়োজনের তাগিদেই একদিন সমাজবদ্ধ হয়েছিল এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই সমাজবদ্ধ জীবনের পটভূমিতেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে রাষ্ট্র। অতএব সময়ের বিচারে সমাজ রাষ্ট্রের অগ্রদূত। দ্বিতীয়ত, সামাজিক কর্মপ্রক্রিয়া ও রাষ্ট্রীয় কর্মপ্রক্রিয়ার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সমাজের পরিধি রাষ্ট্রের পরিধির তুলনায় অনেক ব্যাপক। যেসব বিষয়কে রাষ্ট্রের আইন ও শাসন স্পর্শ করতে পারে সেগুলিই আসে রাষ্ট্রের আওতায়। কিন্তু জটিল ও বিস্তীর্ণ সমাজজীবনের এমন অনেক বিষয় আছে যা রাষ্ট্রের আওতায় আনা সম্ভব নয় অথবা যেগুলিকে রাষ্ট্রের আওতায় আনার চেষ্টা করলে মানুষের জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ ব্যাহত হবে। যেমন মানুষের পারিবারিক জীবনের সুখদুঃখের ঢেউ, তার ধর্মবিশ্বাস, তার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চেতনা এবং তার সৃজনধর্মী কল্পনার বিকাশ—এসব কিছুই রাষ্ট্রের আওতায় পড়ে না। তৃতীয়ত, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের কর্মপরিধি অবশ্যই বাড়ে, কিন্তু সমাজের কর্মপরিধি বাড়ে আরও দ্রুতগতিতে। চতুর্থত, রাষ্ট্রকে চিহ্নিত করা যায় তার নির্দিষ্ট ভূখণ্ড দিয়ে। কিন্তু সমাজ কখনই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ভারতীয় সমাজ কেবলমাত্র ভারতীয় ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা ইংল্যাণ্ডে বসবাসকারী ভারতীয়রাও ভারতীয় সমাজের অংশ। পঞ্চমত, রাষ্ট্র সার্বভৌমিক ক্ষমতার অধিকারী এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই এই সার্বভৌম ক্ষমতার কেন্দ্র চিহ্নিত করা যায়। বস্তুত, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এই সার্বভৌম ক্ষমতার ওপরেই নির্ভরশীল। কিন্তু সমাজের কোনও সার্বভৌম শক্তি নেই। অর্থাৎ সমাজজীবন কোনও দমনমূলক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত নয়। তবু সমাজ চলে এবং সমাজ টিকে থাকে এবং এর একমাত্র ভিত্তি হল মানুষের স্বেচ্ছাদত্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গীকার। ষষ্ঠত, প্রতিটি রাষ্ট্রেরই একটি সুসংগঠিত সরকার থাকে। এই সরকারই হল রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রতিনিধি। কিন্তু সমাজের কোনও সরকার নেই বা শাসনব্যবস্থা নেই। সমাজ পরিচালিত হয় ঐতিহ্যবাহিত অনুশাসনের দ্বারা।

তবে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিবিধ পার্থক্য থাকলেও তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক অতি নিকট। মনে রাখা দরকার যে মানুষের কল্যাণ সাধনই হল সমাজের অন্তিম লক্ষ্য। রাষ্ট্রও দায়বদ্ধ এই একই লক্ষ্যের প্রতি। বস্তুত, সমাজের লক্ষ্যটিকে নির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করার জন্যই উদ্ভব হয়েছিল রাষ্ট্রের। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রকে তার কাজে কর্মে সবসময়েই বিশ্বস্ত থাকতে হয় সামাজিক জীবনধারার প্রতি। অর্থাৎ সমাজে প্রচলিত অভ্যাস ও সংস্কার, বিশ্বাস ও রীতিনীতিকে উপেক্ষা করলে রাষ্ট্রীয় প্রাধিকারের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়। তৃতীয়ত, সমাজ পরিবর্তনের প্রভাব অনিবার্যভাবে এসে পড়ে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ ও তার সংগঠনের ওপর। অন্যদিকে আবার রাষ্ট্রের কর্মধারাও সমাজজীবনকে প্রভাবিত করতে পারে। অনেকে মনে করে থাকেন যে ভারতীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির আধুনিক ক্রিয়াকলাপ ভারতীয় ঐতিহ্যের গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে ভারতীয় সমাজজীবনে আধুনিকতা সঞ্চারিত করেছে।

মার্ক্সবাদীদের মতে সমাজই হল রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি। তাঁদের অভিমত এই যে সমাজের শ্রেণীসম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয় রাষ্ট্র জীবনে। ফলত সমাজের শাসকশ্রেণী (ruling class)-ই রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সামাজিক শোষণ ও উৎপীড়ন বজায় রাখার স্বার্থেই ব্যবহৃত হয় রাষ্ট্রযন্ত্র।

৭। রাষ্ট্র ও সরকার (State and Government)

যতদিন পর্যন্ত একজন ব্যক্তি ছিলেন রাষ্ট্রের শাসক, অর্থাৎ, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হত না। প্রাচীনকালে তাই স্বৈরতান্ত্রিক ব্যক্তিশাসক সদম্ভে ঘোষণা করতে পারতেন যে তিনিই রাষ্ট্র। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার যতই প্রচলন হতে থাকে ততই রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা লোকায়ত (popular) রূপে স্বীকৃত হতে থাকে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই সরকার রাষ্ট্র থেকে পৃথক বলে বিবেচিত হতে থাকে। আধুনিকালে এই পার্থক্য সম্পর্কে প্রত্যেকেই সচেতন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে তাত্ত্বিক স্তরে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে ব্যবধানের কথা প্রথম উল্লেখ করেছিলেন বঁদা এবং এই ব্যবধান আরও স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছিল পরবর্তীকালে জন লকের রচনায়।

রাষ্ট্র হল সমগ্র এবং সরকার হল এই সমগ্রেরই একটি অংশ, যদিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যেমন সমগ্রের সঙ্গে অংশের অভিন্নতা কল্পনা করা যায় না তেমনই রাষ্ট্র ও সরকারকেও এক বলে ভাবা চলে না। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা মূলত সরকারের মধ্য দিয়েই প্রয়োগ করা হয় এবং রাষ্ট্রের সমবেত ইচ্ছা প্রকাশ পায় সরকারের মাধ্যমে। অর্থাৎ রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে একটি বিমূর্ত ধারণা এবং এই ধারণা বাস্তবায়িত হয় সরকারের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে। কাজেই সরকার ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না।

তবু রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে বিপুল পার্থক্য বিদ্যমান। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রের মধ্যে সাধারণত কোনও পার্থক্য করা হয় না। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার বিভিন্ন রকমের। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা করতে গেলে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের কথা ভেবে নিতে হয়। কিন্তু এই নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বাদ দিয়েই সরকারের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। তৃতীয়ত, রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সরকার এই সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম, কিন্তু সরকার সার্বভৌম নয়। রাষ্ট্রে প্রচলিত সাংবিধানিক ও সাধারণ আইনের প্রতি সরকারকেও অনুগত থাকতে হয়। চতুর্থত, রাষ্ট্র বলতে রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের আপামর জনসমষ্টিকে বোঝায়। অন্যদিকে এই জনসমষ্টির অতি ক্ষুদ্র এক অংশ নিয়ে সরকার গঠিত হয়। পঞ্চমত, মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী নন এমন সর্বশ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই মনে করেন যে রাষ্ট্র একটি চিরন্তন প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ, তাঁদের মতে রাষ্ট্র পরিবর্তনশীল নয়। অন্যদিকে সরকার

স্বভাবতই পরিবর্তশীল। প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শাসকগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সরকার পরিচালনা করে। এইভাবে সরকারে পরিবর্তন ঘটলেও তার কোনও প্রভাব রাষ্ট্রের ওপর পড়ে না, রাষ্ট্র সবসময়েই অপরিবর্তিত থেকে যায়। ষষ্ঠত, জনগণ সাধারণত সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করার অধিকার ভোগ করে; বিশেষ করে উদারনৈতিক গণতন্ত্র (liberal democracy)-এ এটি জনগণের স্বীকৃত অধিকার। কিন্তু কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই জনগণের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করার অধিকার নেই। রাষ্ট্রদ্রোহিতা সর্বত্রই অপরাধ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

এইসব পার্থক্য সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে সরকার রাষ্ট্রের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব সরকারের ওপরেই ন্যস্ত। রাষ্ট্রকে চোখে দেখা যায় না, এটি একটি তত্ত্বগত ধারণা। অন্যদিকে সরকারই হল রাষ্ট্রের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ। সম্ভবত এই কথা মনে রেখেই হ্যারল্ড ল্যাস্কি (Harold Laski) বলেছিলেন যে "ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সরকারই রাষ্ট্র" (The State, for all practical purposes, is the Government.)।

৮। রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান (State and other Associations)

বৈচিত্র্যময় সমাজের বহুমুখী কর্মধারা চালিত হয় বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান (association)-এর মাধ্যমে। বস্তুত, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মব্যস্ততাই প্রমাণ করে সমাজের সচলতা। এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি আপনাআপনি গড়ে ওঠে না। সমাজের কিছু মানুষ বিশেষ কোনও লক্ষ্যপূরণের জন্য অথবা নিজেদের সাধারণ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য স্বেচ্ছায় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন করে। এইভাবেই সমাজে ফুটবল ক্লাব অথবা শ্রমিক সংঘ, ধর্মসভা অথবা পাঠাগার, শিক্ষক সমিতি অথবা আইনজীবী সংঘের মত অসংখ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এইসব প্রতিষ্ঠানের সদস্যেরা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুগত থাকেন এবং প্রতিষ্ঠান-প্রণীত নিয়মকানুন যথাসাধ্য মেনে চলেন। আধুনিক কালে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই অ্যারিস্টটলের সূত্র অনুসরণ করে রাষ্ট্রকেও একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করেন। তাঁদের মতে কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই রাষ্ট্রের সৃষ্টি, অতএব রাষ্ট্রও একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা অ্যারিস্টটলের সিদ্ধান্তের সমর্থক তাঁরা মনে করেন যে রাষ্ট্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলেও এর অনন্য চরিত্র ও কার্যাবলী একে সমাজের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানরূপে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অনেক ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। অন্যদিকে বহুত্ববাদী (pluralist) রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রকে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সমগোত্রীয় বলে মনে করেন। অর্থাৎ, এককথায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে এ বিষয়ে একটি বিতর্ক রয়েছে এবং এই বিতর্কের মীমাংসা করতে গেলে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাষ্ট্রের মিল ও গরমিল কী কী তা ভালভাবে জানা দরকার।

রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই কিছু মিল আছে। যেমন রাষ্ট্রের মতই একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়তে প্রয়োজন হয় জনসমষ্টির। রাষ্ট্রকে চলমান রাখতে যেমন প্রয়োজন হয় সরকারের তেমনই সামাজিক প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্যও একটি নির্দিষ্ট পরিচালক গোষ্ঠী থাকে। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের সদস্যেরা রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলতে বাধ্য। তেমনই প্রতিষ্ঠানের সভ্যরাও প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে চলে।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। প্রথমত, রাষ্ট্রের সদস্যপদ বাধ্যতামূলক। প্রত্যেক ব্যক্তিকে কোনও না কোনও রাষ্ট্রের সদস্য হতে হয়। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন যে কোনও ব্যক্তি যদি কোনও রাষ্ট্রের সদস্য না হয় তাহলে ধরে নিতে হবে সে মানুষ নয়, সে পশু কিংবা দেবতা। অন্যদিকে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ স্বেচ্ছামূলক। একজন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় একটি ফুটবল ক্লাব অথবা পাঠাগারের সদস্য হয়। তাকে

কেউ জোর করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে। কয়েকজন ব্যক্তি যুক্তি-পরামর্শ করে হঠাৎ একদিন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে নি। কিন্তু অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি। তৃতীয়ত, রাষ্ট্র চরম নিগ্রহমূলক শক্তির অধিকারী। রাষ্ট্রের আইনভঙ্গ করার অপরাধে রাষ্ট্রের নাগরিককে কারারুদ্ধ করা যায়, এমনকী তার প্রাণদণ্ড হতে পারে। কিন্তু অন্য কোনও সামাজিক প্রতিষ্ঠানই এই চরম ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। চতুর্থত, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য যে কোনও একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যাপক। শিক্ষকসমিতির উদ্দেশ্য শিক্ষার উন্নয়ন ও শিক্ষকদের স্বার্থরক্ষা। অন্যদিকে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হল সামগ্রিক সামাজিক কল্যাণ। পঞ্চমত, একজন ব্যক্তি বিনা বাধায় একই সঙ্গে অনেকগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হতে পারেন। যেমন একজন আইনজীবী আইনজীবী সংঘের সভ্যপদ লাভ করেও একটি ফুটবল ক্লাবের সদস্য হতে পারেন। কিন্তু একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারেন। ষষ্ঠত, রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তার সার্বভৌমত্ব। রাষ্ট্র অন্য কারুর নিয়ন্ত্রণ বা নির্দেশের অধীন নয়। কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়। বস্তুত, এই কারণেই সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে কোনও না কোনওভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের আওতায় আসতে হয়। এছাড়া দুটি প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক বিবাদের ক্ষেত্রে এদের অনিবার্যভাবে রাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থার দ্বারস্থ হতে হয় এবং এর দ্বারাই এই প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর রাষ্ট্রের অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব প্রমাণিত হয়। সর্বশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী নন এমন সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই রাষ্ট্রকে এক শাশ্বত প্রতিষ্ঠান বলে মনে করে থাকেন। তাঁদের মতে সমাজের পরিবর্তন ঘটে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে পালাবদল হয়, কিন্তু রাষ্ট্র থাকে অপরিবর্তিত ও চিরন্তন হয়ে। অন্যদিকে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রের মত স্থায়িত্ব দাবি করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রেই তারা পরিবর্তিত হয় অথবা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের পর লুপ্ত হয়ে যায়।

অধ্যায় ৩

রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা

১। সার্বভৌমিকতার ধারণার তাৎপর্য ও ক্রমবিকাশ (Implication and Evolution of the concept of Sovereignty)

সমাজে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের পাশাপাশি কার্যরত থাকে নানাবিধ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এইসব সামাজিক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে রাষ্ট্রের স্থান ; তার কর্তৃত্ব প্রশ্নাতীত, তার নিয়ন্ত্রণ অমোঘ এবং তার প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য সার্বিক ও চিরন্তন। রাষ্ট্রের এই সর্বোচ্চতা (paramountcy) সম্পর্কে সকলকে নিরন্তর সচেতন রাখার উদ্দেশ্যে সার্বভৌমিকতা (sovereignty)-এর ধারণা প্রবর্তিত হয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে। স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক বর্ণনায় সার্বভৌমিকতা চিহ্নিত হয়েছে রাষ্ট্রের এক নিশ্চিত লক্ষণ রূপে।

সার্বভৌমিকতা অবশ্যই রাষ্ট্রের এক বিমূর্ত বৈশিষ্ট্য। একে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু প্রতিনিয়ত অনুভব করা যায়। বেদান্তের ব্রহ্মের মতই সার্বভৌমিকতা নিরাকার ও অদৃশ্য, অথচ চরম ও সর্বব্যাপী, এক, অখণ্ড ও পূর্ণ।সার্বভৌমিকতার ধারণা সর্বপ্রথম তাত্ত্বিক আকারে উপস্থাপিত করেন ষোড়শ শতকের ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বদাঁ সার্বভৌমিকতার ধারণার ক্রমবিকাশে সপ্তদশ শতকের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হব্‌স্ এবং অষ্টাদশ শতকের রাষ্ট্রতাত্ত্বিক রুশো ও ব্ল্যাকস্টোন (Blackstone)-এর অবদানও উপেক্ষণীয় নয়। ঊনবিংশ শতকে সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে সুবিস্তৃত তত্ত্ব প্রণয়ন করেন জন অস্টিন (John Austin)। জার্মান আইনবিদ্ গিয়ার্কে (Gierke) এবং ইংরাজ ঐতিহাসিক মেটল্যাণ্ড (Maitland)-এর অনুপ্রেরণায় বিংশ শতকের প্রথম কয়টি দশকে সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে নতুন করে প্রশ্ন ওঠে। ফিগিস (Figgis), দুগুই (Duguit), লিণ্ডসে (Lindsay), ল্যাস্কি (Laski) প্রমুখ বহুত্ববাদী (pluralist) রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার চরমতা ও সর্বাত্মকতা অস্বীকার করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাময়িকভাবে সার্বভৌমিকতার ধারণার গুরুত্ব হ্রাস পায়। তবে কিছুকালের মধ্যেই বাস্তব তথ্যের বিচারে বহুত্ববাদীদের যুক্তির দুর্বলতা প্রমাণিত হয়। ফলত রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় সার্বভৌমিকতার ধারণার যে একটি বিশেষ স্থান আছে—একথা আজকের দিনে আর কেউই অস্বীকার করেন না।

২। সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ (Definition and nature of Sovereignty)

সার্বভৌমিকতার স্বরূপ উপলব্ধি করতে গেলে তার সংজ্ঞা দিয়ে আলোচনা শুরু করা দরকার। সার্বভৌমিকতার প্রথম সংজ্ঞাটি দিয়েছিলেন বদাঁ। তিনি বলেছিলেন সার্বভৌমিকতা হল "নাগরিক ও প্রজাদের ওপর আইনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা" (Highest power over citizens and subjects, unrestrained by laws)। সার্বভৌমিকতার সংক্ষিপ্ততম সংজ্ঞা দিয়েছিলেন উইলোবি (Willoughby)। তাঁর মতে সার্বভৌমিকতা হল "রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ইচ্ছা" (Supreme will of the State)। অন্যদিকে বৃহত্তম ও বিস্তারিত সংজ্ঞাটি দিয়েছিলেন অস্টিন। তাঁর মতে "যদি কোনও সুনির্দিষ্ট মানবীয় প্রধান অনুরূপ কোনও প্রধানের বশ্যতা স্বীকারে অভ্যস্ত না হয় অথচ সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির অভ্যাসগত আনুগত্য লাভ করে তাহলে সেই সুনির্দিষ্ট প্রধান ঐ সমাজের সার্বভৌম রূপে পরিগণিত হবে" (If a determinate human superior not in the habit of obedience to a like superior receives habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is sovereign in that society)। এই তিনটি সংজ্ঞার মধ্যে উইলোবির সংজ্ঞাটি কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এটি নিতান্ত অস্পষ্ট। বস্তুত, ইচ্ছা কখনই ক্ষমতার সূচক নয়। অতএব 'চূড়ান্ত ইচ্ছা'কে সার্বভৌমিকতা

বলা যায় না। অস্টিন তাঁর সংজ্ঞায় সার্বভৌমের সুনির্দিষ্টতায় সবিশেষ আগ্রহী এবং তাঁর কাছে আনুগত্যই সার্বভৌমিকতার প্রধান মাপকাঠি। এগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না, তবে অস্টিনের সংজ্ঞায় সার্বভৌমিকতার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যই অনুপস্থিত। অন্যদিকে বদাঁর সংজ্ঞাটি পুরাতন হলেও যথেষ্ট মূল্যবান। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চরমতা, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ সকলের এই ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য এবং আইনের উর্ধ্বে সার্বভৌমিকতার অবস্থিতি—এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বদাঁর সংজ্ঞায় বিবৃত। মূলত বদাঁর সংজ্ঞার ওপর নির্ভর করে এবং সার্বভৌমিকতার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি স্মরণে রেখে আমরা এইভাবে সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারি : স্থায়ী ও অবাধ, অখণ্ড ও চূড়ান্ত আইনোর্ধ্ব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাই সার্বভৌমিকতা।

সার্বভৌমিকতা একটি বিমূর্ত ধারণা। তবে এর বাস্তব অবিভ্যক্তি ঘটে রাষ্ট্রীয় আইনব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ রাষ্ট্র যে সার্বভৌম তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এইখানে যে রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তি ও সংস্থা রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলতে বাধ্য। এছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে অথবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অথবা কোনও ব্যক্তি ও কোনও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধ ও বিবাদ দেখা দিলে তা মীমাংসা করার চূড়ান্ত অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রের। অবশ্য আইনের বিচারে রাষ্ট্র একটি ব্যক্তি (legal person) এই অর্থে যে রাষ্ট্র অন্যের বিরুদ্ধে নালিশ করতে পারে এবং যে কেউ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নালিশ করতে পারে। তবে আইনত ব্যক্তি হলেও রাষ্ট্রের অনন্যতা এইখানে যে সার্বভৌমিক ক্ষমতার বলে একমাত্র রাষ্ট্রই আইন প্রণয়নের অধিকারী। রাষ্ট্র আইনের অধীন নয়। চূড়ান্ত ক্ষমতা আইনে নিহিত থাকে না। এর প্রমাণ হল এই যে প্রয়োজনানুসারে আইনের পরিবর্তন হয় এবং সে পরিবর্তন সাধিত হয় রাষ্ট্রের দ্বারাই। আরও উল্লেখ্য যে রাষ্ট্রের আদেশ ও অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতেই সমাজে আইনগত ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়ে থাকে। নিজস্ব ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে এই যে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বিভিন্ন স্তরে প্রকট হয় একে বলা হয় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা (internal sovereignty)।

অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা ছাড়াও রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা (external sovereignty) আছে। বাহ্যিক সার্বভৌমিকতার অর্থ হল এই যে রাষ্ট্র তার যাবতীয় কর্মধারায় ও নীতি প্রণয়নে সমস্তরকমের বহির্নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। এই অর্থে রাষ্ট্র ভোগ করে বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা। বস্তুত, এই বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার পরিপূরক। কারণ বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা না থাকলে অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা অনেকাংশে অর্থহীন হয়ে পড়ে।

কেউ কেউ বলে থাকেন যে রাষ্ট্র আইন প্রণয়নের সময় জাতীয় ভাবধারা ও সংস্কৃতি, প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতি এবং সংগঠিত জনমতকে উপেক্ষা করতে পারে না। কাজেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা অনিয়ন্ত্রিত নয়। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে এই উপাদানগুলির অবশ্যই প্রভাব বিস্তারের সামর্থ্য আছে। কিন্তু এই প্রভাব স্বীকার করা বা না করার অন্তিম অধিকার রাষ্ট্রের। অর্থাৎ প্রভাব কখনই নিয়ন্ত্রণ নয়। অতএব রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা সীমাবদ্ধ একথা সহজে মেনে নেওয়া যায় না। বাহ্যিক সার্বভৌমিকতার বিশুদ্ধতা সম্পর্কেও কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন। এঁরা মনে করেন যে আন্তর্জাতিক আইনের বহুল ব্যবহার আধুনিক কালে রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমিকতাকে খর্ব করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন এখনও পর্যন্ত যথার্থরূপে বাধ্যতামূলক হয় নি। রাষ্ট্রের সদিচ্ছার ওপর আন্তর্জাতিক আইনের কার্যকারিতা নির্ভরশীল। অতএব আন্তর্জাতিক আইনের সক্রিয়তায় রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা ক্ষুণ্ণ হয় একথা বলা চলে না। একই কারণে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যতা রাষ্ট্রের অবাধ বাহ্যিক সার্বভৌমিকতার পরিপন্থী—এই যুক্তি নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয় না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হিসাবে আধুনিক রাষ্ট্রের যথেষ্ট দায়-দায়িত্ব আছে বটে, তবে একটি রাষ্ট্রকে এই দায়িত্ব পালনে বাধ্য করার মত ক্ষমতা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নেই। আবার

ক্ষেত্রবিশেষে এই ক্ষমতা থাকলেও তা প্রয়োগ করার মত দৃঢ় ইচ্ছা আজ পর্যন্তও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দেখাতে পারে নি। অতএব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অবস্থিতি প্রকৃত বিচারে আধুনিক রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমিকতার বিরুদ্ধ শক্তি নয়।

পরিশেষে মনে রাখা দরকার যে সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রেরই বৈশিষ্ট্য, সরকারের নয়। আধুনিক রাষ্ট্রে সরকারের প্রায়শই পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু এর দ্বারা রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতায় কোনও পরিবর্তন সূচিত হয় না। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা অপরিবর্তনীয়।

৩। সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Sovereignty)

রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মুখ্যত নির্ভরশীল সার্বভৌমিকতার ওপর। সার্বভৌমিকতার অবসানে রাষ্ট্রেরও অবসান ঘটে। এইজন্যই সার্বভৌমিকতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর স্থায়িত্ব। সমাজে নানা পরিবর্তন দেখা দিতে পারে, শাসনব্যবস্থার চরিত্র বদলাতে পারে, এক সরকারের পরিবর্তে আসে অন্য সরকার। কিন্তু রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা সবসময়েই থাকে অপরিবর্তিত। ভারতবর্ষে ১৯৭৭ সনে কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হয়েছিল জনতা দল শাসিত সরকার। এটা ছিল ভারতীয় রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। কিন্তু এর দ্বারা ভারত রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার কোনও পরিবর্তন ঘটে নি। সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের এক চিরন্তন মৌলিক উপাদান।

সার্বভৌমিকতার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল তার সর্বব্যাপকতা। রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের অধীন। এই অধীনতা অস্বীকার করার যে কোনও প্রয়াসই দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। প্রতিটি দেশে রাষ্ট্রপ্রধানকেও তাঁর পদে যোগদানের পূর্বে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে হয়। অবশ্য বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতেরা যে রাষ্ট্রের এলাকায় কর্মরত থাকেন সেই রাষ্ট্রের অধীন নন, তাঁদের আনুগত্য তাঁদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের প্রতি। তবে এই ঘটনার দ্বারা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার ব্যত্যয় প্রমাণিত হয় না। কারণ কোনও বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে নয়, আন্তর্জাতিক রীতিনীতির প্রতি নিছক সৌজন্যবশতই আধুনিক রাষ্ট্র বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের এই বিশেষাধিকার মেনে নেয়। যে কোনও রাষ্ট্র ইচ্ছা করলেই এই বিশেষাধিকার দানে বিরত থাকতে পারে। এছাড়া যে কোনও রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে যে কোনও বিদেশী রাষ্ট্রদূতকে বিতাড়িত করতে পারে।

মৌলিকতা, চরমতা ও সীমাহীনতা হল সার্বভৌমিকতার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। সার্বভৌমিকতা মৌলিক এই অর্থে যে এর দ্বারা সূচিত হয় ক্ষমতার অন্তিম স্তর যার কোন স্রষ্টা নেই, যা নিজেই নিজের স্রষ্টা। সার্বভৌমিকতা চরম ও সীমাহীন এই অর্থে যে রাষ্ট্রের ভিতরে ও বাইরে এমন কোনও শক্তি নেই যা একে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। রাষ্ট্র সমস্ত রকমের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। তাই সে সার্বভৌম। অস্বীকার করা যায় না যে সামাজিক জীবন ধারা ও জাগ্রত জনমতের কেন্দ্র থেকে সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতি নানাবিধ নির্দেশ প্রেরিত হয়। কিন্তু এই নির্দেশ মানা বা না মানার চূড়ান্ত অধিকার রাষ্ট্রের। অতএব রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা এগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে না। একইভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতি আনুগত্যও রাষ্ট্রের অবাধ ও সীমাহীন সার্বভৌমিকতার ওপর রেখাপাত করে না। কারণ এই আনুগত্য কোনও বহিঃশক্তির দ্বারা আরোপিত নয়, এই আনুগত্য প্রতিটি রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাদত্ত। কেউ কেউ মনে করে থাকেন যে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা তার সংবিধানের দ্বারা সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয়। কারণ সংবিধান প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে না, সংবিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় শাসনব্যবস্থার কাঠামো ও কার্যাবলী। এছাড়া মনে রাখা দরকার যে সংবিধান বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতারই অভিব্যক্তি। কারণ এই সংবিধান নির্মাণ করেছে রাষ্ট্র নিজেই এবং কোনও অভ্যন্তরীণ শক্তি বা বহিঃশক্তির নির্দেশে এই সংবিধান রচিত হয়নি।

অবিভাজ্যতা সার্বভৌমিকতার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য। সার্বভৌমিকতা চূড়ান্ত ও চরম বলেই তা

অবিভাজ্য। কারণ ক্ষমতা যদি একটি কেন্দ্রে সন্নিবদ্ধ না হয়ে দুই বা ততোধিক কেন্দ্রের মধ্যে বণ্টিত হয় তাহলে কোনও কেন্দ্রই চূড়ান্ত ক্ষমতার দাবি করতে পারে না কারণ বিভক্ত ক্ষমতা স্বভাবতই চরমতার সূচক নয়। এছাড়া এমতাবস্থায় ক্ষমতার বিভিন্ন কেন্দ্রগুলির মধ্যে চরম ক্ষমতার অধিকার নিয়ে বিরোধ দেখা দিতে পারে এবং কোনও সর্বময় কর্তৃত্বের অবর্তমানে এই বিরোধের মীমাংসা না হয়ে শুধু বিশৃঙ্খলাই বাড়ে যা ক্ষমতার সমগ্র ভিত্তিকেই দুর্বল করে দেয়। বহুত্ববাদী (pluralist) রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সার্বভৌমিকতার অবিভাজ্যতায় বিশ্বাসী নন। তাঁদের মতে, যেহেতু আধুনিক সমাজে ব্যক্তির আনুগত্য রাষ্ট্র ছাড়াও আরও বহুবিধ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি সেইহেতু আধুনিক সমাজ প্রকৃতপক্ষে এক বিকেন্দ্রিত সমাজ (federal society) যেখানে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের সঙ্গে সার্বভৌমিকতার অংশীদার। তবে বাস্তব বিচারে বহুত্ববাদীদের এই যুক্তি অসার বলেই প্রতিপন্ন হয়। কারণ অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ওপর রাষ্ট্রের অন্তিম কর্তৃত্ব এক অবিসংবাদিত সত্য। প্রতিটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানকেই রাষ্ট্রকৃত আইন মেনে চলতে হয়। এছাড়া সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ দেখা দিলে তার নিষ্পত্তি করার সর্বময় কর্তৃত্ব একমাত্র রাষ্ট্রের হাতেই।

হস্তান্তরের অযোগ্যতা হল সার্বভৌমিকতার পঞ্চম বৈশিষ্ট্য। সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ। কাজেই রাষ্ট্র তার অস্তিত্বের স্বার্থেই তার সার্বভৌমিকতা হস্তান্তরিত করতে পারে না। কারণ সার্বভৌমিকতা অন্য কাউকে অর্পণ করার অর্থ হল রাষ্ট্রের বিলুপ্তি। অনেক সময় যুদ্ধবিগ্রহের ফলে অথবা সন্ধি বা চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র তার ভূখণ্ডের কোনও অংশ অন্য রাষ্ট্রকে অর্পণ করে। কিন্তু এই ভূখণ্ডের পুনর্বিন্যাস সার্বভৌমিকতার হস্তান্তরকরণ বোঝায় না। সার্বভৌমিকতার এই বৈশিষ্ট্যটিকে মর্যাদা দেওয়ার জন্যই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে (Charter of the United Nations) প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সনদে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে জাতিপুঞ্জের সদস্যতার অর্থ এই নয় যে কোনও প্রকারে জাতিপুঞ্জের কাছে সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা হস্তান্তরিত হয়েছে।

৪। সার্বভৌমিকতার বিভিন্ন রূপ (Different Forms of Sovereignty)

ক) ব্যক্তিকেন্দ্রিক সার্বভৌমিকতা (Personal Sovereignty)

প্রাচীনকালে নির্ভেজাল রাজতন্ত্রের যুগে রাজাই ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হত তাঁর হাতে এবং তাঁর দাবি ছিল যে তিনিই রাষ্ট্র। তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছানুসারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করা হত এবং তিনি ছিলেন সমস্ত নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে। তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের দ্বারা প্রজার জীবন নিয়ন্ত্রিত হত এবং তাঁর অঙ্গুলি হেলনে প্রজার প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হতে পারত। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা ও রাজার ব্যক্তিগত ইচ্ছার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা সম্ভব ছিল না। একেই বলা যায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক সার্বভৌমিকতা। সময়ের বিবর্তনে রাজার অবাধ ও চরম ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে এবং কালক্রমে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সার্বভৌমিকতা বিলুপ্ত হয় আধুনিক রাষ্ট্রগুলিতে।

খ) নামসর্বস্ব সার্বভৌমিকতা (Titular Sovereignty)

কোনও কোনও দেশে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সার্বভৌমিকতা অবলুপ্ত হলেও এই ধরনের সার্বভৌমিকতার স্মারকচিহ্ন হিসাবে নামসর্বস্ব সার্বভৌমিকতা প্রচলিত আছে। অর্থাৎ, এইসব দেশে পুরানো দিনের মত চরম ও অবাধ রাজতন্ত্র অবশ্যই আর নেই, তবে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজতন্ত্র এখনও টিকিয়ে রাখা হয়েছে এবং এই রাজতন্ত্রকে যাবতীয় রাষ্ট্রক্ষমতার আধার হিসাবে ভাবা হয় যদিও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে এই ক্ষমতা প্রয়োগের কোনও অধিকার রাজার নেই। উদাহরণস্বরূপ বর্তমান ব্রিটেনের রাজতন্ত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। আজও ব্রিটেনের রানী দেশের সার্বভৌম হিসাবে

স্বীকৃত। তিনিই সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতার ধারক, তাঁর নামেই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় এবং দেশের শাসনকার্য চালানা হয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এই ক্ষমতার কণামাত্রও তিনি ভোগ করেন না। নামেই তিনি রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা, কাজেই তাঁর সার্বভৌমিকতা নামসর্বস্ব।

গ) আইনগত সার্বভৌমিকতা ও কার্যগত সার্বভৌমিকতা (De Jure and De Facto Sovereignty)

কখনও কখনও বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আইনত যিনি সার্বভৌম রূপে স্বীকৃত কার্যত তাঁর হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা নাও থাকতে পারে। এই অবস্থায় আইনগত সার্বভৌমিকতার সঙ্গে কার্যগত সার্বভৌমিকতার পার্থক্য করা হয়। দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণত আইনগত সার্বভৌমই কার্যত সার্বভৌম থাকেন। কিন্তু দেশ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হলে অথবা দেশে কোনও বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান দেখা দিলে অনেক সময় দেখা যায় যে আইনত যিনি সার্বভৌম আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর ক্ষমতার অবসান হয় নি, কিন্তু কার্যত এক বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জনগণের আনুগত্য ও সমর্থন পাচ্ছে। এমতাবস্থায় আইনগত সার্বভৌমের পাশাপাশি কার্যগত সার্বভৌমের অস্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য এই দুই ধরনের সার্বভৌমের সহাবস্থান সাময়িক ঘটনামাত্র। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কার্যগত সার্বভৌম জনগণের আনুগত্য দৃঢ়ভাবে করায়ত্ত করে নিজেকে শেষ পর্যন্ত আইনগত সার্বভৌম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। আবার কোনও কোনও সময় দেখা যায় যে আইনগত সার্বভৌম কালক্রমে কার্যগত সার্বভৌমকে অপসারিত করে নিজেকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। এই কারণেই অনেকে আইনগত সার্বভৌমিকতা ও কার্যগত সার্বভৌমিকতার পার্থক্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না।

ঘ) আইনানুগ সার্বভৌমিকতা ও রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা (Legal and Political Sovereignty)

আধুনিককালে আইনানুগ সার্বভৌমিকতাকে পৃথক করা হয় রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা থেকে যদিও একথা স্বীকার করা হয় যে এদুটিই পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বস্তুত, আইনানুগ সার্বভৌমিকতা হল বাইরের দিক আর ভিতরের দিকটি হল রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা। রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের চরম ক্ষমতাই আইনানুগ সার্বভৌমিকতা নামে পরিচিত। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদ রাষ্ট্রে সর্বব্যাপক আইন প্রণয়ন করে তাকেই আইনানুগ সার্বভৌম রূপে গণ্য করা হয়। উদাহরণ হিসাবে ব্রিটেনের রানী সহ পার্লামেন্ট (Queen-in-Parliament)-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। রানী সহ পার্লামেন্ট যেকোনও ধরনের আইন প্রণয়নের অধিকারী এবং এই আইনের কর্তৃত্ব চূড়ান্ত ও অবিসংবাদিত। অধ্যাপক ডাইসি (A.V. Dicey) এই আইনানুগ সার্বভৌমের পিছনে আর এক ধরনের সার্বভৌমের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন এবং তিনি এর নাম দিয়েছিলেন রাজনৈতিক সার্বভৌম। ডাইসিকে অনুসরণ করে অনেক আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই রাজনৈতিক সার্বভৌমের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। তাঁদের মতে, আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভোটাচরণ, সংগঠিত জনমত, রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠীর কার্যাবলী, বিভিন্ন গণপ্রচার-মাধ্যম ইত্যাদি প্রতিনিয়ত নানারকমের নীতি ও নির্দেশ সরবরাহ করছে এবং এগুলিকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা আইনানুগ সার্বভৌমের নেই। এইভাবেই, তাঁদের মতে, আইনানুগ সার্বভৌম নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে রাজনৈতিক সার্বভৌমের দ্বারা এবং আইনানুগ সার্বভৌম এই নিয়ন্ত্রণে এতই অভ্যস্ত যে রাজনৈতিক সার্বভৌমকে উপেক্ষা করে আইনানুগ সার্বভৌমের অস্তিত্ব ধারণা করা সম্ভব নয়। এই যুক্তির সত্যতা অবশ্যই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সমস্যা এই যে রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার উপাদানগুলি এতই অসংগঠিত ও বিক্ষিপ্ত যে রাজনৈতিক সার্বভৌম স্বভাবতই সুনির্দিষ্ট নয়। কিন্তু

সুনির্দিষ্টতা না থাকলে আইনের চোখে কোনও কিছুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হতে পারে না। কাজেই চূড়ান্ত বিচারে রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার কোনও আইনগত মূল্য বা তাৎপর্য নেই।

ঙ) লোকায়ত সার্বভৌমিকতা (Popular Sovereignty)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধ আন্দোলনের মূলে ছিল লোকায়ত সার্বভৌমিকতার ধারণা। এরপর গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলি যতই সবল হতে থাকে ততই জনপ্রিয় হয় লোকায়ত সার্বভৌমিকতার ধারণা। তাত্ত্বিক পর্যায়ে এই ধারণার ভিত্তি নির্মিত হয় রুশোর রাষ্ট্রচিন্তায়। অন্যদিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে লোকায়ত সার্বভৌমিকতার ধারণা প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করে অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধকে। চূড়ান্ত বিচারে জনগণই হল সার্বভৌমিকতার উৎস এবং সেই কারণে রাষ্ট্রে জনগণই প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌম—এই হল লোকায়ত সার্বভৌমিকতার মূল কথা। আরও বলা হয় যে আইনানুগ সার্বভৌম সার্বভৌমিকতার আনুষ্ঠানিক আধার মাত্র এবং এই আইনানুগ সার্বভৌম একমাত্র লোকায়ত সার্বভৌমিকতার পরিপ্রেক্ষিতেই ক্রিয়াশীল হতে পারে। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লোকায়ত সার্বভৌমিকতার ধারণা খুবই জনপ্রিয় সন্দেহ নেই, তবে এই ধারণা নিতান্তই অস্পষ্ট। জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার কোনও নির্ভরযোগ্য ও কার্যকর মাধ্যম নেই। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ ভোটদান করে সরকার গঠন করে বটে, তবে এর দ্বারা জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রমাণিত হয় না। কাজেই কঠোরভাবে আইনের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে লোকায়ত সার্বভৌমিকতার বাস্তব ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

অধ্যায় ৪

রাষ্ট্রের উৎপত্তিবিষয়ক মতবাদ

১। রাষ্ট্রের উৎপত্তিবিষয়ক মতবাদের তাৎপর্য (Implications of the theories of the Origin of the State)

বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদের প্রচলন ছিল। কী পরিস্থিতিতে কেমন করে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল—এই সত্য উদ্ঘাটনই ছিল এই সব মতবাদের মূল লক্ষ্য। আধুনিক বিচারের মানদণ্ডে এই মতবাদগুলির অধিকাংশই অসার ও ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় এই মতবাদগুলির বিশ্লেষণ আবশ্যিক হয়ে পড়ে কারণ এদের এক বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। এই ঐতিহাসিক মূল্য এই অর্থে যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত বিশেষ একটি মতবাদ যে সময়ে এটি প্রচারিত হয়েছিল সেই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার যথার্থ পরিচয় বহন করে। বস্তুত, আজকের দিনে এ বিষয়ে দ্বিমত নেই যে অধিকাংশ রাষ্ট্রের উৎপত্তিবিষয়ক মতবাদের ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে নির্ভেজাল অনুসন্ধিৎসা প্রেরণা হিসাবে কাজ করে নি। আসলে এক বিশেষ রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় রাষ্ট্রাধিনায়ককে তাঁর ক্ষমতার বৈধকরণের জন্য এক বিশেষ ধরনের যুক্তি ও তত্ত্বের ওপর নির্ভর করতে হত। এই যুক্তি ও তত্ত্বের সমন্বয়ে যে মতবাদ গড়ে উঠত তাকেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ হিসাবে ব্যবহার করা হত। কাজেই একথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদগুলির অধিকাংশ রাষ্ট্রের উদ্ভব বিষয়ে যথার্থ তথ্য না দিতে পারলেও এগুলি বিশ্লেষণ করে আমরা সঠিকভাবে জানতে পারি যে বিভিন্ন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রকর্ণধারেরা নিজেদের স্বার্থে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও ভিত্তি সম্পর্কে কী ধরনের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতেন। রাষ্ট্রের উৎপত্তিবিষয়ক মতবাদ আলোচনার সার্থকতা এইখানেই।

২। ঐশী উৎপত্তিতত্ত্ব বা ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ (Theory of Divine Origin)

রাষ্ট্র মানুষের সৃষ্টি নয়, ঈশ্বরের সৃষ্টি। সর্বশক্তিমান ভগবান তাঁর ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্র সৃষ্টি করে তাঁর জাগতিক প্রতিনিধির হাতে অর্পণ করেছেন রাষ্ট্রের শাসনভার। এই শাসক ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে স্বভাবতই নিরঙ্কুশ আধিপত্য ভোগ করবেন এবং যেহেতু ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি মানুষের আনুগত্য প্রশ্নাতীত সেইহেতু জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় শাসককে নিঃশর্ত আনুগত্য দান করবেন। এই হল ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের মূল কথা।

ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত প্রাচীনতম তত্ত্ব। অতি প্রাচীনকালে এই মতবাদের অস্তিত্বের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের শতপথ ব্রাহ্মণে রাজা চিত্রিত হয়েছিলেন ভগবান প্রজাপতির প্রতিনিধিরূপে। অবশ্য ভারতবর্ষের লিখিত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আমাদের দেশে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে নি। বস্তুত, নবম শতাব্দীতে মেধাতিথি তাঁর রচিত মনু-স্মৃতির ভাষ্যে কার্যত ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদকে খণ্ডন করেছিলেন। ইয়োরোপে গ্রীক ও রোমানরাও রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক ভিত্তি মেনে নিতে পারেন নি। ইয়োরোপে খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তন ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের সূচনা করে। বাইবেলে সেণ্ট পল রোমানদের বলেছিলেন যে সমস্তরকমের জাগতিক ক্ষমতার উৎসই হল ভগবানের ক্ষমতা। মধ্যযুগের নিশ্চল সামন্ততান্ত্রিক ইয়োরোপীয় সমাজে ধর্মসংস্কার যখন প্রবল তখনই ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী হয়। মধ্যযুগের অবসানে জাতীয় রাজতন্ত্র প্রবল হয়ে উঠলে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের বহুল ব্যবহার শুরু হয় ইয়োরোপে। ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স্ তাঁর স্বেচ্ছাচারী রাজকীয় ক্ষমতা প্রয়োগের সমর্থনে সরাসরি নির্ভর করেন ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের ওপর। ইংরাজ লেখক রবার্ট ফিল্‌মার (Sir

Robert Filmer) ১৬৮০ সনে প্রকাশিত তাঁর 'পেট্রিয়ার্কা' (Patriarcha) গ্রন্থে রাজকীয় প্রাধিকারের সমর্থনে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ প্রয়োগ করেন। প্রায় একই সময়ে ফরাসী লেখক বসুয়ে (Bishop Jacques Bossuet) তাঁর লিখিত দুখানি গ্রন্থে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদকে সমর্থন করেন। অন্যদিকে সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে ইংরাজ চিন্তাবিদ জন লকের রচনায় ফিল্‌মারের ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। অষ্টাদশ শতকে মার্কিনী লেখক টমাস পেন (Thomas Paine) ও ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। অবশ্য ১৬৮৮ সনে সংঘটিত ইংল্যাণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব (Glorious Revolution)-এর পরিপ্রেক্ষিতে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের অনুকূল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের অবসান ঘটে। গৌরবময় বিপ্লবের দ্বারা রাজশক্তি চিরতরে নিয়ন্ত্রিত হয়ে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটতে থাকে। অন্যদিকে বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির ফলে সমাজচিন্তায় ধর্মীয় বিশ্বাস ও অন্ধসংস্কারের প্রভাব ক্রমশই কমতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।

আজকের দিনে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের অসারতা এতই স্পষ্ট যে এর বিরুদ্ধে যুক্তিপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হলে তা হবে নেহাতই তাত্ত্বিক প্রয়াস ; স্বভাবতই এই বিরুদ্ধ যুক্তিগুলির ব্যবহারিক মূল্য অতি সামান্যই। রাষ্ট্রের ঐশী উৎপত্তি তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অবৈজ্ঞানিক। ঈশ্বরের ইচ্ছা নিরূপণের ব্যাপারে কোনও বৈজ্ঞানিক সূত্র আজ পর্যন্তও আবিষ্কৃত হয় নি। অতএব ঈশ্বরেচ্ছায় রাষ্ট্রের সৃষ্টি এই ধারণার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। দ্বিতীয়ত, এই মতবাদ অনৈতিহাসিক। মানুষের ইতিহাস ঈশ্বর কর্তৃক রাষ্ট্রসৃষ্টির কোনও সাক্ষ্য বহন করে না। অতএব ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের পিছনে ইতিহাসের সামান্যতম সমর্থনও নেই। তৃতীয়ত, ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ অযৌক্তিক, এর মধ্যে স্পষ্টতই যুক্তিভ্রান্তি লক্ষ করা যায়। যদি ধরে নেওয়াই যায় যে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন রাষ্ট্র তাহলেও প্রশ্ন ওঠে যে কোন্ বিবেচনায় বা কিসের ভিত্তিতে অন্য কাউকে বাদ দিয়ে রাজাকেই তিনি নিজের প্রতিনিধিরূপে মনোনীত করেছিলেন। ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদে এই প্রশ্নের কোনও জবাব পাওয়া যায় না। আবার রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করলে তার নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারকে ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলেই গ্রহণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে করুণাময় ও মঙ্গলময় ঈশ্বরের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। চতুর্থত, ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ এক অতি বিপজ্জনক তত্ত্ব কারণ এই তত্ত্বের দোহাই দিয়ে রাষ্ট্রশাসক চরম স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে। বস্তুত, এই তত্ত্বের সুযোগ নিয়ে ইংল্যাণ্ডের স্টুয়ার্টবংশীয় রাজারা রাজক্ষমতার সীমাহীন অপব্যবহার করছিলেন বলেই সপ্তদশ শতকের ইংল্যাণ্ডে শেষ পর্যন্ত জ্বলে ওঠে পিওরিটান বিপ্লব (Puritan Revolution)-এর আগুন। পঞ্চমত, ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ নিঃসন্দেহে পক্ষপাতদুষ্ট। কারণ এই তত্ত্ব শুধুমাত্র রাজতন্ত্রের বা স্বৈরতন্ত্রের সমর্থনেই প্রয়োগ করা সম্ভব। অবাধ ব্যক্তিশাসন ছাড়া অন্য কোনরকম শাসনব্যবস্থাতে এই তত্ত্বের কোনও প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। কাজেই এই তত্ত্বের কোনও আধুনিকতা নেই।

এই অসংখ্য বিরুদ্ধ যুক্তির ভিড়ে অবশ্য ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের গুরুত্ব ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এর গুরুত্ব নিহিত আছে এর ঐতিহাসিক মূল্যে। পৃথিবীতে একদিন ধর্ম কীভাবে আচ্ছন্ন করেছিল রাজনৈতিক চিন্তাকে, কীভাবে ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করে ব্যক্তিশাসক তাঁর স্বৈরাচারী শাসন অব্যাহত রাখতে চেয়েছিলেন—এই ঐতিহাসিক সত্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে গেলে অনিবার্যভাবেই ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। এককথায়, ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়কে জানার অন্যতম মাধ্যম হল রাষ্ট্রের ঐশী উৎপত্তি তত্ত্ব।

৩। বলপ্রয়োগের মতবাদ (Theory of Force)

বলপ্রয়োগ তত্ত্বানুযায়ী বল বা পাশবশক্তিই হল রাষ্ট্রের উৎস এবং বলপ্রয়োগের ওপরেই নির্ভর করে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব। গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস ছিলেন বলপ্রয়োগ তত্ত্বের আদি প্রবক্তা। তাঁর

বহুশত বছর পরে ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে ইতালিয় রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ম্যাকিয়াভেলি বলকে রাষ্ট্রের উৎস ও ভিত্তিরূপে বর্ণনা করেন। এছাড়া কোঁৎ (Comte), হার্বার্ট স্পেন্‌সার (Herbert Spencer), ট্রিট্‌স্কে (Treitschke), লীকক (Leacock), ওপেনহাইমার (Oppenheimer), জেংক্স (Jenks) প্রভৃতি চিন্তাবিদেরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে বলপ্রয়োগের মতবাদটিকে সমর্থন করেছেন। এঁদের প্রদত্ত যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করলে সাধারণভাবে বলপ্রয়োগ তত্ত্বের দুটি প্রধান দিকের সন্ধান পাওয়া যায়। এ দুটি দিকের একটি হল ঐতিহাসিক এবং অন্যটি হল সামাজিক মনস্তত্ত্বভিত্তিক। ইতিহাস পর্যালোচনা করে বলপ্রয়োগ মতবাদের প্রবক্তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে মানুষের ইতিহাস মূলত বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সাফল্য ও জয়লাভের ইতিহাস এবং শক্তিপ্রয়োগের ঘটনাবলীর আবর্তনের মধ্য দিয়েই পৃথিবীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। তাঁরা দেখিয়েছেন যে প্রাচীনকাল থেকেই সমাজের অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হত বাহুবলের ভিত্তিতে। একজন শক্তিশালী যোদ্ধা বলপ্রয়োগ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করত গোষ্ঠীপতি হিসাবে এবং ক্রমশ অন্যান্য গোষ্ঠীকে নিয়ে আসত নিজের অধীনে। এইভাবে বলপ্রয়োগ ও যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্র। আবার রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার পরেও বলপ্রয়োগের নীতি অব্যাহত রাখতে হয়। কারণ সাধারণ মানুষ, ম্যাকিয়াভেলির ভাষায়, অকৃতজ্ঞ, অস্থির, মিথ্যাচারী, কাপুরুষ ও লোভী। এইসব কুপ্রবৃত্তির মোকাবিলা করে রাষ্ট্রে স্থিরতা ও সংহতি আনতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন হয় বলপ্রয়োগ ও ভীতিপ্রদর্শনের। অতএব বলই হল রাষ্ট্রের উৎস এবং ভিত্তি।

ইতিহাসের বিচারে এবং বাস্তব সত্যের নিরিখে বলপ্রয়াগ তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভ্রান্ত একথা বলা যায় না। ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ সন্ধিক্ষণে যুদ্ধবিগ্রহ ও পাশবশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যে রাষ্ট্রের কখনও কখনও উদ্ভব ঘটেছে একথা অস্বীকার করা যায় না। আবার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলি যে প্রয়োজনে নাগরিকদের ওপর বলপ্রয়োগ করে থাকে এও এক নির্মম রাজনৈতিক সত্য। কিন্তু তবু বলপ্রয়োগ মতবাদ সমর্থনযোগ্য নয় কারণ এটি একটি একপেশে ও বিপজ্জনক মতবাদ। এই তত্ত্বের প্রধান ত্রুটি এই যে এটি বলকেই রাষ্ট্রগঠনের ও রাষ্ট্রপরিচালনার একমাত্র উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে নিতান্ত একপেশে হয়ে পড়ে। বল যেমন রাষ্ট্রের উদ্ভবের পিছনে একটি উপাদান হিসাবে কাজ করেছে তেমনই আরও বিভিন্ন উপাদানও একই সঙ্গে কার্যকর হয়েছে। বর্তমান ভারতরাষ্ট্রের উদ্ভবের পিছনে যেমন সশস্ত্র জাতীয় সংগ্রামের অবদান ছিল তেমনই অবদান ছিল গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন অহিংস আন্দোলনের এবং ভারতবাসীর জাগ্রত নৈতিক ও আত্মিক শক্তির। কাজেই বলপ্রয়োগ মতবাদকে অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করলে ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন বিশ্লেষণে বিশ্বাসী হতে হয় যা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক। আবার রাষ্ট্রের অধীনে যে নিগ্রহমূলক ব্যবস্থা কার্যরত থাকে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। আইন ও শৃঙ্খলার স্বার্থে রাষ্ট্র অবশ্যই বলপ্রয়োগ করে থাকে। কিন্তু এই বলকেই রাষ্ট্রীয় প্রাধিকারের একমাত্র ভিত্তি বলে গ্রহণ করলে শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের নৈতিক ভিত্তিকে অস্বীকার করা হয় এবং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নাগরিকেরা রূপান্তরিত হয় খোঁয়াড়ে বদ্ধ ভয়ার্ত জন্তুর গোষ্ঠীতে। বস্তুত, ভয়ের দ্বারা, জোর করে আনুগত্য আদায় করা যায় বটে, কিন্তু সে আনুগত্য হয় নিতান্ত ভঙ্গুর। নাগরিকেরা রাষ্ট্রের প্রতি এক স্থায়ী আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয় এই কারণে যে রাষ্ট্রের কল্যাণকর কাজের পরিপ্রেক্ষিতে তারা রাষ্ট্রীয় প্রাধিকার সম্পর্কে এক যুক্তিময় সদিচ্ছা পোষণ করে তাদের অন্তরে। উনিশ শতকের ইংরাজ রাষ্ট্রদার্শনিক টি· এইচ· গ্রীণ (T. H. Green) যথার্থই বলেছিলেন যে "বল নয়, নাগরিকদের সদিচ্ছাই হল রাষ্ট্রের ভিত্তি" (Will, not force, is the basis of the State)। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে যাঁরা ম্যাকিয়াভেলির মত সাধারণ মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে বলপ্রয়োগের উপযোগিতা প্রমাণ

করার চেষ্টা করেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে মানুষের চরিত্রের অবমূল্যায়ন করে থাকেন। মানুষ সাধারণ প্রাণী নয়। তার মধ্যে অনেক উচ্চতর গুণ ও মহিমা বিদ্যমান। কাজেই মানুষ সম্পর্কে ছোট ধারণা নিয়ে রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রণয়নে অগ্রসর হলে তার মহত্ত্বের অবমাননা করা হয়।

বলপ্রয়োগ মতবাদের বিপজ্জনক দিকটিও উপেক্ষণীয় নয়। এই তত্ত্ব যে কোনও দুরাচারী ও স্বৈরাচারী শাসকের হাতে তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারে। বলই হল রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি—এই যুক্তিতে রাষ্ট্রশাসক নিরন্তর বলপ্রয়োগ করে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলতে পারেন। এছাড়া বলপ্রয়োগ তত্ত্ব গণতান্ত্রিক আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। বলের ওপর নির্ভর করলে জনমতের ওপর নির্ভর করতে হয় না, অথচ জনমতই হল গণতন্ত্রের অন্যতম রক্ষাকবচ। আবার বলপ্রয়োগের পথে স্বাভাবিকভাবেই পদদলিত হয় স্বাধীনতা, সাম্য প্রভৃতি মূল গণতান্ত্রিক আদর্শ। সর্বোপরি বলপ্রয়োগ তত্ত্বের ব্যবহার রাষ্ট্রকে অনিবার্যভাবে যুদ্ধপ্রবণ করে তোলে এবং সব রাষ্ট্রই এই তত্ত্বে বিশ্বাসী হলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহ বিশ্বশান্তিকে বিঘ্নিত করে পৃথিবীর সমগ্র মানব সমাজেরই চরম বিপদ ডেকে আনবে।

৪। সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Theory of Social Contract)

ক) সামাজিক চুক্তিতত্ত্বের বিবরণ :

রাষ্ট্রের উৎপত্তিবিষয়ক তত্ত্বগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল সামাজিক চুক্তি মতবাদ ; এটি সবচেয়ে বেশী আলোচিত তত্ত্বও বটে। সামাজিক চুক্তি মতবাদের তিন সুবিখ্যাত প্রবক্তা ছিলেন সপ্তদশ শতকের ইংরাজ রাষ্ট্রচিন্তাবিদ টমাস হব্‌স্ (Thomas Hobbes) ও জন লক (John Locke) এবং অষ্টাদশ শতকের ফরাসী রাষ্ট্রদার্শনিক রুশো (Rousseau)। রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে এঁরা চুক্তিমতবাদী (Contractualists) দার্শনিক নামে পরিচিত। হব্‌সের সামাজিক চুক্তি মতবাদ বিধৃত হয়েছিল তাঁর লিখিত 'লিভায়াথান (Leviathan) গ্রন্থে, লক তাঁর তত্ত্ব পেশ করেছিলেন তাঁর গ্রন্থ 'টু ট্রিটীজেস্ অভ গভর্ণমেন্ট' (Two Treatises of Government)-এর দ্বিতীয়ভাগে এবং রুশোর সামাজিক চুক্তি পরিবেশিত হয়েছিল তাঁর 'সামাজিক চুক্তি' (The Social Contract) নামক গ্রন্থে। হব্‌স্, লক ও রুশোর তত্ত্বের মধ্যে নানাদিকের বিচারে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। তবে রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূল প্রক্রিয়া ব্যাপারে তাঁরা তিনজনেই ছিলেন একমত। অর্থাৎ তিনজনেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে স্বেচ্ছাকৃত সামাজিক চুক্তির মাধ্যমেই উদ্ভব হয়েছিল রাষ্ট্রের। এই কারণেই চিন্তাবিদ হিসাবে তাঁদের সমগোত্রীয় ভাবা হয় এবং তাঁদের বক্তব্যগুলির মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে সামাজিক চুক্তি মতবাদ নামে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত এক সাধারণ তত্ত্ব আলোচিত হয়ে থাকে।

হব্‌সের তত্ত্ব : সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রথম কথা এই যে ইতিহাসে এমন একটা সময় ছিল যখন রাষ্ট্রের কোনও অস্তিত্বই ছিল না, যখন রাষ্ট্রহীন মানুষ বাস করত প্রকৃতির রাজ্যে (State of Naure)। এই প্রকৃতির রাজ্যে বসবাসকারী ব্যক্তিরা ভোগ করত সাম্য ও স্বাধীনতা। তবে এখানকার প্রকৃত অবস্থা ও পরিবেশ সম্পর্কে হব্‌স্, লক ও রুশো কল্পনা করেছেন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। হব্‌সের মতে, প্রকৃতির রাজ্যে ছিল অশান্তি ও সংঘাত। অধিবাসীদের সকলেই একই লক্ষ্যবস্তুর দিকে ধাবিত ছিল বলে তাদের মধ্যে দেখা দেয় তীব্র প্রতিযোগিতা। এছাড়া একে অপরকে ক্ষমতায় ছাড়িয়ে যাবে এই ভয় এবং প্রত্যেকেরই প্রধান বলে স্বীকৃত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সকলকেই লিপ্ত করে সংঘাতে। এই প্রতিযোগিতা ও সংঘাতের ফলে প্রকৃতির রাজ্য কালক্রমে পরিণত হয় যুদ্ধক্ষেত্রে এবং মানুষের জীবন হয়ে ওঠে "নিঃসঙ্গ, দরিদ্র, কদর্য, পাশব ও সংক্ষিপ্ত" (solitary, poor, nasty, brutish and short)। আত্মরক্ষার তাগিদে প্রকৃতির রাজ্যের অধিবাসীরা এই বিপজ্জনক-পরিস্থিতি থেকে মুক্তিলাভে প্রয়াসী হয়। তারা অনুভব করে যে প্রবলতম কোনও

শক্তির কাছে তারা সকলে মিলে আত্মসমর্পণ করলে তাদের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষিত হবে। এই উদ্দেশ্যে তারা সকলে নিজেদের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদন করে অসীম ক্ষমতাশালী এক সার্বভৌম ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদের হাতে অর্পণ করল তাদের যাবতীয় প্রাকৃত ক্ষমতা ও অধিকার এবং বিনিময়ে এই সার্বভৌম শক্তির কাছ থেকে পেল শান্তি ও নিরাপত্তা। এই সার্বভৌম শক্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভব হল রাষ্ট্রের। সার্বভৌম শক্তির আদেশ প্রচলিত হল আইনরূপে এবং চুক্তি অনুযায়ী সকলেই এই আইনের প্রতি অনুগত থাকতে বাধ্য হল। এইভাবে রাষ্ট্রীয় প্রাধিকার ও তার প্রতি নাগরিকদের বাধ্যতামূলক আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং এইভাবেই চলমান হল আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা।

লকের তত্ত্ব : লকের কল্পিত প্রকৃতির রাজ্যে হবসের প্রকৃতির রাজ্যের মত যুদ্ধাবস্থা ছিল না, এ ছিল প্রকৃতই শান্তির রাজ্য। এরাজ্যের অধিবাসীরা নানাবিধ প্রাকৃতিক অধিকার ভোগ করত যাদের মধ্যে অন্যতম ছিল জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার। প্রকৃতির রাজ্যে বিরাজিত ছিল শান্তি ও শৃঙ্খলা। অর্থাৎ একধরনের সংঘটিত সামাজিক জীবনের অস্তিত্ব ছিল এই প্রকৃতির রাজ্যে। এই সামাজিক জীবন সম্ভব ছিল এই কারণে যে লকের কল্পিত প্রকৃতির রাজ্যে একধরনের আইনের শাসন প্রচলিত ছিল। এই আইন অবশ্য আধুনিক রাষ্ট্রীয় আইনের মত লিখিত ছিল না। এই আইন ছিল অলিখিত প্রাকৃতিক নিয়ম যা ছিল প্রকৃতপক্ষে যুক্তির অনুশাসন। তবে প্রকৃতির রাজ্যের সবাই যুক্তিপ্রবণ (rational) ছিল বলে তারা স্বভাবতই অনুগত ছিল প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি। এই কারণেই লকের চিত্রিত প্রকৃতির রাজ্যে কোনও গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলা ছিল না। কিন্তু লকের মতে কালক্রমে এই প্রকৃতির রাজ্যে গুরুতর অসুবিধা দেখা দিল। যেহেতু প্রাকৃতিক আইন ছিল অলিখিত সে কারণে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী প্রাকৃতিক আইনের ব্যাখ্যা করত। এছাড়া এই প্রাকৃতিক আইন বলবৎ করার জন্য কোনও নির্বাহিক না থাকার ফলে এবং এই আইনভঙ্গের বিচার করার জন্য কোনও সাধারণ বিচারক না থাকার জন্য অধিবাসীদের প্রত্যেকেই প্রাকৃতিক আইনভঙ্গের ক্ষেত্রে নিজের হাতে তুলে নিত দণ্ডদানের অধিকার। এই ছিল প্রকৃতির রাজ্যের অসুবিধাজনক পরিস্থিতি এবং এর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে নিহিত ছিল বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা। এই অসুবিধা থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রকৃতির রাজ্যের অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদন করে প্রতিষ্ঠা করল এক রাষ্ট্রসমাজ (political society)। এই রাষ্ট্রসমাজের কাছে তারা সমর্পণ করল তাদের প্রাকৃতিক অধিকার এবং রাষ্ট্রসমাজের সার্বভৌম ক্ষমতাকে তারা মেনে নিল। লক্ষণীয় যে, হবসের ক্ষেত্রে সামাজিক চুক্তি থেকে উদ্ভব হয়েছিল একক সার্বভৌম শক্তির। কিন্তু লকের ক্ষেত্রে সামাজিক চুক্তির ফলে সমগ্র রাষ্ট্রসমাজ যৌথভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, হবসের মতে, সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে প্রকৃতির রাজ্যের মানুষেরা নিজেদের সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেছিল সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তির কাছে। কিন্তু লকের তত্ত্বানুযায়ী এই সমর্পণ ছিল আংশিক। প্রকৃতির রাজ্যের মানুষেরা কেবলমাত্র সমর্পণ করেছিল আইন প্রণয়নের, প্রণীত আইন ব্যাখ্যার ও প্রয়োগের এবং প্রতিষ্ঠিত আইনভঙ্গের অপরাধের বিচার নির্বাহ করার অধিকার। যা তারা সমর্পণ করে নি তার মধ্যে ছিল ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির মৌলিক প্রাকৃত অধিকার।

রুশোর তত্ত্ব : রুশো বর্ণিত প্রকৃতির রাজ্য লকের কল্পিত প্রকৃতির রাজ্য অপেক্ষা অনেক বেশী সুন্দর ও মনোরম। রুশোর মতে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ ভোগ করত স্বর্গ সুখ। তারা মুক্ত ছিল সমস্তরকমের বন্ধন থেকে এবং তাদের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ ও দ্বন্দ্বের কোনও চিহ্নও ছিল না। প্রকৃতির কোলে লালিত মানুষ ছিল মুক্ত, মহান্, বন্য, সরল ও সাহসী। সে ছিল সৎ ও সহানুভূতিসম্পন্ন। ফলে সে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে শান্তিতে বাস করত। কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও সম্পত্তিপ্রথার উদ্ভবে এই প্রাকৃতিক শান্তি বিঘ্নিত হল। জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে সীমিত প্রাকৃতিক

সামগ্রীর অধিকার নিয়ে তীব্র সংঘাত দেখা দিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে কেউ বেশী সম্পত্তি, কেউ কম সম্পত্তির মালিক হল। এইভাবে বৈষম্য, অশান্তি ও জটিলতা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকল। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চুক্তির মাধ্যমে মানুষেরা প্রকৃতির রাজ্য পরিত্যাগ করে সমাজ সৃষ্টি করল এবং এই সমাজে এক সার্বভৌম শক্তি চিহ্নিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভব হল রাষ্ট্রের। এই সার্বভৌম শক্তির কাছে জনগণ চুক্তির মাধ্যমে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করল। কিন্তু, রুশোর মতে, এই সমর্পণ ছিল প্রকৃতপক্ষে নিজেদের কাছে নিজেদের সমর্পণ। কারণ এই সার্বভৌম শক্তি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র কোনও শক্তি নয়। গণ অভীপ্সা বা জনগণের সাধারণ ইচ্ছা (general will) -ই হল এই সার্বভৌম শক্তি। রুশো মনে করেন যে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে যা সম্পাদিত হল তা এই রকম : প্রত্যেকে তার দেহ ও সমগ্র ক্ষমতা একত্রিত করে সকলের সম্মিলিত সাধারণ ইচ্ছার চূড়ান্ত নির্দেশের অধীনে স্থাপন করল। অর্থাৎ সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে চুক্তিকারী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে দেখা দিল এক যৌথ সত্তা (collective body) যার কাছে সমর্পণের অর্থ হল প্রত্যেকের নিজের কাছেই নিজেকে সমর্পণ। এই যৌথ সত্তা ব্যক্ত হয় রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে। অতএব রাষ্ট্রের প্রতি সার্বিক আনুগত্য ব্যক্তির স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে না কোনমতেই।

খ) সামাজিক চুক্তিতত্ত্বের সমালোচনা :

রাষ্ট্রের উৎপত্তিসংক্রান্ত তত্ত্ব হিসাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ বিভিন্ন কারণে সমালোচিত হয়েছে। প্রথমত, সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রকে একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান (natural institution) হিসাবে গণ্য না করে একে একটি অস্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান (artificial institution) বলে মনে করে। অর্থাৎ এই তত্ত্বানুযায়ী ইতিহাসের এক বিশেষ অধ্যায়ে মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছিল, তা কোনও প্রাকৃতিক বিবর্তনের পথ ধরে আসে নি। কিন্তু আধুনিককালের সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে মানুষের জীবনচর্যা, তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি, তার নানাবিধ প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিকশিত ও পরিণত হয়েছে। এককথায়, আধুনিক সিদ্ধান্ত এই যে বিবর্তনই হল মানবসভ্যতার মূল সূত্র। দুর্ভাগ্যক্রমে, সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রের উদ্ভবের ক্ষেত্রে বিবর্তনের ওপর কোনও গুরুত্ব আরোপ না করে মানবসভ্যতার এই মূল সূত্রটিকে অস্বীকার করে।

চুক্তিতত্ত্বের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে এটি সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক কারণ মানুষের ইতিহাসে প্রকৃতির রাজ্যের অস্তিত্বের কোনও সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। হব্‌স্ তো কার্যত প্রকৃতির রাজ্যকে একটি যৌক্তিক অনুমান (logical hypothesis) বলে স্বীকার করেই নিয়েছিলেন। লক অবশ্য তাঁর "টু ট্রিটীজেস্ অভ গভর্ণমেন্ট" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের ১০১ ও ১০২ নং অনুচ্ছেদে প্রকৃতির রাজ্যের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করার জন্য নানা যুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু এই যুক্তিগুলি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে নি।

তৃতীয়ত, সামাজিক চুক্তিবাদ স্পষ্টতই অযৌক্তিক। কারণ এই তত্ত্বের অন্যতম পূর্বানুমান এই যে রাষ্ট্রের উদ্ভবের আগেই মানুষ চুক্তির ধারণায় অভ্যস্ত ছিল এবং বস্তুত চুক্তি সম্পাদন করতে সমর্থও হয়েছিল। কিন্তু চুক্তির ব্যাপারটিই অঙ্গাঙ্গিভাবে রাষ্ট্রীয় আইনের সঙ্গে জড়িত। রাষ্ট্রীয় আইনের সাহায্যেই চুক্তি কার্যকর হয়। অতএব প্রাক-রাষ্ট্রীয় প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ চুক্তি সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়েছিল—এই ধারণা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। একইভাবে বলা যেতে পারে যে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের স্বাধীনতার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়াও নিতান্ত অযৌক্তিক। আইনের দ্বারা সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত না হলে মানুষের স্বাধীনতা নিরর্থক হয়ে পড়ে। কিন্তু হব্‌স্ ও রুশোর মতে প্রকৃতির রাজ্যে কোনও আইনের নিয়ন্ত্রণ ছিল না। লক অবশ্য প্রাকৃতিক আইনের উপস্থিতির কথা উল্লেখ

করেছেন। কিন্তু এই আইন চূড়ান্ত বিচারে নিতান্ত বিবেকের অনুশাসন বলে প্রতীয়মান হয়, কাজেই একে যথার্থ আইন বলে মানা যায় না। ফলত বলা চলে যে হব্‌স্, লক ও রুশো—তিনজনেই আইনের অবর্তমানে স্বাধীনতার সম্ভাব্যতা দাবী করে স্বাধীনতা সম্পর্কে এক অযৌক্তিক ধারণার শিকার হয়েছেন।

চতুর্থত, চুক্তিবাদীদের যুক্তি অনুসরণ করেই প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে বহুকাল আগে কোনও এক সময় যদি পূর্বপুরুষেরা সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রকে আনুগত্য দেওয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকার করেও থাকেন তাহলেও তাঁদের উত্তরপুরুষেরা কেন এই চুক্তি মেনে চলবেন। অন্ততপক্ষে লক এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন যে পূর্বপুরুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকার গ্রহণের সময় স্বাভাবিকভাবেই পূর্বপুরুষের কৃত সামাজিক চুক্তির দায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর ওপর বর্তায়। কিন্তু লকের এই যুক্তির ওপর নির্ভর করলে সামাজিক চুক্তিবাদের মূল সুরটিই নষ্ট হয়। সামাজিক চুক্তিবাদের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য আরোপিত (imposed) নয়, এটি স্বেচ্ছাক্রিয় (Voluntary)। কিন্তু সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করতে গেলে রাষ্ট্রকে আনুগত্য দেখাতে হবে অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য মেনে না নিলে ন্যায্য উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হবে—এই যুক্তি প্রয়োগ করলে আনুগত্য আর স্বেচ্ছাকৃত থাকে না, তা সম্ভাব্য বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে পড়ে বাধ্যতামূলক।

পঞ্চমত, সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলে তার পরিণতি বিপজ্জনকও হতে পারে। কারণ চুক্তিবাদীদের মূল কথা এই যে মানুষ তার ইচ্ছামত এক নির্দিষ্ট দিনে রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছিল। অর্থাৎ রাষ্ট্র হল মানুষের এক আকস্মিক খেয়ালের সৃষ্টি। এই তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে সঙ্গতভাবেই এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে মানুষ নিজেই যদি রাষ্ট্রের স্রষ্টা হয়ে থাকে তাহলে যে কোনদিন নিজের মর্জি অনুযায়ী সে এই রাষ্ট্রকে ভেঙে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়ায় এক ভঙ্গুর প্রতিষ্ঠান এবং অবশ্যই এ এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি। কারণ মনে রাখা দরকার যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর এই ধারণার ওপর যে রাষ্ট্র এক শাশ্বত প্রতিষ্ঠান যার ক্ষয় নেই, যার পরিবর্তন নেই।

গ) সামাজিক চুক্তিবাদের মূল্য

রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঠিক সন্ধান দিতে ব্যর্থ হলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জগতে সামাজিক চুক্তি মতবাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্রীয় প্রাধিকারের ভিত্তি সম্পর্কে এবং ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের কাম্য সম্পর্ক বিষয়ে এই মতবাদ এমন কতকগুলি ধারণার জন্ম দেয় যেগুলিকে অনুসরণ করে কালক্রমে পশ্চিমের রাষ্ট্রচিন্তায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। এছাড়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও সামাজিক চুক্তি মতবাদের অবদান উপেক্ষণীয় নয়। কয়েকটি ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পিছনে সামাজিক চুক্তি মতবাদই ছিল অন্যতম প্রেরণা।

তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল এই যে, এই তত্ত্বেই সর্বপ্রথম বলা হয় যে রাষ্ট্রীয় প্রাধিকারের মূল ভিত্তি হল জনগণের স্বেচ্ছাদত্ত সম্মতি। জনগণ স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রকে আনুগত্য দিতে সম্মত হয়েছে বলেই রাষ্ট্র ব্যক্তির কাছ থেকে দাবি করতে পারে আনুগত্য। আধুনিক ইয়োরোপে এই সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা। কাজেই সামাজিক চুক্তি মতবাদকে ইয়োরোপীয় গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি-প্রস্তর বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সার্বভৌমিকতার প্রশ্নে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে চুক্তিমতবাদীদের সকলেই সার্বভৌমিকতাকে রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য রূপে স্বীকার করে নেন। এছাড়া হব্‌স্, লক ও রুশো—তিনজনেই সার্বভৌমিকতার বিভিন্ন রূপ বিশ্লেষণ করে পরবর্তীকালের সার্বভৌমিকতা

সংক্রান্ত ভিন্নমুখী আলোচনাকে অনুপ্রাণিত করেন। বস্তুত, পরবর্তীকালের আইনগত সার্বভৌমিকতা (legal sovereignty)-এর ধারণা আহৃত হয়েছিল হব্‌সের তত্ত্ব থেকে, লকের তত্ত্বই ছিল পরবর্তীকালের রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা (political sovereignty)-এর মৌল ভিত্তি। অন্যদিকে যে লোকায়ত সার্বভৌমিকতা (popular sovereignty)-এর ধারণা আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ তার বীজ নিহিত ছিল রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদে।

তৃতীয়ত, লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই ইয়োরোপে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে উদারনীতিবাদ (liberalism)-এর বলিষ্ঠ ঐতিহ্য। জনসম্মতির ওপর রাষ্ট্রক্ষমতার নির্ভরতা, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমের সীমাবদ্ধতা এবং ব্যক্তি অধিকারের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা—এই তিনটি হল উদারনীতিবাদের সর্বস্বীকৃত মূল সূত্র। এই তিনটি সূত্রই উদ্ভাবিত হয়েছিল লকের চুক্তিতত্ত্বে। এই জন্যই লককে আধুনিক উদারনীতিবাদের জনক—এই আখ্যায় ভূষিত করা হয়। একইভাবে রুশোর চুক্তিবাদ ছিল ইতিহাসখ্যাত কয়েকটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল প্রেরণা। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় রুশোর তত্ত্বের প্রভাব। অন্যদিকে ১৭৮৯ সনের ফরাসী বিপ্লবের পিছনে কাজ করেছিল রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব।

৫। হব্‌স্, লক ও রুশোর তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা (A comparative analysis of the theories of Hobbes, Locke and Rousseau)

হব্‌স্, লক ও রুশো তিনজনেই ছিলেন চুক্তিবাদী। অর্থাৎ জনগণের স্বেচ্ছাকৃত সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের উদ্ভব—এই সিদ্ধান্তের সামিল ছিলেন তিনজনেই। এই হল এই লেখকত্রয়ের তত্ত্বের প্রথম সাদৃশ্য। তাঁদের চিন্তার দ্বিতীয় মিল এইখানে যে তিনজনেই রাষ্ট্রের পূর্বাবস্থায় প্রকৃতির রাজ্যের অস্তিত্ব কল্পনা করেছিলেন। তৃতীয়ত, তিনজনেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিশ্লেষণের মধ্যে তাঁদের আলোচনাকে আবদ্ধ রাখেন নি। তিনজনেই এই উৎপত্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন রাষ্ট্রের প্রকৃতি। চতুর্থত, তিনজনেই রাষ্ট্রিক বাধ্যতা (political obligation) বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ, কেন ব্যক্তি রাষ্ট্রের প্রতি তার আনুগত্যকে কর্তব্য বলে মনে করে—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা করার চেষ্টা করেছেন তিনজনেই।

এই মূল চারটি ব্যাপারে মিল থাকলেও হব্‌স্, লক ও রুশোর তত্ত্বের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পার্থক্য তিনজনের প্রকৃতির রাজ্য বর্ণনায়। হব্‌সের প্রকৃতির রাজ্য প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংঘাতে আলোড়িত এক রক্তাক্ত রণাঙ্গন। লকের প্রকৃতির রাজ্য প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীন, যুক্তি-অনুগত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষের সম্মিলনে এক প্রায়-সামাজিক অবস্থা যেখানে অখণ্ড শান্তি বিরাজিত। রুশোর প্রকৃতির রাজ্য প্রকৃতার্থে মুক্ত প্রকৃতির অঙ্গন যেখানে সভ্যতার চিহ্নমাত্র নেই, অথচ যেখানে প্রকৃতিদত্ত শিক্ষার প্রভাবে এবং প্রকৃতির দ্বারা লালিত হয়ে উদার ও সরল মানুষ স্বর্গসুখের অধিকারী।

দ্বিতীয়ত, এই প্রকৃতির রাজ্য পরিত্যাগের কারণ অর্থাৎ সামাজিক চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও হবস্, লক ও রুশোর বক্তব্য পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। হব্‌সের মতে এই কারণ ছিল আত্মরক্ষার তাগিদ। অর্থাৎ, প্রকৃতির রাজ্যের বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকাটাই প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এবং এইজন্যই এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য তারা প্রবৃত্ত হয় সামাজিক চুক্তি সম্পাদনে। লকের মতে, অসুবিধাই ছিল প্রধান কারণ, প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক আইনের কোনও সাধারণ নিয়ন্তা না থাকায় ব্যবহারিক অসুবিধা দেখা দেয় এবং সেইজন্যই প্রয়োজন হয় সামাজিক চুক্তির। রুশোর মতে, প্রকৃতির রাজ্যের স্বর্গ থেকে বিদায় নেওয়া প্রয়োজন হয়েছিল লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও সম্পত্তির উদ্ভবের জন্য কারণ এগুলি নিয়ে এসেছিল বৈষম্য, অশান্তি ও জটিলতা।

তৃতীয়ত, সামাজিক চুক্তির ফলাফল বর্ণনার ক্ষেত্রেও হব্‌স্, লক ও রুশো ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন। হব্‌সের মতে, সামাজিক চুক্তির ফলে উদ্ভব হয় একক সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় শক্তির, সামাজিক চুক্তির কোনও শর্তের প্রতিই যে দায়বদ্ধ নয়। অর্থাৎ, এই সার্বভৌম সমস্ত নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে ভোগ করে অবাধ ক্ষমতা, নিজে আরোপ করে সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ এবং তার আদেশই আইনের রূপ ধারণ করে দাবি করে অবিসংবাদিত আনুগত্য। অর্থাৎ, এককথায়, হব্‌সের মতে, সামাজিক চুক্তির ফলে উদ্ভব হয় সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী (totalitarian) রাষ্ট্রের। এই ব্যাপারে লকের অভিমত সম্পূর্ণ ভিন্ন। হবস্ দেখিয়েছিলেন যে সামাজিক চুক্তির ফলে ব্যক্তির সমস্ত প্রাকৃত ক্ষমতা ও অধিকার সমর্পিত হয় সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় শক্তির কাছে। কিন্তু লকের মতে, এই সমর্পণ সার্বিক নয়। ব্যক্তি সমর্পণ না করে তার নিজের কাছেই রেখে দেয় জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির প্রাকৃত অধিকার এবং এই ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির। অর্থাৎ, লক হব্‌সের মত অনিয়ন্ত্রিত সার্বভৌমিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর চোখে রাষ্ট্রীয় শক্তি সবসময়েই সীমাবদ্ধ এবং ব্যক্তি অধিকারের একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ক্ষেত্র আছে যেখানে রাষ্ট্রশক্তির প্রবেশাধিকার নেই। ব্যক্তিকে এইভাবে রাষ্ট্রের পাশাপাশি একটি স্বতন্ত্র মর্যাদার স্থান দিয়ে লক জন্ম দিয়েছিলেন উদারনীতিবাদ (liberalism)-এর, হব্‌সের তত্ত্বে যার চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না। এই উদারনীতিবাদকে সুরক্ষিত করার জন্য লক ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়েছিলেন প্রতিরোধের অধিকার। তিনি বলেছিলেন যে রাষ্ট্রশাসক যদি ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে দায়িত্ব পালন না করে তাহলে সেই শাসককে অপসারণের অধিকার আছে জনগণের। তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছিলেন যে এই প্রতিরোধের অধিকার প্রয়োগ করে শুধুমাত্র রাষ্ট্রশাসকের পরিবর্তন ঘটানো যায়, কিন্তু সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা থাকে অপরিবর্তিত। অর্থাৎ, লক রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। অন্যদিকে হবস্ এই পার্থক্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন ছিলেন এবং রুশোর তত্ত্বেও এ বিষয়ে সচেতনার কোনও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।

রুশো তাঁর চুক্তি মতবাদে হব্‌সের মতই এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে জনগণ তাদের ক্ষমতার সর্বাংশ সমর্পণ করে রাষ্ট্রের কাছে। তবুও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে এই প্রশ্নে রুশোর তত্ত্বের অবস্থান হব্‌সের তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীতে। কারণ রুশো দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে এই সমর্পণ কোনও বাহ্যিক শক্তির কাছে নয়, এ হল প্রকৃতপক্ষে নিজের কাছে নিজেকে সমর্পণ। তাঁর মতে, সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে উদ্ভূত রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিদের সম্মিলনে সৃষ্ট এক যৌথ নৈতিক সত্তা (collective moral body) যেহেতু এর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় গণ অভীপ্সা বা সাধারণ ইচ্ছা (general will)। এই সাধারণ ইচ্ছাই হল সার্বভৌম। এর শক্তি অসীম ও অবাধ। তবে এর সার্বিক নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার প্রকৃত অর্থ হল নিজের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হওয়া। এই সাধারণ ইচ্ছার তত্ত্ব বাহ্যত জনগণের সার্বভৌমিকতাই প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে লোকায়ত সার্বভৌমিকতা (popular sovereignty)-এর আবরণে রুশো হব্‌সের মতই সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। কারণ সাধারণ ইচ্ছার ধারণাটি সম্পূর্ণ একটি বিমূর্ত ধারণা। এই সাধারণ ইচ্ছা বলতে প্রকৃতপক্ষে কী বোঝায় সে বিষয়ে রুশো স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি এবং এই সাধারণ ইচ্ছাকে কীভাবে বাস্তবায়িত করা যায় সে বিষয়েও তিনি কোনও নির্দেশ দেন নি। বস্তুত রুশোর সমালোচকেরা বলেছেন যে সাধারণ ইচ্ছার ধারণাটি একটি অবাস্তব ধারণা এবং রুশোর তত্ত্ব থেকে যে বাস্তব সত্যটি বেরিয়ে আসে তা হল এই যে সাধারণ ইচ্ছার ধারণা রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার এক সুবিধাজনক তাত্ত্বিক মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বিচারে চুক্তিবাদী হিসাবে রুশো হব্‌সের বড় কাছাকাছি এসে যান। অর্থাৎ, অন্তিম বিচারে হব্‌স্ ও রুশো দু জনেই

সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী তত্ত্বের প্রবক্তা রূপে প্রতিভাত হন। অবশ্য একথা সত্য যে রুশোর তত্ত্ব ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রেরণা জুগিয়েছিল। তবে এই ঘটনার দ্বারা অবশ্যই প্রমাণিত হয় না তাঁর তত্ত্বের গণতান্ত্রিক স্বরূপ। বস্তুত, রুশোর তত্ত্বের কোনও কোনও ব্যাখ্যাতা রুশোর চুক্তিবাদে নিবিড় অনুসন্ধান চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে রুশো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রেরণাদাতা ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অবশ্যই গণতান্ত্রিক তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে চুক্তিবাদী হিসাবে হব্‌স্, লক ও রুশোর মধ্যে নানা সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য থাকলেও চূড়ান্ত বিচারে হব্‌স্ ও রুশো ছিলেন একই গোত্রের, অন্যদিকে লকের অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ এক বিপরীত চিন্তার মেরুতে।

৬। ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ (Historical or Evolutionary theory)

প্রায় আড়াইহাজার বছর আগে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাঁর 'পলিটিক্স' গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন যে হঠাৎ একদিন মানুষ রাষ্ট্র সৃষ্টি করে নি, রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে দীর্ঘ এক ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। এরপর আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব রচিত হলেও শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়েছে যে রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের মূল দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল অভ্রান্ত। আধুনিক কালে সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের বহুমুখী গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সাধারণভাবে একমত হয়েছেন যে রাষ্ট্র হঠাৎ একদিন ঈশ্বরেচ্ছায় অথবা প্রবল পশুশক্তির প্রভাবে কিংবা জনগণকৃত চুক্তির দ্বারা আবির্ভূত হয় নি, দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথ ধরে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠেছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের বিবর্তনের এই ধারা যে তত্ত্বে সুসম্বদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জগতে বলা হয় বিবর্তনবাদ।

বিবর্তনবাদের মূল সিদ্ধান্ত তিনটি। প্রথম সিদ্ধান্ত স্বভাবতই এই যে রাষ্ট্রের জন্মের মূলে রয়েছে দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্তন। দ্বিতীয়ত, সব রাষ্ট্রের উদ্ভব বিবর্তনের মধ্য দিয়ে হয়ে থাকলেও সব রাষ্ট্রই একইভাবে বিবর্তিত হয়নি। প্রত্যেক রাষ্ট্রের বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যেই আছে কিছু স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য। তৃতীয়ত, এই বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করলে লক্ষ করা যায় অসংখ্য উপাদানের মিথষ্ক্রিয়া (interaction)। এই উপাদানগুলির কোনও একটিকে রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, সব উপাদানের মিলিত প্রভাবেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি। অবশ্য অনেক সময় অবস্থা বিশেষে একটি উপাদান অন্য উপাদানের চেয়ে বেশী প্রভাবশালী হয়েছে।

বিবর্তনবাদ অনুযায়ী যেসব উপাদানের ক্রিয়াশীলতায় রাষ্ট্রের বিবর্তন প্রক্রিয়া সচল থেকেছে তাদের আলোচনার সুবিধার্থে ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি হল : মানুষের সামাজিক প্রবণতা, রক্তের বন্ধন, ধর্মের বন্ধন, বলপ্রয়োগ, ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রচলন এবং রাজনৈতিক চেতনা।

একক জীবনচর্যায় মানুষ অসহায় ও অসম্পূর্ণ। সেইজন্য সভ্যতার আদিপর্বেই দেখা দেয় মানুষের সামাজিক প্রবণতা অর্থাৎ সভ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ গ্রহণ করে সমাজবদ্ধ জীবন। এই সমাজবদ্ধ জীবনে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা। পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশে চলতে গিয়ে প্রত্যেককেই মানতে হয় কিছু সাধারণ নিয়ম এবং এই নিয়ম রক্ষার জন্য প্রয়োজন দেখা দেয় কর্তৃত্বময় সাধারণ নিয়ন্তার। তাই প্রাচীনকালে বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে উদ্ভব হয় দলনেতা বা গোষ্ঠীপতির। একদিকে এই দলনেতা বা গোষ্ঠীপতির অনুজ্ঞা ও আদেশ দান এবং অন্যদিকে তার প্রতি দল বা গোষ্ঠী ভুক্ত জনমণ্ডলীর আনুগত্য—এই দুটি উপাদানই রাষ্ট্রের উৎপত্তির সূচক। সমাজজীবন যত উন্নত হয়েছে ততই সুদৃঢ় ও সংহত হয়েছে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং ততই ত্বরান্বিত হয়েছে রাষ্ট্রের উদ্ভব।

জনমণ্ডলীর মধ্যে একটা ন্যূনতম ঐক্যানুভূতি গড়ে না উঠলে সমাজ কিংবা রাষ্ট্র কিছুই টিকে থাকতে পারে না। এইজন্য প্রাচীনকাল থেকে যে সব উপাদান মানুষদের একতাবদ্ধ হতে সাহায্য করেছে সেগুলি রাষ্ট্রের উৎপত্তির বিবর্তনে বিশেষ অবদান রেখেছে, সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গেই এসে পড়ে রক্তের সম্পর্কের কথা। আদিম সমাজে মানুষের মধ্যে একতা স্থাপনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল রক্তের বন্ধন। রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতেই মানুষ প্রথম গড়ে পরিবার। পরিবারের জীবনধারা সংহত ও সুশৃঙ্খল করার জন্য পরিবারের শীর্ষে দেখা দেয় কর্তৃত্বময় পরিবার কর্তা। এইভাবে পরিবারের মধ্যে সর্বপ্রথম মানুষের সামাজিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবারগুলির আয়তন বাড়তে থাকে এবং বিবাহসূত্রে পরিবারগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হতে থাকে। এতৎসত্ত্বেও মূল রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে একধরনের নৈকট্যবোধ বজায় রাখা হয়। ভারতবর্ষে এই নৈকট্যবোধকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য প্রবর্তিত হয় গোত্র ব্যবস্থা। রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে এই আত্মীয়তা যুগ যুগ ধরে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে সাহায্য করে এবং এই একতার পরিবেশে রাষ্ট্র গড়ে ওঠা সহজ হয়।

সমাজের আয়তন ও জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রক্তের বন্ধন স্বভাবতই শিথিল হতে থাকে। এই অবস্থায় ধর্মের বন্ধন এক বিশেষ কার্যকর উপাদান হয়ে ওঠে। আদিম সমাজে মানুষের বুদ্ধি ও শক্তির যথেষ্ট বিকাশ ঘটে নি বলে সে ভয় করত প্রাকৃতিক শক্তিকে। তার এই ভয়ের সুযোগ গ্রহণ করে কালক্রমে উদ্ভব হয় একদল জাদুকরের যারা ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের দ্বারা প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে কিছু পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে জনসাধারণের মনে এই ধারণা গড়ে তুলতে সমর্থ হয় যে তারা প্রাকৃতিক শক্তিকে স্ববশে ও নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম। এইভাবে জাদুকরেরা সমাজের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে থাকে। ইতিমধ্যে অমোঘ প্রাকৃতিক শক্তিতে দেবত্ব আরোপিত হতে থাকে এবং এই দেবতাদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য নানা ক্রিয়াকর্মের প্রচলন হয়। এই ক্রিয়াকর্ম পরিচালনার জন্য উদ্ভব হয় পুরোহিত শ্রেণীর। সমগ্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে নিজেদের শাসন ও নিয়ন্ত্রণে রাখার অভিপ্রায়ে পুরোহিত সম্প্রদায় বিভিন্ন আচার, অনুশাসন ও নিয়মকানুনের প্রবর্তন করে এবং এইসব রীতিনীতি ও নিয়মকানুন বিশ্বস্তভাবে পালন করাই ধর্ম আখ্যা লাভ করে। উল্লেখ্য যে প্রাচীন সমাজে এই ধর্মই জনমণ্ডলীকে ঐক্যবদ্ধ, সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখার প্রধান মাধ্যম ছিল এবং এই ধর্মের মধ্য দিয়েই একদল মানুষের আজ্ঞাদান ও অন্য সকলের এই আদেশের প্রতি অনুগত থাকার অভ্যাস গড়ে ওঠে। অস্বীকার করা যায় না যে ধর্মের তাড়নায় জাত এই সামাজিক অভ্যাস রাষ্ট্রগঠনের অন্যতম উপাদান হিসাবে কাজ করেছিল।

রাষ্ট্রের বিবর্তনে বলপ্রয়োগের অবদানও উপেক্ষণীয় নয়। প্রাচীনকালে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ ও যুদ্ধবিগ্রহ ছিল অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। এইসব সংঘর্ষের ফলে শক্তিশালী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে আসত দুর্বল গোষ্ঠীগুলি এবং শক্তিশালী গোষ্ঠীর নেতা নিজের আধিপত্য স্থাপন করত ব্যাপকতর জনমণ্ডলীর ওপর। এইভাবেই কালক্রমে উদ্ভব হয় রাজশক্তির। এছাড়া আধুনিক ইতিহাসে রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের যুদ্ধবিগ্রহের পরিণামে নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভবও বিরল ঘটনা নয়।

এছাড়া সমাজবিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে যখন সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা প্রথার প্রচলন হয় তখন দেখা দেয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য মালিক শ্রেণী এক ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই রাষ্ট্রের জন্ম সূচিত হয়। কাজেই রাষ্ট্রের বিবর্তনে ব্যক্তিগত সম্পত্তিব্যবস্থার ভূমিকা উপেক্ষা করা যায় না, বস্তুত যাঁরা মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী তাঁরা এই উপাদানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন।

একইভাবে রাজনৈতিক চেতনার উদ্ভব রাষ্ট্রের বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে।

সমাজে অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষকে বিভিন্নপ্রকারের আদেশ ও অনুজ্ঞার প্রতি আনুগত্য দেখাতে হয়েছে। যে মুহূর্তে মানুষ এই আদেশ ও অনুজ্ঞার যাথার্থ্য উপলব্ধি করে নিজের দেওয়া আনুগত্যের উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, বলা যেতে পারে, সেই মুহূর্তেই দেখা দিয়েছে তার রাজনৈতিক চেতনা। এই রাজনৈতিক চেতনা যতই সংহত ও সন্নিবদ্ধ হয়েছে ততই সুদৃঢ় হয়েছে রাষ্ট্রের ভিত্তি।

আজকের দিনে বিবর্তনবাদই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক মতবাদ বলে বিবেচিত হয়। অবশ্য বিবর্তনবাদ সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন নয়। বিবর্তনবাদ কেবলমাত্র রাষ্ট্রের বিবর্তনের একটি সাধারণ রূপরেখা দিতেই সক্ষম, কিন্তু এই বিবর্তনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক দিকনির্দেশ করতে বিবর্তনবাদ সম্পূর্ণ অক্ষম। দ্বিতীয়ত, বিবর্তনবাদ বিভিন্ন উপাদানের অবদান স্বীকার করেছে বটে, কিন্তু এই উপাদানগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে বিবর্তনবাদীদের মধ্যে কোনও ঐকমত্য নেই। তৃতীয়ত, এই উপাদানগুলির ক্রিয়াশীলতা অনুধাবনের কোনও সূত্র নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়নি বিবর্তনবাদে। ফলত বিবর্তনবাদ অনেকাংশে কতকগুলি অস্পষ্ট ঐতিহাসিক ধারণার ওপর নির্ভরশীল। চতুর্থত, রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত অন্যান্য মতবাদ থেকে বিবর্তনবাদ স্বতন্ত্র হলেও সম্ভবত এই মতবাদ মৌলিকতার দাবি করতে পারে না. কারণ প্রকৃতপক্ষে বিবর্তনবাদ গড়ে উঠেছে অন্যান্য অনেকগুলি মতবাদের সমন্বয়ে।

এতৎসত্ত্বেও রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদগুলির মধ্যে বিবর্তনবাদই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশী যুক্তিসঙ্গত ও বিশ্বাসযোগ্য। একমাত্র এই মতবাদটিই সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সমর্থন লাভ করেছে, বাস্তবতার বিচারে এই মতবাদটিই সসম্মানে উত্তীর্ণ এবং ঐশীতত্ত্ব, বলপ্রয়োগের মতবাদ ও সামাজিক চুক্তি মতবাদের মত এর কোনও বিপজ্জনক দিক নেই। অতএব বিবর্তনবাদকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদগুলির মধ্যে একমাত্র গ্রহণযোগ্য মতবাদ বলে রায় দিলে অন্যায় হবে না।

অধ্যায় ৫

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা

১। ভূমিকা (Introduction)

আধুনিক কালে জাতীয় ও বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদকে গুরুত্বপূর্ণ শক্তিরূপে গণ্য করা হয়। এই ধারণা দুটি জনগণকে কখনও একত্রিত করতে সহায়তা করেছে, আবার কখনও তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রেরণা দিয়েছে।

কোনও রাষ্ট্রের সামগ্রিক আচার-আচরণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে সাধারণত জাতীয় আশা, জাতীয় আকাঙ্ক্ষা, জাতীয় ভয়, জাতীয় বিরোধ, জাতীয় আন্দোলন, জাতীয় পতাকা, জাতীয় প্রতীক প্রভৃতি শব্দগুলির দ্বারা বোঝান হয়ে থাকে।

সাধারণত জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ, জাতি ও জাতীয়তাবাদ এই শব্দগুলি একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। আবার অনেক সময় জাতি ও রাষ্ট্র এই শব্দ দুটিও সমার্থক বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রতিটি শব্দ একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়।

২। জনসমাজ (People)

একই ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনসমষ্টির মধ্যে যদি মনোভাব বা ঐতিহ্যের দিক দিয়ে ঐক্য দেখা যায় তবে তাকে জনসমাজ বলা হয়। ভাষা, সাহিত্য, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, অতীত স্মৃতি, অভাব-অভিযোগ, অধিকারবোধ ইত্যাদি বিষয়ে এরূপ ঐক্যবোধ পরিলক্ষিত হতে পারে। অনেক লেখক আবার জনসমাজের ঐক্যবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে উদ্ভবগত ঐক্যকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রূপে গণ্য করেন।

৩। জাতীয় জনসমাজ (Nationality)

জাতীয় জনসমাজের সঙ্গে জনসমাজের পার্থক্য হল এই যে জাতীয় জনসমাজ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হয়, কিন্তু জনসমাজের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক চেতনা থাকে না। জাতীয় জনসমাজের মধ্যে ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, আদর্শ প্রভৃতি কারণে ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনৈতিক চেতনা বিকশিত হয়। ফিল্ডের (Field) মতে বাস্তব অর্থে জাতীয় জনসমাজ বলতে একটি জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যারা নিজেদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনে অভিলাষী। (Nationality in the concrete sense indicates a group of people who aspire to become a separate state of their own)।

জাতীয় জনসমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের অন্য গোষ্ঠী থেকে সর্বদা স্বতন্ত্র বলে মনে করে। জাতীয় জনসমাজ গঠনের একটি প্রয়োজনীয় ও বাস্তব উপাদান হল রাষ্ট্রগঠনের ইচ্ছা। তবে এই ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়। যে সব ব্যক্তিরা জাতীয় জনসমাজের অন্তর্ভুক্ত তাঁরা সর্বদা মনে করেন যে চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা, আচরণ ও লক্ষ্যের দিকে দিয়ে তাঁরা সমমনোভাবাপন্ন এবং একটি রাজনৈতিক সংস্থার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হলে তাঁরা সুখসমৃদ্ধি অর্জন করতে সমর্থ হবেন। সুতরাং চূড়ান্ত বিচারে জাতীয় জনসমাজ হল এক ধরনের মানসিকতা এবং সাধারণ ভাবে কোনও জনসমাজ এই মানবিকতার পরিচয় না দিলে তাদের জাতীয় জনসমাজ বলে গণ্য করা যায় না।

৪। জাতি (Nation)

ফিল্ডের মতে ব্যাকরণগত দিক দিয়ে জাতি শব্দটি একটি সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এবং জাতীয় জনসমাজ শব্দটি তাঁদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত (Grammatically, nation ought to be used for a concrete group of people, and nationality for

the characteristics they have in common)। কোনও জাতীয় জনসমাজ যখন একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করে অর্থাৎ তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে তখন ঐ জাতীয় জনসমাজকে জাতি বলা হয়। সুতরাং কোনও জনসমাজ রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে তাকে জাতীয় জনসমাজ বলে। আবার এই জাতীয় জনসমাজ পৃথক রাষ্ট্র গঠনের আশাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সমর্থ হলে তৎক্ষণাৎ জাতিতে পরিণত হয়। জাতীয় জনসমাজ হল একটি মানসিক ধারণা। জাতি হল একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অধীনে সংগঠিত একটি জাতীয় জনসমাজ।

কার্ল ডয়েচের (Karl Deutsch) মতে জাতীয় জনসমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা যদি শাসন কাজে অংশ গ্রহণ করে, তাদের ভাষাতেই যদি শাসন কাজ পরিচালিত হয় এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতিগুলির মাধ্যমে যদি জাতীয় জনসমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিফলিত হয় তাহলেই স্বতন্ত্র ও নিজস্ব রাষ্ট্র কথাটির তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৯৩৯ সনে Royal Institute of International Affairs তাঁদের প্রতিবেদনে বলেন যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির সবগুলি না হলেও অধিকাংশই জাতিগুলির মধ্যে পরিলক্ষিত হয় :

১। একটি সাধারণ সরকার সম্পর্কিত ধারণা।
২। সমস্ত জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য।
৩। একটি মোটামুটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড। (তবে ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ইহুদি জাতির অবস্থিতি এই সূত্রের একটা বড় ব্যতিক্রম।)
৪। কতকগুলি বৈশিষ্ট্য যা কোনও জাতিকে অন্য জাতি বা বিজাতীয় গোষ্ঠী থেকে পৃথক বলে চিহ্নিত করে। ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ও জাতীয় চরিত্র এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।
৫। সমস্ত জনগণের সাধারণ কতকগুলি স্বার্থ রক্ষা করা। রাষ্ট্রের মাধ্যমে জাতি তার অধিকাংশ সামাজিক প্রয়োজন মেটায়। সুতরাং জাতির অন্তর্ভুক্ত থাকার ফলে বহু নির্দিষ্ট স্বার্থ এবং জাতিকে চিরস্থায়ী করে রাখার মৌলিক স্বার্থকে রক্ষা করা সম্ভব।
৬। জনগণের মধ্যে জাতির প্রতিচ্ছবিজড়িত একটি মনোভাব।

৫। জাতি ও রাষ্ট্র (Nation and State)

অনেক সময় জাতি ও রাষ্ট্র এই শব্দ দুটিকে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কয়েকটি সার্বভৌম রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ (League of Nations) নামে পরিচিত ছিল। জাতিসংঘের পতনের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে পুনরায় যে আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তাও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) নামে পরিচিত। সুতরাং দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থার নামকরণের ক্ষেত্রেই জাতি শব্দটি রাষ্ট্রের পরিবর্ত শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। একইভাবে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বলতে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পর্ক এবং 'জাতীয় ঋণ' বলতে রাষ্ট্র গৃহীত ঋণকে বোঝায়।

বাস্তবে জাতি ও রাষ্ট্র এই দুটি ধারণার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমত, রাষ্ট্র হল একটি আইনগত ধারণা। জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমিকতা—এই চারটি মূল উপাদান নিয়ে গঠিত রাজনৈতিক সংগঠন হল রাষ্ট্র। অন্যদিকে জাতি হল একটি আবেগাশ্রিত মনস্তাত্ত্বিক ধারণা। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র তার ভূখণ্ডে বসবাসকারী নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় প্রাধিকারের প্রতি আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে একত্রিত হওয়ার মনোভাব বা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেতনার ওপর জাতি প্রতিষ্ঠিত। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে প্রয়োগ করার জন্য একটি কেন্দ্রীভূত সংস্থা থাকে যা সরকার নামে পরিচিত। জাতির এরূপ কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থা

থাকে না।

কোনও রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনগণের মধ্যে একাত্মবোধের মনোভাব না থাকলে তাকে জাতি আখ্যা দেওয়া যায় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যকে রাষ্ট্র বলা হত, কিন্তু জাতি বলা যেত না। জার শাসিত রাশিয়াকেও রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া হলেও জাতি বলা যেত না। আবার বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ধর্মাবলম্বী জনগণ একটি রাষ্ট্রীয় সংগঠনের অধীনে বসবাস করে একটি সমরূপ গোষ্ঠীতে পরিণত হতে পারে। এইভাবে অনেক সময় দুই বা ততোধিক গোষ্ঠী শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অথবা অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। এই ধরনের রাষ্ট্রে বসবাসকারী ব্যক্তিদের প্রাথমিক পর্যায়ে জাতীয় জনসমাজ বলা যায় না। কিন্তু কালক্রমে তারা শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হতে পারে। এক্ষেত্রে সুইজারল্যাণ্ডকে উদাহরণ রূপে গণ্য করা যেতে পারে। ভাষা, ধর্ম ও সামাজিক সংগঠনের দিক দিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও পরস্পর বিরোধী কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র তাদের সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করার জন্য চুক্তির মাধ্যমে একত্রিত হয়ে সুইজারল্যাণ্ড রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। বর্তমান বিশ্বে সুইজারল্যাণ্ডকে একটি শক্তিশালী জাতি রূপে গণ্য করা হয়।

নতুন রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে একাত্মবোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৪৮ সনের আগে ইহুদিরা জাতীয় সমাজ বলে পরিচিত থাকলেও তাদের নিজস্ব কোন রাষ্ট্র ছিল না। ১৯৪৮ সনে তারা তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র ইস্রায়েল প্রতিষ্ঠা করে প্রকৃত অর্থে জাতিতে পরিণত হয়।

আবার অনেক সময় কোনও জাতীয় জনসমাজের নিজস্ব কোনও রাষ্ট্র না থাকলেও তারা জাতিরূপে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান ও জাপানীগণ জাতিরূপে টিকে থাকলেও রাষ্ট্ররূপে জার্মানী ও জাপানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছিল।

কোনও রাষ্ট্র একটি মাত্র জাতি নিয়ে গঠিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ জাপান, ফ্রান্স, ইস্রায়েল, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি রাষ্ট্রের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। আবার একাধিক জাতি নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রও দেখা যায়। সুইজারল্যাণ্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র' প্রভৃতি হল বহুজাতি ভিত্তিক রাষ্ট্র। সুতরাং রাষ্ট্রের সীমারেখার সঙ্গে জাতির সীমারেখা সর্বদা এক হওয়া আবশ্যক নয়।

জাতি ও রাষ্ট্র—এই দুটি ধারণা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত না হলেও ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এদের পরস্পরের পরিপূরক বলা যেতে পারে। অনেক সময়েই রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জাতীয় জনসমাজ তাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করার জন্য রাষ্ট্র গঠন করেছে। আবার রাষ্ট্রও বহু ক্ষেত্রে জাতি গঠনের সহায়ক শক্তিরূপে ভূমিকা গ্রহণ করেছে।।

৬। জাতীয় জনসমাজ গঠনের উপাদানসমূহ (Elements of Nationality)

যে সব উপাদান কোনও জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় জনসমাজে পরিণত করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে সেগুলিকে জাতীয় জনসমাজ গঠনের সহায়ক উপাদান রূপে গণ্য করা হয়। তবে এই উপাদানসমূহের প্রত্যেকটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। ল্যাস্কির মতে জাতীয় জনসমাজ ধারণাটির সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নয় কারণ এর কোন পরিমাপযোগ্য উপাদান নেই। জাতীয় জনসমাজের ধারণাটি প্রধানত একটি মানসিক অনুভূতি। সুতরাং জাতীয় জনসমাজ গঠন করার সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ উপাদানসমূহ উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে জাতীয় জনসমাজ গঠনের ক্ষেত্রে সহায়ক কয়েকটি বাহ্যিক ও ভাবগত উপাদানের উল্লেখ করা যায়। ভৌগোলিক ঐক্য, জাতিগত ঐক্য, ভাষাগত ঐক্য ও ধর্মগত ঐক্য বাহ্যিক উপাদানের অন্তর্গত। অন্যদিকে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা, অর্থনৈতিক স্বার্থ ও ঐতিহ্যগত ঐক্যকে ভাবগত বা মানসিক উপাদান বলে গণ্য করা যায়।

(ক) ভৌগোলিক ঐক্য (Geographical Unity)—কোনও জনসমষ্টি একটি সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে দীর্ঘকাল বসবাস ও যাতায়াত করার ফলে তাদের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও ভাব বিনিময় সম্ভব হয়। এর ফলে ঐ ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগণের মধ্যে জাতীয় জনসমাজ গঠনের প্রয়োজনীয় ঐক্যবোধ গড়ে উঠতে পারে। তবে ভৌগোলিক ঐক্য ও সান্নিধ্যকে জাতীয় জনসমাজ গঠনের অপরিহার্য উপাদানরূপে গণ্য করা যায় না। ১৯৪৮ সনে ইহুদিদের নিয়ে গঠিত রাষ্ট্র ইস্রায়েল সৃষ্টির পূর্বে ইহুদিরা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করলেও তাঁরা একই জাতীয় জনসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ঐক্যবোধের অভাব দেখা যেত না।

(খ) জাতিগত ঐক্য (Racial Unity)—বংশগত বা কুলগত ঐক্যকে অনেকে জাতীয় জনসমাজ গঠনের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান রূপে গণ্য করেন। তাঁদের মতে কোনও জাতীয় জনসমাজের অন্তর্গত সমস্ত ব্যক্তিরা একই বংশ বা কুল থেকে উদ্ভূত বলে মনে করলে তাদের মধ্যে ঐক্যবোধ নিঃসন্দেহে দৃঢ় হয়। হিটলার জার্মান জাতিকে আর্যজাতির বংশধর রূপে গণ্য করে জার্মানদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রচার করেন। এইভাবে প্রচারের ফলে তিনি জার্মানদের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করে জার্মানীকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তবে নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে বর্তমানে কোনও জাতির মধ্যেই কুলগত পবিত্রতা দেখা যায় না। একই কুল থেকে উদ্ভূত কোনও জাতির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া এখন অসম্ভব। পৃথিবীর যে কোনও জাতিই আসলে বিভিন্ন বংশ বা কুলের সমন্বয়ে ও রক্তের সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্ট। সুতরাং জাতিগত ঐক্যকে জাতীয় জনসমাজ গঠনের অত্যাবশ্যক উপাদানরূপে গণ্য করা অযৌক্তিক।

(গ) ভাষাগত ঐক্য (Linguistic Unity)—ভাষার মাধ্যমে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। সুতরাং একই ভাষাভাষী ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব বিনিময় করা বিভিন্ন ভাষাভাষী ব্যক্তিদের মধ্যে ভাব বিনিময় করা অপেক্ষা সহজতর। এইজন্য অনেকে বলেন যে একই ভাষা ব্যবহারকারী জনগণের মধ্যে ঐক্যবোধ সাধারণত প্রবল হয়। কিন্তু বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে একই ভূখণ্ডে বসবাসকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ভাষাগত বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও ঐ সব রাষ্ট্রে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছে। সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসীরা জার্মান, ফরাসী ও ইটালীয়—প্রধানত এই তিনটি ভাষা ব্যবহার করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নেও বহু ভাষা প্রচলিত আছে। ভারতের সংবিধানে ১৫টি ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু কথ্য ভাষা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এইসব রাষ্ট্রে ভাষাগত বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনা ও ঐক্যবোধের অভাব পরিদৃষ্ট হয় না।

(ঘ) ধর্মীয় ঐক্য (Religious Unity)—অতীতে অনেক সময় ধর্মীয় ঐক্য জাতীয় জনসমাজ গঠনের ক্ষেত্রে প্রেরণা জুগিয়েছে। একই ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের সহজেই ঐক্যবদ্ধ করা যায়। বিশেষ করে যখন কোনও জনসমষ্টির মধ্যে এই ভাব জাগ্রত হয় যে অন্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের দ্বারা তারা উৎপীড়িত হচ্ছে তখন তাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হতে পারে। ধর্মীয় অনৈক্যের কারণেই ভারত বিভক্ত হয় এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। সাম্প্রতিক কালে অবশ্য ধর্মগত ঐক্যকে জাতীয় ঐক্যবোধ গঠনের প্রয়োজনীয় উপাদানরূপে গণ্য করা হয় না। সাধারণভাবে বলা যায় যে আধুনিক বিশ্বে জাতীয় জনসমাজ গঠনের ক্ষেত্রে ধর্মের গুরুত্ব ও প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রে বহু ধর্মাবলম্বী জনগণ একত্রে বসবাস করলেও এইসব রাষ্ট্রে জাতীয় ঐক্যবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয় না। ধর্ম ঐক্য সৃষ্টির সহায়ক উপাদানরূপে কাজ করলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত না এবং ইরাক ও ইরান এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যেও শত্রুতার

সম্পর্ক দেখা দিত না। আধুনিক কালে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহে পরধর্ম সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতির মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা হয়।

(ঙ) রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা (Political Aspiration)—জাতীয় জনসমাজ গঠনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল জাতি গঠনের ইচ্ছা। একটি নির্দিষ্ট জনসমাজ যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য সচেষ্ট হয় সেক্ষেত্রে তাদের শেষ পর্যন্ত কেউই দমন করতে পারে না। সুতরাং জাতি গঠনের ইচ্ছা একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ধর্মাবলম্বী ভারতীয় জনগণ স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এইভাবে জাতি গঠনের প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করে ও এইজন্য ইংরাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী জনগণ স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের জন্য দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ফলে অবশেষে তারা বাংলাদেশ নামে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করতে সক্ষম হয়।

(চ) অর্থনৈতিক স্বার্থ (Economic Interest)–কোনও রাষ্ট্রে বসবাসকারী ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ একই ধরনের তাদের মধ্যে সহজেই ঐক্য বোধ গড়ে ওঠে। এইভাবে দেখা যায় যে সাধারণত অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একই শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা অনেক সময় তাঁদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে প্রয়াসী হন।

(ছ) সাংস্কৃতিক ঐক্য (Cultural Unity)—জাতীয় জনসমাজ গঠনের ক্ষেত্রে ঐতিহ্য বা সাংস্কৃতিক ঐক্য একটি অপরিহার্য উপাদান। জাতীয় জনসমাজের ধারণাটি মূলত একটি মানসিক অনুভূতি । একই ভূখণ্ডে বসবাস, ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা, অর্থনৈতিক স্বার্থ প্রভৃতি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু শুধুমাত্র এই উপাদানগুলির সমন্বয়ে জাতীয় জনসমাজের ঐক্যকে ব্যাখ্যা করা যায় না। জাতীয় জনসমাজ গঠনের জন্য জনগণের মধ্যে ভাবগত ঐক্য গড়ে ওঠা একান্ত আবশ্যক। ভাবগত ঐক্য বলতে আচার-ব্যবহার, শিল্পকলা, সাহিত্য, শিক্ষা, প্রভৃতি ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে সমজাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থাকাকে বোঝায়। প্রকৃত অর্থে জাতীয় জনসমাজ বলতে মনের অবস্থাকে বোঝায়। মনের অবস্থা হল চিন্তা করা, অনুভব করা ও জীবন যাপন করার একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। এইরূপ মানসিক অনুভূতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস, ভাষা, ধর্ম,বর্ণ অপেক্ষা অতীতের স্মৃতি ও ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখা এবং ভবিষ্যৎ আদর্শসমূহ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস অধিকতর প্রয়োজনীয়। সুতরাং ভাষাগত, ধর্মগত, বর্ণগত প্রভৃতি বিষয়ে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র ভাবগত ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় জনসমাজ গঠিত হতে পারে।

৭। ভারতীয় জাতীয় জনসমাজের প্রকৃতি (Nature of Indian Nationality)

ভারতকে একটি জাতি বলে গণ্য করা যায় কিনা এই প্রশ্নটি একটি বিতর্কমূলক বিষয়। অনেকের মতে ভারতকে প্রকৃতপক্ষে একটি জাতি বলে আখ্যা দেওয়া অসুবিধাজনক। এর কারণ হল ভাষা, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতির দিক দিয়ে ভারতীয় জনগণের মধ্যে কোনও ঐক্য দেখতে পাওয়া যায় না। ঐতিহ্য, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতির দিক দিয়েও ভারতের বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী জনগণের মধ্যে অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়। এমন-কি জলবায়ু ও ভৌগোলিক অবস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেও ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বহু বৈসাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়।

তবে ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রাচীনকাল থেকেই এই দেশে সর্বদা নানা ধরনের বৈচিত্র্য বা বিভেদের মধ্যে মৌলিক ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়। ব্রিটিশ শাসনকালে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভারতীয়দের মধ্যে একটি শক্তিশালী জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। এর ফলে ভারতের সমগ্র জনগণের মধ্যে একটি জাতীয় ঐক্যের মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে। ১৯৩০ সনে ব্রিটিশ সরকার গঠিত সাইমন কমিশন তাঁদের প্রতিবেদনে এই ঐক্যের কথা স্বীকার করেন। এই প্রতিবেদনের এক স্থানে বলা হয়েছিল যে

ভৌগোলিক বিস্তৃতি বা জনসংখ্যার পরিসংখ্যান বা ধর্ম, বর্ণ এবং ভাষার জটিলতা ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের গুরুত্বকে হ্রাস করেছে এরূপ মনে করা ভুল। ব্রিটিশ আমলে সমগ্র দেশে একই ধরনের শিক্ষা, আইন ও প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকার ফলে জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনার মনোভাব ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকার এই শক্তিকে দমন করতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত ভারতকে স্বাধীনতা দান করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই স্বাধীন অখণ্ড ভারতে একটি জাতি গঠনে প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে সাম্প্রদায়িক কারণে জিন্নার 'দুই জাতি তত্ত্ব' অনুসারে পাকিস্তান নামে একটি পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। অনেকে বলেন যে এর দ্বারা এই প্রমাণিত হল যে বিভেদকামী শক্তিগুলি ঐক্যসৃষ্টির সহায়ক শক্তিগুলি অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী।

যাই হোক পাকিস্তান নামে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও ভাষাভাষী জনসাধারণ একত্রে বসবাস করছে। সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুসারে ভারতে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং নাগরিকদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-মর্যাদা, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির আশ্বাসক ভ্রাতৃভাব বর্ধন করা (Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation) হল এই সংবিধানের একটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় জনগণকে সাম্য, স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিষয়ক এবং শোষণ থেকে ত্রাণের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গণকে বিশেষ সুযোগসুবিধা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতের ঐক্য ও সংহতি সমুন্নত রাখা ও রক্ষা করা, ধর্মীয়, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণীগত বিভিন্নতা অতিক্রম করে ভারতের জনগণের সকলের মধ্যে সমন্বয় ও সাধারণ ভ্রাতৃত্ববোধ বর্ধন করা এবং ভারতের সংমিশ্র সংস্কৃতির সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারের সম্মাননা ও রক্ষা করা হল প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য। সুতরাং প্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় সভ্যতায় বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা স্থাপনের যে আদর্শ প্রচলিত আছে ১৯৫০ সনে প্রবর্তিত ভারতের সংবিধানের মাধ্যমেও সেই আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলেও জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য এক-নাগরিকতা স্বীকৃত হয়েছে। বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ধর্মাবলম্বী জনগণকে নিয়ে গঠিত সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যাণ্ডকে যদি জাতি রূপে গণ্য করা যায় তাহলে বতমান ভারতকেও একটি জাতিরূপে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

৮। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Right of Self-determination of Nations)

প্রতিটি জাতীয় জনসমাজের নিজস্ব সত্তা ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ রক্ষা করার জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করার অধিকারকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলা হয়। 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' (One nation, one state) এই নীতির ওপর আত্মনিয়ন্ত্রণের তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত। এই নীতি অনুযায়ী প্রতিটি রাষ্ট্র একটি মাত্র জাতির জনগণ নিয়ে গঠিত হওয়া উচিত। যে সব রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতির জনগণ বসবাস করেন তাঁদের ভেঙে প্রতিটি জাতির জনগণকে নিয়ে পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গঠন করা প্রয়োজন। এই নীতি অনুসারে বহুজাতিক রাষ্ট্রের (Multinational states) পরিবর্তে একজাতিক রাষ্ট্র (Mononational states) গঠন করা বাঞ্ছনীয়।

হায়েস (Hayes)-এর মতে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে 'ব্যক্তিরা যে সার্বভৌম রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হবে এবং যে ধরনের শাসন ব্যবস্থার অধীনে বসবাস করবে তা নির্ধারণ করার অধিকারকে বোঝায়' (the right of individuals to determine the sovereign state to which they would belong and the form of government under which they would live)। এই নীতির মাধ্যমে জাতীয় জনসমাজসমূহ কর্তৃক 'রাষ্ট্রত্বের' আকারে তাদের 'জাতিত্ব' অর্জনের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা হয়। অর্থাৎ এই নীতির মূল কথা এই যে একমাত্র

সার্বভৌম রাষ্ট্রের মাধ্যমেই একটি জাতীয় জনসমাজ শক্তিশালী ও মহিমান্বিত হয়ে উঠতে পারে।

১৭৭২ সনে পোল্যাণ্ড বিভক্ত হওয়ার পর থেকেই জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বিষয়টি নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আলোচনা শুরু করেন ও বাস্তব রাজনীতিতেও এই ধারণাটি সক্রিয় শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তবে ১৮১৫ সনে ভিয়েনা কংগ্রেস অনষ্ঠিত হওয়ার পর সমগ্র ইয়োরোপে এই নীতি সমর্থিত হয়। ১৮৬১ সনে জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর Representative Government গ্রন্থে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারটি বিশেষভাবে সমর্থন করেন। মিলের মতে জাতীয় জনসমাজের সীমারেখা সরকারের সীমারেখার সমানুপাতিক হওয়া প্রয়োজন (The boundaries of Government should coincide with those of nationality)।

তিনি আরও বলেন যে, যে রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজ বসবাস করে সেখানে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের অস্তিত্ব অসম্ভব। মিলের মতে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য এক জাতির ওপর ভিত্তিশীল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা একান্ত আবশ্যক। ভূতপূর্ব মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' তত্ত্বটিকে সমর্থন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উড্রো উইলসন প্রচারিত চোদ্দদফা শান্তি প্রস্তাবের মধ্যে একটিতে প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে উল্লেখ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই মতবাদ খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই নীতিটি জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত সফল ও ব্যর্থ বহু আন্দোলনকে অনুপ্রেরণা দান করেছে।

ক) জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের পক্ষে যুক্তি (Arguments for the Right of Self-determination of Nations)

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের পক্ষে সাধারণত নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখানো হয়ে থাকে :

প্রথমত, এক জাতি নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রে জাতির সংস্কৃতি ও প্রতিভা স্বাধীনভাবে বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ লাভ করে এবং জাতীয় ঐতিহ্য বজায় রাখা সম্ভব হয়। কিন্তু বহু জাতি সম্বলিত রাষ্ট্রে শক্তিশালী জাতিসমূহের প্রাধান্যের ফলে সংখ্যালঘু ও দুর্বল জাতিসমূহের জাতীয় গুণাবলী উপেক্ষিত হয়।

দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের জন্য 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' এই নীতিটি বিশেষ উপযোগী। প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় জনসমাজ জাতীয় সংগ্রামের মাধ্যমে নিজস্ব রাষ্ট্র গঠন করতে চায়। কারণ একটি ভূখণ্ডের মধ্যে একটি মাত্র জাতি বাস করলে জনগণ স্বায়ত্ত-শাসনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক আদর্শসমূহ চরিতার্থ করতে পারে। বহু জাতি সম্বলিত রাষ্ট্রে দুর্বল জাতিগুলি অনেক সময় সরকার গঠন ও পরিচালন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি উপেক্ষিত হয়।

তৃতীয়ত, প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা হলে সংখ্যালঘু দুর্বল জাতিগুলির ওপর সবল জাতিগুলির অত্যাচার ও শোষণের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এর ফলে প্রত্যেক জাতি কোনও শক্তিশালী জাতির নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করার সুযোগ পাবে।

চতুর্থত, এক জাতি সম্বলিত রাষ্ট্রে সরকার জনগণের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় বলে ঐ সরকার সর্বদা বিপুলভাবে জনসমর্থন লাভ করে। ফলে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শান্তি বজায় থাকে এবং অগ্রগতির পথ অব্যাহত থাকে। দেশ গঠনের কাজে আহ্বান দিলে সহজেই জনগণের সহযোগিতা ও সমর্থন পাওয়া যায়।

পঞ্চমত, বিশ্বে শান্তি ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার জন্যও 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' নীতিটিকে সমর্থন

করা যায়। প্রতিটি জাতীয় জনসমাজ আত্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ লাভ করলে পৃথিবীতে যুদ্ধের অন্যতম একটি প্রধান কারণের অবসান ঘটবে। এছাড়া প্রত্যেক জাতীয় জনসমাজ নিজস্ব রাষ্ট্রের মাধ্যমে সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরিপূর্ণরূপে বিকাশ করতে সমর্থ হবে। এর ফলে সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বিশ্বসভ্যতার বৈচিত্র্যও বৃদ্ধি পাবে।

খ) জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারটির বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against the Right of Self-determination of Nations)

অনেক বলেন যে প্রতিটি জাতীয় জনসমাজের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নীতিটি বাস্তবে অবাধে প্রয়োগ করা সম্ভব নয় এবং কাম্যও নয়। সমালোচকেরা এই নীতিটির বিরুদ্ধে অনেকগুলি যুক্তি প্রয়োগ করেন।

প্রথমত, 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' নীতিটিকে কার্যকর করতে গেলে বহু রাষ্ট্রকে ভেঙে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর ফলে পৃথিবীতে রাষ্ট্রের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবে। সুইজারল্যাণ্ডে প্রধানত ফরাসী, জার্মান ও ইটালীয়গণ বসবাস করেন। এই নীতিকে কার্যকর করতে হলে সুইজারল্যাণ্ডকে তিনটি রাষ্ট্রে ভাগ করতে হবে। একইভাবে ইয়োরোপ ও সোভিয়েত রাশিয়ায় অসংখ্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি হবে। ভারতের বর্তমান ২২টি রাজ্য ও ৯টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পরিবর্তে অন্তত পক্ষে ৪০টি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হবে। সুতরাং এই নীতিটিকে অবাধে প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নয়।

দ্বিতীয়ত, বহুজাতি সম্বলিত রাষ্ট্রে একাধিক জাতি দীর্ঘকাল একত্রে বসবাস করার ফলে তাদের মধ্যে একাত্মবোধের সৃষ্টি হয় এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলে সভ্যতা ও সংস্কৃতি উচ্চমান সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ হয়। অনগ্রসর ও অনুন্নত জাতিগুলি উন্নত জাতিগুলির সংস্পর্শে থাকার ফলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে থাকে না, এই কারণে অনেকে 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' নীতিটির বিরোধিতা করেন।

তৃতীয়ত, একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে দীর্ঘকাল একত্রে বসবাসকারী জাতিসমূহকে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসারে স্বতন্ত্র করার ফলে অনেক সময় ভৌগোলিক কারণেও নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। কোনও বৃহৎ রাষ্ট্রকে বিভক্ত করার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের অসম বণ্টন হওয়ার ফলে তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে না। এর ফলে নানারূপ অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হবে এবং জাতীয় অগ্রগতিও বাধাপ্রাপ্ত হবে।

চতুর্থত, জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারটি অবাধে প্রয়োগ করা হলে অসংখ্য ছোট ছোট রাষ্ট্রের সৃষ্টি হবে। এই রাষ্ট্রগুলি কেবলমাত্র আয়তনেই ক্ষুদ্রাকৃতি হবে না, অর্থনৈতিক দিক দিয়েও এরা দুর্বল হবে। স্বভাবতই এই সব রাষ্ট্রগুলি বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির তাঁবেদারে পরিণত হবে।

পঞ্চমত, বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে একজাতি সম্বলিত রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা বহুজাতি সম্বলিত রাষ্ট্রগুলি সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, বাণিজ্য, সামরিক শক্তি প্রভৃতি সব দিক দিয়েই অনেক বেশি অগ্রসর ও শক্তিশালী হয়ে থাকে। এ বিষয়ে সোভিয়েত রাশিয়াকে উদাহরণ রূপে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ষষ্ঠত, 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' তত্ত্বটিকে রূপায়িত করার ফলে সৃষ্ট অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

পরিশেষে বলা যায় যে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নীতিটি ভবিষ্যতে বিশ্বের সকল জাতিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি বিশ্ব রাষ্ট্র (World State) গঠনের প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যদি কয়েকটি রাষ্ট্রই একত্রিত হয়ে একটি রাষ্ট্রে বসবাস করতে না পারে সেক্ষেত্রে বিশ্বরাষ্ট্রের প্রস্তাবটি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

লর্ড কার্জনের ভাষায় জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারটি একটি দুইদিকে ধার সম্পন্ন তরবারির মত। এই নীতি প্রয়োগ করার ফলে কোনও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জাতি যেমন ঐক্যবদ্ধ হয় তেমনই বিভিন্ন জাতি স্বতন্ত্র হয়ে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষের সৃষ্টি করে থাকে। সুতরাং এই নীতিটি শর্তসাপেক্ষে প্রয়োগ করা যেতে পারে। দুর্বল ও অনগ্রসর জাতিগুলিকে শক্তিশালী জাতিগুলির স্বৈরাচার ও অর্থনৈতিক শোষণের কবল থেকে মুক্তির জন্য সংগঠিত জাতীয় আন্দোলনসমূহকে সর্বদা সমর্থন করা যায়। এক্ষেত্রে এই অধিকারটিকে একটি নৈতিক দাবি বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে সব জাতিকেই বিনা বিবেচনায় স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের অধিকার প্রদান করার নীতিটি সঠিক নয়। একই রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রতিটি জাতির—বৃহৎ ও সংখ্যালঘু—নিজস্ব ভাষা, ধর্ম, লিপি, সংস্কৃতি প্রভৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশ ঘটাবার অধিকার দেওয়া যেতে পারে সংবিধানের মাধ্যমে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতে এইভাবে সংবিধানের মাধ্যমে প্রতিটি জাতীয় জনসমাজের স্বাধীন সত্তাকে বিকশিত করার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে।

৯। জাতীয়তাবাদ (Nationalism)

জাতীয়তাবাদের কোনও সন্তোষজনক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। হায়েস (Hayes)-এর মতে জাতীয় জনসমাজ ও স্বদেশপ্রেম—এই দুটি প্রাচীন ঘটনার আধুনিক আবেগপ্রবণ সংমিশ্রণ ও অতিরঞ্জনের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ধারণার সন্ধান পাওয়া যায়। কন (Kohn) বলেছেন যে জাতীয়তাবাদ হল প্রধানত ও সর্বাগ্রে মনের অবস্থা, চেতনার বহিঃপ্রকাশ ("Nationalism is the first and foremost a state of mind, an act of consciousness")। বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের প্রায় সর্বত্র রাজনৈতিক জীবনে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ দেখা দিলেও প্রতিটি দেশের ঐতিহাসিক অবস্থা ও সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদের প্রকৃতির পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদকে একটি জাতির মানসিক সত্তারূপে গণ্য করা যায়। কোনও একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বসবাসকারী জনগণ ভাষা, ধর্ম, প্রথা, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির ভিত্তিতে যখন নিজেদের মধ্যে গভীর একাত্মবোধ অনুভব করে তখনই জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটে। অতএব জাতীয়তাবাদ হল ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট স্তরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মেধাগত উপাদানসমূহের দ্বারা সৃষ্ট কোনও জাতীয় জনসমাজের মানসিক অবস্থা বা অনুভূতি। এইরূপে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জনসমাজ নিজস্ব স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব সত্তাকে বিকশিত করে। সুতরাং জাতীয়তাবাদ একদিকে বহুসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করে, আবার অন্যদিকে এটি প্রতিটি জনগোষ্ঠীকে তার স্বাতন্ত্র্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করে। পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কার্ল ডয়েচ (Karl Deutsch) তাঁর Nationalism and Social Communication গ্রন্থে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, কোনও দেশের জনগণের অন্তর্ভুক্ত মধ্য ও নিম্নশ্রেণীর বিশাল সংখ্যক গোষ্ঠী যদি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংযোগ স্থাপন করে তবে তখনই উন্মেষ ঘটে জাতীয়তাবাদের। ডয়েচের মত অনুসারে সংযোগ স্থাপন করাই হল জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি এবং সামাজিক যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই এই সংযোগ গড়ে ওঠে।

কোনও একটি বৃহৎ রাষ্ট্রে সমগ্র দেশব্যাপী জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের পাশাপাশি যদি ঐ রাষ্ট্রের কোনও অংশ বা অঞ্চলে সামগ্রিকভাবে জাতীয়তাবাদের সাথে যুক্ত ও সঙ্গতিপূর্ণ জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে তবে তাকে উপ-জাতীয়তাবাদ (Sub-nationalism) বলা যায়। এরূপ উপ-জাতীয়তাবাদ কখনও সামগ্রিক জাতীয়তাবাদের বিরোধী হয় না। উপ-জাতীয়তাবাদের

দৃষ্টান্তরূপে ব্রিটিশ আমলে ইংরাজ শাসনের অবসানের জন্য ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের পাশাপাশি তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় জাতীয়তাবাদের উন্মেষকে উল্লেখ করা যেতে পারে।

জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনসমূহকে সময় বা যুগ, দেশ, প্রভাব অর্থাৎ ভালমন্দ, সামগ্রিক-আঞ্চলিক—বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। ইদানীং কালে আবার জাতীয়তাবাদকে—বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও প্রোলেতারিয়েত জাতীয়তাবাদ—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যে সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত সেখানে পত্র-পত্রিকা, বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতি সামাজিক সংযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ঐ শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়। এর ফলে ঐ শ্রেণী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কৃষ্টিগত সব ক্ষেত্রে তাদের আধিপত্য বিস্তার করার ফলে যে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয় তাকে বুর্জোয়া বা ধনিক শ্রেণীর জাতীয়তাবাদ আখ্যা দেওয়া যায়। অন্যদিকে সর্বহারা বা শ্রমিক শ্রেণীর প্রাধান্যে পরিচালিত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কৃষ্টিগত ব্যবস্থায় ঐ শ্রেণী সামাজিক সংযোগ ব্যবস্থার ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করার ফলে জাতীয়তাবাদ প্রোলেতারিয়েত বা শ্রমিক শ্রেণীর জাতীয়তাবাদের রূপ গ্রহণ করে।

জাতীয়তাবাদের আদর্শ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনগণকে মুক্তি সংগ্রামের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছে। এই আদর্শ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ধারণার সহিত যুক্ত। এই ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিটি জাতি আত্মনির্ভরশীল ও আত্মসচেতন হতে পারে। প্রতিটি জাতি যদি জাতীয়তাবাদের আদর্শের নীতিসমূহে আস্থাশীল হয় সেক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের সত্তা বিকশিত হতে পারে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে মানবসমাজের কল্যাণ ও প্রগতি সাধিত হবে।

তবে জাতীয়তাবাদ অনেকসময় উগ্র ও বিকৃতরূপ ধারণ করে বিপদ ডেকে আনে। হায়েস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ লেখকগণ জাতীয়তাবাদের বিপদগুলির বিষয়ও উল্লেখ করেছেন। ঊনবিংশ শতকের রাশিয়ার দার্শনিক ভ্লাদিমির সোলোভেব (Vladimir Solovyev) জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বলেন যে এটি উগ্র আকার ধারণ করলে জাতিকে বিনষ্ট করে, কারণ সেক্ষেত্রে সে নিজেকে মানবতার শত্রুতে পরিণত করে (In its extreme form it destroys a nation, for it makes it the enemy of mankind)। জাতীয়তাবাদ কর্তৃক উদ্বুদ্ধ স্বদেশপ্রেম বা স্বদেশপ্রীতির মনোভাব অনেক ক্ষেত্রে অন্য জাতির প্রতি হিংসা বা দ্বেষের সৃঞ্চার করে। বিকৃত জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি হওয়ার ফলে কোনও জাতি কেবলমাত্র নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে না, একই সঙ্গে অপরকে নীচ বলে ঘৃণা করে। অতএব কোনও জাতির ক্ষমতা বৃদ্ধি হলে ঐ জাতি নিজের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। এইভাবে জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। শক্তিশালী জাতিগুলি প্রথমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদের ক্ষমতা প্রসারিত হয়। এর ফলে জাতিগুলির মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ দেখা যায় এবং বিশ্বশান্তি বিনষ্ট হয়। সুতরাং জাতীয়তাবাদ বিকৃত আকার ধারণ করলে মানব সভ্যতার অগ্রগতি ও কল্যাণের পথ রুদ্ধ হয় এবং গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার আদর্শ সমূলে বিনষ্ট হয়।

১০। আন্তর্জাতিকতা (Internationalism)

বিভিন্ন যুগে কবি, দার্শনিক ও আইনজ্ঞগণ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু সম্পর্ক বজায় রাখা, যুদ্ধ বন্ধ করা, বিশ্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা ও আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব দেখা যায়। এগুলির মধ্যে অ্যাবে ডি সেণ্ট প্যারের (Abbe de St Pierre) ইয়োরোপে শান্তি আনয়নের প্রস্তাব, বেন্থামের (Bentham) সার্বিক ও চিরস্থায়ী শান্তির

জন্য সমর্থন, গ্রোসিয়াসের (Grotius) 'যুদ্ধ ও শান্তির আইন' এবং কান্টের (Kant) 'চিরস্থায়ী শান্তি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশ্বে শান্তি স্থাপন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ বা প্রতিনিধিদের নিয়ে বহু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আজও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এরূপ কোনও পরিবেশ তৈরি হয় নি যাতে কোনও রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক জনমত বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিকতাবাদের উদ্ভব হয়েছে। আন্তর্জাতিকতাবাদ হল প্রকৃতপক্ষে একটি মানসিক ধারণা। বিশ্বে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করাই হল এর মূল লক্ষ্য।

বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রসমূহ অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নিরাপত্তার কারণে পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। ছোট বড় কোনও রাষ্ট্রই এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। একাকী কোনও রাষ্ট্রই তার প্রয়োজন মেটাতে পারে না। বিজ্ঞান ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলেও বিশ্বের একপ্রান্তের সাথে অন্য প্রান্তের সম্পর্ক সহজতর হয়ে উঠেছে। এছাড়া বিগত দুটি মহাযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্ট ভয়াবহতা ও ভবিষ্যতে আণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনাকে দূর করার জন্য রাষ্ট্রসমূহ পারস্পরিক ঐক্য ও সহযোগিতার বিষয়ে কিছু পরিমাণে সচেতন। অধ্যাপক ল্যাস্কির (Laski) ভাষায় বলা যায় যে, বিশ্ব এরূপভাবে পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে যে কোনও রাষ্ট্রের অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা অন্যান্য রাষ্ট্রের শান্তির পক্ষে মারাত্মক। রাষ্ট্রসমূহের পরস্পর নির্ভরশীলতা বিশ্ব-সমাজের দাবি স্বীকার করা প্রয়োজন বলে গণ্য করে ("The world has become so independent that an unfettered will in any state is fatal to the peace of other states.... The interdependence of states makes it necessary to postulate a world-community.")

জাতিসমূহের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, সন্দেহ ইত্যাদি মনোভাবের পরিবর্তে বন্ধুত্বমূলক ও প্রতিবেশীমূলক সম্পর্ক স্থাপন ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করাই হল আন্তর্জাতিকতার মূল উদ্দেশ্য। আন্তর্জাতিকতার নীতি অনুসারে প্রতিটি জাতিই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এরূপ একটি সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করবে যাতে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আন্তর্জাতিকতার নীতি অনুসারে কোনও রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা ক্ষুণ্ণ হয় না। এই নীতি অনুযায়ী যে সব বিষয়ে সকল রাষ্ট্রের বা অধিকাংশে রাষ্ট্রের সাধারণ স্বার্থ জড়িত থাকে সেই বিষয়গুলি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের সম্মতি নিয়ে স্থির করা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিকতার আদর্শটিকে নিছক রাজনৈতিক আদর্শরূপে গণ্য করা যায় না। এই আদর্শটি একটি নৈতিক আদর্শও বটে কারণ এর মহিমান্বিত উদ্দেশ্য হল সমস্ত জাতিসমূহের মধ্যে সর্বকালের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। আন্তর্জাতিক নৈতিকতা, আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকতার পথ প্রশস্ত করা সম্ভব।

'নিজে বাঁচ ও অপরকে বাঁচাও' (live and let others live) এই হল আন্তর্জাতিকতার মূল বক্তব্য। সুতরাং আন্তর্জাতিকতা বলতে বিশ্বে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করার বিষয় বোঝায় যেখানে প্রতিটি রাষ্ট্রকে কতকগুলি শর্ত পালন করতে হয়। এই শর্তগুলি হল : প্রথমত, প্রতিটি রাষ্ট্রকে এরূপভাবে বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা প্রয়োগ করতে হয় যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতি মান্য করা উচিত। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব রাষ্ট্রকে সমান মর্যাদা প্রদান করে বিশ্ব সৌহার্দ্য গড়ে তুলতে হবে। এইভাবে জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। তবে আন্তর্জাতিকতার চরম লক্ষ্য হল জাতিসমূহের নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রেখে একটি বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের দিকে অগ্রসর হওয়া।

১১। জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা (Nationalism and Internationalism)

বিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। বর্তমানে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উদীয়মান দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রসারিত হয়েছে। অন্যদিকে এই শতাব্দীকে ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা ও আন্তর্জাতিকতার যুগ বলেও অনেকে আখ্যা দিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক কন (Kohn)-এর মতে 'বর্তমানে আমরা সকল মহাদেশেই একটি সর্ব-জাতীয়তাবাদের যুগে বাস করছি' ('We are living in the age of pan-nationalism in all continents')। অর্থাৎ আজকের দিনে জাতীয় রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক বিবাদ ও প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদ ব্যক্ত হয় একথা মনে করে গুরুত্ব আরোপ করা হয় বিভিন্ন সভ্যতা, ঐতিহ্য ও আদর্শসম্বলিত জাতীয়তাবাদের সামগ্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের ওপর।

অনেক সময় অবশ্য জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাকে পরস্পরের বিরোধী শক্তিরূপে গণ্য করা হয়। বস্তুত জাতীয়তাবাদ উগ্র, বিকৃত ও সংকীর্ণ রূপ ধারণ করলে আন্তর্জাতিকতার শত্রুতে পরিণত হতে পারে। মনে রাখা দরকার যে আজকের পৃথিবীতে জাতীয়তাবাদকে বিকৃত করে সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism)। আধুনিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আশাতীত সাফল্যের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সভ্যতা বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে। সুতরাং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে অনুন্নত দেশগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এইসব দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে সহায়তা করার অজুহাতে ধীরে ধীরে তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা খর্ব করে। এইভাবে জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়। ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি অনুন্নত রাষ্ট্রগুলির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করার উদ্দেশ্যে তাদের ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতিকেও দমন করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ফলে উপনিবেশবাদের অবসান ঘটেছে। কিন্তু ইদানীং কালে দেখা যায় যে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি নতুন উপায়ে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করেছে। শর্ত সাপেক্ষে ঋণদান, বহু জাতি ভিত্তিক সংস্থাসমূহ (Multinational corporations) প্রভৃতির মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শোষণ করে চলেছে। এরূপ অবস্থাকে নয়া সাম্রাজ্যবাদ (Neo-imperialism) আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

উগ্র ও বিকৃত জাতীয়তাবাদকে অবশ্যই মানবতা ও আন্তর্জাতিকতার শত্রু বলে গণ্য করা যেতে পারে। প্রকৃত জাতীয়তাবাদের ধারণা কখনও কোনও জাতিকে অন্য জাতিদের হেয় প্রতিপন্ন করাকে বা অন্য জাতিদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করাকে সমর্থন করে না। জাতীয়তাবাদ প্রতিটি জাতির নিজ নিজ প্রতিভা ও সত্তার বিকাশ ঘটিয়ে মানব সভ্যতাকে উন্নত করতে আগ্রহী। সুতরাং জাতীয়তাবাদ জাতিসমূহের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের আদর্শে বিশ্বাসী।

প্রকৃত জাতীয়তাবাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার কোন বিরোধ থাকা সম্ভব নয়। জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তিতেই আন্তর্জাতিকার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা যায়। প্রকৃত জাতীয়তাবাদের নীতি অনুসারে কখনও জাতিতে জাতিতে বিরোধ ঘটতে পারে না। জাতীয়তাবাদের আদর্শের আত্মগর্বে পূর্ণ হয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতি হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হলেই আন্তর্জাতিক শান্তি ব্যাহত হয়।

আন্তর্জাতিকতার অর্থ এই নয় যে প্রত্যেক জাতি তার নিজস্ব সত্তাকে বিসর্জন দেবে। আদর্শ জাতীয়তাবাদের পথ দিয়েই আন্তর্জাতিকতার দিকে অগ্রসর হতে হয়। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে পরিত্যাগ করে তার পরিবর্তে যে মহৎ ও উচ্চ ধারণাকে গ্রহণ করা উচিত তা হল আন্তর্জাতিকতা। সুতরাং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ব্যতীত কোন রাষ্ট্রের নিজস্ব সত্তা বিকশিত হতে পারে না।

অধ্যায় ৬

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা রাষ্ট্রসংঘ

১। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (Historical Background)

বিশ্বের ইতিহাসে কোনও সময়েই নিরবচ্ছিন্ন শান্তি অথবা অবিরত যুদ্ধ দেখা যায় না। বিগত দিনগুলিতে যুদ্ধ ও শান্তি পরস্পর পরস্পরকে ক্রমান্বয়ে অনুসরণ করেছে এবং বর্তমান শতকেও এই ঘটনাপ্রবাহ অব্যাহত। কোনও কোনও সময়ে যুদ্ধের ফলে যে ভয়াবহ নৃশংসতা ও বিভীষিকা দেখা দিয়েছে তার সমাধানের জন্য বিশ্ববাসী শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছে। আবার অনেক সময় তারা যুদ্ধের মাধ্যমে বিরোধের মীমাংসা করেছে। তবে ঐতিহাসিক সত্য এই যে সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ঐতিহাসিকগণ খ্রীস্টের জন্মের হাজার বছর পূর্বে চীন দেশে বসবাসকারী দার্শনিকদের লেখনীতে শান্তি ও মানবতার কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিশ্ব সহযোগিতার আদর্শের সন্ধান দেখান। অন্য একটি প্রাচীন উদাহরণ হল খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় থেকে প্রথম শতকের মধ্যে গ্রীক নগরগুলি নিয়ে গঠিত সংস্থা আন্তঃনগর পর্ষদ (Amphictyonic Council)।

দান্তে (Dante), পিরে দুবেস (Pierre Dubois), এম্রিক গ্রুস (Emrick Gruce), উইলিয়াম পেন (William Penn), সেন্ট পিরে (Abbe de Saint Pirre), রুশো (Rousseau), বেন্থাম (Bentham), কাণ্ট (Kant) প্রভৃতি লেখকদের বিশ্ব শান্তি সম্পর্কিত কল্প ধারণাগুলিও আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের পিছনে প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে।

যুদ্ধ বন্ধ করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য কাল্পনিক পরিকল্পনাগুলি ব্যতীত ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিকরা কয়েকটি বাস্তব প্রচেষ্টাও করেন। এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই উচ্চপর্যায়ে কয়েকটি বহুপাক্ষিক রাজনৈতিক সম্মেলন দেখা যায়। এর মধ্যে ভিয়েনা কংগ্রেস (১৮১৫), ইয়োরোপের ঐক্য (Concert of Europe), হেগ সম্মেলনসমূহ (১৮৯৯ ও ১৯০৭) উল্লেখ করা যেতে পারে। সুতরাং মতের আদান প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পরিচালনা করার পদ্ধতিটি খুব ফলপ্রসূ না হলেও ঊনবিংশ শতকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্যরূপে পরিগণিত হয়। এই সব আন্তঃরাষ্ট্র সম্মেলনগুলিকে আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের পদক্ষেপ রূপে গণ্য করা যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক সংস্থা হল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্রমাগত বর্ধিত জটিলতা সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করার একটি পদ্ধতি। প্রতিষ্ঠানরূপে কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থা বলতে এই পদ্ধতিকেই বোঝান হয়।

প্রতিষ্ঠানরূপে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ও বিলুপ্ত হতে পারে। কিন্তু পদ্ধতিরূপে আন্তর্জাতিক সংস্থা বর্তমান বিশ্বের একটি স্থায়ী বন্দোবস্ত। এই মনোভাব থাকার ফলেই দেখা যায় যে জাতিসংঘের বিলুপ্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন সংস্থা—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৃষ্টি হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও যদি কোনদিন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যায় তাহলে একইভাবে আবার একটি নতুন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায়। অতএব আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের মোকাবিলা করার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাকে একটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বলে গণ্য করা হয় এবং এই সব সমস্যাসমূহ সমাধান করতে এই সকল প্রতিষ্ঠান কতদূর সক্ষম তা আর বর্তমানে বিচার্য বিষয় নয়। অতএব আন্তর্জাতিক সংস্থা হল একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে বিভিন্ন

রাষ্ট্রসমূহ আনুষ্ঠানিক সংগঠনের মাধ্যমে একে অপরের সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও উন্নত করে থাকে।

জাতিসংঘ (League of Nations) নামটি থেকেই বোঝা যায় যে এটি ছিল জাতিসমূহকে নিয়ে গঠিত একটি সংস্থা। জাতি শব্দটি এখানে রাজনৈতিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ জাতি বলতে রাষ্ট্রকে বোঝান হয়েছে। জাতিসংঘের চুক্তিপত্র (Covenant) হল সর্বপ্রথম বিস্তারিত ও উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে মানবজাতি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দার্শনিক, রাজনীতিবিদ ও মহান চিন্তানায়করা বিশ্বে শান্তি ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তব বা কাল্পনিক যে সব প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সর্বপ্রথম গুরুত্বসহকারে সেই প্রচেষ্টাকে কার্যকর করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধরত ও নিরপেক্ষ কয়েকটি রাষ্ট্র এই যুদ্ধের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে ভবিষ্যতে যাতে এরূপ যুদ্ধ আর না ঘটে এইজন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যবোধ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। তবে আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রথম বাস্তব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এই পরিকল্পনাকে কার্যকর করার প্রথম সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন। তাঁর প্রস্তাবিত চোদ্দ দফা শান্তি প্রস্তাবের শেষটিতে বলা ছিল যে বড় ও ছোট সব রাষ্ট্রগুলিকে সমভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ভূখণ্ডের সংহতি রক্ষার পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি প্রদান করার উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট চুক্তিপত্রের মাধ্যমে জাতিসমূহকে নিয়ে একটি সাধারণ সংস্থা গঠন করা হবে। এই প্রস্তাব অনুসারে ১৯১৯ সনে প্যারিসে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে জাতিসংঘ গঠনের একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অতঃপর জাতিসংঘের চুক্তিপত্র প্রণয়ন করা হয়। ১৯২০ সনের ১০ই জানুয়ারী তারিখটি জাতিসংঘের আনুষ্ঠানিক উৎপত্তির দিন বলে গণ্য করা হয় কারণ ঐ দিন ভার্সাই-এর চুক্তি কার্যকর করা হয়। ভার্সাই-এর চুক্তির প্রথম ২৬টি ধারায় জাতিসংঘের চুক্তিপত্র উল্লেখ করা ছিল। অতএব জাতিসংঘের চুক্তিপত্রকে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তিরূপে গণ্য করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য। এই সব লক্ষ্য কার্যকর করার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া, বিভিন্ন জাতির মধ্যে সরাসরি ন্যায় ও সম্মানসূচক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা, সরকারসমূহের মধ্যে প্রকৃত কার্য পরিচালনার নিয়মাবলীরূপে আন্তর্জাতিক আইনকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা, সংগঠিত জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ন্যায়বোধ মান্য করা ও সকল চুক্তি থেকে উদ্ভূত কর্তব্যসমূহের প্রতি যথাযথ মর্যাদা দেওয়া—এই সব নীতি অনুসরণ করতে প্রতিশ্রুত হন। তবে এই প্রতিষ্ঠানটির গঠন ও প্রকৃতিগত দুর্বলতার জন্য এবং এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মনোভাব পোষণ করার প্রবৃত্তি থাকার ফলে এর উদ্দেশ্য কার্যত ব্যর্থ হয়। ১৯৩৯ সনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে এই প্রতিষ্ঠানটি একরূপ ভেঙে পড়ে। সুতরাং জাতিসংঘের ইতিহাস হল দুটি বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তীকালীন দুই দশকের ইতিহাস। কিন্তু এই সংস্থাটির এই স্বল্প সময়ের অস্তিত্ব থেকে অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দমনে জাতিসংঘ ব্যর্থ হওয়ার ফলে বিভিন্ন জাতিসমূহ পুনরায় আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যকারিতা ও যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করে দেয়। বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদগণ পুনরায় একত্রিত হয়ে আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘকে সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করা হয় ও তার স্থলে নতুন আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একটি নতুন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে আবির্ভূত এই নবজাতক প্রতিষ্ঠানের নাম সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations)। ১৯৪৬ সনের ৮ই এপ্রিল জাতিসংঘের সভার শেষ অধিবেশনে লর্ড রবার্ট সিসিল এই উক্তি দ্বারা তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন—'The League is dead, Long

live the United Nations'. (জাতিসংঘ মৃত, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দীর্ঘজীবী হক)। এই উক্তিটির দ্বারা সমগ্র অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উৎপত্তি (Origin of the United Nations)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকেই সর্বত্রই জনগণ এই ধারণা পোষণ করেছিলেন যে মিত্র শক্তিবর্গের চূড়ান্ত বিজয়ের পর কোনও বিশ্ব সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে। বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদগণ এই আশাও করেছিলেন যে জাতিসংঘের অভিজ্ঞতা থেকে রাষ্ট্রসমূহ বহু সুবিধা লাভ করবে। এছাড়া দুটি বিশ্বযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা, বিশ্বব্যাপী মন্দা, ইতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব ধ্বংসলীলা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার বিপর্যয়—এইগুলির যাতে ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেইজন্য একটি শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গঠনের ক্ষেত্রে নতুন এক আন্তর্জাতিক সংস্থাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদান করা হবে বলেও অনেকে আশা প্রকাশ করেন।

যুদ্ধ চলাকালে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধান ও প্রতিনিধিরা একাধিক সভা, অধিবেশন ও ঘোষণার মাধ্যমে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করেন। এই সব আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়েই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে(Charter) উল্লেখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কেও চূড়ান্ত মতৈক্যে পৌছান সম্ভব হয়।

১৯৪১ সনের ১৪ই অগস্ট বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট আটল্যান্টিক মহাসাগরে একটি যুদ্ধজাহাজে মিলিত হয়ে বিশ্বের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁদের আশার ভিত্তিতে আটটি নীতি ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা আটল্যাণ্টিক সনদ (Atlantic Charter) নামে পরিচিত এবং এইটিকে অনেক সময় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠনের প্রথম পদক্ষেপ রূপে চিহ্নিত করা হয়।

অতঃপর ১৯৪২ সনের ১লা জানুয়ারী ওয়াশিংটনে ২৬টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ যুদ্ধ ও শান্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণায় (Declaration of the United Nations) স্বাক্ষর করেন। এই সম্মেলনেই মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এই নামটি প্রথম ব্যবহার করেন।

১৯৪৩ সনের অক্টোবর মাসে গ্রেট ব্রিটেন, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক মন্ত্রীরা মস্কোয় একটি অধিবেশনে (Moscow Conference) মিলিত হয়ে ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক সংস্থার মূল নীতি ও উদ্দেশ্যসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

মস্কোর পর ১৯৪৩ সনের নভেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্তালিন তেহেরানে একটি অধিবেশনে (Teheran Conference) মিলিত হয়ে একটি সমবেত বিবৃতি প্রকাশ করেন। এই বিবৃতিতে বড় ও ছোট সকল রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

তারপর ১৯৪৪ সনের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ওয়াশিংটনের সন্নিকটে ডাম্বারটন ওকস্-এ অনুষ্ঠিত সম্মেলনে (Dumbarton Oaks Conference) গ্রেট ব্রিটেন, সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনদেশের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নামে একটি সাধারণ আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাব আলোচনা করেন। এই সম্মেলনে প্রস্তাবিত সংস্থার উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ, প্রধানসংস্থাসমূহ, আর্ন্তজাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অছি পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ব্যতীত সনদের মূল রূপরেখা এই সম্মেলনেই স্থির করা হয়।

১৯৪৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্তালিন ইয়াল্টা সম্মেলনে (Yalta Conference) মিলিত হয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে ভোটদান পদ্ধতির ওপর

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ডাম্বারটন ওকস্ সম্মেলনে গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবগুলিও সামান্য পরিবর্তন করে এই সম্মেলনে সমর্থন করা হয়।

পরিশেষে ১৯৪৫ সনের ২৫শে এপ্রিল থেকে শুরু করে ২৬শে জুন পর্যন্ত সানফ্রানসিস্কোতে যে সম্মেলন (Sanfrancisco Conference) অনুষ্ঠিত হয় তাতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের খসড়া চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন করা হয়। এই সম্মেলনেই জাতীয় সার্বভৌমিকতা ও বৃহৎ শক্তিবর্গের সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতি সনদে উল্লেখ করা হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং অছি পরিষদের গঠন, গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স ও জাতীয়তাবাদী চীনকে নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসন প্রদান ও ভিটোক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কেও এই সম্মেলনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তবে সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদের আপেক্ষিক ক্ষমতা, নিরাপত্তা পরিষদে ভোটদান পদ্ধতি, রাশিয়ার দুটি অঙ্গরাজ্যকে— বাইলোরাশিয়া ও ইউক্রেনিয়া—সদস্যপদ প্রদান ইত্যাদি অনেক বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। নতুন সংস্থায় বৃহৎ শক্তিবর্গের বিশেষ পদমর্যাদা সম্পর্কে ছোট ছোট রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা অনেক আপত্তি জানায়। কিন্তু উপস্থিত প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় মীমাংসা করে নিয়ে অবশেষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন।

১৯৪৫ সনের ২৬শে জুন সানফ্রানসিস্কো সম্মেলন সমাপ্ত হওয়ার প্রায় চার মাসের মধ্যেই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যবৃন্দ ও সম্মেলনে স্বাক্ষরকারী প্রতিনিধিদের রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা সনদ অনুমোদিত হয়। ১৯৪৫ সনের ২৪শে অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ (The Charter of the United Nations)

ভবিষ্যৎ বংশধরদের যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করার মহান আদর্শ সামনে রেখে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ রচিত হয়। এই সনদ আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক নীতি সম্বলিত এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সনদে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য, নীতি এবং সাধারণ প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সংস্থার প্রতিটি প্রধান অঙ্গের গঠন, কার্যাবলী ও ক্ষমতা, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধসমূহের মীমাংসার উপায় প্রভৃতিও সনদে আলোচিত হয়েছে। এই সনদ প্রায় দশ হাজার শব্দ সম্বলিত। এতে প্রস্তাবনা ব্যতীত ১৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত ১১১টি ধারা রয়েছে।

৪। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ (Purposes and Principles of the United Nations)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের প্রথম অধ্যায়ে জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। সনদের প্রথম ধারায় বর্ণিত জাতিপুঞ্জের চারটি মূল উদ্দেশ্য হল :

১। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা।

২। জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা।

৩। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সৃষ্টি করা যাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা মানবতামূলক সমস্যাসমূহের সমাধান করা যায়।

৪। এই সব সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ কার্যকর করার জন্য জাতিসমূহের কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কেন্দ্ররূপে কাজ করা।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যদের মধ্যে রাজনৈতিক ও আদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁরা এই সব উদ্দেশ্যগুলিকে তাঁদের নিজ নিজ রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যাণার্থে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা এই

উদ্দেশ্যগুলির প্রতি ব্যক্ত করেছেন তাঁদের আনুগত্য।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা হল জাতিপুঞ্জের প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যতীত জাতিপুঞ্জের অন্যান্য উদ্দেশ্য সমূহ সফল হতে পারে না। আন্তর্জাতিক সংস্থারূপে জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য হল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং সনদ অনুসারে এই সংস্থা অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করার জন্য কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ এক্তিয়ারভুক্ত কোনও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিপুঞ্জ শান্তি ভঙ্গ ও আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যথাযথ সমবেত প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। এই সংস্থা শান্তিপূর্ণ উপায়ে ও ন্যায়বোধ ও আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে যে সব আন্তর্জাতিক বিরোধ বা সমস্যাদির ফলে শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে সেগুলির সমাধানের জন্য সচেষ্ট থাকবে।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য অধিকতর কার্যকর পদক্ষেপ হল সমানাধিকার ও আত্মনির্ধারণের নীতির ওপর ভিত্তি করে জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। অনিশ্চয়তা, অবিশ্বাস ও যুদ্ধের আশঙ্কার পরিবেশে কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করাকে জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বলে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত জাতিগুলির মধ্যে সামাজিক অসাম্য, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য দেখা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। এইসব অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য জাতিপুঞ্জের একটি উদ্দেশ্য হল জাতিগুলির মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবতামূলক সমস্যাদি দূর করা এবং সেই সঙ্গে জাতি ধর্ম-ভাষা-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমানাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা। সনদে জীবন যাত্রার উচ্চমান, পূর্ণ কর্মনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের ব্যবস্থা সম্পর্কেও উল্লেখ করা হয়েছে।

জাতিপুঞ্জের আর একটি উদ্দেশ্য হল জাতি সমূহের মধ্যে উপরিউক্ত সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ কার্যকর করার জন্য একটি কেন্দ্র রূপে কাজ করা। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কার্যকলাপ কেবল মাত্র জাতিপুঞ্জের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। জাতিপুঞ্জের বাইরেও বহু সংস্থা এইসব আদর্শ রূপায়িত করার জন্য চেষ্টা করছে। সুতরাং বিশ্ব সংগঠন রূপে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন জাতির কার্য কলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে জাতিগুলির মধ্যে মতভেদ ও বিরোধের পরিবর্তে ঐক্য ও মতসামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের প্রথম ধারায় বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহকে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় ধারায় সাতটি নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জাতিপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্রগুলি এককভাবে এবং জাতিপুঞ্জ একটি যৌথ সংস্থারূপে এইসব নীতি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করবে।

প্রথম নীতিতে বলা হয়েছে যে এই সংস্থা সকল সদস্য রাষ্ট্রদের সার্বভৌম সমতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আইনগত দিক দিয়ে বিচার করে বলা যায় যে জাতিপুঞ্জের সদস্যরূপে সকল রাষ্ট্রই সমান যদিও আয়তন, জনসংখ্যা, ধনসম্পদ, শক্তি অথবা সভ্যতার বিকাশের দিক দিয়ে তারা অসমান। সার্বভৌম সমতার নীতিটিকে কার্যকর করার জন্য সাধারণ সভায় প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রকে সমান প্রতিনিধিত্ব (৫ জন করে সদস্য প্রেরণের ক্ষমতা) ও সমান ভোটাধিকার (একটি করে) প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে পাঁচটি বৃহৎ শক্তি (যারা জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য) ও জাতিপুঞ্জের অন্যান্য সদস্যদের ক্ষমতার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এছাড়া সাধারণ পরিষদে সকল সদস্য রাষ্ট্রকে একটি করে ভোট প্রদান করা হলেও সোভিয়েত রাশিয়া তিনটি ভোট প্রদান করতে পারে। এর কারণ হল রাশিয়ার দুটি অঙ্গ রাজ্য (Union Republic)—বাইলো-রাশিয়া ও ইউক্রেনিয়া—জাতিপুঞ্জের স্বতন্ত্র সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। অনেকের মতে এর ফলেও সার্বভৌম সমতার নীতি কিয়দংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

দ্বিতীয় নীতিতে বলা হয়েছে যে সকল সদস্য রাষ্ট্র সনদে বর্ণিত কর্তব্যগুলি নিষ্ঠার সাথে পালন করবে। তবে জাতিপুঞ্জের সূচনার পর থেকেই দেখা যাচ্ছে যে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ সনদে প্রদত্ত কর্তব্যসমূহের প্রতি যথেষ্ট আস্থাশীল নন। অনেক রাষ্ট্রের কাছেই এই কর্তব্যের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে জাতীয় স্বার্থের প্রশ্ন।

তৃতীয় নীতিতে বলা হয়েছে যে সকল সদস্য রাষ্ট্র এরূপ শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের পারস্পরিক বিরোধের সমাধান করবে যাতে শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার বিপন্ন না হয়। এই নীতিটিকে কার্যকর করার জন্য সনদে বলা হয়েছে যে, যেসব বিরোধের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে সেইগুলি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের জন্য বিবদমান পক্ষগুলি আলাপ-আলোচনা, অনুসন্ধান, মধ্যস্থতা, আঞ্চলিক সংস্থা বা বিচারালয়ের মাধ্যমে আপোষ, অথবা তাদের সুবিধা অনুযায়ী যে কোনো শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন করতে পারে। তবে কার্যত দেখা যায় যে সনদে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ উপায় উল্লেখ করা সত্ত্বেও বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্র প্রায়শই এগুলিকে অমান্য করে।

চতুর্থ নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে সকল সদস্য রাষ্ট্র তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের সংহতি বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার ওপর বলপ্রয়োগ বা বলপ্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন করবে না। কারণ এইরূপ কার্যকলাপ জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

পঞ্চম নীতির বক্তব্য হল এই যে, যে সকল কাজে জাতিপুঞ্জ অগ্রণী হবে তাতে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ সর্বপ্রকার সাহায্য প্রদান করবে। যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তাকে কোনও সদস্য রাষ্ট্র সাহায্য করবে না।

ষষ্ঠ নীতি অনুসারে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য জাতিপুঞ্জের সদস্য নয় এরূপ রাষ্ট্রগুলিও যাতে সনদে বর্ণিত নীতিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাদের কার্যকলাপ পরিচালনা করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যেদিকে লক্ষ্য রাখবে। এখন প্রশ্ন হল এই যে জাতিপুঞ্জের বহু সদস্য রাষ্ট্রই সনদে বর্ণিত নীতিগুলির সাথে সঙ্গতি রেখে চলে না এবং জাতিপুঞ্জও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। এমতাবস্থায় অসদস্য-রাষ্ট্রকে সনদীয় নীতির প্রতি অনুগত রাখার প্রয়াস কতদূর সফল হতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। এছাড়া যদি কোনও রাষ্ট্রকে ইচ্ছাকৃতভাবে এই সংস্থায় সদস্যপদ দেওয়া না হয় সে ক্ষেত্রে কি জাতিপুঞ্জ ঐ রাষ্ট্রের কাছ থেকে নৈতিকভাবে সনদে বর্ণিত নীতিগুলির প্রতি আস্থা প্রত্যাশা করতে পারে?

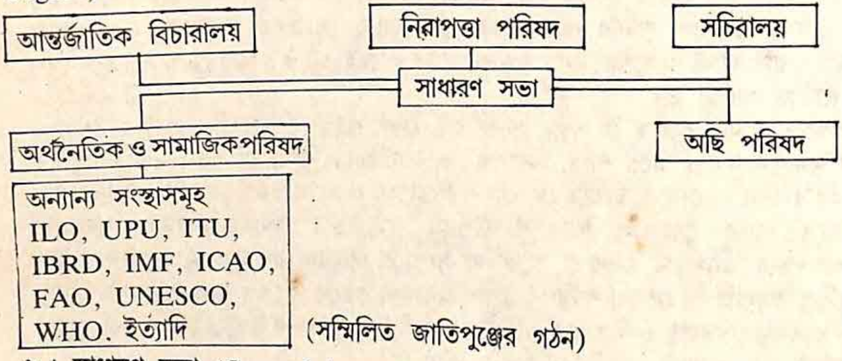
সপ্তম ও শেষ নীতি অনুযায়ী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোনও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। সদস্য রাষ্ট্রসমূহকেও এই ধরনের ব্যাপার নিষ্পত্তির জন্য জাতিপুঞ্জের দ্বারস্থ হতে বাধ্য করা যায় না। এই নীতিটি থাকার ফলে জাতিপুঞ্জের কর্তৃত্ব বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কোনও একটি বিশেষ পরিস্থিতি কোনও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ এক্তিয়ার ভুক্ত বিষয় অথবা আন্তর্জাতিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত কিনা তা নির্ণয় করা অনেক ক্ষেত্রেই অসুবিধাজনক। এই নীতিটির দ্বারা সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌমিকতার ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৫। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান সংস্থাসমূহ (Principal Organs of the United Nations)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের তৃতীয় অধ্যায়ে এর সংস্থা বা অঙ্গ (Organs) সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতিপুঞ্জের ছয়টি মুখ্য সংস্থা হল : ১। সাধারণ সভা (General Assembly), ২। নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council), ৩। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council), ৪। অছি পরিষদ (Trusteeship Council), ৫। আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice) ও ৬। সচিবালয় (Secretariat)।

এছাড়া প্রয়োজন হলে বর্তমান সনদ অনুযায়ী সহায়ক বা সম্পূরক সংস্থাও (Subsidiary

Organs) প্রতিষ্ঠা করা যাবে।



(সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গঠন)

৬। সাধারণ সভা (General Assembly)

সাধারণ সভাকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্ববৃহৎ ও একটি অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ রূপে গণ্য করা হয়। সর্ববৃহৎ কারণ জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য রাষ্ট্রই সাধারণ সভার সদস্য। গুরুত্বপূর্ণ কারণ সনদ অনুযায়ী জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য রাষ্ট্রদের সাধারণ সভায় সমপ্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়েছে এবং আলোচনা ও ভোটদানের ক্ষেত্রেও সমান অধিকার ও সুযোগ স্বীকৃত।

গঠন (Composition)—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য রাষ্ট্রদের নিয়ে সাধারণ সভা গঠিত হয়। তবে কোনও সদস্য রাষ্ট্রই এখানে পাঁচজনের বেশি প্রতিনিধি পাঠাতে পারে না। নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন ক্রমে সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থনে যে কোনও আবেদনকারী সার্বভৌম রাষ্ট্রকে সাধারণ সভার সদস্যপদ দেওয়া যায়।

সাধারণ সভা তার নিজের কর্মপদ্ধতি স্থির করে। সভার প্রতি অধিবেশনে একজন সভাপতি ও উপ-সভাপতিগণকে নির্বাচন করা হয়। সভা তার কাজ পরিচালনার জন্য কতকগুলি কমিটি গঠন করে।

সাধারণ সভার বাৎসরিক নিয়মিত অধিবেশন ব্যতীত প্রয়োজন হলে বিশেষ অধিবেশন হয়ে থাকে। নিরাপত্তা পরিষদ বা জাতিপুঞ্জের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের অনুরোধে মহাসচিব সভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন।

ভোটদান পদ্ধতি (Voting Procedure)—সাধারণ সভায় কোনও সদস্য রাষ্ট্র পাঁচজন পর্যন্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারলেও প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র একটি মাত্র ভোট দিতে পারে। যে সব বিষয়ে সাধারণ সভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে সেগুলিকে সনদ অনুযায়ী 'গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন' ও 'অন্যান্য প্রশ্ন' এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যের নির্বাচন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের এবং অছি পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন, জাতিপুঞ্জে নতুন সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি ও বহিষ্কার ইত্যাদি সনদে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের সমর্থন প্রয়োজন। সনদে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করা নেই এরূপ কোনও প্রশ্নকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের পর্যায়ভুক্ত করা হবে কিনা এই ধরনের বিষয় সহ অন্যান্য যে কোনও বিষয়ে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী (Powers and functions) —তত্ত্বগতভাবে সাধারণ সভা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এক্তিয়ারভুক্ত যেকোনওবিষয় আলোচনা করতে পারে। এর অর্থ হল বিশ্বে পুষ্টি সমস্যা থেকে শুরু করে আগ্রাসনের সংজ্ঞা পর্যন্ত যে কোনও বিষয় সভার আলোচ্য বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহ যতই পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে ততই দেখা যাচ্ছে যে শান্তি

ও নিরাপত্তার প্রশ্ন থেকে শুরু করে শিল্প, বাণিজ্য, উন্নয়ন, মানবিক অধিকার, দুর্দশা বিষয়ক সাহায্য, ঔপনিবেশিকতার অবসান, আন্তর্জাতিক আইন পর্যন্ত সব কিছুই আন্তর্জাতিকভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা বেড়ে চলেছে। এই সমস্ত বিষয়ই সাধারণ সভার এক্তিয়ারভুক্ত। একমাত্র ব্যতিক্রম হল শান্তি ও নিরাপত্তা। এই বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদকে প্রাথমিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যদিও এ ক্ষেত্রে সাধারণ সভার একটি পরিপূরক ভূমিকা আছে।

সাধারণ সভার প্রধান কার্যাবলীকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যেতে পারে :

১। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা সংক্রান্ত যে কোনও প্রশ্নই সভা আলোচনা করতে পারে। যে কোনও সদস্য রাষ্ট্র বা নিরাপত্তা পরিষদকে এই সকল বিষয়েকোনওকার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সাধারণ সভা সুপারিশ করতে পারে।

২। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় এবং আন্তর্জাতিক আইন ও মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য সাধারণ সভা তৎপর হতে পারে ও সুপারিশ করতে পারে।

৩। নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যগণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং অছি পরিষদের সদস্যগণ সাধারণ সভার দ্বারা নির্বাচিত হন।

৪। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণসভা মহাসচিবকে নিয়োগ করে।

৫। সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদ স্বতন্ত্রভাবে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিদের নির্বাচিত করে।

৬। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ ক্রমে সাধারণ সভা নতুন সদস্য গ্রহণ, সদস্যদের বহিষ্কার ও সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারে।

৭। সনদ সংশোধনের প্রশ্নে অংশ গ্রহণ করতে পারে সাধারণ সভা।

৮। নিরাপত্তা পরিষদ ও জাতিপুঞ্জের অন্যান্য সংস্থার বাৎসরিক ও বিশেষ প্রতিবেদনসমূহ সাধারণ সভা বিবেচনা করে।

৯। সাধারণ সভা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাজেট বিবেচনা ও অনুমোদন করে।

আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ সভার বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা থাকলেও এই সংস্থাটিকে একটি ক্ষমতা প্রয়োগকারী সংস্থা বলা যায় না। কারণ কোনও বিষয়ে এই সংস্থা সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। সনদের ভাষায় সাধারণ সভার দায়িত্ব হল আলোচনা করা (Discuss), সুপারিশ করা (Make recommendation),বিবেচনা করা(consider),নজরে আনা(call the attention), ঘোষণা করা (notify), অনুশীলন করা (initiate studies), এবং গ্রহণ ও বিবেচনা করা (receive and consider)। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ সভা সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ও নিরাপত্তা পরিষদের কাছে সুপারিশ করতে পারে ও উপদেশ দিতে পারে। তবে নিরাপত্তা পরিষদের নিকট উপস্থাপিত কোনও বিষয়ে ঐ সংস্থার অনুরোধ ব্যতীত সাধারণ সভা নিজ উদ্যোগে অনুমোদন দেওয়ার অধিকারী নয়।

আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর মোকাবিলায় নিরাপত্তা পরিষদ গত কয়েক দশকে যথোপযুক্ত ক্ষমতা প্রয়োগে ব্যর্থহওয়ায় সাধারণ সভার কর্তৃত্ব ও গুরুত্ব স্বভাবতই কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সনদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদকে মুখ্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং এই ব্যাপারে সাধারণ সভার দায়িত্ব গৌণ। তবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সূচনা থেকেই দেখা যায় যে বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে মতৈক্যের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই নিরাপত্তা পরিষদ প্রয়োজনীয় কোনও বিষয়ে তৎপরতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হয়। এই জন্য ১৯৫০ সনে সাধারণ সভা এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে যদি কোনও ক্ষেত্রে স্থায়ী সদস্যদের ভিটো প্রয়োগের ফলে নিরাপত্তা পরিষদ কোনও আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে অসমর্থ হয় তাহলে

সেক্ষেত্রে সাধারণসভা ঐ বিষয়টি সম্পর্কে সুপারিশ করতে পারে। এই প্রস্তাবটিকে শান্তির সপক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব (Uniting for Peace Resolution) বলা হয়। তবে এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ সভা কোনও বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেবলমাত্র সুপারিশই করতে পারে। ঐরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দিতে পারে একমাত্র নিরাপত্তা পরিষদ।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হলেও সাধারণ সভাকে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থারূপে গণ্য করা যায় না। সভা কোনও বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে পারে, সোচ্চার হয়ে উঠতে পারে, উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে পারে, কিন্তু বাধ্য করতে পারে না। তবে সভার কাজ যদি ঠিকমত পরিচালনা করা হয় সেক্ষেত্রে এই সংস্থা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করতে পারে। একথা সত্য যে সাধারণ সভার হাতে শাসনদণ্ড নেই। তবু অনস্বীকার্য যে আজকের পৃথিবীতে বিশ্বজনমত প্রতিফলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল এই আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং এই বিচারে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

৭। নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী শান্তি রক্ষার জন্য প্রধান দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হল নিরাপত্তা পরিষদ। নিরাপত্তা পরিষদকে এরূপভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে এই পরিষদ দ্রুততার সঙ্গে ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।

গঠন (Composition)—প্রথমে এই সংস্থা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ১১টি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠন করা হত। এই ১১ জনের মধ্যে ৫ জন স্থায়ী ও ৬ জন অস্থায়ী সদস্য থাকতেন। ১৯৬৫ সনে পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে ১৫ জন করা হয়েছে। ৫ জন স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র হল—গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীন। ১০ জন অস্থায়ী সদস্যকে সাধারণসভা ২ বছরের জন্য নির্বাচিত করে। তাদের কার্যকাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পুনঃ নির্বাচিত করা যায় না। পরিষদের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের একজন করে প্রতিনিধিকে সর্বদা জাতিপুঞ্জের সদর কার্যালয়ে থাকতে হয় যাতে তিনি যে কোনও সময়ে জরুরী প্রয়োজনে নিরাপত্তা পরিষদের সভায় যোগদান করতে পারেন। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের নামের ইংরাজী বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী পর্যায় ক্রমে প্রত্যেক সদস্যই একমাস করে সভাপতির কাজ করে থাকেন। সনদে বলা আছে যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নন অথবা সম্মিলিত জতিপুঞ্জের সদস্য নন এরূপ কোনও রাষ্ট্রের স্বার্থজড়িত বিষয় পরিষদে আলোচনা চলা কালে ঐ রাষ্ট্রকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হবে। যদিও তার ভোটদানের অধিকার থাকবে না।

ভোটদান পদ্ধতি (Voting Procedure)—নিরাপত্তা পরিষদের ভোটদান পদ্ধতিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্র একটি করে ভোট দিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের নিকট বিবেচনার জন্য প্রেরিত বিষয়গুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—পদ্ধতিগত বিষয় (Procedural matters) এবং অন্যান্য বিষয় (Other matters)। পদ্ধতিগত কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের যে কোনও ৯ জন সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন। অন্যান্য বিষয় অর্থাৎ নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ৫ জন স্থায়ী সদস্যদের সর্ববাদিসম্মত সম্মতি সহ মোট ৯ জন সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন। অতএব পদ্ধতিগত ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পাঁচজন **স্থায়ী সদস্যের** সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত আবশ্যক। পাঁচ জন স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে যে কোনও একজনের অসম্মতি বা নেতিবাচক ভোটপ্রদানকে 'ভিটো'(Veto) বলা হয়। সনদে অবশ্য 'ভিটো' শব্দটি কোথাও উল্লেখ করা হয় নি। আবার কোনও বিষয় পদ্ধতিগত কিংবা পদ্ধতিগত নয়—এইরূপ প্রশ্নও 'অন্যান্য বিষয়ের' অন্তর্ভুক্ত। অতএব কোনও স্থায়ী সদস্য একটি বিষয়ে দুবার

ভিটো প্রয়োগ করতে পারে। প্রথমত, কোনও বিষয়কে পদ্ধতিগত বিষয়রূপে গণ্য করার বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, প্রস্তাবটির বিষয়বস্তুর বিরোধিতা করে ভোট দিতে পারে। এরূপ অবস্থাকে 'দ্বৈত ভিটো' (Double Veto)প্রয়োগ বলা হয়।

কার্যাবলী (Functions)—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মুখ্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তা পরিষদকে। শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পরিষদ মূলত নিম্নলিখিত কাজগুলি করে থাকে।

১। কোনও বিরোধের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে নিরাপত্তা পরিষদ প্রয়োজন হলে বিবদমান রাষ্ট্রগুলিকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার জন্য আহ্বান জানাতে পারে। এই ধরনের কোনও বিরোধ মীমাংসার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ বিরোধের যে কোনও পর্যায়ে উপায় সুপারিশ করতে পারে।

২। কোনও বিরোধের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে কিনা সে বিষয়েও নিরাপত্তা পরিষদ তদন্ত করতে পারে।

৩। নিরাপত্তা পরিষদের ওপর শান্তির ক্ষেত্রে বাধাপ্রদান, শান্তি ভঙ্গ বা আগ্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদ কোনও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রদের ঐ সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অর্থনৈতিক সংযোগ ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার অনুরোধ জানাতে পারে। এই ব্যবস্থা যথেষ্ট না হলে নিরাপত্তা পরিষদকে আন্তর্জাতিক সামরিক বাহিনীর দ্বারা বল প্রয়োগ করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে।

৪। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে মিলিটারী স্টাফ কমিটির সহায়তায় যুদ্ধাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করার পরিকল্পনা নির্ধারণ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা ব্যতীত নিরাপত্তা পরিষদকে অন্যান্য যে সকল সাংগঠনিক দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল :

১। কোনও রাষ্ট্রকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ প্রদান করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ সভাকে সুপারিশ করতে পারে। আবার কোনও সদস্য রাষ্ট্রের বিতাড়নের জন্যও নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ সভার কাছে সুপারিশ করতে পারে।

২। নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ সভার নিকট মহাসচিব পদ প্রার্থীর নাম সুপারিশ করে।

৩। গুরুত্বপূর্ণ অছি এলাকাসমূহের শাসনের তদারক করাও নিরাপত্তা পরিষদের একটি কাজ।

৪। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতেই সাধারণ সভা আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিদের নিয়োগ করে।

৫। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের রায় যদি কোনও রাষ্ট্র অমান্য করে তবে ঐ রায়কে বলবৎ করার জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সেই সম্পর্কে সুপারিশ করে নিরাপত্তা পরিষদ।

৬। জাতিপুঞ্জের সনদের সংশোধনের ক্ষেত্রেও নিরাপত্তা পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কারণ কোনও সংশোধন প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য পরিষদের পাঁচ জন স্থায়ী সদস্যের অনুমোদন আবশ্যক।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মূল দায়িত্ব যাতে নিরাপত্তা পরিষদ যথাযথভাবে পালন করতে পারে এই প্রত্যাশা নিয়েই পরিষদকে বিশেষভাবে গঠন করা হয়েছিল। প্রথমত, সনদ রচনার সময়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তি ও প্রগতির জন্য পাঁচটি বৃহৎ শক্তির মধ্যে মতৈক্য আবশ্যক বলে মনে করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ যাতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে এজন্য সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে চুক্তি করে সামরিক বাহিনী গঠনের বন্দোবস্ত করা হবে বলেও সনদে উল্লেখ করা হয়েছে। সামরিক বাহিনী সদস্য রাষ্ট্রদের অধীনে

থাকবে, কিন্তু প্রয়োজন হলে নিরাপত্তা পারষদ যাতে তাদের দ্রুত সাহায্যলাভ করতে পারে এরূপ ব্যবস্থার বিষয়ও সনদে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এই দুটি আশাই বিফল হয়েছে। প্রথমত, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সামরিক বাহিনী গঠন করে উঠতে পারে নি। ১৯৪৬-৪৭ সনে মিলিটারী স্টাফ কমিশনে পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে সৈন্যবাহিনীর গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কিত আলোচনায় তীব্র মতবিরোধ দেখা যায়। সুতরাং কোনও আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ বল প্রয়োগ করতে পারে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষে সনদ অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভব হয় নি বলে পরিষদ দুর্বল হয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয়ত, স্থায়ী সদস্যদের সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত ছাড়া নিরাপত্তা পরিষদে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য সর্বদাই আন্তর্জাতিক স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থকেই বড় করে দেখে। স্থায়ী পাঁচটি সদস্যের ঘন ঘন ভিটো প্রয়োগের ফলেও নিরাপত্তা পরিষদ কিছুটা অসার হয়ে গিয়েছে। এই কারণে ১৯৫০ সনে সাধারণ সভায় গৃহীত শান্তির সপক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে যদি কোনও ক্ষেত্রে স্থায়ী সদস্যদের ভিটো প্রয়োগের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় সে ক্ষেত্রে সাধারণ সভা ঐ বিষয়টি সম্পর্কে সুপারিশ করবে।

নিরাপত্তা পরিষদকে মূলত একটি রাজনৈতিক সংস্থা বলা যেতে পারে। বস্তুত রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক পার্থক্য ও বিরোধ নিরন্তর প্রতিফলিত হয় এই সংস্থার মধ্যে। নিরাপত্তা পরিষদকে যে সব সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করতে হয় সেগুলি হল মুখ্যত রাজনৈতিক সমস্যা। এই রাজনৈতিক সমস্যার মোকাবিলায় স্থায়ী সদস্যদের ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ভিটো প্রয়োগের অবাধ অভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রায়শই পরিষদের অভ্যন্তরে জটিলতার সৃষ্টি করে। তবে এর জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে দায়ী করা অনুচিত। পরিষদের যা কিছু অক্ষমতা ও ব্যর্থতা তা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বরাজনীতির ব্যর্থতারই প্রতিফলন মাত্র।

৮। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ —(Economic and Social Council)—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হল প্রধানত একটি রাজনৈতিক ও নিরাপত্তামূলক প্রতিষ্ঠান। যুদ্ধ বা যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই হল এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে একটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান বলেও বর্ণনা করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাই এর একমাত্র কাজ নয়। সনদের প্রথম ধারায় বর্ণিত একটি উদ্দেশ্যতে বলা হয়েছে যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা মানবতামূলক আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ সমাধানে তৎপর হবে এবং জাতি, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা বা ধর্ম নির্বিশেষে মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবে। সনদের ৫৫ ধারায় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধারায় আরও বলা হয়েছে যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ জাতিসমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে স্থায়িত্ব ও কল্যাণের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য (ক) উচ্চ জীবনযাত্রার মান, পূর্ণ কর্মসংস্থান, এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি ও উন্নয়ন, (খ) আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য ও জড়িত সমস্যাবলীর সমাধান এবং আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত সহযোগিতা ও (গ) জাতি, স্ত্রীপুরুষ, ভাষা বা ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা প্রদানের জন্য সচেষ্ট থাকবে।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালনের ভার দেওয়া হয়েছে সাধারণ সভার ওপর। সাধারণ সভার তত্ত্বাবধানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এই সব দায়িত্ব সম্পাদন করবে। সুতরাং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে সনদে জাতিপুঞ্জের একটি প্রধান অঙ্গ রূপে বর্ণনা করা হলেও বাস্তবিকপক্ষে এই সংস্থা সাধারণ সভার একটি অধস্তন

(Subsidiary) প্রতিষ্ঠান।

গঠন (Composition)—অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৪। প্রতি তিন বছর সাধারণ সভা কর্তৃক ১৮ জন করে সদস্য নির্বাচিত হন। সদস্যদের কার্যকাল ৩ বছর। সদস্যদের কার্যকাল শেষ হওয়ার পর তাদের পুনর্নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনওবাধা থাকে না। প্রতিটি সদস্যের একজন করে প্রতিনিধি থাকেন।

ভোটদান পদ্ধতি (Voting Procedure)—অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের প্রতিটি সদস্যের একটি করে ভোট থাকে। উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অথবা বিশেষীকৃত সংস্থাসমূহের যে কোনও সদস্যকে এই পরিষদে অংশ গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। তবে আমন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা ভোট দিতে পারেন না।

কার্যাবলী (Functions)—রাজনীতি ও অস্ত্রসংক্রান্ত কোনও আন্তর্জাতিক বিষয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপ পরিদর্শন করাই হল এই সংস্থার প্রধান দায়িত্ব। এই পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি হল :

১। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমীক্ষার ব্যবস্থা করা। সাধারণ সভা, জাতিপুঞ্জের সদস্যসমূহ ও বিশেষীকৃত সংস্থাগুলির নিকট সুপারিশসহ সমীক্ষার প্রতিবেদনগুলি প্রেরণ করা যেতে পারে।

২। মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের প্রতি মর্যাদা প্রদান ও ঐগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার বিষয়ে সুপারিশ করা।

৩। এই পরিষদের এক্তিয়ার ভুক্ত বিষয়গুলির উপর নিয়মপত্র (convention) প্রণয়ন করে সাধারণ সভার নিকট প্রেরণ করা।

৪। পরিষদের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা।

৫। সাধারণ সভার অনুমোদন ক্রমে বিশেষীকৃত সংস্থাসমূহের কার্যকলাপের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা।

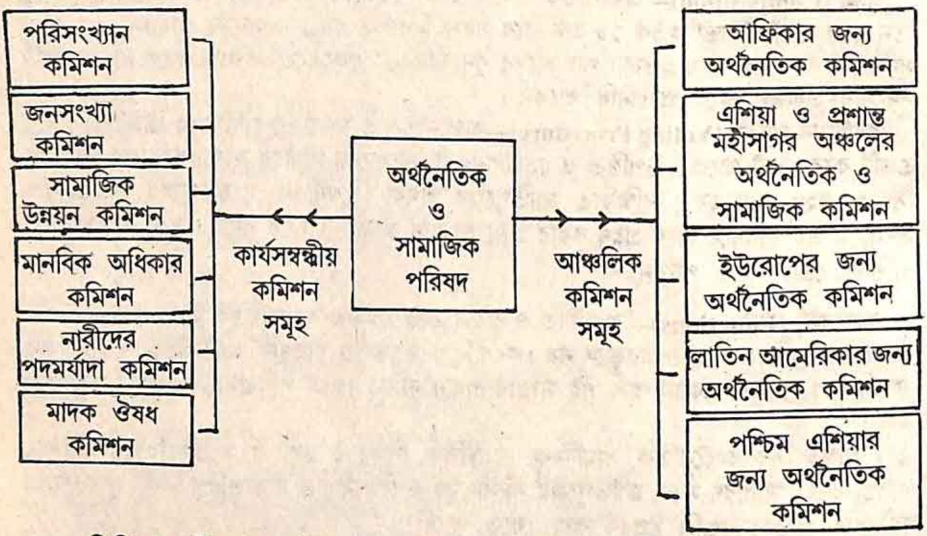
৬। বিশেষীকৃত সংস্থাসমূহের নিকট থেকে নিয়মিত প্রতিবেদন গ্রহণ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই সকল প্রতিবেদনগুলি সুপারিশসহ সাধারণ সভার নিকট পাঠানো হয়।

৭। নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধে ঐ পরিষদকে তথ্য জ্ঞাপন ও সহায়তা করতে পারে।

৮। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্র বা বিশেষীকৃত সংস্থাসমূহের অনুরোধে এই পরিষদ সাধারণসভার অনুমতি নিয়ে তাদের কোনও বিশেষ দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ যথাযথভাবে কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহায়তা গ্রহণের জন্য অনেকগুলি কমিশন ও কমিটি প্রতিষ্ঠা করেছে। ৬টি কার্য সম্বন্ধীয় (Functional) কমিশন এই সংস্থার বিশেষ বিশেষ দিকের সমস্যা ও নীতিসমূহ সম্পর্কে পরামর্শ দান করে। এই ৬টি কমিশন হল : পরিসংখ্যান, জনসংখ্যা, সামাজিক উন্নয়ন, মানবিক অধিকার, নারীদের মর্যাদা ও মাদক ঔষধ সংক্রান্ত। বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলের স্বার্থ ও সমস্যা পর্যালোচনা করার জন্য ৫টি আঞ্চলিক (Regional) কমিশনের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এইগুলি হল : ১। আফ্রিকার জন্য অর্থনৈতিক কমিশন (Economic Commission for Africa), ২। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific), ৩। ইয়োরোপের জন্য অর্থনৈতিক কমিশন (Economic Commision for Europe), ৪। লাতিন আমেরিকার জন্য অর্থনৈতিক কমিশন (Economic Commission for

Latin America) ও ৫। পশ্চিম এশিয়ার জন্য অর্থনৈতিক কমিশন (Economic Commission for Western Asia)।



সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এক্তিয়ারের বাইরেও কয়েকটি স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ সংস্থা (Specialized Agencies) গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে অনেকগুলি সংস্থা জাতিপুঞ্জের সৃষ্টির অনেক আগে থেকেই গড়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সাথে চুক্তি করেও কতকগুলি সংস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই সংস্থাগুলি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের নিকট প্রতিবেদন পেশ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্থাগুলির নাম থেকেই ঐগুলির বিশেষ কর্মক্ষেত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিশেষীকৃত সংস্থা হল: আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ (International Labour Organisation— ILO), বিশ্ব ডাক সংঘ (Universal Postal Union— UPU), আন্তর্জাতিক দূরসংযোগ সংস্থা (International Telecommunication Union —ITU), পুনর্গঠন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development—IBRD), আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (International Monetary Fund—IMF), আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান পরিবহন সংস্থা (International Civil Aviation Organisation—ICAO), খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (Food and Agriculture Organisation—FAO), সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শিক্ষাগত, বৈজ্ঞানিক ও সংস্কৃতি সংস্থা (United Nations Educational, Scientific & Cultural Organisation—UNESCO), বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organisation—WHO), বিশ্ব আবহবিদ্যা সংস্থা (World Meteorological Organisation—WMO) এবং আন্তঃসরকার নৌবিভাগীয় পরামর্শ সংস্থা (Inter-Governmental Maritime Consultative Organisation)।

৯। **অছি পরিষদ (Trusteeship Council)**—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ যখন রচনা করা হয় ঐ সময়ে বিশ্বের বহু অঞ্চলের জনগণ স্বায়ত্বশাসনের কোনও সুযোগ পেতেন না। তাঁরা অন্য রাষ্ট্র কর্তৃক শাসিত হতেন। স্বায়ত্বশাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত অঞ্চলসমূহের প্রশাসন পরিচালনা ও তদারকি করার জন্য সনদে যে ব্যবস্থা উল্লেখিত আছে তাকে আন্তর্জাতিক অছি ব্যবস্থা (International Trusteeship System) বলা হয়। সনদের একাদশ অধ্যায়ে স্বায়ত্বশাসন বিহীন অঞ্চলের সম্পর্কে ঘোষণার (Declaration regarding Non-self- governing Territories) সূচনাতে বলা হয়েছে যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে সব সদস্য স্বায়ত্বশাসন বিহীন অঞ্চলসমূহের প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তারা এই নীতি স্মরণ রাখবে যে ঐসব অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষাই তাদের পবিত্র কর্তব্য। আন্তর্জাতিক অছি ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল : (ক) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রসার ঘটানো ; (খ) অছি অঞ্চলের অধিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত অগ্রগতি সাধন এবং ঐসব অঞ্চলের জনগণের স্বায়ত্বশাসনের বা স্বাধীনতার দাবিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সম্ভাবনাকে দৃঢ় করা, (গ) জাতি, স্ত্রীপুরুষ, ভাষা বা ধর্ম নির্বিশেষে মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি মর্যাদা প্রদানে উৎসাহ দেওয়া এবং বিশ্বের জনগণকে পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় উৎসাহিত করা এবং (ঘ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সকল সদস্যরাষ্ট্রসমূহ ও তাদের জনগণকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যাপারে সমান সুযোগ প্রদান করা।

তিন ধরনের অঞ্চলকে অছি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে—১। সনদ্ গৃহীত হওয়ার সময় যে সব অঞ্চলজাতিসংঘেরঅন্তর্গত ম্যানডেট ব্যবস্থার অধীনস্থ ছিল, ২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে যে সব অঞ্চল শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রসমূহের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল ও ৩। যে সব অঞ্চল স্বেচ্ছায় অছি ব্যবস্থার অন্তর্ভূত হবে।

সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ (Strategic) অছি অঞ্চলের প্রশাসন নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্বাধীনে থাকবে। অন্যান্য অছি অঞ্চলের প্রশাসনের কর্তৃত্ব সাধারণ সভার ওপর ন্যস্ত। তবে সাধারণ সভার কর্তৃত্বাধীনে অবস্থিত অছি পরিষদ অছি ব্যবস্থার কার্যাবলী পরিচালনা করে।

গঠন (Composition)

অছি পরিষদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে গঠন করা হয় :

(ক) যে সব সদস্য অছি অঞ্চল সমূহের প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত।

(খ) নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে যাঁরা অছি অঞ্চলের প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত নন ;

(গ) অছি অঞ্চলের প্রশাসনের সাথে যুক্ত ও অছি অঞ্চলের প্রশাসনের সাথে যুক্ত নয় এই উভয় শ্রেণীর সদস্য সংখ্যা সমান করতে যে কজন সদস্য প্রয়োজন হয় তাদের ৩ বছরের জন্য সাধারণ সভা নির্বাচিত করে।

অছি পরিষদের প্রতিটি সদস্যের একটি করে ভোট থাকে। উপস্থিত এবং ভোটদানকারী সদস্যদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

কার্যাবলী (Functions)—সনদে অছি পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে।

১। সাধারণ সভার কর্তৃত্বাধীনে অছি পরিষদ অছি অঞ্চলসমূহের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করে, অছি অঞ্চলের আবেদন পত্র গ্রহণ করে, ঐ সব অঞ্চলের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে, আবেদন পত্র পরীক্ষা করে, অছি অঞ্চল পরিদর্শন করে এবং অছি সম্পর্কিত চুক্তি অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

২। অছি পরিষদ প্রশ্নমালা প্রণয়ন করে অছি এলাকার প্রশাসনের সাথে জড়িত রাষ্ট্রগুলির নিকট থেকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ঐসব অঞ্চলের জনগণের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। এরূপ প্রশ্নমালার ভিত্তিতে সাধারণসভার কর্তৃত্বাধীনে অবস্থিত প্রতিটি অছি অঞ্চলের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সাধারণ সভার নিকট প্রতিবেদন পেশ করে।

প্রয়োজন হলে অছি পরিষদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং অন্যান্য বিশেষীকৃত সংস্থাসমূহের সহায়তা গ্রহণ করতে পারে।

১০। আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice)

জাতিসমূহের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করার জন্য আর্ন্তজাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করার ধারণাটি বহু শতাব্দী ধরে আলোচিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে কোনও বিরোধ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের রাজার মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। এইভাবে নেদারল্যাণ্ডের রাজা ব্রিটেন ও মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে (১৮৩১), রাশিয়ার জার ফ্রান্স ও নেদারল্যাণ্ডের মধ্যে (১৮৯১), ইটালীর রাজা ব্রিটেন ও ব্রেজিলের মধ্যে (১৯০৪), স্পেনের রাজা বৃটেন ও জার্মানীর মধ্যে সালিসি করেন। জাতি সমূহের মধ্যে সংঘটিত বিরোধসমূহ সালিসি করার ঐতিহ্য থেকেইআন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠার ধারণাটির আংশিকভাবে উদ্ভব হয়। ১৮৯৯ সনে প্রথম হেগ সম্মেলনে সালিসির জন্য একটি স্থায়ী আদালত (Permanent Court of Arbitration) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯০৭ সনে দ্বিতীয় হেগ সম্মেলনেও আন্তর্জাতিক বিরোধ সমূহের বিচার বিভাগীয় সমাধানের ব্যাপারে জাতিসমূহের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যায়। জাতিসংঘের (League of Nations) চুক্তিপত্রের (Convenant) ১৪ ধারায় বলা হয়েছিল যে পরিষদ (Council) জাতিসংঘের সদস্যদের নিকট একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা পেশ করবে। ১৯২০ সনে জাতিসংঘের পরিষদ প্রস্তাবিত আদালতের বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়ন করার জন্য ১০ জন আইনজ্ঞকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির সুপারিশ জাতিসংঘের পরিষদ, সভা ও সদস্যদের দ্বারা আলোচিত হওয়ার পর ১৯২২ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক বিচারের স্থায়ী আদালত (Permanent Court of International Justice—PCIJ) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অঙ্গ আন্তর্জাতিক আদালতকে (ICJ) আন্তর্জাতিক বিচারের স্থায়ী আদালতের (PCIJ) উত্তরাধিকারী বলা হয়। সনদে আন্তর্জাতিক আদালতকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান বিচার বিভাগীয় অঙ্গ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিচারের স্থায়ী আদালতের (PCIJ) বিধিবদ্ধ আইনের ওপর ভিত্তি করে এই আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিচারের স্থায়ী আদালত জাতিসংঘের অঙ্গ ছিল না। এই আদালত ছিল জাতিসংঘের এক্তিয়ারের বহির্ভূত একটি সংস্থা। কিন্তু আন্তর্জাতিক আদালত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এর কার্যালয় অবস্থিত নেদারল্যাণ্ডের হেগ (Hague) শহরে।

গঠন (Composition)—সনদে আদালতের গঠন সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ নেই। সনদের সঙ্গে সংযোজিত আন্তর্জাতিক আদালতের বিধিবদ্ধ আইনে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫ জন বিচারপতি নিয়ে এই আদালত গঠিত হয়। বিচারপতিগণ ৯ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তাঁরা পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন। সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদ স্বতন্ত্রভাবে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বিচারকদের নির্বাচিত করে। একই দেশ থেকে একাধিক বিচারপতি নিয়োগ করা হয় না। বিচারপতি পদের যোগ্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে 'মনোনীত' ব্যক্তিকে উন্নত নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন হতে হয়। এছাড়া তাঁকে তাঁর নিজ দেশের সর্বোচ্চ বিচারবিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন অথবা আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।

৯ জন বিচারপতির উপস্থিতিতে বিচারালয়ের কাজ পরিচালনা করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

কার্যাবলী (Functions)—আন্তর্জাতিক আদালত দুটি প্রধান কাজ সম্পাদন করে—রাষ্ট্রসমূহের

মধ্যে বিরোধ সংক্রান্ত মামলা বিচার করে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অঙ্গসমূহ ও বিশেষীকৃত শাখাসমূহকে পরামর্শ দান করে।

১। আন্তর্জাতিক আদালত কেবলমাত্র রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিরোধ বিচার করতে পারে। জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য রাষ্ট্র এই আদালতে বিচারের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। তবে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে ও সাধারণ সভার অনুমোদন অনুযায়ী জাতিপুঞ্জের সদস্য নয় এরূপ রাষ্ট্রসমূহও এই আদালতের বিচারের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। কোনও রাষ্ট্র কর্তৃক কোনও সন্ধির ব্যাখ্যা, আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ক কোনও প্রশ্ন, কোনও রাষ্ট্রের কোনও কার্যকলাপ আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের বিরোধী কিনা এবং আন্তর্জাতিক দায়িত্ব লঙ্ঘন করার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে কিনা—এই বিষয়গুলিও আন্তর্জাতিক আদালতের নিকট পেশ করা যায়।

তবে জাতীয় আদালতসমূহের সঙ্গে আন্তর্জাতিক আদালতের কতকগুলি পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমত, ব্যক্তিগত কোনও মামলা আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার করা হয় না। দ্বিতীয়ত, বিবদমান রাষ্ট্রগুলি সম্মত হলেই আন্তর্জাতিক আদালত তাদের মধ্যে বিরোধ বিচার করতে পারে। এই আদালতের এক্তিয়ার ঐচ্ছিক, বাধ্যতামূলক নয়। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক আদালতের সঙ্গে জড়িত পুলিশ, কারাগার ইত্যাদি ধরনের কোনও সংস্থা নেই। এই কারণে এই আদালতের কর্তৃত্ব গ্রহণ করার বিষয়টিও সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাধীন।

২। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের পরামর্শদান এলাকা রয়েছে। সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধে কোনও আইন বিষয়ক প্রশ্নে এই বিচারালয় পরামর্শ দিতে পারে। সাধারণ সভার নির্দেশে জাতিপুঞ্জের অন্যান্য অঙ্গ ও বিশেষীকৃত শাখাসমূহও এই বিচারালয়কে কোনওবিষয়ে পরামর্শ দানের জন্য অনুরোধ করতে পারে।

অনেকসময় রাষ্ট্রসমূহের পক্ষ থেকে এই ধারণা পোষণ করা হয় যে আন্তর্জাতিক আদালতের কর্তৃত্ব মানলে তাদের সার্বভৌমিকতা বিনষ্ট হবে। এই কারণে রাষ্ট্রসমূহ সাধারণত রাজনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে জড়িত প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে এই আদালতের এক্তিয়ারে আসতে চায় না। প্রকৃত পক্ষে অনেকসময় আইনগত প্রশ্নকে বিবদমান রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ থেকে পৃথক করা যায় না বলে আন্তর্জাতিক আইন মান্য করাকে বাধ্যতামূলক করা সম্ভব নয়। এই কারণে আন্তর্জাতিক আদালত আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারে নি।

১১। সচিবালয় (Secretariat)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দৈনন্দিন কাজের অধিকাংশই সম্পাদন করে সচিবালয়। নিউ ইয়র্ক শহরে সচিবালয়ের সদর দপ্তর অবস্থিত। জেনিভাতে জাতিসংঘের প্রাক্তন অবস্থানস্থলেও এর একটি শাখা দপ্তর আছে। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্নস্থানে প্রায় ৪০টি শহরে সচিবালয়ের তথ্যকেন্দ্র রয়েছে।

সচিবালয়ের পরিচালক প্রধান হলেন মহাসচিব (Secretary-General)। মহাসচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়ে সচিবালয় গঠিত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করা হল সচিবালয়ের প্রধান দায়িত্ব। সচিবালয়ের ৮টি প্রধান বিভাগ আছে। প্রতিটি বিভাগের প্রধান হলেন একজন সহকারী সচিব। এই ৮টি বিভাগ হল : (১) নিরাপত্তা পরিষদ সম্পর্কিত, (২) অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত, (৩) সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত, (৪) অছি ব্যবস্থা সম্পর্কিত, (৫) জনতথ্য, (৬) সম্মেলন ও সাধারণ সেবা, (৭) প্রশাসনিক ও আর্থিক সেবা এবং (৮) আইন।

নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভার দ্বারা মহাসচিব ৫ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। কার্যকালের শেষে তাঁকে পুনর্নির্বাচিত করা যেতে পারে। সনদে মহাসচিবকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান প্রশাসনিক আধিকারিক (Chief administrative officer) রূপে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই পদাধিকার বলে তিনি সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং

অছি পরিষদের সভায় যোগদান করেন ও দায়িত্বসমূহ পালন করেন। সনদ অনুযায়ী তাঁকে বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁকে সাধারণ সভার নিকট একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করতে হয়। তাঁকে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকাও প্রদান করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এরূপ কোনও বিষয়ে তিনি নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। অধিকাংশ সদস্যরাষ্ট্র অথবা নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধে মহাসচিব সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশন ডাকতে পারেন।

সাধারণ সভা স্থিরীকৃত প্রবিধান (regulation) অনুসারে মহাসচিব সচিবালয়ের কর্মচারীদের নিয়োগ করেন। কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চমানের দক্ষতা, যোগ্যতা ও সংহতির ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। সনদে আরও বলা হয়েছে যে যতদূর সম্ভব ব্যাপকভাবে ভৌগোলিক ভিত্তির ওপর দৃষ্টি রেখে সচিবালয়ের কর্মচারীদের নিয়োগ করা প্রয়োজন।

সচিবালয়ের কার্যাবলী (Functions of the Secretariat)

চমকপ্রদ না হলেও সচিবালয়কে কয়েকটি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদন করতে হয়। সচিবালয়ের কার্যাবলীকে ছয়ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে।

১। সচিবালয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন অংশ ও বিশেষীকৃত শাখাসমূহকে আইনগত ও কার্য-পরিচালনার প্রণালী সংক্রান্ত বিষয়ে সহায়তা প্রদান করে থাকে। এই উদ্দেশ্যে সচিবালয়কে ব্যাখ্যা করা, অনুবাদ করা, সভার কার্যবিবরণ লিপিবদ্ধ করা, খসড়া করা, দলিলের নকল করা ও গ্রন্থাগারের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা প্রভৃতি নানাবিধ কার্য সম্পাদন করতে হয়।

২। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্যের জন্য সচিবালয়ের তথ্য সরবরাহ সংক্রান্ত কার্যকলাপ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সচিবালয়ের কর্মচারীবৃন্দ প্রতিনিধি কমিটি ও কমিশনসমূহকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করে সরবরাহ করে থাকেন।

৩। সচিবালয়কে কিছু শাসনতান্ত্রিক কার্যাবলী ও প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করতে হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উন্নয়ন কার্যসূচীর আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য সচিবালয় প্রায়োগিক সাহায্য ও প্রাক-বিনিয়োগ অনুদান প্রদান করে থাকে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ তার দৈনন্দিন করণীয় হিসাবে নির্দিষ্ট বিভিন্ন কাজ, গবেষণা, পরিসংখ্যানমূলক তথ্য, দলিল রচনা, অভিজ্ঞ পরামর্শ ও সাহায্যের জন্য সচিবালয়ের ওপর যথেষ্ট নির্ভরশীল। সচিবালয়ের প্রায় ৮০ শতাংশ কর্মচারীই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যকলাপের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

৪। সচিবালয় কার্যক্ষেত্রে সেবামূলক কার্য (UN Field Service) পরিচালনার মাধ্যমে একধরনের আধা-শাসনতান্ত্রিক কার্য সম্পাদন করে থাকে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জের কমিশন ও শান্তি রক্ষা বাহিনীদের পরিবহন, যোগাযোগ, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে লক্ষ্য রাখার জন্য ১৯৪৯ সনে সাধারণ সভা অনধিক ৩০০ ব্যক্তি সম্বলিত এই স্থায়ী UN Field Service প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেছে।

৫। সচিবালয়কে নানাবিধ রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করতে হয়। অনেক সময়েই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আদর্শ ও লক্ষ্যসমূহকে কার্যকর করার জন্য জাতিপুঞ্জের কর্মচারীদের অনেক রাজনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

৬। সচিবালয় তার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা করে। যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিদের যাতে নিয়োগ করা হয় এবং সচিবালয়ের কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের যাতে যথাযথ বেতন প্রদান করা হয় এবং তাদের কাজের শর্তাবলী যাতে উপযুক্ত হয় তার জন্য সচিবালয়কে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

৭। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে কোনও সদস্যরাষ্ট্র সম্পাদিত প্রতিটি চুক্তি ও প্রতিটি আন্তর্জাতিক

সন্ধি সচিবালয়ে রেজিস্ট্রীকৃত করতে হয় এবং সচিবালয় ঐগুলি প্রকাশ করে।

মহাসচিব ও সচিবালয়ের কর্মচারীবৃন্দ তাঁদের কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনও সরকার বা বাহ্যিককোনওকর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন নির্দেশ গ্রহণ করেন না। তাঁরা কেবলমাত্র সংস্থার নিকট দায়ী থাকেন।

১২। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্য (Success of the United Nations)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাতিসংঘের পতনের পর আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জাতিসমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সনদে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও নীতিগুলির যথাযথ রূপায়ণের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হবে এই গভীর আশা নিয়েই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যাত্রা শুরু হয়। জাতিপুঞ্জের বিগত ৪০ বছরের কার্য-কলাপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই প্রতিষ্ঠান প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও বহু বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে অনেক ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিপুঞ্জ কয়েকটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কোরিয়া সমস্যা, সুয়েজ সমস্যা, কঙ্গো সমস্যা ও পরবর্তীকালে সিরিয়া ও লেবাননের সমস্যায় জাতিপুঞ্জের অবদান উল্লেখযোগ্য। ভারত-পাকিস্তান বিরোধ ও ইস্রায়েল-আরব যুদ্ধেও জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপের ফলেই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়। মধ্যপ্রাচ্য, কঙ্গো ও সাইপ্রাস এই তিনটি এলাকায় শান্তি স্থাপনের জন্য জাতিপুঞ্জের পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষক দল প্রেরণ করা হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ, অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ, আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। অতএব বলা যায় যে জাতিপুঞ্জ অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিরোধ সুষ্ঠুভাবে সমাধানের উপায় নির্ধারণ করতে পেরেছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে বিবাদ যাতে গুরুতর আকার ধারণ করতে না পারে তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। কোনও বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের জন্য বিবদমান রাষ্ট্রগুলি ও জাতিপুঞ্জের অন্যান্য সদস্যরা সর্বদাই জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে আলাপ আলোচনা করতে পারে। সুতরাং শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে জাতিপুঞ্জকে অন্তত একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীরূপে গণ্য করা যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জ ঈপ্সিত লক্ষ্য পূরণে সম্পূর্ণরূপে সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এর বিপুল অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৪৮ সনে জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে মানবিক অধিকারের সার্বিক ঘোষণা (Universal Declaration of Human Rights) একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯৪৬ সনে সাধারণ সভায় গণহত্যা বা 'জোনোসাইড'কে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকে অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক সাহায্য ও ঋণদান করা হয়ে তাকে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শিক্ষাগত, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার (UNESCO) মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে সহায়তা করে চলেছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং খাদ্য ও কৃষি সংস্থার অবদানও উল্লেখযোগ্য। বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলি ব্যতীত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষ থেকেও অর্থনৈতিক ও কারিগরী সাহায্য প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দ্বারা পরিচালিত উন্নয়ন কার্যসূচী (United Nations Development Programme—UNDP) প্রতি বছর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করে থাকে। এছাড়া বর্তমানে পরিবেশ, জনসংখ্যা, শরণার্থী, মাদক ঔষধ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি নানা জটিল ও জরুরী বিষয় সম্পর্কেও জাতিপুঞ্জ কাজ শুরু করেছে। সামাজিক ও

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জের এই সব বাস্তব কর্মসূচীগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সাফল্য অর্জন করেছে।

১৩। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতা (Failure of the United Nations)

অনেকে বলেন যে প্রধানত শান্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ 'অক্ষম'। বিশ্বের প্রধান রাজনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানে এর অবদান অতি সামান্য। সুতরাং বর্তমানে একটি ক্ষয়িষ্ণু প্রতিষ্ঠানরূপে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোন মতে টিকে আছে মাত্র।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, মধ্যপ্রাচ্য, অ্যাঙ্গোলা, রোডেশিয়া, সাইপ্রাস প্রভৃতি অঞ্চলে তীব্র সংকটের মোকাবিলায় জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতা নগ্নভাবে প্রকট হয়েছে। জাতিপুঞ্জের অক্ষমতার জন্য প্রায় ১০ বছর ভিয়েতনাম বিশ্বের সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিপদ এলাকারূপে চিহ্নিত ছিল। লাওস, কাম্বোডিয়া, সুদান, ইথিওপিয়া, লেবানন প্রভৃতি রাষ্ট্রের সমস্যাগুলি ঐসব রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়রূপে গণ্য হওয়ায় এগুলি জাতিপুঞ্জে আদৌ আলোচিত হয় নি।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার মূল কারণগুলি হল এইরূপ :

১। সনদ অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচজন সদস্যের সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত ছাড়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়ে কোনও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে পরিষদের স্থায়ী সদস্যরা সর্বদা আন্তর্জাতিক স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থকে বড় করে দেখে। পাঁচটি বৃহৎ শক্তির ঘনঘন ভিটো প্রয়োগের ফলে নিরাপত্তা পরিষদ তার দায়িত্ব পালনে অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছে।

২। সনদে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী গঠন করার বিষয় উল্লেখ করা থাকলেও এক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জ ব্যর্থ হয়েছে। জাতিপুঞ্জের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী না থাকার ফলে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষে দ্রুত ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

৩। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার বিষয়ে সাধারণ সভা দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সুপারিশ করতে পারেন। তবে সদস্যরাষ্ট্রেরা এই সুপারিশ গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে না।

৪। সনদ অনুযায়ী জাতিপুঞ্জ কোনও সদস্যরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ এক্তিয়ারভুক্ত কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই অনেক বিরোধকে রাষ্ট্রগুলি অভ্যন্তরীণ এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়রূপে গণ্য করার ফলে জাতিপুঞ্জ ঐসব বিষয়ে নিতান্ত নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

৫। জাতিপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্রগুলি অনেকসময় জাতিপুঞ্জকে এড়িয়ে অন্য উপায়ে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করে। জাতিপুঞ্জের ওপর সদস্যরাষ্ট্রদের সম্যক আস্থা নেই বলেই উত্তর আটল্যান্টিক চুক্তি জোট (NATO), দক্ষিণপূর্ব এশিয়া চুক্তি জোট (SEATO) ইত্যাদি আঞ্চলিক সন্ধিজোট গড়ে উঠেছে। এইসব চুক্তিতে আবদ্ধ রাষ্ট্রসমূহ আক্রান্ত হলে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

১৪। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ (Future of the United Nations)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের একটি পদক্ষেপরূপে গণ্য করা যায়। জাতিপুঞ্জের সনদে শান্তি ও নিরাপত্তার সমস্যা. মানবিক অধিকারগুলির সুরক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতিসমূহের মধ্যে সহযোগিতা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে এরূপ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে যাতে এই সব সমস্যাগুলিকে জাতীয় সমস্যার পারিবর্তে আন্তর্জাতিক সমস্যারূপে

গণ্য করা যায়। সুতরাং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে ধীরে ধীরে একটি বিশ্বসমাজ ও বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সুদৃঢ় সংহতির মনোভাব গড়ে উঠবে বলে অনেকেই আশা করেছিলেন।

তবে বাস্তবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে সমসাময়িক বিশ্বের একটি যথাযথ প্রতিচ্ছবি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এই সংস্থায় সব দিক দিয়েই বৈচিত্র্যপূর্ণ একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র একত্রিত হয়ে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহ আলোচনা করে। যদি বিভিন্ন রাষ্ট্র, জাতি ও মতাদর্শের মধ্যে বিরোধ ও মতভেদ থাকে তবে জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে সেই সব পার্থক্যগুলি স্বভাবতই প্রকাশ পাবে। সুতরাং জাতিপুঞ্জের অসম্পূর্ণতার জন্য বিশ্ব রাজনীতিকে দায়ী করা প্রয়োজন। বিশ্ব রাজনীতিতে যদি সুস্থ পরিবেশ না থাকে তবে যত দক্ষই হক না কেন কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থাই আন্তর্জাতিক ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে না।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সম্পূর্ণরূপে সফলও নয়, আবার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থও হয় নি। জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতা ও ত্রুটিগুলি থাকা সত্ত্বেও বিশ্বে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বের জনগণ এই সংস্থাকে অপরিহার্য বলে গণ্য করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ষ্ট্রং (C.F. Strong) বলেছেন যে নৈতিক দিক দিয়ে এটা নিশ্চিত যে যদি এই আণবিক যুগে জাতিসমূহ এই বিশ্ব সংবিধানকে চালাতে না পারে তবে কোনও জাতীয় সংবিধানই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে না (It is a moral certainty that, if in this Atomic Age the nations do not make this world constitution work, no national constitution can survive)। এই কারণে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতায় হতাশ ও আহত ব্যক্তিরাও এই প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি কামনা করেন না।

অধ্যায় ৭

নাগরিকতা, অধিকার ও কর্তব্য

ক· নাগরিকতা

১। নাগরিকতার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of Citizenship)

রাষ্ট্র একটি মানবিক প্রতিষ্ঠান। জনসমষ্টি ব্যতীত রাষ্ট্রের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। সাধারণ অর্থে রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনগণকে নাগরিক রূপে গণ্য করা হয়। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নাগরিক শব্দটি ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়। শুধুমাত্র রাষ্ট্রের সদস্যপদ লাভ করাকে নাগরিকতা বলা হয় না।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করলে দেখা যায় যে নাগরিক শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রীক নগররাষ্ট্রের সময়ে। গ্রীস দেশে নগররাষ্ট্রগুলি আয়তন ও জনসংখ্যা উভয় দিক দিয়েই খুব ক্ষুদ্র ছিল। এই সব নগররাষ্ট্রে বসবাসকারী সমস্ত ব্যক্তিদের নাগরিক বলে গণ্য করা হত না। গ্রীক আমলে নাগরিকতার ধারণাটি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বা সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হত।

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল সর্বপ্রথম নাগরিকতার ধারণাটি সুসম্বদ্ধভাবে বিশ্লেষণ করেন। 'কিভাবে একজন ব্যক্তি নাগরিক হতে পারেন?' ("What makes a person a citizen?")—এইটি ছিল তাঁর আলোচনার প্রারম্ভিক প্রশ্ন। কোনও নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস (Residence) অথবা জন্মসূত্রে পিতামাতার কাছ থেকে নাগরিকতা প্রাপ্তি এই দুটির কোনটিকে তিনি নাগরিকতার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা রূপে গ্রহণ করেন নি। অ্যারিস্টটল নাগরিকতা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উৎসের পরিবর্তে কর্তব্যসূচক দিকের (Functional side) ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে যে সব প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরা নগররাষ্ট্রের পরিচালনা সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে যুক্ত তাদেরই কেবলমাত্র নাগরিক রূপে গণ্য করা যায়। অ্যারিস্টটল বলেছেন যে, নাগরিক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি বিচার পরিচালনা কাজে অংশ গ্রহণ করেন এবং কোনও পদে অধিষ্ঠিত থাকেন ("a man who shares in the administration of justice and the holding of office")। অতএব তাঁর মতে নাগরিক শাসনও করেন এবং শাসিত হয়েও থাকেন। তাঁরা আইন প্রণয়ন করেন, আইন মান্য করেন এবং আইন বলবৎও করেন। সুতরাং শাসক ও শাসিত এই দ্বৈত ভূমিকা পালন করার জন্য কোনও ব্যক্তির বিশেষ যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে শাসন সংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করার জন্য ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা থাকা আবশ্যক। অ্যারিস্টটলের মতে এই যোগ্যতা রাষ্ট্রে বসবাসকারী সমস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। এই কারণে তিনি ক্রীতদাসদের (Slaves) নাগরিক রূপে গণ্য করেন নি। তাঁর সময়ে নারীরা রাষ্ট্র পরিচালনা কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন না বলে তাঁদেরও তিনি নাগরিক বলে স্বীকৃতি দেননি। অ্যারিস্টটলের মতে গৃহস্থালি পরিচালনা করাই ছিল নারীদের প্রধান দায়িত্ব। বস্তুত, প্রাচীন গ্রীক নগররাষ্ট্রে নাগরিকতাকে এক ধরনের পেশা বা বৃত্তি রূপে গণ্য করা হত। নাগরিকরা ছিলেন একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী। এই পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিকতা সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের ধারণা মূলত তিনটি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১) নাগরিক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি কতকগুলি কর্তব্য সম্পাদন করেন। ২) এরূপ একটি কাজ হল প্রাধিকার (authority) প্রয়োগের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করা। ৩) এইভাবে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা সীমাবদ্ধ।

অষ্টাদশ শতকের ফরাসী দার্শনিক রুশোর মতে 'নাগরিকগণ যখন সরকারি কার্যকলাপে মুখ্যরূপে সংশ্লিষ্ট হওয়া থেকে বিরত হন...তখন রাষ্ট্র পতনের কাছাকাছি পৌঁছায়' ("As soon as public

service ceases to be the main concern of the citizens...the state is already close to ruins")। রুশোর জন্মভূমি জেনিভার মত ছোট রাষ্ট্রেই নাগরিকদের পক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল বলে অ্যারিস্টটলের মত রুশোও রাজনৈতিক বিষয়ে সক্রিয়তাকে নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করেছেন।

আধুনিক রাষ্ট্রগুলি আয়তনে প্রাচীন রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা অনেক বড়। এখনকার রাষ্ট্রগুলির জনসংখ্যাও বিশাল। বর্তমান রাষ্ট্রসমূহে বসবাসকারী সমস্ত নাগরিকদের পক্ষে রাষ্ট্রের পরিচালনা সংক্রান্ত কাজে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করা অসম্ভব। নাগরিকতা শব্দটি তাই বর্তমানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। রাষ্ট্রের পরিচালনা সংক্রান্ত কাজে অংশ গ্রহণ আজ আর নাগরিকতা বিচারের মাপকাঠি নয়। কোনও রাষ্ট্রে বসবাসকারী সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি—যাঁরা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন—তাঁদেরই নাগরিক রূপে গণ্য করা হয়। আনুগত্য বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যে নাগরিকরা নিজ রাষ্ট্রের মূল আদর্শের প্রতি আস্থাবান হবেন এবং প্রয়োজন হলে সংকটময় মুহূর্তে রাষ্ট্রকে সহায়তা করবেন। আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের কতকগুলি পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয় এবং নাগরিকদেরও রাষ্ট্রের প্রতি কতকগুলি কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়।

অতএব কোনও রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী কোনও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যদি ঐ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে, রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার সমূহ উপভোগ করে এবং সামাজিক কল্যাণের জন্য সচেষ্ট থাকে তাবে তাকেই নাগরিক বলা হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে নাগরিকতা হল সাধারণের কল্যাণে কোনও ব্যক্তির সচেতন বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ (Citizenship is "the contribution of one's instructed judgment to public good.")।

নাগরিকতা সম্পর্কে সনাতনপন্থী ও বর্তমান ধারণার মধ্যে পার্থক্য হল এরূপ। আগে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি নাগরিকরূপে সক্রিয় ও প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত কাজে অংশ গ্রহণ করতেন। সর্বসাধারণ দূর থেকে নীরব দর্শকের মত তাঁদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতেন। নাগরিকদের কার্যকলাপ ছিল জনসাধারণের ধ্যান ধারণার বহু ঊর্ধ্বে। আধুনিক কালে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে, বিশেষত সমতা নীতির প্রসার ও ভোটাধিকারের বিস্তৃতিকরণের ফলে, নাগরিকরা রাজনৈতিক বিষয়ে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন না। বর্তমানে তাঁরা অনেক বেশী আত্মসচেতন ও আত্মবিশ্বাসী হয়েছেন। সরকারের ওপরও তাঁরা এখন অনেক বেশী নির্ভরশীল। বর্তমান রাষ্ট্রগুলিতে নাগরিকদের সামান্য এক অংশ রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেলেও প্রায় সমস্ত নাগরিকই পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। লিপসনের ভাষায় বলা যায় যে বিংশ শতকের রাজনীতি হল গণ-কর্মশক্তির প্রয়োগের রাজনীতি। সরকারগুলি নিষ্ক্রিয় জনসাধারণের ওপর নির্ভর করতে পারে না ; তারা সর্বদা নাগরিকদের কর্মতৎপরতার জন্য প্রস্তুত থাকে ("Twentieth century politics is the politics of mass action. Governments can rely no more on the passivity of subjects; they must be prepared for the activity of citizens")।

২। নাগরিক ও স্বজাতীয় (Citizen and National)

কোনও রাষ্ট্রে বসবাসকারী সমস্ত ব্যক্তিদের নাগরিকরূপে গণ্য করা হয় না। রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা অতিক্রম করার পর যাঁরা রাষ্ট্র-প্রদত্ত রাজনৈতিক অধিকার লাভ করেন, বিশেষ করে ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা পান, তাঁদেরই প্রকৃত অর্থে নাগরিক বলা হয়। বর্তমানে যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে ১৮ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিদের ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়েছে। ভারতে ২১ বৎসর বয়স না হওয়া পর্যন্ত ভোটাধিকার লাভ করা যায় না। কোনও রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা

রাজনৈতিক অধিকার বিশেষত ভোটাধিকার প্রয়োগের বয়সে পৌছান নি তাঁদের স্বজাতীয় বলা হয়। সুতরাং নাগরিক ও স্বজাতীয়দের মধ্যে মূল পার্থক্য হল এই যে নাগরিকরা রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করেন আর স্বজাতীয়রা রাজনৈতিক অধিকার ভোগের যোগ্যতা লাভ করেন নি। এছাড়া রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নাগরিক ও স্বজাতীয়দের মধ্যে অন্য কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না।

৩। নাগরিক ও বিদেশী (Citizen and Alien)

প্রত্যেক রাষ্ট্রই অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের ও স্বজাতীয়দের বিদেশী বলে গণ্য করে। কোনও ব্যক্তি কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাময়িকভাবে তাঁর নিজ রাষ্ট্র ত্যাগ করে অন্য রাষ্ট্রে বাস করলে ঐ ব্যক্তিকে বিদেশী বলা হয়। নাগরিকদের ন্যায় বিদেশীরাও যে রাষ্ট্রে অস্থায়ীভাবে বসবাস করেন সেই রাষ্ট্রের সাধারণ আইন কানুন মান্য করেন এবং ঐ রাষ্ট্র কর্তৃক ধার্য করসমূহও প্রদান করে থাকেন। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও রাষ্ট্রে বসবাসকারী সমস্ত ব্যক্তিদের—নাগরিক, স্বজাতীয় ও বিদেশী—জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা হয়। তবে নাগরিক ও বিদেশীদের মধ্যে কতকগুলি সুযোগসুবিধার পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমত, নাগরিকরা স্বদেশেই থাকুন আর বিদেশেই থাকুন তাঁরা যে রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা তাঁদের সেই রাষ্ট্রের প্রতিই সর্বদা আনুগত্য স্বীকার করতে হয়। বিদেশীরা যে রাষ্ট্রে সাময়িকভাবে বসবাস করেন তাঁদের সেই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয় না। দ্বিতীয়ত, নাগরিকরা রাষ্ট্র প্রদত্ত পৌর ও রাজনৈতিক সমস্ত অধিকারই উপভোগ করে থাকেন। বিদেশীরা পৌর, সামাজিক ইত্যাদি অধিকার উপভোগ করলেও তাঁদের কখনও রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয় না। এই কারণে কোনও রাষ্ট্রেই বিদেশীদের ভোটদানের অধিকার, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার ইত্যাদি দেওয়া হয় না। অনেক সময় সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলি ভোগ করার ক্ষেত্রেও নাগরিক ও বিদেশীদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। যেমন, ভারতের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে কয়েকটি অধিকার কেবলমাত্র ভারতীয় নাগরিকরাই ভোগ করতে পারেন। আবার আইনগত সাম্যের অধিকার, ধর্মাচরণের স্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতি অধিকারগুলি ভারতে বসবাসকারী সমস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং এই সব অধিকারগুলি নাগরিক ও বিদেশী সমভাবে ভোগ করতে পারেন। তৃতীয়ত, নাগরিক নিজ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন বলে রাষ্ট্র প্রয়োজন হলে তাঁকে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করাতে পারে। যে রাষ্ট্রে বিদেশী সাময়িকভাবে বসবাস করেন সেই রাষ্ট্র কখনও তাঁকে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করতে বাধ্য করতে পারে না। চতুর্থত, অনেক রাষ্ট্রেই সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরীর ক্ষেত্রে নাগরিকদের তুলনায় বিদেশীদের কম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের বর্তমান সংবিধানে বিদেশীদের আশ্রয় দানের (Asylum) কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাজনৈতিক কারণে যে সব বিদেশী চীনে আশ্রয় নেওয়ার অনুরোধ করেন, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন তাঁদের চীনে আশ্রয় গ্রহণ করার অধিকার দিতে পারে। শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ ও শান্তির আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য, কিংবা বৈপ্লবিক ও জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য, কিংবা প্রগতিশীল সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক বা অন্য প্রকার সৃষ্টিশীল কাজকর্মের জন্য নির্যাতিত বিদেশী নাগরিকদের সোভিয়েত ইউনিয়ন আশ্রয় লাভের অধিকার দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনদেশে আশ্রয় পাওয়ার অধিকারটিকে বিদেশীদের একটি বিশেষ সুবিধা বলে গণ্য করা যেতে পারে।

৪। নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি (Modes of Acquisition of citizenship)

যে কোনও রাষ্ট্রে প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে নাগরিকতা প্রদান করা হয়। প্রথমটি হল স্বাভাবিক (Natural) পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে কোনও ব্যক্তি জন্ম (Birth) বা উদ্ভব (Descent)

সূত্রে নাগরিকতা অর্জন করেন। দ্বিতীয়টি হল অনুমোদন (Naturalisation) দ্বারা নাগরিকতা প্রদান করা। জন্মের দ্বারা যে সকল ব্যক্তি নাগরিকতা অর্জন করেন তাঁদের জন্মসূত্রে নাগরিক (Natural born citizens) বলা হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদন দ্বারা যাঁদের নাগরিকতা প্রদান করা হয় তাঁদের অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক (Naturalised citizen) বলে গণ্য করা হয়।

জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নাগরিকতাকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়—রক্তের সম্পর্কের নীতি (Jus Sanguinis) এবং জন্মস্থান নীতি (Jus soli)। প্রথম নীতি অনুসারে ব্যক্তিগত সম্পর্কের দ্বারা নাগরিকতা নির্ণয় করা হয়। এই নীতি অনুসারে কোনও শিশু যে রাষ্ট্রেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন তার পিতামাতা যে রাষ্ট্রের নাগরিক সেও সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলে গণ্য হবে। যেমন, কোনও ভারতীয় নাগরিক দম্পতি অস্থায়ীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকালে তাদের কোন সন্তান ঐদেশে জন্মগ্রহণ করলে ঐ শিশু পরবর্তীকালে ভারতের নাগরিক বলে পরিগণিত হবে।

জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী নাগরিকতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক উপাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই নীতি অনুসারে কোনও শিশুর পিতামাতা যে রাষ্ট্রের নাগরিক হক না কেন শিশু যে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে সে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলে বিবেচিত হবে। যেমন, কোনও ভারতীয় নাগরিক দম্পতি অস্থায়ীভাবে ইংল্যাণ্ডে বসবাসকালে তাদের কোনও সন্তান ঐ দেশে জন্মগ্রহণ করলে ঐ সন্তান ইংল্যাণ্ডের নাগরিক বলে বিবেচিত হবে।

জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী নাগরিকতা নির্ণয়ের পদ্ধতিটিকে যুক্তিসঙ্গত বলে গণ্য করা যায় না। এই নীতি অনুসারে নাগরিকতা নির্ধারণ করা হলে একই পিতামাতার সন্তান দৈবক্রমে বিভিন্ন রাষ্ট্রে জন্মলাভ করলে তারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করবে। কোনও ভারতীয় দম্পতি ইংল্যাণ্ডে অস্থায়ীভাবে বসবাস করার সময় তাদের একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে জন্মস্থান নীতি অনুসারে ইংল্যাণ্ডের নাগরিক বলে গণ্য হবে। আবার ঐ ভারতীয় দম্পতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অস্থায়ীভাবে থাকা কালে তাদের আর একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করবে। এরূপ ক্ষেত্রে পিতামাতা এক রাষ্ট্রের নাগরিক এবং দুই সন্তান দুটি পৃথক রাষ্ট্রের নাগরিক বলে পরিগণিত হবে।

বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্র নাগরিকতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করে। ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্র নাগরিকতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জন্মস্থান নীতি ও রক্তের সম্পর্ক নীতি উভয়কেই অনুসরণ করে। এইভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করার ফলে অনেক সময় একই ব্যক্তি দুটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনের অধিকারী হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে কোনও ভারতীয় নাগরিকের সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলে ঐ শিশু জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলে বিবেচিত হবে। আবার যেহেতু ঐ শিশুর পিতামাতা ভারতের নাগরিক অতএব রক্তের সম্পর্ক নীতি অনুসারে সে ভারতীয় নাগরিক বলে গণ্য হবে। এইরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত এই দুটি রাষ্ট্রই তাকে নাগরিক বলে দাবী করতে পারে। একই সঙ্গে কোনও ব্যক্তি দুই রাষ্ট্রের নাগরিকতা পাবার অধিকারী হওয়ার সমস্যাকে দ্বি-নাগরিকতার সমস্যা (Problem of dual citizenship) বলা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে উভয় রাষ্ট্র পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে দ্বি-নাগরিকতার সমস্যা সমাধান করতে পারে। তবে এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত দুই রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করেছেন এরূপ ব্যক্তিরা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর স্বেচ্ছায় যে কোনও একটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণ করে থাকেন।

কোনও জাহাজ বা বিমানে কোনও শিশুর জন্ম হলে ঐ জাহাজ বা বিমান যে রাষ্ট্রের তাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলে গণ্য করা হবে। পররাষ্ট্র দূতাবাসের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে জন্মস্থান নীতি প্রয়োগ করা হয় না। যুক্তরাজ্যে কর্মরত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের কোনও সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে যুক্তরাজ্যের নাগরিকরূপে গণ্য করা যাবে না।

কোনও ব্যক্তি অনুমোদনের দ্বারাও বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করতে পারেন। কোনও বিদেশীকে রাষ্ট্রের নাগরিকতা প্রদানকে অনুমোদন (Naturalisation) বলা হয়। বিবাহ, সেনা বাহিনীতে যোগদান, সম্পত্তি ক্রয়, সরকারী চাকরী গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে কোনও ব্যক্তি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করতে পারেন। কোনও মহিলা বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিককে বিবাহ করার পর স্বামীর রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করেন। আবার অনেক সময় বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণের জন্য কোনও ব্যক্তিকে বিদেশী রাষ্ট্র নির্ধারিত কয়েকটি শর্ত পালন করতে হয়। এই শর্তগুলি যথাযথভাবে মান্য করার পর তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত নাগরিকতা প্রদান করা যেতে পারে। এই শর্তগুলিকে স্থায়ী বাসিন্দার শর্ত (Conditions of domicile) বলা হয়। এই শর্তগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল বিদেশী রাষ্ট্রে নাগরিকতা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে একটি নির্ধারিত সময় ধরে ঐ রাষ্ট্রে বসবাস করতে হবে। তবে একাদিক্রমে কোনও ব্যক্তিকে কতদিন সেই রাষ্ট্রে বসবাস করতে হবে এ সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন নিয়ম প্রচলিত আছে। তবে সাধারণত সারা জীবন বিদেশী রাষ্ট্রে বসবাস করার আগ্রহ প্রকাশ না করলে কোনও ব্যক্তিকে বিদেশী কোনও রাষ্ট্রের নাগরিকতা প্রদান করা হয় না।

বিদেশী রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বাস করার অঙ্গীকার ব্যতীত অনেক সময় রাষ্ট্র অন্যান্য কতকগুলি শর্তও আরোপ করে। যে সকল ব্যক্তি ভারতে অনুমোদন সিদ্ধ নাগরিকতার জন্য আবেদন করেন তাঁদের সচ্চরিত্র বলে প্রমাণ দিতে হয়। এছাড়া ভারতের সংবিধানে উল্লেখিত ১৫টি ভাষার মধ্যে যে কোনও একটি ভাষায় দক্ষতার প্রমাণ দিতে হয়। ইংল্যাণ্ডেও অনুমোদনের দ্বারা নাগরিকতা অর্জনের জন্য আবেদনকারীকে সচ্চরিত্র বলে প্রমাণ দিতে হয় ও ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

অনেক রাষ্ট্র জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নাগরিক ও অনুমোদন দ্বারা প্রাপ্ত নাগরিকদের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করে না। এরূপ ক্ষেত্রে অনুমোদনের দ্বারা পূর্ণ (Grand or perfect) নাগরিকতা প্রদান করা হয়। ভারতে জন্মদ্বারা ও অর্জনের দ্বারা এই উভয়ভাবে প্রাপ্ত নাগরিকরাই রাজনৈতিক অধিকার সহ সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা সমান ভাবে উপভোগ করে থাকেন। সংবিধানের বিভিন্ন স্থানে এই কারণে কেবলমাত্র 'ভারতীয় নাগরিক' এই কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক রাষ্ট্রে আবার জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নাগরিক ও অনুমোদনের দ্বারা স্বীকৃত নাগরিকদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে অনুমোদনের দ্বারা আংশিক (Partial or imperfect) নাগরিকতা প্রদান করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে যে একমাত্র জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নাগরিকরাই রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পদ দুটির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। অনুমোদন প্রাপ্ত নাগরিকরা এই দুটি পদের জন্য নির্বাচন প্রার্থী হতে পারেন না। অনেকে মনে করেন যে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদসমূহে অধিষ্ঠিত হতে হলে যে ধরনের স্বদেশানুরাগ ও নিষ্ঠার প্রয়োজন তা কেবলমাত্র জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নাগরিকদের মধ্যেই দেখা যায়। সেই কারণে এই দুই শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে পার্থক্যমূলক আচরণ করা হয়ে থাকে।

অনুমোদন দ্বারা নাগরিকতা প্রদান আবার ব্যক্তিগত অনুমোদন (Individual naturalisation) এবং সমষ্টিগত অনুমোদন (Group naturalisation) এই দু ধরনের হতে পারে। কোনও ব্যক্তি একা বা তাঁর পরিবার সহ অনুমোদন দ্বারা বিদেশী কোনও রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করতে পারেন। আবার যুদ্ধে জয়লাভ বা চুক্তি করে কোনও রাষ্ট্র তার ভৌগোলিক এলাকায় অন্য কোনও বিদেশী রাষ্ট্রের ভূখণ্ড অন্তর্ভুক্ত করলে ঐ বিদেশী রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকদের একসঙ্গে নাগরিকতা দেওয়া হয়ে থাকে। এইরূপে নাগরিকতা দান করাকে সমষ্টিগত অনুমোদন বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে সিকিমকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার পর সিকিমের সমস্ত অধিবাসীদের সমষ্টিগতভাবে ভারতীয় নাগরিকতা দেওয়া হয়েছে।

৫। নাগরিকতার বিলোপ (Loss or Termination of Citizenship)

নানা কারণে নাগরিকতার বিলোপ হয়ে থাকে। তবে নাগরিকতা বিলোপের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পদ্ধতি হল স্বেচ্ছায় বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণ। সুতরাং নাগরিকতার বিলোপ বলতে প্রকৃত অর্থে নাগরিকতার পরিবর্তনকে বোঝায়। কোনও ব্যক্তি এক রাষ্ট্রের নাগরিকতা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণ করতে পারেন। পূর্বে অনেক রাষ্ট্র নাগরিকদের স্বেচ্ছায় নাগরিকতা পরিত্যাগের অধিকারকে স্বীকৃতি দান করত না। তখন এরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল যে রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের আনুগত্য অপরিবর্তনীয়। কিন্তু বর্তমানে গণতান্ত্রিক ধারণার বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণারও পরিবর্তন ঘটেছে। এই কারণে বর্তমানে কোনও নাগরিক যদি স্বেচ্ছায় অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণ করতে চান তবে তাঁর নিজ রাষ্ট্র ঐ বিষয়ে বাধা প্রদান করে না।

স্বেচ্ছায় নাগরিকতা পরিত্যাগের কারণগুলির মধ্যে দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, বিদেশী রাষ্ট্রে চাকুরী গ্রহণ করে কোনও ব্যক্তি নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতা পরিত্যাগ করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, কোনও মহিলা বিদেশী কোনও পুরুষকে বিবাহ করার পর স্বামীর রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করেন।

কতকগুলি কারণে রাষ্ট্র আদেশ দান করেও নাগরিকতার অবসান ঘটাতে পারে। প্রথমত, মাতৃভূমির বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যকলাপ ও সেনাবাহিনী থেকে পলায়নের ফলে রাষ্ট্র আদেশবলে নাগরিকতার অবসান ঘটাতে পারে। দ্বিতীয়ত, অনেক রাষ্ট্রে এরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে যে কোনও নাগরিক আদালত কর্তৃক গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁকে নাগরিকতা থেকে বঞ্চিত করা হয়। তৃতীয়ত, অনেক রাষ্ট্রে আবার এই ধরনের নিয়মও প্রচলিত আছে যে কোনও নাগরিক সরকারের অনুমতি ব্যতীত বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট থেকে কোনও উপাধি বা সম্মান গ্রহণ করলে তাঁকে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে। পরিশেষে বলা যেতে পারে যে দীর্ঘকাল নিজ রাষ্ট্রে অনুপস্থিত থাকার ফলেও নাগরিকতার বিলোপ ঘটতে পারে।

অন্য কোনও রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন না করে যদি কোনও ব্যক্তি তাঁর নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতা হারান তবে ঐ ধরনের ব্যক্তিকে রাষ্ট্রহীন (stateless) ব্যক্তি বলা হয়।

খ· অধিকার ও কর্তব্য

৬। অধিকারের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and nature of Rights)

ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের যথাযথ সমন্বয় সাধনের প্রশ্নটি সম্পর্কে বিভিন্ন যুগে রাজনৈতিক চিন্তাবিদরা আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্রীয় প্রাধিকার (authority) প্রবলতর হলে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন হয়। অন্যদিকে অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়। যার ফলে সমাজে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলতা ও অরাজকতা।

কোনও প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক কল্যাণের যথাযথ সমন্বয় সাধনের সমস্যাটির সঠিক সমাধান করা যেতে পারে। এরূপ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে বিপন্ন না করে সর্বাধিক পরিমাণে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

যে সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যক্তিরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে সমাজে বাস করে তা হল অ্যারিস্টটলের ভাষায় 'সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করা'। সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ সুবিধা না থাকলে তাঁদের পক্ষে সুষ্ঠু জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। এই কারণে ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য ব্যক্তিকে কতকগুলি ন্যূনতম সুযোগসুবিধা প্রদান করা একান্ত আবশ্যক। রাষ্ট্রের কর্তব্য হল ব্যক্তিকে এই সব সুযোগ সুবিধাগুলি দেওয়া। সুতরাং ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সমৃদ্ধ করার জন্য রাষ্ট্রস্বীকৃত সুযোগ সুবিধার সমষ্টিকে অধিকার বলা যেতে পারে। কোনও রাষ্ট্রের সদস্যপদ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে যে কোনও ব্যক্তিকে কতকগুলি অধিকার প্রদান করা হয়।

নাগরিকতার সঙ্গে অধিকার তাই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

সাধারণ অর্থে কোনও ব্যক্তির স্বাধীনভাবে কোনও কিছু করার ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকে অধিকার বলা হয়। কিন্তু কোনও ব্যক্তি এরূপ স্বাধীনভাবে কাজ করার ফলে অন্য ব্যক্তির অসুবিধা হতে পারে বা সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। সুতরাং কোনও ব্যক্তির সব ইচ্ছাই সমভাবে সুযুক্তিপূর্ণ অথবা সামাজিক অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে। কোনও ব্যক্তি তাঁর শত্রুকে হত্যা করতে ইচ্ছুক হতে পারেন। কিন্তু এই ধরনের ইচ্ছা কেবলমাত্র অযৌক্তিক নয়, এটি সমাজবিরোধীও বটে। এরূপ ইচ্ছা অধিকারের ভিত্তি হতে পারে না। বাস্তবে দেখা যায় যে এই ধরনের ইচ্ছাকে সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সীমিত বা দমন করার ওপরেই নির্ভর করে অধিকারের অস্তিত্ব। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে অধিকারসমূহ যুক্তি ও সুনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কোনওব্যক্তিই আত্মহত্যা করাকে অধিকার বলে দাবি করতে পারে না। এই ধরনের দাবি অযৌক্তিক ও নীতিবিরুদ্ধ কারণ এই দাবি ব্যক্তির কল্যাণের পক্ষে ক্ষতিকর। অন্যদিকে চিন্তা ও অভিব্যক্তির স্বাধীনতাকে যুক্তিযুক্ত ও সুনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে গণ্য করা যায়। এরূপ স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে ও এর ফলে সে একজন সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারে।

গ্রীন (T. H. Green) বলেন যে গণমঙ্গলের সহায়ক রূপে দাবিকৃত ও স্বীকৃত ক্ষমতাই হল অধিকার (Right is a power claimed and recognised as contributory to common good)। এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারে যে ব্যক্তির পক্ষ থেকে অধিকার দাবি করা হয় এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাকে স্বীকৃতি দান করা হয়।

আরনেষ্ট বার্কারের (Ernest Barker) মতে আদর্শ অধিকার সঞ্জাত হয় দুটি উৎস থেকে এবং এর বৈশিষ্ট্যও হল দুটি। প্রথম উৎস হল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং এই ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করাই হল অধিকারের বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় উৎস হল রাষ্ট্র ও তার আইন এবং এখানে রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা স্বীকৃত হওয়াই হল অধিকারের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু, বার্কারের মতে, বাস্তবে এক ধরনের অধিকার দেখা যায় যাকে আধা-অধিকার (Quasi right) বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এরূপ অধিকার একটি উৎস থেকে উৎসারিত এবং একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। যেমন, কোনও দাসরাষ্ট্রে ক্রীতদাসদের ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারকে আধা-অধিকার বলা যেতে পারে। কারণ এই অধিকার ক্রীতদাসদের পক্ষ থেকে দাবি করা হলেও রাষ্ট্র কখনও তাকে স্বীকৃতি দান করে নি। অনুরূপভাবে দাসরাষ্ট্রে দাস-মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে ক্রীতদাস রাখার অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হলেও ঐ অধিকার ক্রীতদাসদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে সহায়ক ছিল না। অতএব ঐ অধিকারকেও আধা-অধিকার রূপে গণ্য করা যেতে পারে।

ল্যাস্কির (Laski) মতে অধিকার হল সমাজ জীবনের সেইসব শর্তাদি যেগুলি ব্যতীত সাধারণভাবে কোনও মানুষের পরমতম বিকাশ ঘটতে পারে না। (Rights are those conditions of social life without which no man can in general be at his best)।

সুতরাং অধিকারের প্রকৃতি ও সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করলে এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়।

প্রথমত, অধিকার ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। দ্বিতীয়ত, কোনও অধিকারকে প্রকৃত অর্থে অধিকার রূপে গণ্য করতে হলে রাষ্ট্র কর্তৃক তা স্বীকৃত হওয়া আবশ্যক।

এই দুটি অত্যাবশ্যক শর্ত ব্যতীত অধিকারের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

প্রথমত, ব্যক্তি তার অধিকার এমনভাবে প্রয়োগ করবে যাতে সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয়। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অধিকার প্রয়োগ করার সময় অন্য ব্যক্তির ঐ ধরনের অধিকারের নিরাপত্তা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। তৃতীয়ত, অধিকারগুলি কখনও অবাধ বা নিরঙ্কুশ হতে

পারে না। প্রতিটি রাষ্ট্রেই সামাজিক শৃঙ্খলা, সুনীতি, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি কারণে ব্যক্তি-অধিকারের ওপর নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়ে থাকে। চতুর্থত, অধিকার সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তনশীল, স্থিতিশীল নয়। শিল্পোন্নয়নের প্রথম দিকে ব্যক্তির অবাধ পরিমাণে সম্পত্তি অর্জন ও ব্যবহার করার অধিকার স্বীকৃত ছিল। কিন্তু বিংশ শতকের মধ্যভাগে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই সম্পত্তির অধিকারকে যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। এই কারণে ল্যাস্কি বলেছেন যে কোনও স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় অধিকারের সনদ প্রণয়ন করা সম্ভব নয়।

৭। অধিকারের শ্রেণী বিভাগ (Classification of Rights)

অধিকারগুলিকে প্রধানত নৈতিক (Moral) ও আইনগত (Legal) এই দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। নৈতিক অধিকারসমূহ ব্যক্তির নৈতিক সচেতনা ও বিবেকের ওপর নির্ভর করে। এই অধিকারগুলি সমাজে প্রচলিত নৈতিক বিধির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন পিতামাতার কাছ থেকে সস্নেহ আচরণ লাভের অধিকার সন্তানের একটি নৈতিক অধিকার। কোনও শিক্ষক নৈতিকভাবে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা প্রত্যাশা করতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্র তার আইনগত কাঠামোর মাধ্যমে এই সব নৈতিক অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি প্রদান করে না। সমাজে প্রচলিত নৈতিক ধারণার ওপর এই অধিকারগুলি প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য কোনও বিশেষ নৈতিক দাবি শক্তিশালী জনমতের সমর্থন লাভ করে অবশেষে আইনগত স্বীকৃতির মাধ্যমে আইনগত অধিকারে পরিণত হতে পারে।

নাগরিকদের যে সব সুযোগ সুবিধা রাষ্ট্রীয় আইন বা সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত সেগুলিকে আইনগত অধিকার বলা হয়। আইনগত অধিকারগুলি লঙ্ঘন করা হলে সাধারণত আইনের সাহায্যে ঐগুলি বলবৎ করা যায়।

আইনগত অধিকারগুলিকে আবার পৌর (Civil) ও রাজনৈতিক (Political) অধিকার—এই দুইভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

পৌর অধিকারসমূহ মানুষ ব্যক্তি হিসাবে উপভোগ করে। এই অধিকারগুলি ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে সামাজিক জীবন যাপন করা যায় না। অর্থাৎ, ব্যক্তির সামাজিক অস্তিত্বের জন্য এই অধিকারগুলি অপরিহার্য। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রের সংবিধান বা আইনের মাধ্যমে পৌর অধিকার স্বীকৃত। আবার এই অধিকারগুলি অন্য ব্যক্তি, কোনও প্রতিষ্ঠান বা সরকার ক্ষুণ্ণ করলে তার যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থাও থাকে। বাক্ স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘ বা সমিতি গঠনের অধিকার ও সমবেত হওয়ার অধিকারকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পৌর অধিকাররূপে গণ্য করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রস্বীকৃত ও প্রদত্ত যে সব সুযোগসুবিধাগুলির মাধ্যমে নাগরিকরা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করে সেগুলিকে রাজনৈতিক অধিকার বলা হয়। যে কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করে জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। অধ্যাপক ল্যাস্কি রাজনৈতিক অধিকারকে 'রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকার' (Right to Political Power) বলে অভিহিত করেছেন।

আধুনিক কালে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে নাগরিকদের ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করা হয়। নাগরিকগণ কতটা সচেতন ভাবে তাঁদের রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করেন তার ওপর নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি। রাজনৈতিক অধিকারসমূহ বিচক্ষণতার সাথে প্রয়োগ করা হলে যোগ্য ব্যক্তিরা ক্ষমতায় আসীন হতে পারেন। এর ফলে সামগ্রিকভাবে সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয়। এই কারণে দেখা যায় যে কোনও রাষ্ট্রেই সমস্ত ব্যক্তিদের রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করা হয় না। এই অধিকারগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করার মত মানসিক প্রস্তুতি না থাকার জন্য অপ্রাপ্তবয়স্কদের এগুলি দেওয়া হয় না। একই কারণে মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি, দেউলিয়া ও

ভবঘুরেদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। বিদেশীরা যে রাষ্ট্রে সাময়িক ভাবে বসবাস করেন তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয় না বলে তাঁদেরকেও রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয় না।

৮। প্রধান পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহ (Principal Civil and Political Rights)

বিভিন্ন রাষ্ট্রে ও বিভিন্ন সময়ে নাগরিকগণ বিভিন্ন ধরনের অধিকার অর্জন করে থাকেন। তবে প্রায় প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই নাগরিকগণকে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়ে থাকে।

নাগরিকদের প্রধান কয়েকটি পৌর অধিকার হল এরূপ :

১। জীবনের অধিকার (Right to life)—জীবনের অধিকারকে ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধিকার বলে গণ্য করা হয়। এই অধিকারটিকে ভিত্তি করে অন্যান্য অধিকারসমূহ গড়ে ওঠে। জীবনের নিরাপত্তা ব্যতীত কোন ব্যক্তির পক্ষে অন্যান্য অধিকার উপভোগ করা অসম্ভব। ব্যক্তির জীবন যদি সর্বদা অন্যান্য ব্যক্তির বা সরকারের করুণার ওপর নির্ভরশীল হয় সে ক্ষেত্রে সামাজিক জীবন যাপন সুখকর হতে পারে না। জীবনের অধিকার ও ব্যক্তিগত নিশ্চয়তার ফলে ব্যক্তি নির্ভয়ে সমাজ বসবাস করতে পারে। এই অধিকার থাকার ফলে কোনও ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে না বা দৈহিক ভাবে আহত করতে পারে না। এই অধিকার বলে প্রত্যেক ব্যক্তিই আক্রমণ বা হত্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বলপ্রয়োগ করতে পারে। কোনও ব্যক্তি জঘন্য অপরাধ করা ব্যতীত তাকে রাষ্ট্র মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে না। জীবনের অধিকারকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বহু উন্নত রাষ্ট্রে মৃত্যুদণ্ড উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বা উঠিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। মানুষের জীবনকে এত মূল্যবান বলে মনে করা হয় যে আত্মহত্যাকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। এই কারণে যে সব ব্যক্তি আত্মহত্যা করতে গিয়ে বিফল হন অনেকসময় তাঁদের শাস্তি প্রদান করা হয়।

২। স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom)—ব্যক্তির নিজস্ব সত্তাকে নির্বাধে বিকশিত করার অধিকারকেই স্বাধীনতার অধিকার বলা হয়। স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার, যে কোনও স্থানে বাসস্থান ও বসতি স্থাপন করার অধিকার, যে কোনও পেশা, বৃত্তি, উপজীবিকা বা ব্যবসা গ্রহণের অধিকার ইত্যাদি স্বাধীনতার অধিকারের অন্তর্গত। এছাড়া সরকার যথেচ্ছভাবে কোন ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না। আইনের অনুমোদন ব্যতীত কোনও ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার বা আটক করা যায় না। স্বাধীনতার অধিকার যথেচ্ছায় ক্ষুণ্ণ করা হলে ব্যক্তি আদালতের সাহায্যে তার প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করতে পারে। তবে অন্যান্য অধিকারের মত স্বাধীনতার অধিকারের ওপরও প্রয়োজন হলে রাষ্ট্র বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

৩। বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা (Freedom of Speech and Expression)—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অধিকার হল বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা। এই অধিকারটি কোনও ব্যক্তির মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ব্যতীত কোনওব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারে না। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে অনেক সময় কোনও বিষয়ে সত্যকে উদ্ঘাটিত করা যেতে পারে বা কোন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা যেতে পারে। এছাড়া সরকারি নীতি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করার মাধ্যমে জনগণ সরকারকে সংযত রাখতে পারে।

চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা (Freedom of Press) অন্তর্ভুক্ত থাকে। যে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাদের মতামতকে লিখিতভাবে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করে জনমত গঠনে সাহায্য করতে পারে।

সরকারের পক্ষ থেকে ও বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার একটি তাৎপর্য আছে। এই অধিকারটির মাধ্যমে সরকার জনগণের মতামত সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে ও তার ভিত্তিতে প্রয়োজন হলে সরকারী নীতি ও কার্যকলাপ পরিবর্তন করতে পারে।

তবে সরকার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, সুরুচি, নৈতিকতাবোধ, মানহানি, আদালত অবমাননা ইত্যাদি কারণে বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর প্রয়োজন হলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। বিশেষত যুদ্ধ ও অন্যান্য জাতীয়-সংকটকালে রাষ্ট্র এই অধিকারটির ওপর বিভিন্ন বাধানিষেধ প্রয়োগ করে থাকে।

৪। **সংঘ বা সমিতি গঠনের অধিকার (Right to form associations or unions)**—আধুনিক সমাজে মানুষের বহুবিধ প্রয়োজন মেটাবার জন্য নানা ধরনের সংঘ বা সমিতির অস্তিত্ব দেখা যায়। রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তি যেরূপ আনুগত্য প্রদর্শন করে সেইভাবেই তাকে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্ম প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক সংঘ, রাজনৈতিক দল, স্বার্থগোষ্ঠী প্রভৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে নিজস্ব মতামত গঠন করতে হয় ও বিবিধ প্রয়োজন মেটাতে হয়। অধিকাংশ আধুনিক রাষ্ট্রেই সংঘ বা সমিতি গঠন করার অধিকারকে একটি মৌলিক অধিকার রূপে গণ্য করা হয়।

৫। **ধর্মাচরণের স্বাধীনতা (Freedom of Religion)**—আধুনিক যুগে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই ব্যক্তিদের স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকার প্রদান করা হয়। কোনও ব্যক্তি ইচ্ছা করলে কোনও ধর্মের প্রতি আস্থা নাও রাখতে পারেন। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিতে সরকার ব্যক্তিদের ধর্মীয় ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করার পক্ষপাতী। এই ধরনের রাষ্ট্রে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় না। তবে যে কোনও প্রগতিশীল রাষ্ট্রে কোনও ধর্মসম্প্রদায় বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যদি অসামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজের সাথে যুক্ত থাকে অথবা সাম্প্রদায়িকতা বা সাধারণভাবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে তবে সে ক্ষেত্রে সামাজিক কল্যাণ ও শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র অবশ্যই হস্তক্ষেপ করবে।

৬। **সম্পত্তির অধিকার (Right to Property)**—সম্পত্তির অধিকার বলতে কোনও সম্পত্তিতে স্বত্ববান হওয়ার, তা অর্জন করার ও তা হস্তান্তর করার ক্ষমতাকে বোঝায়। বহু আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাবিদ এই অধিকারটিকে সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে এই অধিকারটির বিলোপসাধন ব্যতীত সমাজে ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এছাড়া সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত থাকলে অনেক সময় রাজনীতিতেও অর্থের প্রভাব দেখা যায়। এর ফলে রাষ্ট্র পরিচালনা কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে সম্পত্তির অধিকারের পূর্ণ বিলোপসাধন করা হলে সমাজে ব্যক্তিগত কর্মোদ্যোগে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাবে। সুতরাং ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার কিছু পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। অবশ্য কোনও ক্ষেত্রেই এই অধিকার নিরঙ্কুশ হওয়া উচিত নয়। সাধারণের মঙ্গলের জন্য এই অধিকারের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকা আবশ্যক। সাধারণত করের মাধ্যমে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির একাংশ দাবি করে থাকে। এছাড়া রাষ্ট্র সামাজিক কল্যাণের জন্য আইন প্রণয়ন করে, ক্ষতিপূরণ প্রদান করে বা না করে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে গ্রহণ করতে পারে।

নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকারসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১। **ভোটাধিকার (Right to vote)**—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিক ভোটাধিকারের মাধ্যমে সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহকে প্রভাবিত করার সুযোগ অর্জন করে। একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর নাগরিকরা ভোটদানের মাধ্যমে প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে। এই প্রতিনিধিরাই রাষ্ট্র পরিচালনা করে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রীপুরুষ, সম্পদ বা প্রভাব নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। কেউ কেউ মনে করেন যে শিক্ষা, সম্পত্তি ইত্যাদির

ভিত্তিতে ভোটাধিকারের যোগ্যতা স্থির করে নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা সীমিত করা প্রয়োজন। তাঁদের মতে এরূপ করা হলে ভোটদাতারা অনেক সচেতন হন। তবে বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, যে সকল ব্যক্তিদের রাষ্ট্রের পরিচলনা কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয় না তাদের স্বার্থ অনেক সময় অবহেলা করা হয়। এই কারণে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রবর্তন করাই যুক্তিযুক্ত। অধিকাংশ রাষ্ট্রেই বর্তমানে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রর্বতন করা হলেও ভোটাধিকার অর্জনের জন্য কত বছর বয়সে কোনও ব্যক্তিকে প্রাপ্তবয়স্ক বলে গণ্য করা হবে এ বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের আইন প্রচলিত আছে। বর্তমানে যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে ভোটাধিকারের বয়স হল ১৮ বৎসর। ভারতে ভোটাধিকারের বয়স হল ২১ বৎসর। তবে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই নাবালক-নাবালিকা ব্যতীত ভবঘুরে, অপরাধী ও বিদেশীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয় না।

২। **নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার (Right to stand in elections)**—ভোটাধিকারের মাধ্যমে নাগরিকরা প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করার সুযোগ অর্জন করেন। ভোটাধিকারের পরিপূরক অধিকার হল প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার অথবা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার। যে সব ব্যক্তিরা ভোটাধিকারের অধিকারী তাঁরাই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। তবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রে কতকগুলি যোগ্যতা স্থির করে দেওয়া হয়। সাধারণত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ভোট প্রদানের বয়স অপেক্ষা অধিক বয়স স্থির করা হয়।

৩। **সরকারী কাজে নিযুক্ত হওয়ার অধিকার (Right to hold public office)**—প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার বলতে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারী পদ গ্রহণ করাকে বোঝায়। সাধারণত এই সব পদগুলি অস্থায়ী। এ ছাড়া প্রতি রাষ্ট্রেই অসংখ্য স্থায়ী সরকারী পদ থাকে যেগুলিতে নির্দিষ্ট যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়। এই সব স্থায়ী সরকারী চাকরীসমূহে নিযুক্ত হওয়ার অধিকারও নাগরিকরা ভোগ করেন। এই সব পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণত জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্পদ, প্রভাব ইত্যাদির বিচারে নাগরিকদের মধ্যে কোনও বিভেদ করা হয় না। তবে এই সব সরকারী পদে নিযুক্ত হওয়ার জন্য শিক্ষাগত বা বৃত্তিবিষয়ক যোগ্যতা স্থির করে দেওয়া হয়। ঐরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই কেবল ঐ সব পদে নিযুক্ত হওয়ার জন্য প্রার্থীরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে।

৪। **সরকারকে সমালোচনা করার অধিকার (Right to criticise government)**—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকরা কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগকারী ব্যক্তিদের নির্বাচিতই করেন না, প্রয়োজন হলে তাঁদের সমালোচনাও করতে পারেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি অদক্ষ, দুর্নীতিগ্রস্ত হন বা জনমতকে অবহেলা করেন সে ক্ষেত্রে নাগরিকরা তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এই কারণে নাগরিকদের সচেতন ও সদাজাগ্রত থাকা প্রয়োজন। সুতরাং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজকর্মের প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখা নাগরিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকরা শাসকদের নির্বাচিত করার অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের বিরোধিতা করার অধিকারও ভোগ করে থাকেন।

৯। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার (Social and Economic Rights)

১৯৪৮ সনের ডিসেম্বর মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় গৃহীত মানব অধিকার সম্পর্কে সার্বিক ঘোষণায় (Universal Declaration of Human Rights) ব্যক্তিদের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারগুলির সাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলির বিষয়ও উল্লেখ করা হয়। এই ঘোষণায় বলা হয় যে এই অধিকারগুলি ব্যক্তির মর্যাদা ও তার ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

আধুনিক কালে কল্যাণকর রাষ্ট্রসমূহে নাগরিকরা পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারগুলির সাথে কয়েকটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে থাকে। অধিকাংশ রাষ্ট্রের সংবিধানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি প্রদান করা না হলেও বর্তমানে প্রায় সব রাষ্ট্রেই এই অধিকারগুলির গুরুত্ব স্বীকার করা হয়। অনেক রাষ্ট্রেই দেখা যায় যে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নাগরিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কতকগুলি সুযোগসুবিধা প্রদান করা হয়।

সমাজ জীবনে যাতে ব্যক্তিরা স্বাধীনভাবে ও যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করতে পারেন এ জন্য তাঁদের কতকগুলি সুযোগসুবিধা দেওয়া প্রয়োজন। সমাজে অসাম্য ও বৈষম্য থাকলে নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে না। এই কারণে সামাজিক অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি দেওয়া আবশ্যক। সামাজিক অধিকার (Social Right) বলতে সেই সব সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজ কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদিকে বোঝায়, যেগুলি থাকার ফলে ব্যক্তিরা সুষ্ঠু ও সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ সাধিত হয়।

সামাজিক অধিকারগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১। **শিক্ষার অধিকার (Right to education)**—ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের জন্য শিক্ষা আবশ্যক। আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিকতা সংক্রান্ত কাজগুলি যথাযথ ভাবে পালন করার জন্য যে কোনও ব্যক্তিকে শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক। সুষ্ঠু সমাজ জীবনের ভিত্তি শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষালাভের ফলে কোনও ব্যক্তি নিজে সচেতন ভাবে জীবন যাপন করতে পারেন ও সামাজিক কল্যাণের ক্ষেত্রেও তাঁর নিজস্ব অবদান রাখতে পারেন। সুতরাং গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্যও নাগরিকদের শিক্ষা একটি প্রয়োজনীয় শর্ত।

আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের শিক্ষাগ্রহণের অধিকার থাকা একান্ত আবশ্যক। তবে শিক্ষার অধিকার বলতে নাগরিকদের ন্যূনতম শিক্ষা প্রদান করা বোঝায়। এই কারণে অনেক রাষ্ট্রে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা হয়ে থাকে। তবে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করাই যথেষ্ট নয়। রাষ্ট্রকে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্য উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, সংগ্রহশালা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এই সব ব্যবস্থার মাধ্যমে উজ্জীবিত হয় নাগরিকদের মেধা।

২। **সাংস্কৃতিক অধিকার (Cultural Rights)**—প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনে অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ প্রদান করা উচিত। এই জন্য কোনও গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, লিপি ও কৃষ্টি থাকলে ঐগুলি যথাযথ ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এছাড়া নাগরিকদের নিজ নিজ প্রতিভা অনুযায়ী বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে চর্চা করার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক।

৩। **স্বাস্থ্য সংরক্ষণের অধিকার (Right to Protection of Health)**—কোনও রাষ্ট্রের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে সুস্থ ও সবল নাগরিকদের ওপর। এই কারণে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। অসুস্থ অবস্থায় ব্যক্তিরা যাতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন তা দেখা রাষ্ট্রের কর্তব্য। এই কারণে শহর ও গ্রামে সর্বত্র হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত। দরিদ্র ব্যক্তিরা যাতে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ লাভ করেন তার জন্যও রাষ্ট্রকে ব্যবস্থা করতে হয়। সংক্রামক রোগ যাতে প্রসারিত না হয় সেই কারণে রাষ্ট্রকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এছাড়া জনগণের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য, পানীয় জল ও ঔষধপত্র সরবরাহের দিকে দৃষ্টি রাখাও রাষ্ট্রের কর্তব্য।

৪। **প্রয়োজনে সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির অধিকার (Right to public assistance in case of need)**—বেকার অবস্থা অসুস্থতা বার্ধক্য,কর্মক্ষমতানাশ, বৈধব্য প্রভৃতি অনিচ্ছাকৃত অভাবের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে সরকারী সাহায্য প্রদান করা প্রয়োজন। বেকার অবস্থা ও বার্ধক্যে রাষ্ট্রের পক্ষ

থেকে ব্যক্তিকে ভাতা প্রদান করা উচিত। কোনও ব্যক্তি তার নিজের আয়ত্তের বাইরের কোনও কারণে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে তাকে প্রতিপালন করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বর্তমানে প্রায় সব রাষ্ট্রই সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। জীবন বীমা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রভৃতি পরিকল্পনা প্রচলনের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিছুটা কার্যকর করা যায়।

৫। **শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against exploitation)**—দারিদ্র ও অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে কোনও ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তি কর্তৃক শোষণ ও অত্যাচারের হাত থকে রক্ষা করা প্রয়োজন। শিশু ও নারী শ্রমিকদের কাজের শর্তাবলী রাষ্ট্রের স্থির করে দেওয়া উচিত। আর্থিক প্রয়োজনে ব্যক্তিরা তাঁদের বয়স বা শক্তির অনুপযোগী কোনও পেশায় যাতে যোগদান করতে বাধ্য না হন তার জন্য রাষ্ট্রের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। শিশু ও যুবকরাই রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ। অবএব শিশুদের সুষ্ঠুভাবে এবং স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে গড়ে ওঠার সুযোগসুবিধা দেওয়া দরকার। এছাড়া শৈশবাবস্থা ও যুবাবস্থায় ব্যক্তিকে শোষণ থেকে এবং নৈতিক ও বৈষয়িক অবহেলা থেকে রক্ষা করা উচিত।

অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights)—হল সেই সব অধিকার যেগুলি ব্যক্তিদের দৈনন্দিন জীবনের অভাব অভিযোগ ও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত করে সুষ্ঠ জীবনযাপন করতে সহায়তা করে। সুতরাং অর্থনৈতিক অধিকারগুলি না থাকলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হতে পারে না। এছাড়া অর্থনৈতিক অধিকারগুলি প্রতিষ্ঠিত না হলে সমাজে মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তিরা অর্থনৈতিক ক্ষমতা বলে সমগ্র সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করার সুযোগ গ্রহণ করেন। এই কারণে এই অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি না দিলে সমাজে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান হ্রাস করা সম্ভব নয়। অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে অর্থনৈতিক অধিকার ব্যতীত পৌর, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পূর্ণ মূল্যহীন।

নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকারগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১। **কর্মের অধিকার (Right to work)**—কর্মের অধিকার বলতে মানসিক বা কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকার্জনকে বোঝায়। প্রত্যেক ব্যক্তির যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুসারে কোনও বৃত্তি অবলম্বন করার অথবা যে কোনও উপজীবিকা বা ব্যবসা চালাবার অধিকার হল কর্মের অধিকার। সুতরাং কর্মের অধিকার বলতে প্রকৃত অর্থে যথাযোগ্য কর্মে নিযুক্ত হওয়াকে বোঝায়। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল প্রতিটি ব্যক্তির জন্য যোগ্যতা অনুসারে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। কর্মের অধিকারটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অধিকার, কারণ বেকারত্বের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি না পেলে ব্যক্তি তাঁর সত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারেন না।

২। **উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার (Right to adequate wage)** নাগরিকদের জন্য শুধুমাত্র কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাই যথেষ্ট নয়, কাজের প্রকৃতি ও পরিমাণের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁদের বেতন দেওয়া উচিত। প্রতিটি নাগরিককে তাঁর কাজের বিনিময়ে তাঁর জীবনযাত্রার ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবার মত বেতন দেওয়া প্রয়োজন। কর্মের গুণগত ও পরিমাণগত পার্থক্যের জন্য বেতন বা মজুরীর হারের তারতম্য করা যেতে পারে। তবে প্রতিটি ব্যক্তিকে সমান কাজের জন্য সমান বেতন দেওয়া উচিত। আবার মালিক যাতে শ্রমিক বা কর্মীর কাজ অনুপাতে তাকে কম বেতন দিয়ে শোষণ না করে তার দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

৩। **বিশ্রাম ও অবকাশের অধিকার (Right to rest and leisure)**—উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ন্যায় কাজের শর্তাবলীও স্থির করে দেওয়া আবশ্যক। ব্যক্তির কর্মশক্তির একটি সীমা থাকে। অতএব ব্যক্তি যাতে সুষ্ঠুভাবে মনোযোগ সহকারে কাজ করতে পারেন এ জন্য তাঁকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম দেওয়ার প্রয়োজন। বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার না থাকলে ব্যক্তির শরীর ও মন

উভয়ই ভেঙে পড়ে। সুতরাং ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য অবকাশের অধিকারটি আবশ্যক। এই অধিকারটি কার্যকর করার জন্য দৈনন্দিন কাজের সময়সীমা, সাপ্তাহিক ছুটি, সবেতন বাৎসরিক ছুটি, ছুটিতে ভ্রমণের জন্য বিশেষ অনুদান প্রদান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৪। **শ্রমিক সংঘ গঠনের ও তাতে যোগদানের অধিকার(Right to form and join trade unions)**—কর্মী বা শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁদের সমস্যা ও অভাব অভিযোগ যাতে আলোচনা করতে পারেন তার জন্য শ্রমিক সংঘ গঠনের অধিকার দেওয়া আবশ্যক। অনেক সময় কোনও কর্মী একক ভাবে তাঁর স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম হন না। শ্রমিক সংঘের মাধ্যমে কর্মীরা সংঘবদ্ধভাবে তাঁদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করেন এবং প্রয়োজন হলে তাঁদের স্বার্থ রক্ষার জন্য পরিচালকগোষ্ঠী বা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন।

৫। **পরিচালন ব্যবস্থায় কর্মীদের অংশগ্রহণের অধিকার (Right to participation of workers in the management)**—কোনও শিল্প-উদ্যোগ, সংস্থা বা অন্যান্য সংগঠনের ব্যবস্থায় কর্মীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যে কোনও সংস্থার পরিচালন ব্যবস্থায় কর্মীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হলে নিয়োগকর্তা ও কর্মীদের মধ্যে কৃত্রিম পার্থক্য বহুলাংশে দূর হয়ে যায় এবং যে কোনও সমস্যা অনেক সুষ্ঠুভাবে সমাধান করা সম্ভব হয়।

১০। নাগরিকদের কর্তব্য (Duties of the Citizens)

কর্তব্য বলতে সাধারণভাবে নাগরিকদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্র নির্ধারিত দায়িত্বসমূহ সম্পাদন করাকে বোঝায়। অনেক রাষ্ট্রের সংবিধানে নাগরিকদের কর্তব্যসমূহ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্রের সংবিধানে নাগরিকদের অধিকারের সঙ্গে তাঁদের কর্তব্যগুলিও ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারের অংশ ব্যতীত নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র অংশ দেখা যায়। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে নাগরিকদের কর্তব্য সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করা হয় নি। সেখানে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা হয় নাগরিকদের পৌর চেতনার ওপর।

কর্তব্যগুলিকে আইনগত (Legel) ও নৈতিক (Moral)—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। আইনগত কর্তব্যগুলি রাষ্ট্রের আইন এবং অনেক সময় সংবিধানেও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। এই সব কর্তব্যগুলি অমান্য করলে অথবা সম্পাদন না করলে ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে। রাষ্ট্রের আইন মান্য করা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, কর প্রদান করা, ভোটদান করা ইত্যাদি আইনগত কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। নৈতিক কর্তব্যগুলি আইনগত বাধ্যবাধকতার জন্য মান্য করা হয় না। জনমতের প্রভাবে অথবা ব্যক্তিগত ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে ঐগুলির মূল্য ও উপযোগিতা সততই প্রতিভাত হয় বলে নাগরিকগণ তাঁদের নৈতিক কর্তব্য পালন করেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে। পরিবার ও সমাজের প্রতি নাগরিকদের কর্তবগুলিকে নৈতিক কর্তব্য বলা হয়। পরিবার ভরণপোষণ করা ও সন্তানদের লালনপালন করার কর্তব্য হল নাগরিকদের নৈতিক কর্তব্য। আবার সমাজবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত না হওয়া এবং খরা, বন্যা, মহামারী ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করাকেও নৈতিক কর্তব্য বলে গণ্য করা যেতে পারে। এই সব কর্তব্যগুলি আইনদ্বারা বলবৎ করা যায় না।

আবার কতকগুলি কর্তব্য আছে যাদের অবস্থিতি আইনগত ও নৈতিক কর্তব্যের মধ্যপ্রান্তে। উদাহরণ হিসাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে পুলিস ও সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করা, সমাজবিরোধী ও অন্যায় আচরণকারীদের সহায়তা না করা, সরকারী কর্মচারীদের সাথে সহযোগিতা করা ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলি সুস্পষ্ট রূপে নাগরিকদের কর্তব্য। কিন্তু এগুলিকে সর্বদা বা সহজে বলবৎ করা যায় না।

নাগরিক কর্তব্যগুলির ইতিবাচক (Positive) ও নেতিবাচক (Negative) এই দুটি দিক দেখা যায়। ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে কর্তব্য বলতে নাগরিকগণ কর্তৃক রাষ্ট্রনির্ধারিত কতকগুলি দায়িত্ব সম্পাদন করাকে বোঝায়। রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও আদর্শকে বাস্তবে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করাকে নাগরিকদের ইতিবাচক কর্তব্য রূপে গণ্য করা যায়। দেশ রক্ষার কাজে অংশগ্রহণ করা, সৎ ভাবে ভোট প্রদান করা, কর প্রদান করা ইত্যাদি ইতিবাচক কর্তব্যের উদাহরণ। আবার রাষ্ট্রের আইন দ্বারা নাগরিকদের কতকগুলি বিষয়ে কোনও কিছু করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়ে থাকে। এগুলিকে নেতিবাচক কর্তব্য বলা হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই আইন দ্বারা নাগরিকদের ওপর এই শর্ত আরোপ করা হয় যে তারা অন্য নাগরিকদের অধিকারসমূহের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না। এককথায় ব্যক্তির যে সব ক্রিয়াকলাপ ও আচরণকে রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে অপরাধ বলে গণ্য করা হয় সেগুলি থেকে বিরত থাকার অর্থই হল নেতিবাচক কর্তব্য পালন করা।

১১। নাগরিকদের প্রধান কর্তব্যসমূহ (Principal Duties of the Citizens)

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে নাগরিকরা নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলি সম্পাদন করে থাকেন :

১। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন (Allegiance to the state)—নাগরিকদের প্রাথমিক ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দেখানো এবং রাষ্ট্রের আদর্শ ও স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করা। সংকটময় মুহূর্তে নাগরিকগণ সর্বদা রাষ্ট্রকে সর্বপ্রকার সহায়তা করবেন। অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য করা হল প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। রাষ্ট্রের সংহতি ও সম্মান রক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে নাগরিকরা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। সুতরাং রাষ্ট্রকে রক্ষা করার বিষয়ে নাগরিকদের একটি নৈতিক দায়িত্ব থাকে। দেশরক্ষার কর্তব্যকে কার্যকর করার জন্য অনেক রাষ্ট্রে যুদ্ধের সময় নাগরিকদের বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করানো হয়ে থাকে।

২। আইন মান্য করা (To obey laws)—বর্তমানে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রসমূহে সাধারণত সমাজে প্রচলিত মতামত অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করা হয়। সামাজিক কল্যাণ ও শৃঙ্খলা রক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখে আইনগুলি প্রণয়ন করা হয়। সুতরাং প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য হল আইনগুলি মান্য করা। আইনগুলি অমান্য করলে সমাজে অরাজকতার সৃষ্টি হয় ও ফলে জনসাধারণের কল্যাণ ব্যাহত হয়। এছাড়া আইন ভঙ্গকারীদের রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শাস্তি প্রদান করতে হয়। কিন্তু অনেকে প্রশ্ন করেন যে রাষ্ট্র প্রণীত যে কোনও আইন মান্য করতে কি নাগরিকগণ বাধ্য থাকেন? অনেকসময় আইনগুলি দমনমূলক, অনৈতিক বা অযৌক্তিক হতে পারে। নাগরিকরা কি এই ধরনের আইনের বিরোধিতা করতে পারেন না? অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অভিমত হল এই যে সমাজের স্বার্থের পক্ষে হানিকর আইনসমূহকে নাগরিকগণ শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক পদ্ধতিতে পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করবেন। আবার অনেক লেখক, যেমন ল্যাস্কি, বলেছেন যে কোনও আইন যদি নৈতিক দিক দিয়ে যথাযথ না হয় তাহলে নাগরিকগণ ঐ আইনের বিরোধিতা করতে পারেন। বৈপ্লবিক চিন্তায় পুষ্ট তাত্ত্বিকদের মতে, প্রয়োজন হলে নাগরিকগণ সংবিধান-বহির্ভূত এমন কি সশস্ত্র পদ্ধতিতেও আইনের বিরুদ্ধাচারণ করতে পারেন।

৩। সৎ ভাবে ভোট দান করা ও সরকারীপদে অধিষ্ঠিত হওয়া (Honest exercise of the right to vote and to hold public office)—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে যাঁরা শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাঁদের নির্বাচন করার অধিকার দেওয়া হয় জনগণকে। ভোটাধিকার প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। নাগরিকগণ যে ভাবে এই অধিকার প্রয়োগ করেন তার ওপর সরকারের প্রকৃতি নির্ভর করে। নির্বাচনের সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শসমূহ ও নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে ভোটদাতাদের যোগ্যতমকে বাছাই করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। সুতরাং ভোট প্রদান করার

ক্ষেত্রে নাগরিকদের বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করতে হয়। কোনও প্রকার প্ররোচনা বা প্রলোভন পরিত্যাগ করে সৎ ভাবে ভোট প্রদান করা হল নাগরিকদের কর্তব্য। অন্যথায় জনপ্রিয় বক্তা, কর্মজীবনে উন্নতি লাভে আগ্রহশীল ব্যক্তি ও অসৎ ব্যক্তিরা নির্বাচনে জয়লাভ করবেন।

যাঁরা বিভিন্ন সরকারী কাজে নিযুক্ত হন তাঁরাও এরূপ সৎ ভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন যাতে তাঁদের প্রতি জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা থাকে। সরকারী কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা উৎকোচ গ্রহণ, স্বজনপোষণ প্রভৃতি কাজে লিপ্ত থাকলে তাঁদের প্রতি জনগণ আস্থা হারাবেন।

সরকারী পদ সমূহে যাঁরা নির্বাচিত হন তাঁদের যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অনেকে প্রত্যাবর্তনের (Recall) ব্যবস্থা প্রচলন করাকে সমর্থন করেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী জনগণের প্রতিনিধিরা নির্বাচকমণ্ডলীর আস্থা হারালে তাঁদের কার্যকাল অতিবাহিত হওয়ার আগে পুনরায় নির্বাচনে অবতীর্ণ হতে হয়।

৪। কর প্রদান করা (To pay taxes)—বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের কর্মপরিধি বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের ব্যয়ও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী ব্যয়ের অধিকাংশ অর্থই নাগরিকদের ওপর কর ধার্য করে আদায় করা হয়। রাষ্ট্র বাধ্যতামূলকভাবে নাগরিকদের ওপর কর ধার্য করে। নাগরিকদের কর্তব্য হল সৎ ভাবে সময়মত কর প্রদান করা। নাগরিকরা কর ফাঁকি দিলে জাতীয় অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে। তার ফলে সরকারের পক্ষেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা ও জনকল্যাণকর কার্যাদি যথাযথ ভাবে সম্পাদন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

১২। অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (Correlation of Rights and Duties)

কোনও ব্যক্তিই একাকী বাস করতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁর জীবনের বহুবিধ প্রয়োজন মেটাবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই মেনে নেন সংঘবদ্ধ জীবন। সমাজে একত্রে বাস করার ফলেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদান হল সমাজবদ্ধ জীবনের প্রধান সুবিধা। ব্যক্তির সমাজ চেতনা থেকেই অধিকার ও কর্তব্য উভয়ের উদ্ভব হয়। সমাজজীবনের সীমানার বাইরে দাঁড়িয়ে ব্যক্তির পক্ষে অধিকার ভোগ করা অসম্ভব। আবার সমাজে বসবাস করতে হলে ব্যক্তিকে কতকগুলি কর্তব্যও সম্পাদন করতে হয়। সুতরাং কর্তব্যগুলি হল অধিকারসমূহের ভিত্তি। অধিকার কর্তব্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও কর্তব্যের ওপর নির্ভরশীল।

অনেকসময় ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে কর্তব্যগুলি অবহেলা করে অধিকার সমূহের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবে অধিকার প্রদানের সঙ্গে কতকগুলি কর্তব্য সম্পাদন জড়িত থাকে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ব্যক্তির কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য অধিকারগুলি প্রদান করা হয়। ব্যক্তির কর্তব্য হল এই অধিকারগুলিকে এরূপভাবে প্রয়োগ করা যাতে সামগ্রিকভাবে জনকল্যাণ ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তির অধিকারগুলি সমাজনিরপেক্ষ নয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। নাগরিকদের কর্তব্য হল সৎভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা। এইভাবে প্রতিটি অধিকারের সঙ্গে কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব জড়িয়ে থাকে। এই কারণেই বলা হয় যে অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। অধিকারের মধ্যেই নিহিত থাকে কর্তব্য।

অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রথমত, প্রতিটি অধিকারের সাথে একটি অনুরূপ কর্তব্য জড়িত থাকে। সামাজিক পরস্পর নির্ভরশীলতার একটি শর্ত হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হল অন্য ব্যক্তিদের অধিকারের প্রতি সচেতন থাকা। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার থাকে। সুতরাং অন্য ব্যক্তিদের কর্তব্য হল তার এই অধিকারে বাধা প্রদান না করা। কোনও ব্যক্তির পক্ষ থেকে যে কাজ সম্পাদন করাকে অধিকার বলে গণ্য করা হয় অন্য ব্যক্তির পক্ষ থেকে ঐ ব্যক্তিকে ঐ কাজ বিনা বাধায় সম্পাদন করতে দেওয়াকে কর্তব্য বলে গণ্য করা হয়। সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিরা

পরস্পরের অধিকারগুলির প্রতি যথোপযুক্ত মর্যাদা দান না করলে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে।

দ্বিতীয়ত, প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য হল অধিকারগুলি এরূপভাবে প্রয়োগ করা যাতে সমাজের সমৃদ্ধি সাধিত হয়। অধিকারগুলি কেবলমাত্র ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপায় নয়। অধিকারগুলিকে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করার ফলে সামাজিক মঙ্গলও সাধন করা যেতে পারে। কোনও ব্যক্তি যদি তাঁর অধিকারগুলি অপব্যবহার করেন অর্থাৎ তিনি যদি এরূপভাবে কাজ করেন যার ফলে সামাজিক কল্যাণ ব্যাহত হয় তাহলে তাঁকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে।

তৃতীয়ত, যেহেতু রাষ্ট্র স্বীকৃতি প্রদান না করলে নাগরিকরা অধিকারগুলি ভোগ করতে পারেন না অতএব নাগরিকদের কর্তব্য হল রাষ্ট্রের প্রতি কতকগুলি কর্তব্য সম্পাদন করা। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও তার সঙ্গে সামগ্রিকভাবে সামাজিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে রাষ্ট্র নাগরিকদের অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি প্রদান করে ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। অতএব নাগরিকদের প্রয়োজনীয় কর্তব্য হল সাধারণ সময়ে এবং সংকটময় মুহূর্তে সর্বদা রাষ্ট্রকে যথাযথ ভাবে সহায়তা করা।

অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে অধিকার ও কর্তব্য একই আদর্শের দুটি দিক এবং অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত থাকে (Rights imply duties)।

গ· ভারতে মৌলিক অধিকার সমূহ

১৩। ভারতের সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারসমূহ (Fundamental Rights mentioned in the Constitution of India)

ভারতের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে নাগরিকের মৌলিক অধিকারসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৫০ সনে যখন ভারতের সংবিধান প্রবর্তন করা হয় তখন তাতে সাতটি মৌলিক অধিকার উল্লেখ করা হয়েছিল। সংবিধান (৪৪তম সংশোধন) আইন, ১৯৭৮ দ্বারা সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকাররূপে বাতিল করার ফলে এখন সংবিধানে ছয়টি মৌলিক অধিকার দেখা যায়। এই ছয়টি অধিকার হল—(১) সাম্যের অধিকার বা সমতাধিকার, (২) স্বাধীনতার অধিকার, (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, (৫) সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার এবং (৬) সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার।

১৪। কেন এই অধিকারগুলিকে 'মৌলিক' বলা হয়? (Why are these rights called 'fundamental'?)

ভারতের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত এই অধিকারগুলি ব্যতীত সংবিধানের অন্যান্য অংশেও নাগরিকদের অধিকারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগে উল্লেখিত এই ছটি অধিকারকে 'মৌলিক' আখ্যা দেওয়ার কারণ হল এই যে এই অধিকারগুলিকে সংবিধান অনুযায়ী বিশেষ মর্যাদা বা তাৎপর্য প্রদান করা হয়েছে।

মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধান কর্তৃক বিশেষভাবে স্বীকৃত এবং এইগুলিকে সাংবিধানিক উপায়ে রক্ষা করা হয়। এই অধিকারগুলিকে 'মৌলিক' বলার কারণ হল সাধারণ অধিকার সমূহ আইনসভার দ্বারা সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা গেলেও মৌলিক অধিকারগুলিকে সংবিধানের ৩৬৮ ধারায় বর্ণিত সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি ব্যতীত সংশোধন বা বাতিল করা যায় না। যে রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হক না কেন কেউই ইচ্ছামত মৌলিক অধিকারগুলি পরিবর্তন করতে পারে না। মৌলিক অধিকারগুলিকে যথেচ্ছ ভাবে স্থগিত (Suspend) রাখাও সম্ভব নয়। একমাত্র জরুরী অবস্থার ঘোষণা চলাকালে সংবিধানে উল্লেখিত উপায়ে এই অধিকারগুলি স্থগিত রাখা যায়। মৌলিক অধিকারগুলি দেশের মৌলিক আইন অর্থাৎ সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত বলে সরকারের কোন বিভাগই—আইনসভা, শাসন বিভাগ বা বিচার বিভাগ—এই অধিকারগুলিকে লঙ্ঘন করতে পারে না। মৌলিক অধিকারগুলির পরিপন্থী কোনও আইন বা

কার্যকলাপকে সর্বদা বাতিল বলে গণ্য করা হয়। সংবিধানের ১৩ ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র এরূপ কোনও আইন প্রণয়ন করবে না যার ফলে তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি কোনও ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। ১৩ ধারা লঙ্ঘন করে কোনও আইন প্রণয়ন করা হলে ঐ আইনকে বাতিল বলে গণ্য করা হবে। সুতরাং ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শুরু করে গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যন্ত সমস্ত সরকারী কর্তৃপক্ষের বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত সাংবিধানিক বিধির দ্বারা সীমাবদ্ধ।

মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানে স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত বলে এইগুলি লঙ্ঘন করা হলে যেকোনও নাগরিক সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্টের মাধ্যমে সাংবিধানিক উপায়ে এ বিষয়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে পারেন। এছাড়া মৌলিক অধিকারগুলি স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা আছে বলে জনগণও সর্বদা এই অধিকারগুলি সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন থাকেন।

১৫। সাম্যের অধিকার (Right to Equality)

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুযায়ী নাগরিকদের মধ্যে 'পদমর্যাদা ও সুযোগের সাম্য' প্রতিষ্ঠা করা হল সংবিধানের একটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সাম্যের অধিকারকে বর্ণনা করা হয়েছে।

'সাম্য' শব্দটি এখানে অভেদ বা অভিন্ন (Identity) অর্থে ব্যবহার করা হয় নি। সাম্য বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যে জাতি, ধনদৌলত বা প্রভাব নির্বিশেষে রাষ্ট্র সমস্ত ব্যক্তিদের সমান সুযোগসুবিধা প্রদান করবে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ব্যক্তিদের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না।

সাম্যের অধিকারের মধ্যে প্রথমে আইনগত সাম্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৪ ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র ভারতীয় ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইন সমক্ষে সমতা (Equality before the law) অথবা আইনদ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়া (Equal protection of laws) অস্বীকার করবে না। আইন সমক্ষে সমতার নীতিটি ব্রিটেনের সাংবিধানিক আইন থেকে গৃহীত। আইনদ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়ার নীতিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রথম নীতিটির অর্থ হল এই যে রাষ্ট্রে বসবাসকারী সমস্ত ব্যক্তিরা একই আইনের অধীনস্থ এবং একই আদালতে সমস্ত ব্যক্তিদের বিচার করা হয়। বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য কোনও পৃথক আইন বা স্বতন্ত্র আদালত নেই। তবে এই নীতিটির কতকগুলি ব্যতিক্রম দেখা যায়। প্রথমত, ভারতের রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালগণ যতদিন তাঁদের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন ততদিন তাঁদের সাধারণ আদালত সমূহের নিকট উপস্থিত করা যায় না। দ্বিতীয়ত, ভারতে অবস্থিত বিদেশী দূতাবাসসমূহে যে সব রাষ্ট্রদূতগণ বসবাস করেন তাঁরাও ভারতে প্রচলিত সাধারণ আইনের এক্তিয়ারভুক্ত নন। আইনদ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়ার নীতিটির অর্থ হল এই যে রাষ্ট্র সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে একই ধরনের আইন প্রয়োগ করবে। অবশ্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণে ব্যক্তিদের শ্রেণী বিভাগ করার পর বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের ওপর বিভিন্ন আইন প্রয়োগ করতে পারে। রাষ্ট্র ব্যক্তিদের আয়, উপজীবিকা, বাসস্থান ইত্যাদি কারণে শ্রেণীবিভাগ করতে পারে। আয়কর বা উপজীবিকা কর ধার্যের সময় দেখা যায় যে রাষ্ট্র সব ব্যক্তিদের ওপর সমান হারে কর ধার্য করে না। ব্যক্তিদের আয় অনুসারে তাদের শ্রেণীবিভাগ করার পর বিভিন্ন আয় গোষ্ঠীর (Income group) ব্যক্তিদের নিকট থেকে বিভিন্ন হারে কর ধার্য করে। এই ব্যবস্থার পিছনে যে চিন্তা কাজ করছে তা এইরকম : কোনও সমাজেই নিরঙ্কুশ অর্থে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবও নয় আবার কাম্যও নয়। সুতরাং রাষ্ট্র কোনও নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে আইন প্রণয়ন করে ব্যক্তিদের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত কারণে বৈষম্য করতে পারে।

১৫ ধারা অনুসারে রাষ্ট্র ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, স্ত্রীপুরুষ বা জন্মস্থান হেতু নাগরিকদের মধ্যে বিভেদ

করবে না। কোনও দোকান, সর্বজনীন ভোজনালয়, হোটেল ও সর্বজনীন প্রমোদস্থলে প্রবেশের ক্ষেত্রে অথবা রাষ্ট্রনিধি (State fund) হতে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে পোষিত বা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত কোন কূপ, পুষ্করিণী, স্নানঘাট, সড়ক ও সর্বজনীন সমাগমস্থল ব্যবহারের ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, স্ত্রীপুরুষ বা জন্মস্থান এইসব কারণে বৈষম্য করা যাবে না। তবে ব্যতিক্রম হিসাবে বলা যায় যে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে নারী ও শিশুদের জন্য এবং সামাজিক অবস্থা ও শিক্ষাগত বিচারে অনগ্রসর নাগরিকদের উন্নতি সাধনের জন্য বা তপসিলী জাতি ও তপসিলী উপজাতিসমূহের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে পারে।

১৬ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, স্ত্রীপুরুষ, উদ্ভব, জন্মস্থান বা বাসস্থান নির্বিশেষে সব নাগরিকদের সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে সমান সুযোগসুবিধা প্রদান করা হবে। তবে তিনটি ক্ষেত্রে এই নীতিটির ব্যতিক্রম হতে পারে। প্রথমত, পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে কোনও রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অধীনে কোন সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে ঐ অঞ্চলে বসবাসকে একটি আবশ্যিক শর্ত বলে স্থির করে দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র প্রয়োজন হলে সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য পদ সংরক্ষণ করতে পারে। তৃতীয়ত, কোন ধর্মীয় বা ধর্মসম্প্রদায়মূলক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সম্পর্কিত পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে অথবা এইরূপ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার কাজে যুক্ত সদস্যকে কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বী বা ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত হতে হবে এরূপ বিধি প্রণয়ন করা যেতে পারে।

১৭ ধারায় বলা হয়েছে যে 'অস্পৃশ্যতা' বিলোপ করা হল এবং যে কোনও প্রকারে তার প্রয়োগ নিষিদ্ধ। অস্পৃশ্যতার কারণে অযোগ্যতা বলবৎ করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এই ধারাতে মহাত্মা গান্ধী প্রচারিত একটি আদর্শকে রূপায়ণের চেষ্টা করা হয়েছে। কোন্ কোন্ অপরাধকে অস্পৃশ্যতামূলক অপরাধ বলে গণ্য করা হবে এবং এই সব অপরাধের জন্য কি ধরনের শাস্তি প্রদান করা হবে এ সম্পর্কে পার্লামেন্ট ১৯৫৫ সনে Untouchability Offences Act প্রণয়ন করে। ১৯৭৬ সনে এই আইনটি সংশোধন করে নাম পরিবর্তন করার ফলে এখন তা Protection of Civil Rights Act, 1955 নামে পরিচিত।

১৮ ধারায় বলা হয়েছে যে সামরিক ও বিদ্যাবিষয়ক যোগ্যতা ব্যতীত অন্য কোনও কারণে রাষ্ট্র কোনও উপাধি প্রদান করবে না। কোনও ভারতীয় নাগরিক বিদেশী রাষ্ট্র থেকে কোনও উপাধি গ্রহণ করবে না। তবে ১৯৫৪ সন থেকে ভারত সরকার নাগরিকদের ভারতরত্ন, পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রী এই চার ধরনের সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করতে শুরু করেন। সমালোচকরা বলেন যে এরূপ উপাধি প্রদান করা সংবিধানের উপাধি বিলোপন সংক্রান্ত ধারাটির পরিপন্থী। এর ফলে ব্যক্তিদের মধ্যে একটি কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তবে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়ে থাকে যে এই সব উপাধিগুলি নাগরিকরা কোনও সময়ে তাঁদের নামের সঙ্গে ব্যবহার করবেন না। এগুলি উপাধি নয়, এগুলি তাঁদের কাজের উৎকর্ষের স্বীকৃতিমাত্র। কেন্দ্রে জনতা দল সরকার গঠন করে এরূপ উপাধি প্রদান করা বন্ধ করে দেন। কংগ্রেস(ই) দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর এই ধরনের উপাধি প্রদান করা পুনঃপ্রচলিত হয়েছে।

ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত সাম্যের অধিকারটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই অধিকারের বিভিন্ন অংশে আইনগত, পৌর, সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হলেও কোথাও অর্থনৈতিক সাম্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় নি। অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে অর্থনৈতিক সাম্য ব্যতীত সাম্যের অধিকার কখনও সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। তবে সাম্যের অধিকারের মধ্যে কোথাও অর্থনৈতিক সাম্যের বিষয় উল্লেখ করা না হলেও রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মধ্যে অনেক স্থানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬। স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom)

স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে প্রথমে নাগরিকদের ছয়দফা স্বাধীনতার অধিকারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অতঃপর ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংবিধানের ১৯(১) ধারা অনুযায়ী সকল নাগরিকরা (ক) বাক্ ও মতামত প্রকাশ বা অভিব্যক্তির স্বাধীনতা, (খ) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র হয়ে সমবেত হওয়ার, (গ) সংঘ বা সমিতি গঠন করবার, (ঘ) ভারতের ভূখণ্ডে সর্বত্র স্বাধীনভাবে গমনাগমন করবার, (ঙ) ভারতের ভূখণ্ডে যে কোনও ভাগে বসবাস করবার ও স্থায়ীভাবে নিবাসী হওয়ার এবং (চ) যে কোনও বৃত্তি অবলম্বন করবার অথবা যে কোনও উপজীবিকা, ব্যবসায় বা কারবার চালাবার অধিকার ভোগ করবেন। তবে এই ছয়টি স্বাধীনতার কোনটিই অবাধ বা শর্তশূন্য নয়। রাষ্ট্র প্রয়োজন হলে আইন প্রণয়ন করে উল্লেখিত যে কোনও অধিকারের ওপর যুক্তিসঙ্গত কারণে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে।

বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের ওপর যে সকল কারণে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যেতে পারে সেগুলি হল—ভারতের সার্বভৌমিকতা ও অখণ্ডতা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক বজায় রাখা, জনশৃঙ্খলা, সুরুচি বা নৈতিকতা, আদালত অবমাননা, মানহানি ও কোন অপরাধমূলক কাজে প্ররোচনা।

ভারতের সংবিধানে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা (Freedom of Press) সম্পর্কে পৃথকভাবে কোন কিছু উল্লেখ করা নেই। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত।

সমবেত হওয়ার স্বাধীনতার সঙ্গেই উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে যে এরূপ সমাবেশ শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র হওয়া আবশ্যক। তবে সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে একটি ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, কৃপাণ ধারণ ও বহন করা শিখ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হবে। ভারতের সার্বভৌমিকতা, ও অখণ্ডতা এবং জনশৃঙ্খলার স্বার্থে এই অধিকারটির ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা যেতে পারে।

সংঘ বা সমিতি গঠনের স্বাধীনতার ওপর ভারতের সার্বভৌমিকতা ও অখণ্ডতা, জনশৃঙ্খলা বা নৈতিকতার কারণে বাধানিষেধ আরোপ করা যেতে পারে।

ভারতের ভূখণ্ডের সর্বত্র গমনাগমন ও যে কোনও স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপনের স্বাধীনতাকে জনসাধারণের বা তপসিলী উপজাতিদের স্বাথরসংরক্ষণের জন্য সঙ্কোচন করা যেতে পারে। ভারতে বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাতে প্রাদেশিকতা ও সংকীর্ণতার মনোভাব গড়ে না ওঠে সেইজন্য এই অধিকারটি ঘোষণা করা হয়েছে।

যে কোনও পেশা, উপজীবিকা বা ব্যবসায় গ্রহণের স্বাধীনতাটি জনসাধারণের স্বার্থে সঙ্কোচন করা যেতে পারে। এছাড়া রাষ্ট্র আইনপ্রণয়ন করে কোনও পেশা,উপজীবিকা বা ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় বৃত্তি বিষয়ক বা প্রায়োগিক যোগ্যতা স্থির করে দিতে পারে। আবার নাগরিকদের সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র স্বয়ং বা রাষ্ট্রের নিজস্ব বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোনও সংস্থা, কোনও ব্যবসা, কারবার, শিল্প বা সেবাব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারে।

১৯ ধারায় বর্ণিত ছয়দফা স্বাধীনতা ও তাদের ব্যতিক্রমগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই অধিকারটির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক কল্যাণের সমন্বয় সাধন করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। রাষ্ট্র সামাজিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে সংবিধানে উল্লেখিত বিভিন্ন কারণে আইন প্রণয়ন করে যুক্তিসঙ্গত ভাবে এই অধিকারগুলিকে সঙ্কোচন করতে পারে।

স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকদের ছয়প্রকার স্বাধীনতার অধিকারের পর ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০ ধারায় কোন ব্যক্তিকে যথেচ্ছ ও অতিরিক্ত শাস্তিপ্রদানের হাত থেকে রক্ষা করার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। যে কাজ করার জন্য

অপরাধ হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয় সেই কাজ করার সময় প্রচলিত কোনও আইনের লঙ্ঘন ব্যতীত কোনও ব্যক্তিকে অন্য কোনও অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। কোনও ব্যক্তিকে অপরাধ করার সময় প্রচলিত আইনে যে পরিমাণ শাস্তি প্রদান করা যেত তার থেকে গুরুতর শাস্তি দেওয়া যাবে না। ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে, কোনও ব্যক্তি কোনও অপরাধমূলক কাজ করার পর বিচার চলাকালে যদি ঐ সম্পর্কে আইন পরিবর্তিত হয় বা দণ্ডের পরিমাণ গুরুতর হয় তবে নতুন আইন বা গুরুতর পরিমাণ দণ্ড তার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে না। কোনও ব্যক্তিকে একই অপরাধের জন্য একাধিকবার অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যায় না। তবে একই অন্যায়ের জন্য কোনও ব্যক্তিকে আদালত একবার শাস্তি প্রদান করার সঙ্গে আদালত ছাড়া অন্য কোনও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুনরায় শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। আদালত কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে একই অপরাধের জন্য একাধিকবার শাস্তি দেওয়া যায় না। কোনও অপরাধে অভিযুক্ত কোনও ব্যক্তিকে তাঁর নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী হতে বাধ্য করা যায় না। অতএব ২০ ধারার বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনও ব্যক্তিকে দণ্ডপ্রদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরিবর্তে আইনকে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২১ ধারায় বলা হয়েছে যে আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়া ব্যতীত কোনও ব্যক্তিকে তার জীবন বা ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হবে না। সুতরাং রাষ্ট্র যথেচ্ছ বা বে-আইনীভাবে কোনও ব্যক্তির জীবনে ক্ষতি করতে পারে না বা ব্যক্তি স্বাধীনতা লঙ্ঘন করতে পারে না। একমাত্র বিধিসম্মত পদ্ধতিতে প্রণীত কোনও আইনের অনুমোদন ব্যতীত রাষ্ট্র বা তার কোন সংস্থা কোনও ব্যক্তিকে তাঁর জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। ১৯৫০ সনে গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় সুপ্রীম কোর্টের পক্ষ থেকে বলা হয় যে কোনও আইনসভা যদি যথাবিহিত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রণীত আইনের মাধ্যমে ব্যক্তিকে জীবন বা ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে তাহলে ঐ আইনটিকে আদালত অযৌক্তিক বলে বাতিল করতে পারে না। সুতরাং যথাযথভাবে আইন প্রণয়ন করে কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাধীনতা লঙ্ঘন করা হলে ঐ ব্যক্তির দিক থেকে কোনও প্রতিকারের সুযোগ থাকে না। তবে ১৯৭৮ সনে মানেকা গান্ধী বনাম ভারত রাষ্ট্র মামলায় ২১ ধারা ব্যাখ্যা করে সুপ্রীম কোর্টের পক্ষ থেকে যে রায় প্রদান করা হয়েছে তা গোপালনের মামলার রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই মামলায় বলা হয় যে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন করে কোনও ব্যক্তির ব্যক্তি স্বাধীনতা লঙ্ঘন করার ক্ষমতা থাকলেও এরূপ আইন কখনও যথেচ্ছ বা অযৌক্তিক হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। এরূপ আইন ন্যায়বোধ নীতির পরিপন্থী কিনা তা আদালত বিচার করতে পারে।

২২ ধারা অনুযায়ী কোনও ব্যক্তিকে যথেচ্ছভাবে গ্রেপ্তার ও আটক রাখা যায় না। কোনও ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও আটক করার পর যে সব সুযোগসুবিধা প্রদান করা হয় তা হল—(ক) ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও আটক করার পর যথাসম্ভব শীঘ্র তাকে গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হয়। (খ) আটক ব্যক্তিকে তাঁর মনোনীত আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করার ও তাঁর দ্বারা সমর্থিত হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। (গ) আটক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার ২৪ ঘণ্টা সময় সীমার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করতে হয়।

এই সকল সুযোগসুবিধাগুলি বিদেশী শত্রু ও নিবর্তনমূলক আটক আইনে আটক রাখা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় না। কোনও ব্যক্তি কোনও অন্যায় আচরণ করতে পারেন এরূপ সন্দেহে যদি তাঁকে আটক রাখা হয় তবে ঐ ধরনের আটক রাখাকে নিবর্তনমূলক আটক বলা হয়। প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও ভারতের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পার্লামেন্ট এবং কোনও রাজ্যের নিরাপত্তা ও সমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক সরবরাহ ও সেবামূলক ব্যবস্থা রক্ষা করার জন্য পার্লামেন্ট ও রাজ্য

আইনসভাসমূহ নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রণয়ন করতে পারে। নিবর্তনমূলক আটক আইন অনুসারে কোনও ব্যক্তিকে ৩ মাস পর্যন্ত বিনা বিচারে আটক রাখা যেতে পারে।

অনেক সমালোচক মনে করেন যে নিবর্তনমূলক আটক আইনের ব্যবস্থা ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী। ভারতে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার সমূহ এরূপ আইন প্রণয়ন করে ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করতে পারে। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে সরকার যদি যথেচ্ছভাবে এরূপ আইন প্রণয়ন করে ব্যক্তি স্বাধীনতা লঙ্ঘন করার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে বিচার বিভাগ এরূপ আইনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে। এছাড়া জনস্বার্থের বিরুদ্ধে এরূপ আইন প্রণয়ন করা হলে পরবর্তী নির্বাচনের সময় ক্ষমতাসীন সরকার জনগণের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হবেন।

১৭। শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation)

ভারতের সংবিধানে কেবলমাত্র ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধকরণ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করাই হয় নি, সমাজের অসহায় ব্যক্তিরা যাতে দুর্জন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের দ্বারা শোষিত ও নিপীড়িত না হয় তার জন্য সংবিধানের ২৩ ও ২৪ ধারায় যথাযথ ব্যবস্থা উল্লেখিত হয়েছে।

মানুষ ক্রয়বিক্রয়, বেগার খাটান ও ঐরূপ অন্য কোনও প্রকারে বলপূর্বক শ্রম আদায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এই ব্যবস্থার কোনও প্রকার লঙ্ঘন আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

তবে রাষ্ট্র প্রয়োজন হলে সার্বজনিক উদ্দেশ্যে ধর্ম, প্রজাতি, জাতি বা শ্রেণী নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিদের বাধ্যতামূলক কাজে লাগাতে পারে। চোদ্দ বছরের কম বয়সের কোনও শিশুকে কোনও কারখানা বা খনিতে নিয়োগ করা যাবে না বা অন্য কোনও বিপদসঙ্কুল কাজের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না।

১৮। ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to freedom of religion)

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র রূপে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কোনও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে কোনও একটি বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হয় না ; ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্র একটি পক্ষপাতশূন্য ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। এরূপ রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে বসবাসকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ধর্মীয় কারণে কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় না। সমস্ত ব্যক্তিদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সাম্য প্রদান করা হয়।

ভারতীয় সংবিধানের ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ ধারায় প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটির মধ্য দিয়ে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হয়েছে।

ভারতে বসবাসকারী সকল ব্যক্তিদের বিবেকের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে ধর্ম স্বীকার, আচরণ ও প্রচার করার অধিকার সমভাবে থাকবে। তবে জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা, জনস্বাস্থ্য এইসব কারণে রাষ্ট্র এই অধিকারটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এছাড়া রাষ্ট্র আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ধর্মাচরণের সাথে জড়িত কোনও অর্থনৈতিক, অর্থসংক্রান্ত, রাজনৈতিক বা অন্যপ্রকার ধর্মনিরপেক্ষ কর্মপ্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রণ বা সঙ্কোচন করতে পারে।

জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও জনস্বাস্থ্য এই তিনটি বিষয়ের ওপর লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের (ক) ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করার, (খ) ধর্মীয় ব্যাপারে নিজ কার্যাবলী পরিচালনা করার, (গ) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ ও অর্জন করার এবং (ঘ) আইন অনুসারে ঐরূপ সম্পত্তি পরিচালনা করার অধিকার থাকবে

কোনও বিশেষ ধর্ম বা ধর্মসম্প্রদায়ের উন্নতি বা পোষণের ব্যয় নির্বাহের জন্য ধার্য কোনও কর প্রদান করতে কোনও ব্যক্তিকে বাধ্য করা যাবে না।

সম্পূর্ণরূপে সরকারী অর্থে পরিচালিত কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা

যাবে না। রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রাপ্ত ও রাষ্ট্রের নিকট থেকে আর্থিক অনুদান প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা যেতে পারে বা ধর্মীয় উপাসনা অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে শিক্ষার্থীর নিজের বা সে নাবালক হলে তার অভিভাবকের সম্মতি ব্যতীত এরূপ ধর্মীয় শিক্ষা বা ধর্মীয় উপাসনায় তাকে যোগদান করতে বাধ্য করা যায় না।

১৯ সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার (Cultural and Educational Rights)

সংবিধানের ২৯ ও ৩০ ধারায় প্রদত্ত সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকারটির মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভারতের যে কোনও স্থানে বসবাসকারী নাগরিকদের নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাষা, লিপি বা কৃষ্টি থাকলে তাদের সেগুলি সংরক্ষণ করার অধিকার থাকবে।

সরকারী বা সরকারী অনুদান প্রাপ্ত কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার নাগরিকদের মধ্যে ধর্ম, প্রজাতি, জাতি বা ভাষার কারণে অস্বীকার করা যাবে না।

ধর্মগত ও ভাষাগত—সকল ধর্মসম্প্রদায় তাদের ইচ্ছামত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার অধিকার ভোগ করবে। কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অর্জনের জন্য আইন প্রণয়নের সময় রাষ্ট্র সুনিশ্চিত করবে যে ঐরূপ সম্পত্তি অর্জনের জন্য পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে অনুদান প্রদান কালে রাষ্ট্র কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মগত বা ভাষাগত, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত এই কারণে তার প্রতি কোনরূপ বৈষম্য দেখাবে না।

২০। সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার (Right to Constitutional Remedies)

কোনও লিখিত সংবিধানে কতকগুলি মৌলিক অধিকার উল্লেখ করাই যথেষ্ট নয়। এই অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হলে ঐ গুলিকে বলবৎ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা সংবিধানে উল্লেখ করা না থাকলে সাধারণ নাগরিকদের কাছে অধিকারগুলির কোনও মূল্য থাকে না। ব্রিটেনে নাগরিক অধিকারগুলি সুনির্দিষ্ট না হলেও প্রচলিত অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হলে আদালতসমূহ বিশেষাধিকার-লেখ (Prerogative Writs) জারি করে অধিকারগুলি সুরক্ষার প্রচেষ্টা করে। লেখগুলির (Writs) মাধ্যমে ক্ষমতার অধিক ব্যবহার বা অপব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সাধারণত, রাজা, রাষ্ট্র বা আদালতের নামে এই লেখগুলি জারি করা হয়। লেখগুলির মাধ্যমে কোনও ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারকে কোন কিছু করতে বা করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়।

ভারতের সংবিধানের ৩২ ধারা অনুযায়ী মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হলে ঐগুলি সাংবিধানিক উপায়ে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ভারতে সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকারকে একটি মৌলিক অধিকার রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য ভারতীয় ভূখণ্ডের যে কোন স্থানে বন্দি-প্রত্যক্ষীকরণ (Habeas corpus— হেবিয়াস কর্পাস), হুকুমনামা (Mandamus—ম্যানডেমাস), প্রতিষেধ (Prohibition—প্রহিবিশন), অধিকারপৃচ্ছা (Quo-warranto—ক্যুও ওয়ারান্টো) ও উৎপ্রেষণ (Certiorari—শার্শিওরারাই) এই প্রকৃতির যে কোনও যথাযোগ্য লেখ, আদেশ বা নির্দেশ জারি করতে পারে। গণপরিষদে (Constituent Assembly) বিতর্ক চলাকালে সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডঃ আম্বেদকর বলেছিলেন যে "আমাকে যদি সংবিধানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এমন একটি ধারার নাম করতে বলা হয়, যে ধারাটি ব্যতীত সংবিধান অর্থহীন হয়ে পড়বে, তাহলে আমি এই ধারাটি (অর্থাৎ ৩২ ধারা) ছাড়া অন্য কোনও ধারা উল্লেখ করব না।" তাঁর মতে এই ধারাটি সংবিধানের প্রাণস্বরূপ ও নাগরিকদের নিরাপত্তার শ্রেষ্ঠ

রক্ষাকবচ।

সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুসারে রাজ্যের উচ্চ আদালত সমূহও তাদের নিজ নিজ এলাকায় মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে বন্দি-প্রত্যক্ষীকরণ, হুকুমনামা, প্রতিষেধ, অধিকারপৃচ্ছা ও উৎপ্রেষণ এই প্রকৃতির যে কোনও যথাযোগ্য লেখ, নির্দেশ বা আদেশ জারি করতে পারে।

জরুরী অবস্থার ঘোষণা চলাকালে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ প্রদান করে ২০ ও ২১ ধারা ব্যতীত সংবিধানের তৃতীয় ভাগে উল্লেখিত অন্যান্য যে কোনও মৌলিক অধিকারকে বলবৎ করার জন্য আদালতের মাধ্যমে প্রতিকারের অধিকার স্থগিত রাখতে পারেন।

২১। মৌলিক অধিকার সমূহের বৈশিষ্ট্য (Features of the fundamental rights)

ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল এরূপ :

প্রথমত, মৌলিক অধিকারগুলি অনেকাংশেই অবাধ বা নিরঙ্কুশ নয়। রাষ্ট্র প্রয়োজন হলে এই অধিকারগুলির ওপর সংবিধান-নির্দিষ্ট শর্তানুযায়ী বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, মৌলিক অধিকারগুলি আদালতের দ্বারা বলবৎ যোগ্য। মৌলিক অধিকারগুলির ওপর বাধানিষেধ প্রয়োগ করা হলে ঐ বাধানিষেধগুলি সংবিধান-নির্দিষ্ট শর্তের অনুযায়ী কিনা তা আদালত বিচার করে দেখতে পারে। বস্তুত, মৌলিক অধিকারগুলি কোনও কারণে ক্ষুণ্ণ হলে যে কোনও ব্যক্তি ঐগুলি বলবৎ করার জন্য আদালতে উপস্থিত হতে পারে।

তৃতীয়ত, সংবিধানে প্রদত্ত কয়েকটি মৌলিক অধিকার, যেমন, বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধকরণ, সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে সমতা, ছয় দফা স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার কেবলমাত্র নাগরিকরা (citizens) উপভোগ করেন। আবার কয়েকটি মৌলিক অধিকার ভারতে বসবাসকারী যে কোন ব্যক্তি (Person) উপভোগ করেন। এইগুলির মধ্যে আইন সমক্ষে সমতা ও আইন দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়া, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, শোষনের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার উল্লেখযোগ্য।

চতুর্থত, মৌলিক অধিকারগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীর মৌলিক অধিকারগুলি নেতিবাচক বিধি প্রকৃতির। এই অধিকারগুলিতে রাষ্ট্রকে কোনও কিছু করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, সাম্যের অধিকারের প্রথম ধারাটিতে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইনের সমক্ষে সমতা বা আইন দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়া অস্বীকার করবে না। আবার সাম্যের অধিকারের শেষ ধারায় বলা হয়েছে যে সামরিক ও বিদ্যা বিষয়ক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক নয় এরূপ কোনও উপাধি রাষ্ট্র কর্তৃক অর্পিত হবে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর মৌলিক অধিকারগুলি ইতিবাচক বিধি প্রকৃতির যেগুলির মাধ্যমে ব্যক্তিদের কতকগুলি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার এবং সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকারের উল্লেখ করা যেতে পারে।

পঞ্চমত, মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ করে কোনও আইন প্রণয়ন করা হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধন করে মৌলিক অধিকারগুলি সংশোধন করতে পারে। পার্লামেন্টের প্রতিটি কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশের ভিত্তিতে এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে মৌলিক অধিকারগুলি সংশোধন করা যায়।

ষষ্ঠত, জরুরী অবস্থার ঘোষণা চলাকালে ১৯ ধারায় বর্ণিত ছয়দফা স্বাধীনতার অধিকার বন্ধ থাকে। এছাড়া জরুরী অবস্থার ঘোষণা প্রবর্তিত থাকাকালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশ প্রদান করে ২০ ও ২১ ধারায় বর্ণিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পর্কিত মৌলিক অধিকার ব্যতীত অন্য যে কোনও মৌলিক অধিকারের জন্য সাংবিধানিক প্রতিকার বন্ধ রাখা যেতে পারে।

পরিশেষে উল্লেখ্য যে সংবিধানের তৃতীয়ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে আইনগত, সামাজিক, পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের বিষয় উল্লেখ করা হলেও অর্থনৈতিক অধিকারের বিষয় উল্লেখ করা হয় নি। অনেকের মতে ব্যক্তির অধিকারের সার্থকতা নির্ভর করে তার অর্থনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতিতে এবং এই কারণে তাঁরা অভিযোগ করে থাকেন যে ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় ভাগটি অধিকারের এক অন্তঃসারশূন্য আনুষ্ঠানিক তালিকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

২২। মৌলিক অধিকারগুলির উপর সীমাবদ্ধতা (Limitations on Fundamental rights)

সংবিধানের তৃতীয়ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলির ওপর সাধারণ অবস্থায় এবং জরুরী অবস্থার ঘোষণা চলাকালে বিভিন্ন ধরনের বাধানিষেধ, সীমাবদ্ধতা, ব্যতিক্রম, সংকোচন ইত্যাদি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই কারণে গণ পরিষদে একজন সমালোচক পরিহাস করে বলেছিলেন যে সংবিধানের তৃতীয় ভাগটি 'মৌলিক অধিকারের ওপর সীমাবদ্ধতা' বা 'মৌলিক অধিকার ও তার ওপর সীমাবদ্ধতা' এরূপ নামকরণ করা উচিত। মৌলিক অধিকারগুলির ওপর সীমাবদ্ধতাগুলিকে সাধারণ ও নির্দিষ্ট এই দুইভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত, প্রায় প্রতিটি মৌলিক অধিকারের ওপর কতকগুলি ব্যতিক্রম, সংকোচন ইত্যাদি প্রয়োগ করার বিষয় সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ১৯ ধারায় নাগরিকদের ছয়দফা স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই সব অধিকারগুলির মধ্যে কোনটিই অবাধ নয়, রাষ্ট্র প্রতিটি স্বাধীনতার ওপর যুক্তিসঙ্গত কারণে সঙ্কোচন আরোপ করতে পারে। ২৫ ধারা অনুসারে ভারতে বসবাসকারী সমস্ত ব্যক্তিদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এই অধিকারটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও জনস্বাস্থ্য এই বিষয়গুলির ওপর লক্ষ্য রাখতে হয়। মৌলিক অধিকারগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রায় প্রতিটি অধিকারের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সামাজিক কল্যাণের সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা হয়েছে এবং এইভাবে খোলা রাখা হয়েছে নিয়ন্ত্রণের রাস্তা।

দ্বিতীয়ত, সংবিধানের তৃতীয়ভাগে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে আইনগত, পৌর, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সমূহের উল্লেখ করা হলেও অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। কর্মের অধিকার, সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির অধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলি রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির অংশে ঘোষণা করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হলে সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্টগুলিকে তাদের বলবৎ করার জন্য লেখ, আদেশ বা নির্দেশ জারি করার ক্ষমতা প্রদান করা হলেও বাস্তবে দেখা যায় যে ভারতে বসবাসকারী সাধারণ ব্যক্তিরা সহজে এই সুবিধাগুলি উপভোগ করতে পারে না। এর কারণ হল ভারতের বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়বহুল, জটিল ও সময় সাপেক্ষ।

মৌলিক অধিকারগুলির ওপর সাধারণ সময়ে ও জরুরী অবস্থার ঘোষণা চলাকালে কতকগুলি নির্দিষ্ট বাধানিষেধ আরোপ করার বিষয় সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত ৩১ক ও ৩১গ ধারা অনুযায়ী যথাক্রমে ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত ও চতুর্থভাগে বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিসমূহ রূপায়ণ সংক্রান্ত কোনও আইনের দ্বারা যদি ১৪ ধারা (আইনগত সাম্য) বা ১৯ ধারায় (ছয়দফা স্বাধীনতা) বর্ণিত মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় তাহলে আদালত ঐ আইনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে না। ৩১খ ধারা অনুসারে সংবিধানের ৯ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোনও আইনকে মৌলিক অধিকার বিরোধী বলে বাতিল করা যাবে না। সুতরাং কয়েকটি ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের ওপর আইনকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে সৈন্যবাহিনীদের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার প্রয়োগের

সময় তাদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কোনও অধিকার সঙ্কুচিত করতে পারে বা স্থগিত রাখতে পারে।

তৃতীয়ত, ভারতের ভূখণ্ডের কোনও অংশে সামরিক আইন বলবৎ থাকাকালে শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য মৌলিক অধিকারগুলিকে সঙ্কুচিত করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থার ঘোষণা জারী করা হলে মৌলিক অধিকারগুলির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি দেখা যায় :

প্রথমত, যুদ্ধ বা বহিঃশত্রুর আক্রমণের দ্বারা বিপন্ন হওয়ার ফলে জরুরী অবস্থার ঘোষণা জারি করা হলে ১৯ ধারায় বর্ণিত স্বাধীনতাগুলি বন্ধ থাকে। যতদিন এই জরুরী অবস্থার ঘোষণা বলবৎ থাকে ততদিন নাগরিকগণ স্বাধীনতার অধিকারসমূহ উপভোগ করতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত, জরুরী অবস্থার ঘোষণা চলা কালে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ প্রদান করে ২০ ও ২১ ধারায় বর্ণিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পর্কিত মৌলিক অধিকার ব্যতীত অন্য যে কোনও মৌলিক অধিকারের জন্য আদালতের মাধ্যমে সাংবিধানিক প্রতিকার বন্ধ রাখতে পারেন।

২৩। সংবিধানের অন্যান্য অংশে প্রদত্ত অধিকার সমূহ (Rights guaranteed by other provisions of the Constitution)

ভারতের সংবিধানের তৃতীয়ভাগে বর্ণিত ছয়টি মৌলিক অধিকার ব্যতীত সংবিধানের অন্যান্য অনেক অংশেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যক্তির অধিকারের উল্লেখ দেখা যায়।

সংবিধান (৪৪তম সংশোধন) আইন, ১৯৭৮ দ্বারা সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অংশ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই সংশোধন আইনে সংবিধানের দ্বাদশ ভাগে (অর্থ, সম্পত্তি, চুক্তি ও মোকদ্দমা) ৩০০ক ধারায় সম্পত্তির অধিকার (Right to Property) সংযোজন করা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে আইনের অনুমোদন ব্যতীত কোনও ব্যক্তিকে তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। সুতরাং সম্পত্তির অধিকার বর্তমানে একটি সাংবিধানিক অধিকার, মৌলিক অধিকার নয়। রাষ্ট্র কোনও ব্যক্তির নিকট থেকে আইনে উল্লেখিত পরিমাণের অধিক পরিমাণ সম্পত্তি গ্রহণ করলে ঐ ব্যক্তি ৩২ ধারা অনুসারে সুপ্রীম কোর্টের কাছ থেকে প্রতিকার পাবেন না। তাঁকে সাধারণ মামলার মারফৎ প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

সংবিধানের 'নির্বাচন' অংশে (৩২৫ ও ৩২৬ ধারায়) ভারতীয় নাগরিকদের ভোটাধিকার (Right to Vote) সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংবিধানের ২৬৫ ধারায় বলা হয়েছে যে আইনের অনুমোদন ছাড়া কোনও কর ধার্য বা সংগ্রহ করা যাবে না। ৩০১ ধারায় বলা আছে যে ভারতের ভূ-খণ্ডের সর্বত্র ব্যবসা, বাণিজ্য ও যোগাযোগ অবাধ হবে। প্রথমটির দ্বারা কোনও ব্যক্তিকে যথেচ্ছভাবে ধার্য কর প্রদান না করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টির দ্বারা ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে ব্যবসা, বাণিজ্য ও যোগাযোগের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এই দুটিও সাংবিধানিক অধিকার।

এইসব সাংবিধানিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হলে নাগরিকরা সুপ্রীম কোর্টের মারফৎ প্রতিকারের সুযোগ পান না। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে তাঁরা ২২৬ ধারা অনুসারে হাইকোর্টে আবেদন করতে পারেন অথবা সাধারণ মামলার মারফৎ প্রতিকারের চেষ্টা করতে পারেন।

সংবিধানের রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির অংশে 'কর্ম ও শিক্ষার অধিকার এবং বেকার অবস্থায়, বার্ধক্যে, অসুস্থতায়, কর্মক্ষমতানাশে ও অনিচ্ছকৃত অভাবের অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির অধিকার' (৪১ ধারা) (Right to work, education, public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, disablement and in other cases of

undeserved wants) ও নাগরিকদের পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জনের অধিকার (৩৯ক ধারা) (right to an adequate means of livelihood) সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই অধিকারগুলি নির্দেশমূলক নীতির অন্তর্গত বলে এগুলি কখনও কোন আদালতের দ্বারা বলবৎ করা যাবে না।

ঘ· ভারতে মৌলিক কর্তব্যসমূহ

২৪। ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যসমূহ (Fundamental Duties of the Indian Citizens)

সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্রের সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহের সঙ্গে মৌলিক কর্তব্যসমূহও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ১৯৫০ সনে যখন ভারতের সংবিধান প্রবর্তন করা হয় তখন তাতে কেবলমাত্র মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কে কোনও কিছু উল্লেখ করা হয় নি।

১৯৭৬ সনে সংবিধান (৪২তম সংশোধন) আইন দ্বারা সংবিধানে চতুর্থ 'ক' নামে একটি নতুন ভাগে মৌলিক কর্তব্যসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে। এই ভাগের একমাত্র ধারায়—৫১ক ধারা—ভারতের নাগরিকদের দশটি কর্তব্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের পালনীয় কর্তব্যসমূহ হল এরূপ :

(১) সংবিধান মেনে চলা এবং তার সব আদর্শ ও সংস্থার প্রতি এবং জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

(২) যে সব মহান আদর্শ আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে উদ্বুদ্ধ করেছিল সেগুলি পোষণ ও অনুসরণ করা।

(৩) ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য ও সংহতি সমুন্নত রাখা ও রক্ষা করা।

(৪) আহূত হলে দেশের প্রতিরক্ষা করা ও জাতীয় সেবাকার্য সম্পাদন করা।

(৫) ধর্মীয়, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণীগত বিভিন্নতা অতিক্রম করে ভারতের জনগণের সকলের মধ্যে সমন্বয় ও সাধারণ ভ্রাতৃত্ববোধ বর্ধন করা। নারীদের মর্যাদার হানিকর আচরণ পরিত্যাগ করা।

(৬) আমাদের সংযুত সংস্কৃতির সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারের প্রতি সম্মান দেখানো ও তাকে রক্ষা করা।

(৭) বন, হ্রদ, নদী ও বন্যপ্রাণীসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করা ও তার উন্নতিসাধন করা এবং সকল জীবিত প্রাণীর প্রতি সদয় হওয়া।

(৮) বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবতাবোধ এবং অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কারের স্পৃহা বিকশিত করা।

(৯) সরকারী সম্পত্তি সংরক্ষণ করা ও হিংসা বর্জনের শপথ গ্রহণ করা।

(১০) জাতি যাতে উদ্যম ও সাফল্যের উচ্চতর স্তরে সতত উন্নীত হয় সেজন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কর্মপ্রচেষ্টার সকল ক্ষেত্রে উৎকর্ষের জন্য চেষ্টা করা।

সমালোচনা (Criticism)

ভারতের নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যসমূহকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমালোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, মৌলিক কর্তব্যগুলি আদালতের দ্বারা বলবৎ করা যায় না। নাগরিকরা এই কর্তব্যগুলি অমান্য করলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং এই কর্তব্যগুলিকে নৈতিক অনুশাসনের অধিক আর কিছু বলা যায় না, এদের বাস্তব উপযোগিতা কিছুই নেই।

দ্বিতীয়ত, মৌলিক কর্তব্যগুলি সম্পূর্ণ বা বিস্তারিত নয়। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য, যেমন, করপ্রদান করা সম্পর্কে সংবিধানে আদৌ কিছু উল্লেখ করা হয় নি।

তৃতীয়ত, সংবিধানের চতুর্থ 'ক' ভাগে বর্ণিত মৌলিক কর্তব্যসমূহের মধ্যে কয়েকটি অস্পষ্ট এবং

কয়েকটি ভারতে বসবাসকারী সাধারণ নাগরিকদের চিন্তাশক্তি ও ধারণার বাইরে অবস্থিত। 'সংমিশ্র সংস্কৃতির সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার', 'বৈজ্ঞানিক মানসিকতা', 'মানবতাবোধ', 'অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কারের স্পৃহা' প্রভৃতি বিষয়গুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান আদর্শ, মানবতাবোধ প্রভৃতি বিষয় বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন।

তাৎপর্য (Significance)

মৌলিক কর্তব্যসমূহ আদালতের সাহায্যে বলবৎ করা যায় না বলে এগুলির আদৌ কোন মূল্য নেই এরূপ ধারণা করা যুক্তিযুক্ত নয়। এই কর্তব্যগুলির আইনগত তাৎপর্য না থাকলেও এইগুলির শিক্ষাগত মূল্য রয়েছে। মৌলিক কর্তব্যসমূহ নাগরিকদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে। এই কর্তব্যগুলি সম্পর্কে নাগরিকরা সজাগ হলে তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয় সংহতির মনোভাব জাগ্রত হবে। সুতরাং মৌলিক কর্তব্যসমূহের প্রতীকী ও মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য অস্বীকার করা যায় না।

ঙ· রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ

২৫। নির্দেশমূলক নীতিসমূহের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যসমূহ (Nature and objectives of the Directive Principles)

ভারতের সংবিধানের চতুর্থ ভাগে (Part IV) বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে সংবিধানের একটি অভিনব বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য করা যায়। সংবিধানে এই নীতিসমূহ সংযোজন করার ক্ষেত্রে সংবিধান রচয়িতাগণ আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কারণ আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানেও সংক্ষিপ্ত আকারে সমাজ পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের উল্লেখ দেখা যায়।

নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে কল্যাণকর রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার জন্য গৃহীত একটি বিস্তারিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম বলা যেতে পারে। এই সব নীতি রূপায়ণের মাধ্যমে রাষ্ট্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এই ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মৌলিক প্রয়োজন ও আশা আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করে সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনা সম্ভব।

ভারতের সংবিধান যে সকল মৌলিক নীতি ও আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেইগুলি মূল সংবিধানের শুরুর আগে প্রস্তাবনার মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষেপে এই নীতি ও আদর্শগুলি হল ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রূপে গড়ে তোলা এবং সকল নাগরিকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার, চিন্তার, অভিব্যক্তির, বিশ্বাসের, ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা, প্রতিষ্ঠা ও সুযোগের সমতা প্রদান করা এবং তাঁদের সকলের মধ্যে ব্যক্তিমর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতির অনুকূল ভ্রাতৃভাব বর্ধন করা। রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ এই মূল নীতি ও আদর্শের পরিপূরক। এগুলিকে অনুসরণ ও কার্যকর করতে পারলে প্রস্তাবনায় বর্ণিত নীতি ও আদর্শ স্বভাবতই বাস্তবায়িত হয়ে উঠবে। আবার সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতির অংশটিকে মৌলিক অধিকারের অংশের পরিপূরকও বলা যেতে পারে। কারণ মৌলিক অধিকারসমূহের মাধ্যমে ভারতে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের সনদ বলে আখ্যা দেওয়া যায়।

নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মাধ্যমে শাসন ও আইন বিভাগকে তাদের দায়িত্ব পরিচালনা সংক্রান্ত

বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের ৩৭ ধারায় বলা হয়েছে যে নির্দেশমূলক নীতিসমূহ কোনও আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়, তবে এই নীতিসমূহ দেশ শাসনের পক্ষে অপরিহার্য এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই নীতিসমূহকে প্রয়োগ করা। রাষ্ট্র বলতে এখানে ভারত সরকার ও পার্লামেন্ট, প্রতিটি রাজ্য সরকার ও রাজ্য আইনসভা এবং ভারতের ভূখণ্ডে অবস্থিত অথবা ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল স্থানীয় বা অন্য কর্তৃপক্ষকে বোঝানো হয়েছে।

সংবিধানের ৩৮ ধারায় নির্দেশমূলক নীতিসমূহের দুটি মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথমত, জনকল্যাণার্থে রাষ্ট্র এমন একটি সমাজব্যবস্থা সুরক্ষিত করার চেষ্টা করবে যেখানে জাতীয় জীবনের সকল প্রতিষ্ঠান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের প্রতি উদ্দিষ্ট।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী বা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষত আয়ের অসমতা হ্রাস করার জন্য প্রয়াসী হবে এবং পদমর্যাদা, সুযোগ ও সুবিধার ক্ষেত্রে অসাম্য দূর করার জন্যও সচেষ্ট হবে।

২৬। নির্দেশমূলক নীতিসমূহের বর্ণনা (Enumeration of the Directive Principles)

ভারতের সংবিধানের চতুর্থ ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের বিস্তারিত তালিকায় উল্লেখিত বিষয়গুলিকে সুবিধার জন্য— সমাজতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, সমাজকল্যাণমূলক ও গান্ধীবাদী—এই চারভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে।

(ক) সমাজতান্ত্রিক (Socialistic)— নির্দেশমূলক নীতিগুলির প্রায় অধিকাংশেই গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামো সম্পর্কিত নীতিসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধরনের নীতিগুলি হল : ১। পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জনের অধিকার, ২। সাধারণের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে সমাজের পার্থিব সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের বন্টন, ৩। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে সাধারণের ক্ষতিসাধন করে ধন ও উৎপাদনের উপাদানসমূহ কেন্দ্রীভূত না হয়, ৪। সমান কাজের জন্য পুরুষ ও নারী উভয়ের সম বেতন, ৫। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও শক্তির অপব্যবহার রোধ ও আর্থিক প্রয়োজনের তাগিদে নিরুপায় হয়ে বয়স ও শক্তির অনুপযুক্ত পেশায় নিযুক্ত হতে বাধ্য না হওয়া, ৬। শিশুদের সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠার সুযোগ প্রদান এবং সকলকে শৈশবাবস্থা ও যুবাবস্থায় শোষণ ও অবহেলা থেকে রক্ষা, ৭। কর্ম ও শিক্ষা প্রাপ্তি এবং বার্ধ্যক্যে, বেকার অবস্থায়, অসুস্থতায়, কর্মক্ষমতানাশে ও অনিচ্ছাকৃত অভাবের ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির অধিকার, ৮। ন্যায়সঙ্গত ও মানবোচিত কর্মের শর্তাবলী এবং প্রসূতি সহায়তা, ৯। শ্রমিকদের জন্য জীবন ধারণোপযোগী মজুরি এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা, ১০। খাদ্যপুষ্টির স্তরের ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান, ১১। শিল্প পরিচালন ব্যবস্থায় কর্মীদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা, ১২। সম ন্যায়বিচার ও বিনাব্যয়ে আইনগত সহায়তা প্রদান।

(খ) রাজনৈতিক (Political)—নিম্নলিখিত নীতিসমূহ রাজনৈতিক আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত : ১। ভারতের সর্বত্র নাগরিকদের জন্য একই প্রকার দেওয়ানি আইন প্রবর্তন, ২। সরকারী কৃত্যকসমূহে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের ব্যবস্থা, ৩। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা, জাতিসমূহের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্পর্ক রক্ষা, আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধসমূহ সমাধানে উৎসাহ প্রদান।

(গ) সমাজকল্যাণমূলক (Relating to general social welfare)—সাধারণ সমাজকল্যাণের ন্যূনতম শর্ত হিসাবে এই নীতিগুলি কার্যকর করা আবশ্যক :—১। ১৪ বছর বয়স

পর্যন্ত শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা, ২। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ, শিল্পকলা বা ঐতিহাসিক কারণে চিত্তাকর্ষক স্মারক, স্থান ও বস্তুসমূহের সংরক্ষণ, ৩। দেশের পরিবেশের রক্ষণ ও উন্নতিবিধান এবং বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ।

(ঘ) গান্ধীবাদী (**Gandhian**)—নিম্নলিখিত নির্দেশমূলক নীতিসমূহে প্রত্যক্ষভাবে গান্ধীজী প্রবর্তিত আদর্শসমূহের প্রভাব দেখা যায়:

১। গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন, ২। ঔষধ হিসাবে ব্যবহার ব্যতীত অন্যভাবে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ, ৩। গ্রামাঞ্চলে ব্যক্তিভিত্তিক বা সমবায়ভিত্তিক কুটির শিল্পের উন্নতিবিধান, ৪। আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি ও পশুপালনের ব্যবস্থা, ৫। দুগ্ধবতী ও ভারবাহী গবাদি পশুবংশের পরিরক্ষণ ও উন্নতি এবং ঐরূপ পশুসমূহের হত্যা নিষিদ্ধকরণের ব্যবস্থা, ৬। তপসিলী জাতি, তপসিলী উপজাতি ও অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর জনগণের শিক্ষা বিষয়ক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের উন্নতিবিধান।

ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যসরকারসমূহ এবং স্থানীয় সরকার ও কর্তৃপক্ষসমূহের দায়িত্ব হল আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিকে কার্যকর করা।

২৭। সমালোচনা (Criticism)

নির্দেশমূলক নীতিসমূহের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে অনেক সমালোচক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। প্রথমত, অনেকে বলেন যে সংবিধানে নির্দেশমূলক নীতিগুলি উল্লেখ করার কোনও বিশেষ গুরুত্ব নেই কারণ এই নীতিসমূহকে আদালতের সাহায্যে বলবৎ করা যায় না। এইজন্য এই নীতিসমূহকে রাষ্ট্রের নৈতিক কর্তব্যের অধিক আর কিছুই বলা যায় না; প্রকৃতপক্ষে এই নীতিসমূহের আদৌ কোন বাস্তব মূল্য নেই।

দ্বিতীয়ত, নির্দেশমূলক নীতিসমূহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সংবিধানের প্রস্তাবনায় জনগণের সার্বভৌমিকতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। জনগণের প্রতিনিধিরাই দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সুতরাং শাসনকার্য পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে নির্দেশ প্রদান করার কোনও যৌক্তিকতা দেখা যায় না।

তৃতীয়ত, নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে অনেকে সংবিধানের প্রস্তাবনায় বর্ণিত উচ্চ আদর্শসমূহের পুনরাবৃত্তি বলে গণ্য করেছেন।

চতুর্থত, অনেকে বলেন যে নির্দেশমূলক নীতিসমূহে উল্লেখিত আদর্শসমূহের অনেকগুলি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে উনিশ শতকে প্রচলিত ছিল। বিংশ শতকের মধ্যভাগে রচিত ভারতীয় সংবিধানে এইসব আদর্শের উল্লেখ করে প্রকৃতপক্ষে পশ্চাদগামিতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়ে থাকে যে ভবিষ্যতে হয়ত এমন সময় আসবে যখন ভারতে এই আদর্শগুলির আদৌ কোনও মূল্য থাকবে না। সুতরাং পরিবর্তনশীল সমাজে রাষ্ট্রপরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে কতকগুলি স্থায়ী নির্দেশ সংবিধানে উল্লেখ করে দেওয়ার কোনও যুক্তিযুক্ততা দেখা যায় না।

২৮। তাৎপর্য বা গুরুত্ব (Significance or Importance)

যেহেতু নির্দেশমূলক নীতিসমূহ কার্যকর করতে রাষ্ট্র বাধ্য থাকে না এবং এইগুলি আদালতের সাহায্যে বলবৎ করা যায় না সেজন্য অনেকে সংবিধানে এই নীতিগুলি উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আবার অনেক প্রখ্যাত সংবিধানবিদ ও আইনজ্ঞগণ নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশরূপে গণ্য করেন। তাঁদের মতে এই নীতিসমূহের মাধ্যমে ভারত রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি কি ধরনের হবে সে সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। সুতরাং সংবিধান রচয়িতাগণ কেবলমাত্র একটি আইনগত সাংবিধানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করার কথাই চিন্তা করেন নি। সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিসমূহের অংশের

মাধ্যমে তাঁরা সংবিধানকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের যন্ত্ররূপে গণ্য করেছিলেন।

নির্দেশমূলক নীতিসমূহের তাৎপর্য নিম্নলিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে

প্রথমত, নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে আদালতের দ্বারা বলবৎ করা সম্ভব না হলেও এই নীতিসমূহকে ঠিক নৈতিক সূত্র হিসাবে গণ্য করা যথার্থ নয়। নির্দেশমূলক নীতিসমূহ হল প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি পরিবর্তনশীল ও গতিশীল নীতি যেগুলি কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কোনও সরকার কখনও উপেক্ষা করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, ১৯৭৬ সনে সংবিধান (৪২তম সংশোধন) আইন প্রণয়ন করে নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে নতুন তাৎপর্য দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ৩১গ ধারায় বলা হয়েছে যে কোনও নির্দেশমূলক নীতিকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে প্রণীত কোনও আইনের দ্বারা ১৪ ধারা বা ১৯ ধারায় বর্ণিত কোনও মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ বা সঙ্কুচিত করা হলে ঐ আইনটিকে আদালত কর্তৃক বাতিল করা যাবে না।

তৃতীয়ত, সময় ও যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে কোনও নির্দেশমূলক নীতি মূল্যহীন হয়ে গেলে তাকে সংশোধন বা বাতিল করা যায়। আবার প্রয়োজন হলে সংবিধানে নতুন নির্দেশমূলক নীতি সংযোজন করা যায়। অতএব নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মাধ্যমে একটি স্থায়ী রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে একটি গতিশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। বস্তুত, সংবিধান (৪২তম সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ দ্বারা সংবিধানে কয়েকটি নতুন নির্দেশমূলক নীতি সংযোজন করা হয়েছে। এদের মধ্যে শিল্পপরিচালন ব্যবস্থায় কর্মীদের অংশগ্রহণ ও দরিদ্রদের আইনগত সহায়তা প্রদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চতুর্থত, ভারতের সংবিধানের মৌলিক অধিকারসমূহের অংশে বা অন্য কোনও অংশে অর্থনৈতিক অধিকারের কথা ঘোষণা করা হয় নি। কিন্তু কয়েকটি নির্দেশমূলক নীতির মাধ্যমে কার্যত নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকারের বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য হ্রাস করার বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে।

পঞ্চমত, নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ভারত রাষ্ট্রের আদর্শ কার্যকর করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এইসব নীতিগুলির মধ্যে কয়েকটি বৈপ্লবিক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য এইগুলি রূপায়িত করা হবে সাংবিধানিক উপায়ে।

পরিশেষে দেখা যায় যে সংবিধান প্রবর্তন করার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে ভারত সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্যসরকার আইন প্রণয়ন করে নির্দেশমূলক নীতি রূপায়ণে প্রয়াসী হয়েছেন। জমিদারী প্রথা বিলোপ সাধন, ভূমি সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ, বিভিন্ন শিল্প সংস্থার জাতীয়করণ ইত্যাদির মাধ্যমে ভারত সরকার নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে নিহিত কয়েকটি আদর্শ রূপায়ণের চেষ্টা করেছেন। সর্বভারতীয় খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ, সর্বভারতীয় হস্তশিল্প পর্ষদ, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প পর্ষদ, সিল্ক পর্ষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহের উন্নয়নের চেষ্টা করা হচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্য সরকার গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তন, মাদক দ্রব্য বর্জন, গবাদি পশু হত্যা নিষিদ্ধকরণ প্রভৃতি বিষয়ে আইন প্রচলন করেছেন।

অতএব নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে সম্পূর্ণরূপে মূল্যহীন বলে গণ্য করা যায় না। সংবিধানের ৩৭ ধারায় বলা হয়েছে যে দেশ শাসনের জন্য এই নীতিসমূহ অপরিহার্য এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই নীতিসমূহকে প্রয়োগ করা। ভারতে কেন্দ্রীয়, রাজ্য বা স্থানীয় যে কোনও পর্যায়ের সরকার যদি এই নীতিসমূহকে কার্যকর না করে সেজন্য আদালতের সাহায্যে প্রতিকারের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কিন্তু একথা ভাবা অন্যায় হবে না যে শাসকদল নির্দেশমূলক নীতিসমূহ কার্যকর করার জন্য কতদূর সচেষ্ট ছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনের সময় জনগণ সরকারের কর্মদক্ষতা বিচার করবেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে উপেক্ষা করলে

সরকার পরবর্তী নির্বাচনে জনগণের সমর্থন লাভ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। এই দিক দিয়ে বিচার করলে নির্দেশমূলক নীতিগুলি একবারে নিরর্থক নয়।

২৯। মৌলিক অধিকার সমূহ ও নির্দেশমূলক নীতিসমূহ (Fundamental rights and Directive principles)

ভারতের সংবিধানের চতুর্থভাগে বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহের পরিপূরকরূপে গণ্য করা যেতে পারে। মৌলিক অধিকারসমূহের মাধ্যমে ভারতে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে এবং নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় বর্ণিত গণতান্ত্রিক অঙ্গীকারকে কার্যকর করার জন্য মৌলিক অধিকারসমূহ আবশ্যক। অন্যদিকে প্রস্তাবনায় উল্লেখিত সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য নির্দেশমূলক নীতিসমূহ অপরিহার্য। মৌলিক অধিকারসমূহ ও নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি উল্লেখযোগ্য

প্রথমত, সংবিধানের তৃতীয় ভাগে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারসমূহ নাগরিকরা এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারতে বসবাসকারী সমস্ত ব্যক্তিরা ভোগ করে থাকেন। কিন্তু চতুর্থভাগে বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিসমূহ হল মুখ্যত রাষ্ট্রের কর্তব্য। রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে এই নীতিসমূহ কার্যকর করার চেষ্টা করবে।

দ্বিতীয়ত, মৌলিক অধিকারসমূহকে রাষ্ট্রের ক্ষমতার ওপর বাধানিষেধ বলে গণ্য করা যায়। মৌলিক অধিকারসমূহের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে কয়েকটি ক্ষেত্রে কোনও কিছু করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মৌলিক অধিকারগুলি হল রাষ্ট্রের ক্ষমতার ওপর নেতিবাচক নির্দেশ। যেমন, ১৫ ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র কয়েকটি বিশেষ কারণ দেখিয়ে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। অন্যদিকে নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে ইতিবাচক নির্দেশ বলে গণ্য করা যায়। এই নীতিগুলির মাধ্যমে সরকারকে নির্দেশের আকারে শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও কিছু করতে বলা হয়েছে।। যেমন, রাষ্ট্রকে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন, শিল্প পরিচালনা ক্ষেত্রে কর্মিদের অংশগ্রহণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। এইভবে বলা যায় যে রাজনৈতিক গণতন্ত্র সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রকে নেতিবাচক নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে মৌলিক অধিকারগুলির মাধ্যমে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের ইতিবাচক দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, নির্দেশমূলক নীতিগুলিতে।

তৃতীয়ত, মৌলিক অধিকারসমূহ ও নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হল এই যে মৌলিক অধিকারসমূহ আদালতের দ্বারা বলবৎযোগ্য কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিসমূহ বলবৎযোগ্য নয়। মৌলিক অধিকারসমূহ ক্ষুণ্ণ হলে ব্যক্তিরা সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্টের মাধ্যমে অধিকারগুলিকে সাংবিধানিক উপায়ে বলবৎ করার চেষ্টা করতে পারে। যদিও নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে দেশশাসনের পক্ষে অপরিহার্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু এই নীতিসমূহ রূপায়ণে সরকার সচেষ্ট না হলে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যায় না। সংবিধানে একথা সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে এই নীতিগুলি আদালতের দ্বারা বলবৎযোগ্য নয়।

পরিশেষে মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে কোনও প্রকার বিরোধ দেখা দিলে কোন্‌টিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে এই বিষয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। সাধারণত কোনও নির্দেশমূলক নীতিকে আইনের দ্বারা রূপায়িত করার ফলে ঐ আইন মৌলিক অধিকার বিরোধী হলে মৌলিক অধিকারকেই প্রাধান্য দেওয়া হত। ১৯৫১ সনে চম্পাকম বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় সুপ্রীম কোর্টের পক্ষ থেকে এইরূপে অভিমত প্রদান করে বলা হয় যে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে মৌলিক অধিকারের অধ্যায় অনুসারে এবং তাদের সম্পূরকরূপে চলতে হবে (The

Directive Principles of State Policy have to conform and run subsidiary to the chapter on Fundamental Rights)।

কিন্তু ১৯৭৬ সনে সংবিধান (৪২তম সংশোধন) আইনের মাধ্যমে নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে মৌলিক অধিকারসমূহের ওপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। ৩১গ ধারায় বলা হয়েছে যে কোনও নির্দেশমূলক নীতিকে কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্র প্রণীত কোনও আইনের দ্বারা ১৪ বা ১৯ ধারায় বর্ণিত কোনও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত বা সঙ্কুচিত হলে ঐ আইনকে আদালত অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে না। বর্তমানে কোনও নির্দেশমূলক নীতিকে রূপায়ণ করার ক্ষেত্রে ১৪ ও ১৯ ধারায় উল্লেখিত মৌলিক অধিকার বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় না। অতএব নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে পরোক্ষভাবে ১৪ ও ১৯ ধারার বর্ণিত মৌলিক অধিকার অপেক্ষা অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায় ৮

উদারনীতিবাদ, মার্ক্সবাদ ও গণতান্ত্রিক সমাজবাদ : মূল সূত্র

১। ভূমিকা (Introduction)

কেবলমাত্র তাত্ত্বিক সৌকর্য দিয়ে রাজনৈতিক তত্ত্বের মূল্য নিরূপিত হয় না, রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রকৃত মূল্য তার ব্যবহারিকতায়। এই বিচারে উদারনীতিবাদ (Liberalism) এবং মার্ক্সবাদ (Marxism) আজকের পৃথিবীতে অতি গুরুত্বপূর্ণ দুটি রাজনৈতিক তত্ত্ব। দুটি তত্ত্বেরই মহান ঐতিহ্য সুবিদিত। দুটি তত্ত্বই কৃতধী চিন্তাবিদদের মৌলিক ভাবনার ফসল। দুটি তত্ত্বের যুক্তিবিন্যাসেই অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে, এই দুটি তত্ত্ব থেকে জন্ম নিয়েছে দুটি পৃথক রাজনৈতিক মতাদর্শ যা আধুনিককালে সমান্তরাল গতিতে প্রবহমান। এই দুই স্বতন্ত্র মতাদর্শের অনুপ্রেরণায় আজকের পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থা ; একদিকে উদারনীতিবাদের ভিত্তিতে পৃথিবীর অনেক দেশে গড়ে উঠেছে উদারনীতিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, অন্যদিকে মার্ক্সবাদের ভিত্তিতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, জার্মাণ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, পূর্ব ইয়োরোপের বেশ কয়েকটি দেশ এবং লাতিন অ্যামেরিকার কোনও কোনও দেশে কার্যরত আছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। এই দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি সম্যক্‌ভাবে অনুধাবন করতে গেলে উদারনীতিবাদ ও মার্ক্সবাদের আলোচনা একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে। অর্থাৎ নিতান্ত বাস্তব ও ব্যবহারিক কারণেই তত্ত্ব হিসাবে উদারনীতিবাদ ও মার্ক্সবাদের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা।

আবার উদারনীতিবাদ ও মার্ক্সবাদের আলোচনা গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (Democratic Socialism)-এর আলোচনা ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। কোনও কোনও চিন্তাবিদ উদারনীতিবাদ ও মার্ক্সবাদের সমান্তরাল অবস্থান অস্বীকার করে তাদের এক ঐক্যবিন্দুতে সমন্বিত করার চেষ্টা করেছেন। এই তাত্ত্বিক প্রয়াসের ফলে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ নামে নতুন এক তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। অস্বীকার করা যায় না যে গণতান্ত্রিক সমাজবাদও আধুনিককালের কোনও কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অনুপ্রাণিত করেছে। বস্তুত, বর্তমান ভারতরাষ্ট্রের ঘোষিত নীতি ও লক্ষ্য অনেকাংশে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের অনুসারী। এই কারণে আধুনিক রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ উপেক্ষণীয় নয়। আরও একটি কারণে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এক অর্থে উদারনীতিবাদ ও মার্ক্সবাদের নিজ নিজ গুরুত্ব ও মূল্যের প্রশ্নটি গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সঠিক মূল্যায়নের সঙ্গে জড়িত। কারণ গণতান্ত্রিক সমাজবাদ যদি অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয় তাহলে উদারনীতিবাদ ও মার্ক্সবাদের মধ্যে এতকাল ধরে যে ব্যবধানের প্রাচীর গড়ে উঠেছে তা ভেঙে পড়ে এবং এর ফলে উদারনীতিবাদ ও মার্ক্সবাদের স্বীকৃত স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই কারণেই উদারনীতিবাদ ও মার্ক্সবাদের আলোচনায় গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

২। উদারনীতিবাদ (Liberalism)

ক) প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ (Main Characteristics)

রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে উদারনীতিবাদ যথেষ্ট প্রবীণতার দাবি করতে পারে। সপ্তদশ শতকে ইংরাজ রাষ্ট্রতাত্ত্বিক জন লকের রচনায় এর উদ্ভব। তারপর কয়েক শতাব্দী ধরে বিভিন্ন লেখকের বৈচিত্র্যময় চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে উদারনীতিবাদ পরিণত হয়ে উঠেছে। আবার এই তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগও শুরু হয় ইংল্যাণ্ডের সপ্তদশ শতকীয় গৌরবময় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এবং আজও এই প্রয়োগের ধারা অব্যাহত।

দ্বিতীয়ত, উদারনীতিবাদ শুধুমাত্র রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। ইংল্যাণ্ডে অষ্টাদশ

শতাব্দীর শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই তত্ত্বের অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিশেষভাবে আলোচিত হয় এবং বর্তমান শতকেও উদারনীতিবাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর আলোকপাত করা হয়।

তৃতীয়ত, উদারনীতিবাদের প্রবক্তারা এই তত্ত্বকে ব্যক্তির স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদার রক্ষাকবচ বলে গণ্য করে থাকেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে দাবি করা হয় যে উদারনীতিবাদ হল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। আরও দাবি করা হয় যে একমাত্র উদারনীতিবাদের সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমেই মানুষ মানুষের মত বেঁচে থাকার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি লাভ করে।

চতুর্থত, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সংরক্ষণে উদারনীতিবাদ সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। বস্তুত, উদারনীতিবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী সম্পত্তি হল ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্যতম মাধ্যম এবং এই কারণে সভ্যতা ও প্রগতির মূলে রয়েছে সম্পত্তিব্যবস্থা। অবশ্য বিংশ শতকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উদারনীতিবাদ ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর রাষ্ট্রের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ মেনে নিয়েছে। তবে এই নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা সম্পর্কে উদারনীতিবাদের প্রবল আপত্তি এখনও লক্ষ করা যায়।

পঞ্চমত, সমাজে শৃঙ্খলা ও সংহতি রক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের বিশেষ ভূমিকায় আধুনিক উদারনীতিবাদ আস্থাশীল। বস্তুত, রাষ্ট্রের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক কালের উদারনীতিবাদ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের স্বপ্ন দেখে। এছাড়া উদারনীতিবাদ রাষ্ট্রকেই সমাজ পরিবর্তনের প্রধান মাধ্যম বলে স্বীকার করে নেয়। অবশ্য নানাবিধ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা উদারনীতিবাদ অস্বীকার করে না।

ষষ্ঠত, সমাজ ও রাষ্ট্রের পার্থক্য সম্পর্কে উদারনীতিবাদ চিরদিনই সচেতন। এই পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে উদারনীতিবাদ সমাজের সামগ্রিক চরিত্র দিয়ে রাষ্ট্রের সামগ্রিক চরিত্র বিচারের চেষ্টা করে না। অবশ্য আধুনিক উদারনীতিবাদের প্রবক্তারা আংশিকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রয়োগে কোনও কোনও সামাজিক উপাদানের অবদান মেনে নেন।

সপ্তমত, উদারনীতিবাদ আমূল বৈপ্লবিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী নয়। বস্তুত, উদারনীতিবাদী তত্ত্বানুযায়ী এই ধরনের পরিবর্তন বিপজ্জনক। উদারনীতিবাদী বিশ্বাস রাখে ক্রমিক (gradual) সংস্কারে। অর্থাৎ উদারনীতিবাদের প্রবক্তারা মনে করেন যে মৃদু অথচ নিরন্তর পরিবর্তন প্রক্রিয়াই সামাজিক মঙ্গল সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়।

খ) মূল সূত্র (Basic Principles)

সমাজজীবনে রাষ্ট্রের আধিপত্য দীর্ঘকাল ধরেই এক প্রতিষ্ঠিত সত্য। উদারনীতিবাদ এই সত্যকে অস্বীকার করে না। কিন্তু রাষ্ট্রের আধিপত্য যাতে ব্যক্তির পক্ষে বিপজ্জনক না হয়ে ওঠে, ব্যাপক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার প্রাবল্যে যাতে ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও স্বাধিকার উপেক্ষিত না হয় সে সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ থেকেই উদারনীতিবাদের জন্ম। এককথায়, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তির জন্য তার এক নিজস্ব স্বাধীন ক্ষেত্র সুনিশ্চিত করাই উদারনীতিবাদের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সামনে রেখে, লকের তাত্ত্বিক অনুপ্রেরণায়, উদারনীতিবাদ গড়ে ওঠে কতকগুলি পূর্বানুমানের ওপর নির্ভর করে। এই পূর্বানুমানগুলি হল এইরকম : প্রথমত, চূড়ান্ত বিচারে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস হল জনগণের স্বেচ্ছাদত্ত সম্মতি। অর্থাৎ ব্যক্তির শক্তিকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্রশক্তি স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, মানুষ হিসাবে ব্যক্তির কতকগুলি স্বাভাবিক মৌল অধিকার আছে যেগুলিকে অস্বীকার করার অথবা যেগুলির ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রের নেই। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার মধ্যে থেকেও ব্যক্তি তার এই অধিকারগুলি প্রয়োগ করে এক স্বতন্ত্র জগতের পরিচয় দেয় যেখানে সে স্বাধীন এবং যেখানে তার মর্যাদা ও মহিমা প্রতিষ্ঠিত। এই ধারণার স্বাভাবিক পরিণাম হিসাবে উদ্ভূত হয় তৃতীয় পূর্বানুমান যে ব্যক্তির ওপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অবাধ ও অসীম নয়। রাষ্ট্রের শাসনাধিকার সীমাবদ্ধ এই অর্থে যে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া এবং ব্যক্তির অধিকারগুলি সুরক্ষিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। রাষ্ট্র এই দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট মনোযোগী না

হলে অথবা অক্ষম হলে ব্যক্তি রাষ্ট্রশাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের অধিকারী। চতুর্থ পূর্বানুমানটিও দ্বিতীয় পূর্বানুমানের দ্বারা অনুপ্রাণিত। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও ব্যক্তির যে একটি নিজস্ব ক্ষেত্র আছে—এই সত্যটিকে অধিকতর স্পষ্ট করার জন্য চতুর্থ পূর্বানুমানে বলা হয় যে রাষ্ট্র ও সমাজ পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে এই পার্থক্য নির্দেশের উদ্দেশ্য হল একথা প্রমাণ করা যে রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের মধ্যে আবদ্ধ হলেও সমাজের স্বতন্ত্র পটভূমিতে সে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ।

মূলত এই চারটি পূর্বানুমানের ওপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে উদারনীতিবাদের তাত্ত্বিক কাঠামো। অবশ্য উদারনীতিবাদের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই পূর্বানুমানগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্বে উদারনীতিবাদের আকৃতি হয়েছে বিভিন্নরকমের। যেমন অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে ইংরাজ চিন্তাবিদ অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) উদারনীতিবাদের অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাত্ত্বিক পর্যায়ে এক উগ্র অর্থনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রবর্তন করেন যা ইতিহাসে পরিচিত হয় laissez-faire বা অবাধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নীতি রূপে। অ্যাডাম স্মিথ সমর্থিত উদারনীতিবাদের মূল সূত্র ছিল এই যে ব্যক্তির যাবতীয় অর্থনৈতিক উদ্যোগ সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়া দরকার, কারণ এই ধরনের মুক্ত পরিবেশে অবাধ প্রতিযোগিতা ও বাণিজ্যের সহায়তায় দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিরা প্রভূত সম্পদ আহরণে সমর্থ হবে যা অন্তিম পরিণামে জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধি ঘটাবে। অ্যাডাম স্মিথের উদারনীতিবাদের প্রেরণায় উনবিংশ শতকের ইংল্যাণ্ডে অবাধ বাণিজ্য আন্দোলন (Free trade movement) নামে এক উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলন শুরু হয়। অন্যদিকে রাষ্ট্রতত্ত্বের ক্ষেত্রেও উদারনীতিবাদ রূপান্তরিত হয় উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে। অ্যাডাম স্মিথের সমর্থনে উনবিংশ শতকের হিতবাদী (utilitarian) দার্শনিক জেরেমি বেন্‌থাম (Jeremy Bentham) তাঁর 'ম্যানুয়াল অভ পোলিটিক্যাল ইকনমি' (Manual of Political Economy) গ্রন্থে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে ন্যূনতম করার দাবি জানান। আর এক উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) তাঁর 'অন্ লিবার্টি' (On Libery) গ্রন্থে ব্যক্তির কর্মধারায় আত্মসম্পর্কিত ক্ষেত্র (Self-regarding sphere)-কে পৃথক করেন অপর সম্পর্কিত ক্ষেত্র (other-regarding sphere) থেকে এবং এই অভিমত প্রকাশ করেন যে আত্মসম্পর্কিত ক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণ ও কার্যকলাপে হস্তক্ষেপের কোনও অধিকার রাষ্ট্রের নেই। জন স্টুয়ার্ট মিলের প্রায় সমসাময়িক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেন্‌সার (Herbert Spencer) এর তত্ত্বে উদারনীতিবাদ রূপান্তরিত হয় চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে। স্পেন্‌সার ছিলেন অতি উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকামী। তিনি রাষ্ট্রকে চিহ্নিত করেন এক অশুভ শক্তি রূপে এবং রাষ্ট্রের অধিকাংশ নিয়ন্ত্রণ থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করার সমর্থনে বিভিন্ন যুক্তি প্রয়োগ করেন।

স্পেন্‌সার প্রবর্তিত উদারনীতিবাদ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয় উনবিংশ শতকীয় আর এক ইংরাজ দার্শনিক টি, এইচ, গ্রীণ (T.H. Green)-এর তত্ত্বে। বস্তুত, টি, এইচ, গ্রীণের তাত্ত্বিক উদ্যোগে উদারনীতিবাদ এক নতুন চরিত্র লাভ করে। টি, এইচ, গ্রীণ তাঁর তত্ত্বে এই যুক্তি প্রয়োগ করেন যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপের দ্বারা উদারনীতিবাদী ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ কোনমতেই ক্ষুণ্ণ হয় না কারণ ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন এবং একমাত্র অধিকতর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের দ্বারাই এই পরিবেশ সৃষ্ট হয়। অর্থাৎ, এককথায়, টি, এইচ, গ্রীণের প্রবর্তিত উদারনীতিবাদের মূল কথা এই যে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের কোনও মৌল বিরোধ নেই। ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক সহযোগিতার।

টি, এইচ, গ্রীণের প্রবর্তিত উদারনীতিবাদের নতুন ধারা হব্‌হাউস (L.T. Hobhouse), বার্কার (Ernest Barker) প্রমুখ বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের বিপুল সমর্থন লাভ করে এবং আজও

এই ধারা অব্যাহত। অর্থাৎ আধুনিক উদারনীতিবাদ ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে, কিন্তু একই সঙ্গে রাষ্ট্রের কার্যকলাপকে সন্দেহের চোখে দেখে না। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সমন্বয় সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে আধুনিক উদারনীতিবাদ নির্ভর করে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ওপর। উদারনীতিবাদী দৃষ্টির আলোকে জনপ্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র (representative democracy)-এ রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ বিপুল ও ব্যাপক হলেও তাতে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না, কারণ ব্যক্তির স্বেচ্ছাদত্ত সম্মতি ও সমর্থনের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের কার্যধারার নীতি ও পদ্ধতি নির্ধারিত হয়।

উদারনীতিবাদী আদর্শকে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন বর্তমান যুগের বহুত্ববাদী লেখকরা এবং সেইজন্য বহুত্ববাদ (Pluralism)-কে উদারনীতিবাদের সর্বাধুনিক সংস্করণ বলা যেতে পারে। রেমণ্ড অ্যারোঁ (Raymond Aron), এস, এম, লিপ্‌সেট (S.M. Lipset), রবার্ট ডল (Robert Dahl), ডেভিড ট্রুম্যান (David Truman) প্রমুখ বহুত্ববাদী লেখকদের মতে উদারনীতিবাদী আদর্শ রূপায়ণের জন্য ব্যক্তির ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে দৃষ্টি দেওয়া উচিত সমাজের দিকে। কারণ সামাজিক গোষ্ঠী ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মকুশলতায় যতই সমাজ আত্মনির্ভর ও উন্নত হয়ে উঠবে ততই সে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হবে এবং এই মুক্ত সমাজে স্বাভাবিকভাবেই সুরক্ষিত হবে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা। এই সর্বাধুনিক উদারনীতিবাদে অভিনবত্ব আছে সন্দেহ নেই, তবে এর তাত্ত্বিক ভিত্তি যথেষ্ট দৃঢ় নয়। কারণ সমাজ ও রাষ্ট্রের বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে সমাজকে প্রকৃতই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা যায়—এমন কোনও বাস্তব প্রমাণ দিতে বহুত্ববাদীরা ব্যর্থ হয়েছেন।

এইভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে উদারনীতিবাদ বিভিন্ন রূপে পরিবেশিত হলেও তার মূল নীতি অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। ব্যক্তিই হল উদারনীতিবাদের কেন্দ্রবিন্দু। এই ব্যক্তি যাতে তার অন্তর্নিহিত সমস্ত সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে তার ব্যক্তিত্বের পরম বিকাশ ঘটাতে পারে তার জন্য উদারনীতিবাদ মুক্ত সমাজ (free society)-এর অবস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করে। এই মুক্ত সমাজের অর্থ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণমুক্ত সমাজ নয়। উদারনীতিবাদ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব অস্বীকার করে না। একইভাবে উদারনীতিবাদ রাষ্ট্রের সাধারণ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাও মেনে নেয়। উদারনীতিবাদ শুধুমাত্র সেই সব নিয়ন্ত্রণের বিরোধী যা তার বিচারের মানদণ্ডে ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশের পরিপন্থী। এই কারণে উদারনীতিবাদ প্রতিবাদ জানায় বদ্ধ, অচলায়তন সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে, সংকীর্ণ, যুক্তিহীন সামাজিক সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে এবং পশ্চাদ্‌গামী সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে। একইভাবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ তার নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করে ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব করার চেষ্টা করলে অথবা সকল ব্যক্তিকে সমান সুযোগ দানে বিরত হলে উদারনীতিবাদ তা মেনে নিতে পারে না। উদারনীতিবাদ আরও মনে করে যে তার যাবতীয় তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের সার্থক রূপায়ণ ঘটে উদারনৈতিক গণতন্ত্র (liberal democracy)-এর কাঠামোর মধ্যে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ নিয়তকালিক নির্বাচন (periodic election)-এর মাধ্যমে সরকার গঠন করে। অতএব এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিই শাসনক্ষমতার চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রক। এছাড়া এই শাসনব্যবস্থায় জনগণের স্বাধীনতা, সাম্য ও নানাবিধ অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং রাষ্ট্রীয় কর্মধারা মুক্ত ও কল্যাণময় সমাজের লক্ষ্যে নিবেদিত। অতএব উদারনীতিবাদের প্রায়োগিক মাধ্যম হল উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

গ) মূল্যায়ন (Evaluation) :

সন্দেহ নেই, উদারনীতিবাদ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তত্ত্ব। এর ঐতিহ্য বিশাল ও বর্ণাঢ্য এবং পৃথিবীর একটা বড় অংশের রাষ্ট্রব্যবস্থাই এই তত্ত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত। দ্বিতীয়ত,

উদারনীতিবাদের বিরাট ঐতিহাসিক ভূমিকাও অনস্বীকার্য। ইয়োরোপে মধ্যযুগের অবসানে সমাজ ও রাষ্ট্রের জীবনে আধুনিকতা ও যুক্তিনির্ভরতার সঞ্চার করে উদারনীতিবাদ এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ভগ্নস্তূপ থেকে যে গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠতে থাকে তাকে অনুপ্রাণিত করে উদারনীতিবাদ। এই গণতন্ত্র বদ্ধ ও সংকীর্ণ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় অবশ্যই ছিল এক প্রগতিশীল ব্যবস্থা। এককথায়, ইয়োরোপীয় ইতিহাসের এক বিশেষ অধ্যায়ে উদারনীতিবাদ নিয়ে আসে ব্যাপক পরিবর্তনের বিশুদ্ধ বাতাস। উদারনীতিবাদের প্রভাবে ব্যক্তিমানুষ সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমশই যুক্তিবাদী হতে থাকে, তার স্বাধীনতা ও অন্যান্য ব্যক্তি-অধিকার লাভ করে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা ও বোঝাপড়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তৃতীয়ত, উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে উদারনীতিবাদ চরম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। কিন্তু যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফলে সূচিত হয় উদারনীতিবাদেরই জয়গৌরব। চতুর্থত, উদারনীতিবাদের মুক্ত সমাজের নীতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করে অনেক ক্ষেত্রে যে জাতীয় সম্পদের বিপুল স্ফীতি সম্ভব করেছে একথাও অস্বীকার করা যায় না। পঞ্চমত, অনেকে দাবি করেন যে উদারনীতিবাদের তাত্ত্বিক অনুপ্রেরণায় যে মুক্ত সমাজ গড়ে ওঠে তা শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যবহুল উন্নয়নের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। ষষ্ঠত, আরও বলা হয়ে থাকে যে উদারনীতিবাদ মূলত সমন্বয়ের ও সহাবস্থানের তত্ত্ব, সংঘাতের নয়। স্বভাবতই এই তত্ত্ব শান্তিপূর্ণ সংস্কারে বিশ্বাসী এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিরোধী। কাজেই উদারনীতিবাদের প্রয়োগে সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয় না বলে এই তত্ত্ব কখনই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে না।

এতৎসত্ত্বেও উদারনীতিবাদ আধুনিককালে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। সমালোচকেরা বলে থাকেন যে তাত্ত্বিক পর্যায়ে উদারনীতিবাদ যেসব প্রতিশ্রুতি দেয় তা নিতান্তই মনোহর, কিন্তু সমস্যা এই যে কার্যক্ষেত্রে রূপায়ণের স্তরে এইসব প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ বিপরীত ফল প্রসব করে। যেমন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় উদারনীতিবাদী তত্ত্বে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা এই যে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল ব্যক্তিই যথোচিত মর্যাদা লাভ করে না। যেসব ব্যক্তি আর্থিক বিচারে সম্পন্ন এবং নিজেদের আর্থিক ক্ষমতা যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করে সমাজে বিশেষভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত তাদেরই স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা সুরক্ষিত হয় উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। অন্যদিকে খেটে খাওয়া অসংখ্য সাধারণ ব্যক্তি নিজেদের দারিদ্র্যের নিরিখে সমাজের নীচুতলার মানুষ বলে পরিগণিত হয়। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে এদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকার স্বীকৃতিলাভ করে বটে, কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠার অভাবে তারা এই অধিকার যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারে না। অর্থাৎ, সমালোচকদের মতে, উদারনীতিবাদ ব্যক্তির সামাজিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে সমালোচকেরা উদারনীতিবাদী তত্ত্বের অর্থনৈতিক তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টি দেন। তাঁদের মতে, জাতীয় সম্পদের দ্রুত আয়তন বৃদ্ধির স্বার্থে উদারনীতিবাদ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন অর্থনৈতিক উদ্যোগকে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মোদ্যোগ মূলত মুনাফার লক্ষ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং খেটে খাওয়া মানুষকে তার শ্রমের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করে অর্থাৎ তার ওপর শোষণ অব্যাহত রেখেই উৎপাদিত হয় মুনাফা। ফলত, চূড়ান্ত বিচারে, উদারনীতিবাদ প্রতিপন্ন হয় এমনই এক তত্ত্বরূপে যা প্রকৃতপক্ষে সামাজিক শোষণের তাত্ত্বিক ধারক ও বাহক। সমালোচকেরা আরও বলে থাকেন যে এই সামাজিক শোষণের ধারাকে অব্যাহত রাখার স্বার্থেই কার্যরত থাকে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যাবতীয় রাজনৈতিক সংগঠন। অর্থাৎ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সকল ব্যক্তির রাজনৈতিক অধিকার স্বীকার করে

নেয়, কিন্তু একই সঙ্গে মুনাফার লক্ষ্যে ধাবিত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন অর্থব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করে তার আইনের মাধ্যমে। ফলত, একদিকে সামাজিক শোষণের পরিপ্রেক্ষিতে মেহনতী মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদার প্রশ্নটি নিতান্ত অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং অন্যদিকে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নগ্নরূপে প্রতিভাত হয় এক নিষ্ঠুর শোষণযন্ত্র হিসাবে।

এইসব বিবেচনার ভিত্তিতে সমালোচকেরা মনে করে থাকেন যে ব্যক্তির গৌরব প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে উদারনীতিবাদের তাত্ত্বিক অঙ্গীকার নিছক অর্থহীন শব্দের আড়ম্বর মাত্র। বস্তুত, উদারনীতিবাদের সার্বিক ব্যর্থতায় বিচলিত এক আধুনিক লেখক জন্ ডান্ (John Dunn) বলেছেন যে উদারনীতিবাদ হল প্রকৃতপক্ষে "দম্ভ ও আত্মপ্রবঞ্চনার এক রুচিহীন অভিব্যক্তি" (a tasteless exercise in vanity and self-deception)।

৩। মার্ক্সবাদ (Marxism)

(ক) প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ (Main Characteristics)

মার্ক্সবাদের তাত্ত্বিক ঐতিহ্য উদারনীতিবাদের মত অত দীর্ঘ নয়। মার্ক্সবাদের উদ্ভব হয় ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে। এই সময় থেকে শুরু করে কয়েক দশক ধরে কার্ল মার্ক্স (Karl Marx) এবং ফ্রেডেরিক এঙ্গেল্‌স্ (Frederick Engels)-এর অসাধারণ মৌলিক চিন্তার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে মার্ক্সবাদ একটি সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বিংশ শতকে সোভিয়েত রাশিয়ায় লেনিন (Lenin) ও স্তালিন (Stalin) এবং চীন দেশে মাও জেডং (Mao Zedong) মার্ক্সবাদের বিশ্লেষণ ও সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। এছাড়া মার্ক্সবাদের তাত্ত্বিক বিকাশে লুকাচ্ (Georg Lukacs), অল্‌থুসার (Louis Althusser) ও গ্রাম্‌শি (Antonio Gramsci) প্রমুখ আধুনিক লেখকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও উপেক্ষণীয় নয়। এইভাবে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু করে আজও পর্যন্ত মার্ক্সবাদের তাত্ত্বিক বিকাশের ধারা অব্যাহত। বস্তুত, মার্ক্সবাদীরা কখনই মনে করেন না যে মার্ক্সবাদ সম্পর্কে সর্বশেষ কথাটি বলা হয়ে গেছে। এই গতিশীলতাই হল মার্ক্সবাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়ত, মার্ক্সবাদ নিছক বিমূর্ত তত্ত্ব নয়। তত্ত্ব হয়েও মার্ক্সবাদ নিজেকে দাবি করে সমাজ পরিবর্তনের এক বাস্তব কার্যক্রম রূপে। অর্থাৎ মার্ক্সবাদ তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয়ে বিশ্বাসী এবং এটিই হল মার্ক্সবাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয়ত, মার্ক্সবাদ নিছক দূরকল্পনা (Speculation) বা ভবিষ্যদ্বাণী (forecast)-তে বিশ্বাসী নয়। মার্ক্সবাদ ভবিষ্যতকে বিচার করে অতীত ও বর্তমানে প্রবাহিত সামাজিক ধারার বিশ্লেষণের মাধ্যমে। অর্থাৎ মার্ক্সবাদী বিচারে বর্তমানের গর্ভেই নিহিত থাকে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। অতএব মার্ক্সবাদী তত্ত্বানুযায়ী বর্তমানকে সঠিকভাবে জানলেই অনিবার্য ভবিষ্যতকে জানা যায়।

চতুর্থত, মার্ক্সবাদ কঠোরভাবে এক বস্তুবাদী তত্ত্ব। এই তত্ত্বের আলোকে পৃথিবীর সবকিছুই বিবেচিত হয় বস্তু রূপে। অতএব চিন্তা-ভাবনা-ধারণার ক্ষেত্রেও মার্ক্সবাদ চিহ্নিত করে তাদের বস্তুগত উপাদান।

পঞ্চমত, মার্ক্সবাদ বিশ্বাসী নিরন্তর পরিবর্তনে। এই তত্ত্ব পৃথিবীর কোনও কিছুকেই অপরিবর্তনীয় বা চিরন্তন বলে মনে করে না। এছাড়া মার্ক্সবাদ মনে করে যে এই পরিবর্তনপ্রক্রিয়া চলে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে। অর্থাৎ মার্ক্সবাদী তত্ত্বানুযায়ী পৃথিবীর যে কোনও পরিবর্তনই সাধিত হয় বিরোধ ও বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে।

ষষ্ঠত, মার্ক্সবাদ সম্পর্কশূন্যতায় বিশ্বাসী নয়। অর্থাৎ মার্ক্সবাদ মনে করে যে পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু বা বিষয়ই অপরাপর বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে অটুট সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। এই কারণেই মার্ক্সবাদ রাষ্ট্র ও সমাজের বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। রাষ্ট্রের আলোচনায় মার্ক্সবাদ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সংশ্লিষ্ট সমাজব্যবস্থার চরিত্রের ওপর।

সপ্তমত, সমাজের বিশ্লেষণে মার্ক্সবাদ সমাজে প্রচলিত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার অনুধাবন একান্ত জরুরী বলে মনে করে। এই কারণেই মার্ক্সবাদী বিচারে রাজনীতি ও অর্থনীতি পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

অষ্টমত, মার্ক্সবাদ ইতিহাসের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। যেহেতু মার্ক্সবাদ মনে করে যে বর্তমান আবির্ভূত হয়েছে অতীতের গর্ভ থেকে সেইহেতু মার্ক্সবাদী সমাজ-বিশ্লেষণে ইতিহাস প্রধান মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত। অবশ্য মার্ক্সবাদ ব্যক্তির ইতিহাসে আগ্রহী নয়, মার্ক্সবাদের আগ্রহ সমাজের সামগ্রিক ইতিহাসে।

নবমত, শ্রেণীতত্ত্ব মার্ক্সবাদের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই শ্রেণীতত্ত্বের ভিত্তিতেই মার্ক্সবাদ সমাজের চরিত্র বিশ্লেষণ করে এবং সমাজ পরিবর্তনের কারণ অন্বেষণ করে।

দশমত, মার্ক্সবাদে বিপ্লবের তত্ত্বের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। মার্ক্সবাদ বিপ্লবকে এক স্বাভাবিক ঐতিহাসিক ঘটনা বলে গণ্য করে। বস্তুত, মার্ক্সবাদী তত্ত্বানুযায়ী বিপ্লবই হল মৌলিক সমাজ-পরিবর্তনের প্রধান মাধ্যম এবং এইজন্যই মার্ক্সবাদে বিপ্লব কোনও ভীতিকর বা বিপজ্জনক ঘটনা বলে বিবেচিত হয় না।

মার্ক্সবাদের সর্বশেষ অনন্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে এই তত্ত্ব সমাজতন্ত্র নামে এক নতুন সমাজব্যবস্থার উদ্ভবের অনিবার্যতা ঘোষণা করে এবং আরও দাবি করে যে পৃথিবীতে একদিন রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটবে।

(খ) মূল সূত্র (Basic Principles)

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism) এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism) থেকেই মার্ক্সবাদের মূল সূত্রের নির্দেশ পাওয়া যায়। অবশ্য এই সূত্রের ওপর নির্ভর করে মার্ক্সবাদ সমাজবিকাশের বিভিন্ন পর্বের বর্ণনা দিয়ে পুঁজিবাদী সমাজ (Capitalist society)-এর স্বরূপ উদ্ঘাটন করে এবং সমাজতন্ত্র (Socialism)-এর ঐতিহাসিক অনিবার্যতা সপ্রমাণ করে এই নতুন সমাজব্যবস্থা গঠনের সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের বিবরণ দেয়। কাজেই মার্ক্সবাদের আলোচনায় যে কয়টি বিষয়কে উপেক্ষা করা যায় না সেগুলি হল : ১) দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ২) ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, ৩) প্রাক্-পুঁজিবাদী বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী সমাজ এবং ৪) সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ও তার গড়ন।

১) **দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ** : জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এক সুনির্দিষ্ট ধারণার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে মার্ক্সবাদ। অর্থাৎ মার্ক্সবাদ একাধারে সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব, সমাজ পরিবর্তনের এক প্রায়োগিক কার্যক্রম এবং এক পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। মার্ক্সীয় জীবনদর্শন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ নামে পরিচিত। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল কথা এই যে আমাদের এই জগৎ নিছকই এক বস্তুজগৎ যার প্রতিটি উপাদান অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই বস্তুজগতের পরিচয় তার গতিশীলতায়। অর্থাৎ পৃথিবীর সব কিছুই পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন কোনও বহিঃশক্তির প্রভাবে ঘটে না। এই পরিবর্তনের বীজ নিহিত আছে বস্তুরই অন্তরে কারণ প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আছে ইতিবাচক (positive) ও নেতিবাচক (negative) উপাদান এবং এই বিরুদ্ধ উপাদানের সংঘর্ষের ফলেই নিরন্তর দেখা দিচ্ছে পরিবর্তন যা সবসময়েই গুণগত (qualitative) ও অগ্রগামী (progressive)।

২) **ঐতিহাসিক বস্তুবাদ** : ইতিহাসের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ প্রয়োগের ফলেই গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কোনও বিষয়েরই বিচ্ছিন্নতায় বিশ্বাসী নয়।

তাই মার্ক্সবাদ স্বভাবতই ইতিহাসকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমাহার বলে মনে করে না। অর্থাৎ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রারম্ভিক সূত্র এই যে ইতিহাস এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার একটি পর্যায়ের সঙ্গে অন্য পর্যায় এমনইভাবে সম্পর্কযুক্ত যে সমগ্র মানবেতিহাসের মধ্যেই লক্ষ করা যায় এক সুনির্দিষ্ট ধারা বা গতিসূত্র। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক বস্তুবাদে ইতিহাস ব্যক্তির ইতিহাস বলে বিবেচিত হয় না, ইতিহাস বলতে বোঝা হয় সমগ্র জনসমষ্টির ইতিহাসকে। অর্থাৎ মার্ক্সবাদে অনুসন্ধানের বিষয় হল সমাজের ইতিহাস। তৃতীয়ত, মার্ক্সবাদ ইতিহাস বিশ্লেষণ করে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। অর্থাৎ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তৃতীয় মূল সূত্র এই যে সমাজের ইতিহাস প্রতিফলিত হয় সমাজের বস্তুগত জীবনব্যবস্থায় (material conditions of life) এবং এই বস্তুগত জীবনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হল সমাজে প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতি (mode of production)। উৎপাদনের গুরুত্ব এই কারণে যে অন্ন, বস্ত্র, পানীয় ও বাসস্থান প্রভৃতি জীবনধারণের মূল উপকরণ প্রাপ্তির ওপরেই নির্ভর করে মানুষের অস্তিত্ব। কিন্তু এইসব উপকরণ আপনা আপনি পাওয়া যায় না, এগুলিকে উৎপাদন করতে হয়। তাই মার্ক্সবাদ মনে করে যে উৎপাদনকে বাদ দিয়ে মানুষের জীবন তথা সমাজজীবনের কোনরূপ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণই সম্ভব নয়।

মার্ক্সবাদী তত্ত্বানুযায়ী এই উৎপাদন স্বভাবতই সামাজিক, কারণ উৎপাদন সম্ভব হয় অনেকের যৌথ উদ্যমের দ্বারা। দ্বিতীয়ত, এই সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার দুটি দিক—একটি, উৎপাদন শক্তি (Forces of Production) এবং অন্যটি, উৎপাদন সম্পর্ক (Relations of Production)। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় কাঁচামাল, যন্ত্রাদি, নির্দিষ্ট জায়গা প্রভৃতি নানাবিধ উৎপাদন-উপকরণ (Means of Production)। অবশ্য উৎপাদন কার্যত সম্ভব হয় তখনই যখন একদল মানুষ তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই উৎপাদন-উপকরণগুলিকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করে। এই জনগোষ্ঠী উৎপাদন-উপকরণের সম্মিলনে যে শক্তি সূচিত করে তাই মার্ক্সবাদে চিহ্নিত হয় উৎপাদন শক্তিরূপে। অন্যদিকে উৎপাদনে রত ব্যক্তিদের মধ্যে সম্মিলিতভাবে কার্যরত থাকার দরুণ স্বভাবতই কিছু সরল ও সহজ মানবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার কথা। কিন্তু কার্যত এই সম্পর্ক জটিল হয়ে ওঠে। কারণ দেখা যায় যে উৎপাদনে রত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে উৎপাদন-উপকরণের সম্পর্ক একরকম নয় ; কেউ কেউ উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক অর্থাৎ উৎপাদন-উপকরণ তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং অন্যেরা এই মালিকানা থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত। এই পরিস্থিতিতে মালিক ও অমালিক এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক আর সহজ ও স্বাভাবিক থাকতে পারে না। সম্পত্তি সম্পর্ক (Property relations)-এর পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদনে রত ব্যক্তিদের মধ্যে এই যে জটিল সম্পর্ক দেখা দেয় একেই বলা হয় উৎপাদন সম্পর্ক। এই উৎপাদন সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল উৎপাদন শক্তির বিকাশের এক বিশেষ স্তরে। আদিম সমাজব্যবস্থায় যখন উৎপাদন শক্তি ছিল নিতান্ত অপরিণত, অর্থাৎ যখন সুপ্রচুর ও সহজলভ্য পাথর ইত্যাদিকে মূল উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে মানুষ দলবদ্ধভাবে শিকারের মাধ্যমে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করত তখন স্বভাবতই সম্পত্তি-সম্পর্ক দেখা দেয় নি। কিন্তু যে মুহূর্তে ধাতুজ উপকরণের ব্যবহার শুরু হয় সেই মুহূর্তে এই উপকরণের অপ্রতুলতা ও দুষ্প্রাপ্যতার জন্য এবং শ্রমবিভাগের সুযোগ গ্রহণ করে কিছু লোক এগুলিকে নিজেদের কুক্ষিগত করে অর্থাৎ উৎপাদন-উপকরণকে নিয়ে আসে ব্যক্তিগত মালিকানায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সরল উৎপাদন সম্পর্ক রূপান্তরিত হয় জটিল সম্পত্তি-সম্পর্কে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই যে, এই উৎপাদন সম্পর্কের দ্বারা চিহ্নিত উৎপাদন পদ্ধতিই সমাজের মৌল ভিত্তি (base) এবং এই মৌল অর্থনৈতিক ভিত্তির চরিত্রানুযায়ী তার ওপর গড়ে ওঠে এক ব্যাপক উপরি-কাঠামো (superstructure), যাবতীয় সামাজিক ও

রাজনৈতিক সংগঠন এবং সমগ্র সামাজিক ভাবধারা যে উপরি-কাঠামোর অন্তর্গত। অর্থাৎ মার্ক্সবাদ মনে করে যে সমাজের প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য দৃষ্টি দিতে হবে সমাজে প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতির দিকে যার দ্বারা সাধারণভাবে নির্ধারিত হয় সমগ্র সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া। একইভাবে উৎপাদন পদ্ধতি বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সমাজ-পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা যায়। কারণ কখনও কখনও উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠলে উৎপাদন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং উৎপাদন পদ্ধতিতে এই পরিবর্তনের ফলেই সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন দেখা দেয়।

এই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পটভূমিতেই গড়ে উঠেছে শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কিত মার্ক্সীয় তত্ত্ব। আদিম সমাজব্যবস্থায় সম্পত্তি সম্পর্কের উদ্ভব হয় নি। ফলত এই সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন উপকরণের মালিক ও অমালিক—এই দুই স্বতন্ত্র শ্রেণী দেখা দেয়নি এবং ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় শ্রেণীর ওপর প্রভুত্বেরও কোনও অবকাশ ছিল না। কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়ে উৎপাদন শক্তি উন্নত হয়ে উঠলে দেখা দেয় শ্রমবিভাগ এবং এই শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে এক এক ব্যক্তি এক এক ধরনের দ্রব্য উৎপাদনে বিনৈপুণ্য (specialisation) অর্জন করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অনিবার্য হয়ে দেখা দেয় উৎপাদন উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা এবং উৎপন্ন সামগ্রীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রূপে গণ্য করার প্রবণতা। স্বভাবতই তাই আদিম সমাজব্যবস্থার পরবর্তী সব ধরনের সমাজেই উৎপাদন পরিচালিত হয়েছে উৎপাদন-উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানায় এবং চিহ্নিত হয়েছে সম্পত্তি সম্পর্কের দ্বারা। এই কারণে এইসব সমাজব্যবস্থায় মালিক শ্রেণীর প্রভুত্ব ও অমালিক শ্রেণীর অধীনতা অমোঘ ও অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। মালিক শ্রেণী স্বীয় স্বার্থে অধীনস্থ শ্রেণীকে শোষণ করেছে আর অধীনস্থ শোষিত শ্রেণী মুক্তি পেতে চেয়েছে এই শোষণ থেকে। এই দুই বিরুদ্ধ স্বার্থের সংঘাত প্রকট হয়ে উঠেছে শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে। এই শ্রেণীসংগ্রাম স্বভাবতই চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে এবং ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ সন্ধিক্ষণে এই শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে সমাজে নিয়ে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই কারণেই মার্ক্সবাদ মনে করে যে সমাজের ইতিহাস মূলত শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।

৩) **প্রাক্-পঁুজিবাদী বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা ও পঁুজিবাদী সমাজ** : ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ওপর নির্ভর করে মার্ক্সবাদ বিশ্লেষণ করে সমাজবিকাশের ধারা। মার্ক্সবাদ দেখায় যে সভ্যতার প্রাথমিক পর্বে বিদ্যমান ছিল আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা (Primitive Communist Society)। শ্রমবিভাগ ও সম্পত্তি-সম্পর্কের অবর্তমানে এই সমাজে শ্রেণীর উদ্ভব হয় নি এবং ব্যক্তিগত মালিকানার প্রচলন হয় নি বলে সামাজিক সম্পর্কে ছিল না কোনও বৈষম্য। উৎপাদন শক্তি আরও উন্নত হয়ে উঠলে উদ্ভূত হয় দাস সমাজব্যবস্থা (Slave Society)। আবার দাসসমাজে প্রচলিত উৎপাদন শক্তিতে পরিবর্তন দেখা দিলে উদ্ভব হয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ (Feudal Society)-এর। একইভাবে উৎপাদন শক্তির অধিকতর উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের এক বিশেষ পর্বে দেখা দেয় পঁুজিবাদী সমাজ (Capitalist Society)। প্রতিটি সমাজই তার পূর্বতন সমাজের তুলনায় প্রগতিশীল ও অগ্রগামীরূপে প্রতিভাত হয়েছে। কিন্তু আদিম সাম্যবাদী সমাজ ছাড়া প্রতিটি সমাজব্যবস্থাতেই সম্পত্তি-সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক শোষণ চলেছে অব্যাহত গতিতে।

এই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের পথ ধরে মার্ক্সবাদ অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলে পঁুজিবাদের ওপর। সামন্ততন্ত্রের তুলনায় পুঁজিবাদ যে এক অতি উন্নত সমাজব্যবস্থা একথা মার্ক্সবাদ অস্বীকার করে না। মার্ক্সবাদ আরও স্বীকার করে যে পঁুজিবাদের বিকাশ সমাজের সর্বস্তরে ঐতিহাসিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রবর্তিত হয়েছে উদার গণতান্ত্রিক সংগঠন। কিন্তু মার্ক্সবাদ দেখায় যে এতৎসত্ত্বেও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মতই পঁুজিবাদী সমাজ উৎপাদন-উপকরণের

ব্যক্তিগত মালিকানার দ্বারা চিহ্নিত এবং ফলত এই সমাজেও শোষণের ধারা অব্যাহত। পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতি শ্রেণী (Capitalist class) লিপ্ত থাকে পণ্য (commodity অর্থাৎ বিনিময় বা বিক্রয়ের জন্য উৎপাদিত দ্রব্য) উৎপাদনে। এই পণ্য উৎপাদিত হয় মূলত শ্রমজীবী (Proletariat)-এর প্রদত্ত শ্রমশক্তি (labour power)-এর ভিত্তিতে, যে শ্রমশক্তি পুঁজিপতি শ্রমজীবীর কাছ থেকে কিনে নেয় মজুরি (wage)-এর বিনিময়ে। কিন্তু একজন শ্রমজীবী তার শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার করে যে পরিমাণ সম্পদ উৎপাদন করতে পারে তার সমান মূল্য তাকে মজুরি হিসাবে দেওয়া হয় না। তার ও তার পরিবারের জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবার জন্য যতটা প্রয়োজন ঠিক ততটাই তাকে দেওয়া হয় তার শ্রমশক্তির মূল্য হিসাবে। বাকী যে মূল্যের সম্পদ তার শ্রমশক্তি উৎপাদন করে তাকে বলা হয় উদ্বৃত্ত মূল্য (surplus value) এবং এই উদ্বৃত্ত মূল্য পুরোপুরি আত্মসাৎ করে উৎপাদন-উপকরণের মালিক পুঁজিপতি। এই উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে পুঁজিপতি সংগ্রহ করে তার মুনাফা এবং এইভাবেই পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমজীবী শ্রেণীর ওপর শোষণ ও বঞ্চনা চলে। মার্ক্সীয় তত্ত্বানুযায়ী পুঁজিবাদী সমাজের সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থাই এই সামাজিক শোষণ ও উৎপীড়নের ধারক ও বাহক। অর্থাৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রাক্-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাগুলির মতই সামাজিক শোষণের যন্ত্র। সংখ্যাল্প পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থে সংখ্যাধিক শ্রমজীবী শ্রেণীর ওপর নিগ্রহ অব্যাহত রাখার কাজে ব্যবহৃত হয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রক্ষমতা।

তবে মার্ক্সবাদ মনে করে যে পুঁজিবাদ অপরিবর্তনীয় নয়, তার বিনাশও অনিবার্য। কারণ তার বিকাশের এক বিশেষ স্তরে পুঁজিবাদী সমাজ অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার যতই উন্নয়ন ঘটতে থাকে ততই তার পরিধি বিস্তৃত হয় অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি যুক্ত হয় উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে। এর অর্থ এই যে পুঁজিবাদে উৎপাদন শক্তি ক্রমশই অধিকতর সামাজিক (social) হয়ে ওঠে। কিন্তু উৎপাদন শক্তির এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উৎপাদন সম্পর্কে কোনও পরিবর্তন দেখা দেয় না। উৎপাদন-উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা অব্যাহত থাকার ফলে উৎপাদন সম্পর্ক যথারীতি থাকে সংখ্যাল্প পুঁজিপতি শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে। ফলত উৎপাদন শক্তি ক্রমশ সামাজিক হয়ে উঠলেও উৎপাদন সম্পর্ক অপরিবর্তিতই থাকে। এইভাবে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে অনিবার্যভাবে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্ব বাড়তে বাড়তে এমন একটা স্তরে এসে পৌঁছায় যখন পুঁজিবাদের আর কোনও উন্নয়ন সম্ভব হয় না। এই সংকট থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হল উৎপাদন-উপকরণের সামাজিকীকরণ (socialisation of the means of production) যা সুনিশ্চিত করার প্রাথমিক ধাপ হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (socialist revolution)। এই বিপ্লব পরিচালনার উপযুক্ত শক্তি সৃষ্টি করে পুঁজিবাদ নিজেই। অর্থাৎ পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাই জন্ম দেয় সংগঠিত এক বিশাল শ্রমজীবী শ্রেণীর এবং এই শ্রমজীবী শ্রেণীই এই বিপ্লবের পুরোধা। শ্রমজীবী শ্রেণীর নেতৃত্বে সংঘটিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে শুরু হয় পুঁজিবাদের বিনাশ পর্ব এবং একই সঙ্গে চলতে থাকে এক নতুন সমাজ গড়ার কাজ যার নাম সমাজতন্ত্র (socialism)।

৪) **সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ও তার গড়ন :** মার্ক্সবাদ সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করে এক অনিবার্য ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ারূপে। পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বই সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনা সূচিত করে। অতএব বলা যেতে পারে যে সমাজতন্ত্র অনিবার্যভাবে উদ্ভূত হয় পুঁজিবাদী সমাজের সংকটের আবর্ত থেকে। অবশ্য সমাজতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তাৎক্ষণিক ফলশ্রুতি নয়। বিপ্লবের মূল লক্ষ্য হল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ক্ষমতাদখল। এই ক্ষমতাদখলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রমজীবীর একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of the Proletariat) এবং এই নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিচালনাধীনে শুরু হয় সমাজতন্ত্র গড়ার কাজ। সমাজতন্ত্র গড়ার অন্যতম প্রধান ধাপ হল উৎপাদন-উপকরণের ব্যক্তিগত

মালিকানার অবসান ঘটিয়ে তাদের সামাজিকীকরণ সুনিশ্চিত করা। অবশ্য রাতারাতি এই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে সর্বাত্মক করে তোলা সম্ভব নয়। কারণ পুঁজিবাদের মধ্য থেকেই সমাজতন্ত্রের উদ্ভব বলে বিপ্লবের পরেও সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারে না। এইজন্য প্রথম পর্বে উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপকরণগুলির ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সম্পদবণ্টনের সামাজিক সূত্র হয় এইরকম : "প্রত্যেকের কাছ থেকে নেওয়া হবে তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং প্রত্যেককে দেওয়া হবে তার কাজ অনুযায়ী" (From each according to his ability, to each according to his work)। সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক দিলে স্বভাবতই প্রকৃত সামাজিক সাম্য সূচিত হয় না—এ বিষয়ে মার্ক্সবাদ অবশ্যই সচেতন। তবে মার্ক্সবাদ মনে করে যে এটিই স্বাভাবিক কারণ প্রাথমিক পরিবর্তনের পর্বে সমাজতন্ত্রের পক্ষে পুঁজিবাদী সমাজের অনৈক্যকে পুরোপুরি অস্বীকার করা সম্ভব নয়। অবশ্য যতই ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটতে থাকে ততই পরিকল্পিত উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়। সামাজিকীকরণের চূড়ান্ত পর্যায়ে যখন উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাপক সাফল্য লাভ করে তখন সমাজে উৎপাদিত হয় অপর্যাপ্ত সম্পদ। এই পর্যায়ে সম্পদবণ্টনের সূত্রটি হয় এইরকম : "প্রত্যেকের কাছ থেকে নেওয়া হবে তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং প্রত্যেককে দেওয়া হবে তার প্রয়োজন অনুযায়ী" (From each according to his ability, to each according to his needs)। অর্থাৎ এই পর্বে জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রকৃত সাম্য এবং এখন সমাজতন্ত্র উন্নীত হয় উচ্চতর পর্যায়ে অর্থাৎ দেখা দেয় সাম্যবাদী সমাজ (Communist Society)। এই সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত, প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত, শ্রেণী বিলুপ্ত এবং সামাজিক শোষণ এক অতীত ঘটনা। স্বভাবতই এই সমাজব্যবস্থায় শোষণযন্ত্র সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় এবং এই কারণে অনিবার্য হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের বিলয় (withering away of the state)।

গ) মূল্যায়ন (Evaluation)

মার্ক্সবাদ যে এক অনন্য ও অভিনব তত্ত্ব এবিষয়ে পৃথিবীতে কোনও দ্বিমত নেই। এর প্রায়োগিক সাফল্যও বিস্ময়কর। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে শুরু করে মাত্র ষাট বছরের মধ্যে মার্ক্সবাদ পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভূখণ্ডে নিয়ন্ত্রক নীতিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং বাকী ভূখণ্ডের অসংখ্য নরনারী ক্রমশই আকৃষ্ট হচ্ছে মার্ক্সবাদের প্রতি। মার্ক্সবাদের অন্যতম গুণ এর বস্তুনিষ্ঠতা ও বিজ্ঞানধর্মিতা। মার্ক্সবাদ বিমূর্ত ধারণা অথবা নিছক কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয় না। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে মার্ক্স,এঙ্গেলস্,লেনিন প্রমুখ মার্ক্সবাদের প্রবক্তারা তাঁদের তত্ত্ব নির্মাণের জন্য নির্ভর করেছেন ব্যাপক ঐতিহাসিক সত্য ও তথ্যের ওপর। এছাড়া মার্ক্সবাদ সম্পূর্ণরূপে নির্বাসন দেয় অধিবিদ্যা (Metaphysics)-কে। উদারনীতিবাদের বস্তুবাদী প্রবক্তারাও সম্পূর্ণরূপে অধিবিদ্যার প্রভাবমুক্ত হতে পারেননি এই অর্থে যে কিছু কিছু উপাদানের শাশ্বত অস্তিত্ব তাঁরা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু মার্ক্সীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ চিরন্তনকে সর্বার্থে অস্বীকার করে অধিবিদ্যাকে বর্জন করেছে এবং ফলত এক বৈজ্ঞানিক সত্তা লাভ করেছে। বস্তুত, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সিদ্ধান্তগুলির কোনটিকেই আধুনিক বিজ্ঞান অস্বীকার করতে পারে নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই সিদ্ধান্তগুলিকে বর্জন করলে প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে মানুষের সভ্যতার এ যাবৎ যে অগ্রগতি ঘটেছে তার কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। এছাড়া দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মধ্যে নিহিত আছে এক গভীর আশাবাদ যা সর্বকালের, সর্বযুগের মানুষকে গুণগত পরিবর্তনলাভের প্রেরণা জোগায়।

ইতিহাসের পটভূমিকায় সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল লক্ষ্য হলেও একথা

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মানুষের অধীনতা ও তা থেকে মুক্তিলাভের গভীর আকুতিই এর মর্মবাণী। একথা অনস্বীকার্য যে একই আকুতির আভাস পাওয়া যায় উদারনীতিবাদী তত্ত্বে। তবে মার্ক্সবাদের কৃতিত্ব এইখানে যে উদারনীতিবাদের মত মার্ক্সবাদ মানুষের বিমূর্ত ধারণার ওপর নির্ভর করে নি। মার্ক্সবাদ দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছে রক্তমাংসের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের ওপর এবং এই মানুষ যুগে যুগে কেমন করে উৎপীড়িত ও শোষিত হয়েছে তার বিশদ বিবরণ দিয়ে তার মুক্তির পথ নির্দেশ করেছে। অবশ্যই উদারনীতিবাদ মানুষের স্বাধীনতা ও সাম্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। তবে এই স্বাধীনতা ও সাম্য মূলত রাজনৈতিক ও আইনগত, অর্থাৎ নিতান্তই আনুষ্ঠানিক। অন্যদিকে মার্ক্সবাদ স্বাধীনতা ও সাম্যের সামাজিক দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং দেখাতে চেয়েছে যে সামাজিক দাসত্বের অবসান না ঘটলে উৎপীড়িতের প্রকৃত বন্দিত্ব ঘোচে না। এছাড়া শ্রেণীর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের বিচার করে মার্ক্সবাদ মানবজীবনের দুটি বাস্তব সত্যকে চিহ্নিত করেছে। প্রথম সত্যটি এই যে মানবসত্তা কোনও বিমূর্ত ও অতীন্দ্রিয় পদার্থ নয়, তা ব্যক্ত হয় মানুষের শ্রমজড়িত কর্মোদ্যোগের মধ্যে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে। দ্বিতীয়ত, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়, নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে থেকেই মানুষ তার ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে পারে।

ইতিহাসের এক সুনির্দিষ্ট গতিসূত্র নিরূপণ মার্ক্সবাদের এক অনন্য অবদান। অবশ্য এর পিছনে জার্মান দার্শনিক হেগেল (Hegel)-এর তত্ত্বের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। তবে হেগেল ইতিহাস পরিক্রমা করেছিলেন ভাববাদী (Idealist) পদ্ধতিতে। অন্যদিকে মার্ক্সবাদ দিয়েছে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। উল্লেখ্য যে এই ইতিহাস-ব্যাখ্যা মার্ক্সবাদে নিছক তাত্ত্বিক ইতিহাসচর্চা হয়েই থাকেনি। এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই মার্ক্সবাদ দিতে পেরেছে পুঁজিবাদের বিনাশ এবং সমাজতন্ত্রের উদ্ভব সম্পর্কে সুস্পষ্ট রূপরেখা। বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব এবং আধুনিক পুঁজিবাদের তীব্র সংকট এই রূপরেখার বাস্তবতাই প্রমাণ করে।

তবে মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনারও অন্ত নেই। অনেকেই একে ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক তত্ত্ব বলে মনে করে থাকেন। মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ এই যে মার্ক্সবাদ মানুষকে নিছক অর্থনৈতিক প্রাণী হিসাবে গণ্য করে তার মহত্তর মানবিক মহিমাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। এই অভিযোগের সপক্ষে বলা হয়ে থাকে যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ (Economic Determinism) ছাড়া আর কিছুই নয় কারণ এই তত্ত্বে দেখানো হয়েছে যে অর্থনৈতিক ভিত্তি উপরি-কাঠামোর নিয়ন্ত্রক অর্থাৎ মানুষের সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় একমাত্র অর্থনীতির দ্বারা। কিন্তু অর্থনীতির সংকীর্ণ পরিমণ্ডলে মানুষের জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। নিছক বেঁচে থাকাটাই মানুষের জীবনের লক্ষ্য নয়, নানা সৃষ্টিশীল চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে নিরন্তর ব্যক্ত হয় তার মহত্ত্ব ও মহিমা যা ঐতিহাসিক বস্তুবাদে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। এই অভিযোগ খণ্ডনের জন্য মার্ক্সবাদের সমর্থকেরা এঙ্গেল্‌সের বিখ্যাত পত্রাবলীর আশ্রয় নেন যেখানে এঙ্গেল্‌স স্বীকার করেছেন যে ভিত্তির মতই অনেক ক্ষেত্রে উপরি-কাঠামোও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য সঠিক মার্ক্সবাদী পদ্ধতি প্রয়োগ করে সহজেই এই বিতর্কের নিষ্পত্তি করা যায়। কারণ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিই হল সঠিক মার্ক্সীয় পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুযায়ী পৃথিবীর সব কিছুই পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত এবং এই বিচারে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে ভিত্তি ও উপরি-কাঠামোর মধ্যে পারস্পরিক দ্বিমুখী সম্পর্ক মার্ক্সবাদ অবশ্যই মেনে নেয়। অর্থাৎ মার্ক্সবাদ অর্থনৈতিক উপাদানের পাশাপাশি অন্যান্য উপাদানের গুরুত্বও অস্বীকার করে না।

উদারনীতিবাদী মানদণ্ডে মার্ক্সবাদের বিচার করে অনেকে এই অভিযোগ করে থাকেন যে মার্ক্সবাদী তত্ত্বানুযায়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবান্তে শ্রমজীবীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে একদলপ্রথা প্রবর্তিত হবে এবং সমগ্র সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে প্রবল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। এর ফলে ক্ষুণ্ণ হবে

গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং বিপন্ন হবে ব্যক্তিস্বাধীনতা। এছাড়া আরও বলা হয়ে থাকে যে মার্ক্সবাদ এক অতি বিপজ্জনক তত্ত্ব কারণ এই তত্ত্ব প্রশ্রয় দেয় সহিংস বিপ্লবকে যার মূল্য হিসাবে মেনে নিতে হয় বহু ক্ষয়-ক্ষতি ও রক্তপাত। বস্তুত, সমাজ পরিবর্তনের উপায় হিসাবে সংস্কারপন্থাই শ্রেয়স্কর কারণ এতে হিংসা ও বিশৃঙ্খলার কোনও অবকাশ নেই। এর উত্তরে মার্ক্সবাদীরা বলে থাকেন যে শ্রমজীবীর একনায়কতন্ত্রে এ যাবৎ শোষিত সংখ্যাধিক শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাই মূল লক্ষ্য এবং যেহেতু এই স্বার্থে কোন বিভিন্নতা নেই সেই কারণে একদলপ্রথাই স্বাভাবিক ও যথোপযুক্ত। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মার্ক্সবাদীদের বক্তব্য হল এই যে শ্রমজীবীর একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রকে সমাজতন্ত্র গড়ার এক বিরাট কর্মযজ্ঞের নেতৃত্ব দিতে হয়, এই কারণেই এই নিয়ন্ত্রণ। তবে এই নিয়ন্ত্রণের অন্তিম উদ্দেশ্য হল এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে প্রকৃত সাম্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্র নিজেই অবলুপ্ত হবে অর্থাৎ অন্তর্হিত হবে সবরকমের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। মার্ক্সবাদীরা আরও স্বীকার করেন যে শ্রমজীবীর একনায়কতন্ত্রের স্তরে রাষ্ট্রের নিগ্রহমূলক ব্যবস্থা অবশ্যই থাকে। তবে এই নিগ্রহ প্রয়োগ করা হয় সংখ্যাল্প পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে যাতে তারা বিপ্লবের দ্বারা আপাত-পরাভূত হয়েও প্রত্যাঘাত হানার মত শক্তিসঞ্চয় না করতে পারে। বিপ্লব সম্পর্কে মার্ক্সবাদীদের বক্তব্য এই যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে হিংসার ব্যবহারের জন্য বিপ্লবী শ্রমজীবী শ্রেণী দায়ী নয়। পুঁজিপতি শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করার বৈপ্লবিক প্রয়াসকে এই শ্রেণী নির্বিবাদে মেনে নেয় না, তারা হিংসার ব্যাপক প্রয়োগের মাধ্যমে এই প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। এই সহিংস প্রতিরোধের মোকাবিলা করার জন্যই প্রয়োজনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হিংসাত্মক রূপ ধারণ করতে বাধ্য হয়।

অনেকে রাষ্ট্রবিলয় সংক্রান্ত মার্ক্সীয় তত্ত্বকে নিতান্ত অবাস্তব ও অলীক বলে মনে করে থাকেন। আধুনিককালের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁরা বলে থাকেন যে এই সব দেশে রাষ্ট্রবিলুপ্তির কোনও সম্ভাবনা তো দেখা দেয়ই নি, বরং এই দেশগুলিতে রাষ্ট্র উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এর উত্তরে মার্ক্সবাদীরা বলে থাকেন যে প্রকৃত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত না হলে রাষ্ট্রের স্বাভাবিক বিলয় ঘটে না এবং এই মুহূর্তে যে সব দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত তারা এখনও চূড়ান্ত সাম্যবাদী স্তরে পৌঁছাতে পারে নি। কাজেই বর্তমানকালের দৃষ্টান্ত দিয়ে মার্ক্সবাদের ভ্রান্তি প্রমাণ করা যায় না। স্তালিনের অভিমতের ওপর নির্ভর করে তাঁরা আরও বলে থাকেন যে একটি যথার্থ সাম্যবাদী দেশ যতক্ষণ পর্যন্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকে সাম্যবাদের সুরক্ষার স্বার্থেই। অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না যে রাষ্ট্রবিলয়ের প্রশ্নে মার্ক্সবাদী তত্ত্ব যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। এঙ্গেল্স্ তাঁর 'Socialism, Utopian and Scientific' গ্রন্থে বলেছিলেন যে রাষ্ট্রবিলয়ের স্তরে মানুষ পরিচালিত সরকারের স্থান গ্রহণ করবে "বস্তুসমূহের প্রশাসন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিচালন" (the administration of things and the discretion of the processes of production)। কিন্তু এই ব্যবস্থা কীভাবে কার্যকর হবে তার কোনও স্পষ্ট পরিকল্পনা মার্ক্সবাদ দিতে পারে নি। তবে মার্ক্সবাদ যেহেতু এক চলমান তত্ত্ব যার শেষ কথা এখনও বলা হয় নি সেই কারণে আশা করা যায় যে আগামী দিনে মার্ক্সবাদ এ বিষয়ে সঠিক নির্দেশ দিতে সক্ষম হবে।

৪। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (Democratic Socialism)

ক) প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ (Main characteristics)

উনিশ শতকের শেষভাগের কিছু চিন্তা ও কর্মের দ্বারা গণতান্ত্রিক সমাজবাদের জন্ম সূচিত হলেও গণতান্ত্রিক সমাজবাদ মূলত বিংশ শতকের তত্ত্ব। দ্বিতীয়ত, উদারনীতিবাদের মতই গণতান্ত্রিক সমাজবাদের জন্মভূমি হল ইংল্যাণ্ড। বস্তুত, ইংরাজ চিন্তাবিদেরাই গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রধান প্রবক্তা এবং ইংল্যাণ্ডের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল লেবার পার্টি (Labour Party)-এর

নিয়ন্ত্রক রাজনৈতিক মতাদর্শ হল গণতান্ত্রিক সমাজবাদ। তৃতীয়ত, তত্ত্ব হিসাবে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ উদারনীতিবাদ ও মার্ক্সবাদের মত মৌলিকতার দাবি করতে পারে না। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রকৃতপক্ষে উদারনীতিবাদ ও মার্ক্সবাদের সংমিশ্রণ। চতুর্থত, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ উদারনীতিবাদকে সংশোধন করতে চায় মার্ক্সবাদ প্রয়োগ করে, আবার মার্ক্সবাদকে সংশোধনের চেষ্টা করে উদারনীতিবাদের দ্বারা। পঞ্চমত, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ মার্ক্সবাদের মতই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার কঠোর সমালোচক, কিন্তু এই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে চায় উদারনীতিবাদী পদ্ধতিতে। ষষ্ঠত, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ মার্ক্সীয় শ্রেণীতত্ত্বে বিশ্বাসী নয়। শ্রেণীসংগ্রামের পরিবর্তে এই তত্ত্ব শ্রেণী সহযোগিতায় আস্থাশীল। সপ্তমত, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ সংসদীয় গণতন্ত্র (Parliamentary Democracy)-এর উপযোগিতা মেনে নেয় এবং রাষ্ট্রবিলয়ের ধারণাটিকে ভ্রান্ত বলে মনে করে। অষ্টমত, মানুষের শুভবুদ্ধি, যুক্তিবাদী মন এবং সদিচ্ছার ওপর গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের অগাধ বিশ্বাস। বস্তুত, এরই ওপর নির্ভর করে সমাজে কাম্য পরিবর্তন আনা সম্ভব বলে তাঁরা মনে করেন। নবমত, মার্ক্সবাদের মতই গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান চায়। তবে এর জন্য সহিংস বিপ্লবের প্রয়োজন আছে বলে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ মনে করে না। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সমাজবাদ মার্ক্সীয় বিপ্লবে বিশ্বাসী নয়। এই তত্ত্বানুযায়ী ধীর গতিতে চলমান ক্রমান্বয়ী সংস্কারই হল সমাজপরিবর্তনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম এবং এটিই হল গণতান্ত্রিক সমাজবাদের দশম বৈশিষ্ট্য।

খ) মূল সূত্র (Basic Principles)

মূলত পুঁজিবাদের বিরোধিতা থেকেই গণতান্ত্রিক সমাজবাদের জন্ম। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ মনে করে যে সামাজিক শোষণ ও বৈষম্য হল পুঁজিবাদের অনিবার্য ফল, কারণ পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদন-উপকরণ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন এবং এই মালিকেরা উৎপাদনের মাধ্যমে মুনাফা সঞ্চয়নে তৎপর থাকে। অন্যদিকে শ্রমিকেরা তাদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করে এই উৎপাদন চালু রাখে, অথচ তারা বঞ্চিত হয় তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ চায় এই অবস্থার পরিবর্তন। অর্থাৎ এই তত্ত্বের মূল লক্ষ্য হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান ঘটানো। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সকল প্রবক্তাই এই লক্ষ্য সম্পর্কে একমত। তবে এই লক্ষ্য পূরণের উপায় সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। বস্তুত, এই মতপার্থক্যের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের দুটি স্বতন্ত্র তাত্ত্বিক ধারা চিহ্নিত করা যায়। এদের একটি হল ফেবিয়ান সমাজবাদ (Fabian Socialism) এবং অন্যটি পূগ-সমাজবাদ বা সংঘ-সমাজবাদ (Guild Socialism)।

১৮৮৪ সনে ইংল্যাণ্ডে 'ফেবিয়ান সোসায়েটি' (Fabian Society) নামে এক বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সময় থেকেই ফেবিয়ান সমাজবাদের তত্ত্ব প্রচারিত হতে থাকে। ফেবিয়ান সমাজবাদের প্রধান প্রধান প্রবক্তা ছিলেন সিড্‌নি ওয়েব (Sidney Webb), বিয়াট্রিস ওয়েব (Beatrice Webb), জর্জ বার্নার্ডশ (George Bernard Shaw), এইচ· জি· ওয়েল্‌স্ (H.G. Wells), গ্র্যাহাম ওয়ালাস্ (Graham Wallas), হ্যারল্ড্ ল্যাস্কি (Harold Laski) এবং আর· এইচ· টনি (R. H. Tawney)।

ফেবিয়ান সমাজবাদ পুঁজিবাদকে এক অন্যায় সমাজব্যবস্থা বলে মনে করে। মুষ্টিমেয়ের হাতে উৎপাদন-উপকরণের মালিকানা থাকার ফলে বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ দারিদ্র্য ও বঞ্চনার শিকার হয়। ফেবিয়ান সমাজবাদীরা মনে করেন যে বিনাশ্রমে উপস্বত্ব ভোগকারী ধনী সম্প্রদায়ের অবস্থিতি ব্যক্ত করে পুঁজিবাদী সমাজের নিদারুণ অবিচার এবং স্বভাবতই তাঁরা চান এই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন। তাঁরা মনে করেন যে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজই ন্যায় ও সুবিচার

সুনিশ্চিত করতে পারে। তবে তাঁদের দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রের অর্থ মজুরিজীবী (Wage earner) -দের মালিকানা অথবা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা নয়। বস্তুত, মজুরিজীবীদের একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত করতে তাঁরা আগ্রহী নন। তাঁরা মনে করেন যে শ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্বিচারে সমগ্র সমাজের কাছে জমি ও শিল্পপুঁজি (industrial capital)- এর মালিকানা স্থানান্তরিত করাই সমাজতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য। এই সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁদের দুটি বিশেষ বক্তব্য আছে। প্রথমত, তাঁরা বিপ্লবের মাধ্যমে এই পরিবর্তন সাধন সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের প্রক্রিয়া হবে ধীরগতি, শান্তিপূর্ণ এবং ক্রমান্বয়িক (gradual)। মানুষের স্বভাবে উন্নতি সম্ভব বলে তাঁরা মনে করেন এবং মানুষের সদিচ্ছার ওপর তাঁদের প্রগাঢ় আস্থা। তাই তাঁরা প্রস্তাব রাখেন যে নিরন্তর শিক্ষা ও প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার দরকার এবং এইভাবেই সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের সপক্ষে এক প্রবল জনমত গড়ে উঠবে যা সমাজতন্ত্রের উদ্ভবকে ত্বরান্বিত করবে। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যোগ্যতম মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের মতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হল জনগণের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি ও অভিভাবক এবং এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র উৎপাদন ও সম্পদবণ্টনের ওপর যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে স্বভাবতই সমাজের মালিকানার ধারণাকে বাস্তবায়িত করে তুলতে পারে। এইভাবেই ফেবিয়ান সমাজবাদ সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে।

ফেবিয়ান সমাজবাদের সাফল্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ ও হতাশা থেকেই পূগ-সমাজবাদ বা সংঘ-সমাজবাদের জন্ম হয় ইংল্যাণ্ডে। এই তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন এ· জে· পেন্টি (A. J. Penty), এ· আর· অরেজ (A. R. Orage), এস, জি, হব্‌সন (S. G. Hobson) এবং জি· ডি· এইচ· কোল (G. D. H. Cole)। ফেবিয়ান সমাজবাদের মতই সংঘ-সমাজবাদ ছিল পুঁজিবাদের প্রবল বিরোধী। মার্ক্সবাদের মতই সংঘ-সমাজবাদ মনে করে যে শ্রমিকের উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাতের মাধ্যমে পুঁজিবাদী সমাজে শোষণ চলে অব্যাহত গতিতে এবং ফেবিয়ান সমাজবাদের মতই সংঘ-সমাজবাদ পুঁজিবাদী সমাজের পরিবর্তন চায়। আবার মার্ক্সবাদের বিরোধিতা করে এবং ফেবিয়ান সমাজবাদের সঙ্গে একমত হয়ে সংঘ-সমাজবাদ বিশ্বাস রাখে শান্তিপূর্ণ ও ক্রমান্বয়িক সংস্কার পদ্ধতিতে। তবে ফেবিয়ান সমাজবাদের সঙ্গে সংঘ-সমাজবাদের পার্থক্যও যথেষ্ট স্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ। ফেবিয়ান সমাজবাদ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রধান মাধ্যম বলে মনে করে। অন্যদিকে সংঘ-সমাজবাদ রাষ্ট্রক্ষমতায় আস্থাশীল নয়। সংঘ-সমাজবাদ বিশ্বাসী ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ (decentralisation)- এ। সংঘ-সমাজবাদীরা মনে করেন যে আধুনিক শ্রমিক সমিতি (Trade Union)- গুলিকে মধ্যযুগের ইয়োরোপে ব্যবসায় ও কারিগরিতে প্রচলিত গিল্ড-এর ধাঁচে পুনর্বিন্যস্ত করতে পারলে এই সংঘগুলিই হবে সমাজতন্ত্র সুনিশ্চিত করার প্রধান মাধ্যম।

সংঘ-সমাজবাদী তত্ত্বানুযায়ী পুঁজিবাদী সমাজের চূড়ান্ত ব্যর্থতা প্রতিফলিত হয় পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে অবস্থিত বিরাট ব্যবধানে। সংঘ-সমাজবাদীরা মনে করেন যে এই দুঃখজনক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য শ্রমিক সমিতিগুলির কাছে শিল্পের মালিকানা ও পরিচালনা স্থানান্তরিত করা একান্ত আবশ্যক। অবশ্য তার আগে শ্রমিক সমিতিগুলিকে মধ্যযুগীয় গিল্ড্ বা সংঘের ধাঁচে পরিবর্তিত করা দরকার। অর্থাৎ কায়িক শ্রম দান করেন এমন শ্রমিকেরাই শুধুমাত্র শ্রমিক সমিতির সদস্য হবেন না। কায়িক শ্রম করেন এমন ব্যক্তি, মানসিক শ্রম করেন এমন ব্যক্তি এবং ব্যবস্থাপন (management) -এর কাজে রত থাকেন এমন ব্যক্তি—এই সকল শ্রেণীর কর্মীই হবেন গিল্ডের সদস্য। এক একটি শিল্পে এক একটি গিল্ড্ থাকবে এবং সেই শিল্প পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব থাকবে এই গিল্ডের হাতে। কর্মীরা আর শুধুমাত্র মজুরীজীবীই থাকবেন না। তাঁদের প্রত্যেকেই হবেন সেই

শিল্প প্রতিষ্ঠানের অংশীদার।

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাসী বলে সংঘ-সমাজবাদ রাষ্ট্রসংগঠন সম্পর্কেও ভিন্নমত পোষণ করে। রাষ্ট্রে সর্বময় কর্তৃত্ব সংঘ-সমাজবাদ সমর্থন করে না ; এই তত্ত্ব রাষ্ট্রকে সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম বলে মনে করে এবং স্বভাবতই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে মনে করে। এছাড়া সংঘ-সমাজবাদ ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিত্তিতে আইনসভার প্রতিনিধি নির্বাচন সমর্থন করে না। সংঘ-সমাজবাদীদের মত এই যে কোনও ব্যক্তিই অন্য ব্যক্তিদের প্রতিনিধি হতে পারে না, সে শুধু প্রতিনিধিত্ব করতে পারে একটি বিশেষ স্বার্থ বা পেশাকে। এই কারণেই সংঘ-সমাজবাদ বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা (Functional Representation)- কে আদর্শ ব্যবস্থা বলে গণ্য করে। এককথায়, সংঘ-সমাজবাদের মূল সিদ্ধান্ত এই যে সমগ্র শিল্পব্যবস্থা শক্তিশালী গিল্ড্‌গুলি দ্বারা পরিচালিত হলে এবং বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত আইনসভা কর্মরত থাকলে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে।

গ) মূল্যায়ন (Evaluation)

উদারনীতিবাদী বিচারের মানদণ্ডে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ এক নিরাপদ অথচ বিশেষ কার্যকর তত্ত্বরূপে পরিগণিত হয়। যাঁরা উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাঁরা গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সুফল সম্পর্কে খুবই আশাবাদী। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংগঠনের উপযোগিতা স্বীকার করে নেয় বলে যুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে যে উদারনীতিবাদের সমস্ত গুণই গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বর্তমান। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সমাজবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় এক মুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ যেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত, যেখানে সর্বাত্মক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তির অধিকারকে খর্ব করে না এবং যেখানে মুক্ত রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার শর্তাদি বজায় থাকে। আবার আরও বলা হয় যে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ উদারনীতিবাদের সাফল্যের অংশীদার হলেও তার ব্যর্থতা থেকে মুক্ত। অর্থাৎ সামাজিক সম্পদের সমবণ্টনের কোনও সুষ্ঠু নীতি প্রণয়ণে উদারনীতিবাদ ব্যর্থ হওয়ায় সামাজিক সাম্যের কোনও নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় না উদার-নীতিবাদী তত্ত্বে। এই বিচারে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ এক সফল তত্ত্ব কারণ সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার উপায় উদ্ভাবন করে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ সমাজতন্ত্রের পথ নির্দেশ করে। তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে এক নিরাপদ তত্ত্বরূপে গণ্য করা হয়। যেহেতু এই তত্ত্ব সহিংস বিপ্লবের পথ পরিহার করে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজপরিবর্তনের লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয় সেইহেতু বলা হয় যে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রয়োগের মাধ্যমে কোনও বিশৃঙ্খলা এবং ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।

তবে মার্ক্সবাদের প্রবক্তারা গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে সোনার পাথর বাটি বলে উপহাস করে থাকেন। তাঁদের মতে, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থাকে অপসারিত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয় বটে, কিন্তু বাস্তবে এই প্রতিশ্রুতি নিতান্তই অর্থহীন। কারণ গণতান্ত্রিক সমাজবাদ এক গুরুতর স্ববিরোধিতার দোষে দুষ্ট। মার্ক্সবাদী মানদণ্ডের বিচারে সমগ্র উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পুঁজিবাদী সমাজেরই উপরি-কাঠামো অর্থাৎ এই রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হল পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকেই সুরক্ষিত করা। এককথায়, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংগঠন পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অতন্দ্র প্রহরী। অথচ সেই রাষ্ট্রসংগঠনের সাহায্যেই গণতান্ত্রিক সমাজবাদ পুঁজিবাদের বিনাশ ঘটিয়ে নিয়ে আসতে চায় সমাজতন্ত্র এবং এখানেই লক্ষ করা যায় গণতান্ত্রিক সমাজবাদের স্ববিরোধিতা। এই স্ববিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে মার্ক্সবাদীদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে তত্ত্ব হিসাবে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই কারণ গণতান্ত্রিক সমাজবাদ একহাতে সমাজতন্ত্রকে আবাহন করে অন্য হাত দিয়ে তাকে বিসর্জন দেয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহজপাঠ

দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ১

সংবিধান

১। সংবিধানের প্রকৃতি ও সংজ্ঞা (Nature and definition of the Constitution)

প্রতিটি সুপরিচালিত রাষ্ট্রে একটি করে সংবিধান বা শাসনতন্ত্র থাকে। যে কোনও প্রকার সংবিধান ব্যতীত কোনও সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। কোনও রাষ্ট্রে সরকারের কার্যকলাপ ও সরকারের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক পরিচালনা বিষয়ে নিয়মকানুন প্রচলিত না থাকলে ঐ রাষ্ট্রে অনিবার্যভাবে অরাজকতা দেখা দেবে। তবে এই সব নিয়মকানুন যে সর্বদা লিখিত হতে হবে এরূপকোনওবাধ্যবাধকতা নেই। সরকার ও জনগণের ওপর এই নিয়মকানুনসমূহ প্রয়োগ করা সম্ভব হলেই যথেষ্ট। কোনও রাষ্ট্রে প্রচলিত সাংবিধানিক নিয়মকানুনসমূহ লিখিতই হোক আর অলিখিতই হোক, স্বীকৃত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য আবশ্যক নিয়মকানুনের সমষ্টিকে সাধারণভাবে সংবিধান বলা হয়। সংবিধানের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র তার আদর্শ ও উদ্দেশ্যসমূহকে রূপায়িত করতে পারে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানের মধ্যে বাহ্যত কয়েকটি সাদৃশ্য দেখা গেলেও, প্রতিটি রাষ্ট্রের সংবিধানের নিজস্ব কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকে। প্রতিটি রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক পটভূমিকা, ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশকে কেন্দ্র করে সংবিধান গড়ে ওঠে। এই কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানের প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। ব্রিটেন ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহে একটি দলিলে সরকার পরিচালনার নীতি ও বিষয়সমূহকে লিখিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এইরূপ লিখিত দলিল সংবিধান রূপে পরিচিত। ১৭৮৭ সনে প্রবর্তিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান, ১৯৫০ সনে প্রবর্তিত ভারতের সংবিধান, ১৯৭৭ সনে প্রবর্তিত সোভিয়েত সংবিধান ও ১৯৮২ সনের গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সংবিধানকে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্রিটেনে কোনও একটি নির্দিষ্ট দলিলে সংবিধান সন্নিবিষ্ট নেই বলে ফরাসী লেখক টকভিল (Tocqueville) বলেছেন যে ব্রিটেনে কোনও সংবিধানের অস্তিত্ব দেখা যায় না। কিন্তু এরূপ অভিমত যথার্থ নয়। যতই বিস্তারিত হোক না কেন একটি দলিলে কোনও রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় উল্লেখ করা সম্ভব নয়। একটি দলিলের পরিবর্তে বহু উৎস থেকে ব্রিটিশ সংবিধানের সন্ধান মেলে। এই উৎসগুলি হল ঐতিহাসিক দলিলসমূহ, পার্লামেন্ট প্রণীত আইন, বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত, আইনজ্ঞদের অভিমত, প্রথা ও প্রচলিত রীতিনীতি ইত্যাদি।

সংকীর্ণ অর্থে সংবিধান বলতে কেবলমাত্র লিখিত নিয়মকানুনসমূহকে বোঝায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সংবিধান বলতে লিখিত ও অলিখিত, আইনগত ও আইন বহির্ভূত সকল রকম নিয়মকানুনকে বোঝায়। প্রচলিত রীতিনীতি, প্রথা, আচারব্যবহার প্রভৃতিকে অলিখিত নিয়মকানুন বলে গণ্য করা যায়। এইগুলি আদালতের সাহায্যে বলবৎ করা না গেলেও প্রতিটি রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনাসংক্রান্ত বিষয়ে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সুতরাং কোনও রাষ্ট্রের সংবিধানকে সঠিকভাবে জানতে গেলে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট দলিলে উল্লেখিত বিষয়বস্তুসমূহ বিশ্লেষণ করাই যথেষ্ট নয়। ঐ দেশের শাসন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে যে সকল প্রথা বা রীতিনীতি গড়ে উঠেছে, সংবিধানকে ব্যাখ্যা করে বিচারবিভাগ যে সব রায় প্রদান করেছে, সংবিধানকে সুস্পষ্ট করার জন্য আইনসভা যে সব আইন প্রণয়ন করেছে—সেগুলিও বিচার বিবেচনা করা প্রয়োজন। অধ্যাপক হোয়্যার (Wheare)-এর মতে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের শাসনব্যবস্থা আইনগত ও আইন-বহির্ভূত

নিয়মকানুনের সংমিশ্রণ এবং এরূপ নিয়মকানুনের সংগ্রহকেই সংবিধান বলা সম্ভব (In most countries of the world the system of government is composed of the mixture of legal and non-legal rules and it is possible to speak of this collection as 'the Constitution')

কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক প্রদত্ত সংবিধানের সংজ্ঞা আলোচনা করলে সংবিধানের প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce)-এর মতে "সংবিধান হল সেই সকল আইন ও প্রথার সমষ্টি যেগুলির নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের জীবন প্রবাহিত হয়" (Constitution is the aggregate of laws and customs under which the life of the State goes on)।

জোসেফ লাপালোমবারা (Joseph Lapalombara) বলেন যে "কোনও জাতির সংবিধানকে সামগ্রিকভাবে তার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থাসমূহ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে, যেগুলি হল তার ক্ষমতা প্রয়োগের যন্ত্রসমূহ" (A nation's constitution may be viewed as the totality of its political institutional arrangements, which are its tools for the exercise of power)।

মার্কসীয়-লেনিনীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংবিধান হল "কোনও দেশের মৌলিক আইন, যাতে তার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠন, নির্বাচন ব্যবস্থার নীতিসমূহ, সরকারী সংস্থাসমূহের গঠন ও নাগরিকদের মৌল অধিকার ও কর্তব্যসমূহকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়" (The fundamenatl law of a country defining its social and state organization, the principles of the electoral system, the structure of government bodies and the basic rights and duties of citizens)

সংবিধানের মাধ্যমে তিন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করা হয়ে থাকে। প্রথমত, সমাজ যে সমস্ত স্বার্থ ও গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত তাদের সংঘবদ্ধ করা ও আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করার একটি মাধ্যম হল সংবিধান। দ্বিতীয়ত, মানুষের শরীরের কাঠামো যে উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে সংবিধানও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সেই উদ্দেশ্য সাধন করে। সংবিধানের মাধ্যমে একটি দৃঢ় অবয়ব সৃষ্ট হয় যাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আবর্তিত হয়ে থাকে। গঠন প্রণালী রূপে সংবিধান হল সরকারী ক্ষমতা ও কার্যাবলী এবং ব্যক্তিগত অধিকার ও দায়িত্বের সংমিশ্রণ। কোনও সমাজে কোনও বিশেষ ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের অন্তরালে যে সব নৈতিক ও দার্শনিক নীতিসমূহ কাজ করে সেগুলিও আবার অনেকসময় সংবিধানে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তৃতীয়ত, সংবিধান আইনের প্রাধান্যকে প্রকাশ করে। সংবিধান হল দেশের চরম আইনের মূর্ত প্রকাশ ও অন্যান্য সমস্ত আইনের উৎস। সুতরাং কোনও রাষ্ট্রের সংবিধানকে সমাজ, রাজনীতি ও আইন এই তিন দিক দিয়ে বিচার করা যেতে পারে।

সংবিধানের প্রকৃতি, সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে তার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় :

প্রথমত, সংবিধানের ধারণা মূলত একটি আইনগত ধারণা। এই জন্য সংবিধানের একটি আইনগত মূল্য বা তাৎপর্য দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, প্রকৃত অর্থে সংবিধান বলতে কোনও রাষ্ট্রের সরকারকে পরিচালনা করে এরূপ আইনগত ও আইন-বহির্ভূত সমস্ত নিয়মকানুনকেই বোঝায়। তৃতীয়ত, কোনও দেশের সংবিধান হল ঐ দেশের মৌলিক আইন। কারণ রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য সংবিধান অপরিহার্য। এইজন্য সাধারণ আইন অপেক্ষা সংবিধানে উল্লেখিত বিষয়সমূহকে অধিক গুরুত্ব ও মর্যাদা দেওয়া হয়। চতুর্থত, সংবিধানসমূহ সর্বদা গতিশীল বা পরিবর্তনশীল। কোন সংবিধানই স্থিতিশীল নয়। যে কোনও সময়ে প্রয়োজন হলে যে কোনও রাষ্টের সংবিধান

সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে পরিবর্তন করা যায়। আবার মূল সাংবিধানিক দলিল অপরিবর্তিত থাকলেও অনেকসময় যুগ ও সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব শাসনক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

২। সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Constitutions)

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। গতানুগতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সংবিধানসমূহকে (ক) লিখিত ও অলিখিত এবং (খ) সুপরিবর্তনীয় বা নমনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় বা অনমনীয় এই দুভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) লিখিত ও অলিখিত সংবিধান (Written and Unwritten Constitutions)

যখন রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনাসংক্রান্ত মৌলিক নীতিসমূহের অধিকাংশই এক বা একাধিক দলিলে লিপিবদ্ধ তখন তাকে বলা হয় লিখিত সংবিধান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত। সাধারণত কোনও সংবিধান পরিষদ (Constituent Assembly) বা সম্মেলনে (Convention) আলোচনা করে লিখিত সংবিধান রচনা ও গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে যখন কোনও রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা সংক্রান্ত মৌলিক নীতিসমূহের অধিকাংশই ঐ রাষ্ট্রে প্রচলিত রীতিনীতি, প্রথা, সাধারণ আইন, আদালতের সিদ্ধান্ত ইত্যাদিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তখন তাকে অলিখিত সংবিধান বলে। অলিখিত সংবিধান কোনও নির্দিষ্ট সময়ে কোনও সংবিধান পরিষদ বা সম্মেলনে রচনা করা হয় না। এরূপ সংবিধান বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। বর্তমানে ব্রিটেনের সংবিধান হল অলিখিত সংবিধানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তবে বর্তমানে অনেকে লিখিত ও অলিখিত এই দুভাগে সংবিধানসমূহকে ভাগ করার রীতিকে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেন না। কারণ লিখিত সংবিধান যত বৃহৎ আকৃতিবিশিষ্টই হোক না কেন বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঐ সংবিধানকে অলিখিত নিয়মকানুন মানতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের কোনও স্থানেই ক্যাবিনেটের বিষয় উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু সংবিধান প্রচলিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত রাষ্ট্রপতিরাই ক্যাবিনেট গঠন করে থাকেন। সুতরাং মার্কিন ক্যাবিনেট সম্পূর্ণরূপে প্রথাগত বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের সংবিধান পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম লিখিত সংবিধান হলেও এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে সংবিধানে স্পষ্ট করে কিছুই বলা হয় নি। অতএব ঐ বিষয়গুলি প্রথাগত বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ভারতের সংবিধানে কোথাও উল্লেখ করা নেই যে সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করবেন। কিন্তু সংসদীয় শাসনব্যবস্থার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। বস্তুত কোনও লিখিত সংবিধানেই শাসনকার্য পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। যেমন অধিকাংশ লিখিত সংবিধানেই নির্বাচন বা সরকারী আমলাদের বিষয়ে কোন উল্লেখ দেখা যায় না। বর্তমান যুগে রাজনৈতিক দলসমূহ যে কোনও দেশের শাসনব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেও অধিকাংশ রাষ্ট্রের সংবিধানেই দলব্যবস্থা সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ উল্লেখ দেখা যায় না।

আবার ব্রিটেনের সংবিধান প্রধানত অলিখিত হলেও সেখানে কতকগুলি পার্লামেন্ট প্রণীত আইন, দলিল ও ভাষ্যকে সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে গণ্য করা হয়। এইরূপে ১৯১১ ও ১৯৪৯ সনের পার্লামেন্ট আইনসমূহ, ১৯৭২ সনের স্থানীয় সরকার আইন, অধিকারের সনদ, ব্ল্যাকস্টোনের (Blackstone) Commentaries on the Laws of England, বেজহট (Bagehot)-এর The English Constitution প্রভৃতিকে মৌলিক প্রাধান্য দেওয়া হয়ে

নিয়মকানুনের সংমিশ্রণ এবং এরূপ নিয়মকানুনের সংগ্রহকেই সংবিধান বলা সম্ভব (In most countries of the world the system of government is composed of the mixture of legal and non-legal rules and it is possible to speak of this collection as 'the Constitution')

কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক প্রদত্ত সংবিধানের সংজ্ঞা আলোচনা করলে সংবিধানের প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce)-এর মতে "সংবিধান হল সেই সকল আইন ও প্রথার সমষ্টি যেগুলির নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের জীবন প্রবাহিত হয়" (Constitution is the aggregate of laws and customs under which the life of the State goes on)।

জোসেফ লাপালোমবারা (Joseph Lapalombara) বলেন যে "কোনও জাতির সংবিধানকে সামগ্রিকভাবে তার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থাসমূহ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে, যেগুলি হল তার ক্ষমতা প্রয়োগের যন্ত্রসমূহ" (A nation's constitution may be viewed as the totality of its political institutional arrangements, which are its tools for the exercise of power)।

মার্কসীয়-লেনিনীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংবিধান হল "কোনও দেশের মৌলিক আইন, যাতে তার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠন, নির্বাচন ব্যবস্থার নীতিসমূহ, সরকারী সংস্থাসমূহের গঠন ও নাগরিকদের মৌল অধিকার ও কর্তব্যসমূহকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়" (The fundamenatl law of a country defining its social and state organization, the principles of the electoral system, the structure of government bodies and the basic rights and duties of citizens)

সংবিধানের মাধ্যমে তিন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করা হয়ে থাকে। প্রথমত, সমাজ যে সমস্ত স্বার্থ ও গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত তাদের সংঘবদ্ধ করা ও আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করার একটি মাধ্যম হল সংবিধান। দ্বিতীয়ত, মানুষের শরীরের কাঠামো যে উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে সংবিধানও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সেই উদ্দেশ্য সাধন করে। সংবিধানের মাধ্যমে একটি দৃঢ় অবয়ব সৃষ্ট হয় যাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আবর্তিত হয়ে থাকে। গঠন প্রণালী রূপে সংবিধান হল সরকারী ক্ষমতা ও কার্যাবলী এবং ব্যক্তিগত অধিকার ও দায়িত্বের সংমিশ্রণ। কোনও সমাজে কোনও বিশেষ ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের অন্তরালে যে সব নৈতিক ও দার্শনিক নীতিসমূহ কাজ করে সেগুলিও আবার অনেকসময় সংবিধানে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তৃতীয়ত, সংবিধান আইনের প্রাধান্যকে প্রকাশ করে। সংবিধান হল দেশের চরম আইনের মূর্ত প্রকাশ ও অন্যান্য সমস্ত আইনের উৎস। সুতরাং কোনও রাষ্ট্রের সংবিধানকে সমাজ, রাজনীতি ও আইন এই তিন দিক দিয়ে বিচার করা যেতে পারে।

সংবিধানের প্রকৃতি, সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে তার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় :

প্রথমত, সংবিধানের ধারণা মূলত একটি আইনগত ধারণা। এই জন্য সংবিধানের একটি আইনগত মূল্য বা তাৎপর্য দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, প্রকৃত অর্থে সংবিধান বলতে কোনও রাষ্ট্রের সরকারকে পরিচালনা করে এরূপ আইনগত ও আইন-বহির্ভূত সমস্ত নিয়মকানুনকেই বোঝায়। তৃতীয়ত, কোনও দেশের সংবিধান হল ঐ দেশের মৌলিক আইন। কারণ রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য সংবিধান অপরিহার্য। এইজন্য সাধারণ আইন অপেক্ষা সংবিধানে উল্লেখিত বিষয়সমূহকে অধিক গুরুত্ব ও মর্যাদা দেওয়া হয়। চতুর্থত, সংবিধানসমূহ সর্বদা গতিশীল বা পরিবর্তনশীল। কোন সংবিধানই স্থিতিশীল নয়। যে কোনও সময়ে প্রয়োজন হলে যে কোনও রাষ্ট্রের সংবিধান

সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে পরিবর্তন করা যায়। আবার মূল সাংবিধানিক দলিল অপরিবর্তিত থাকলেও অনেকসময় যুগ ও সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব শাসনক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

২। সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Constitutions)

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। গতানুগতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সংবিধানসমূহকে (ক) লিখিত ও অলিখিত এবং (খ) সুপরিবর্তনীয় বা নমনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় বা অনমনীয় এই দুভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) লিখিত ও অলিখিত সংবিধান (Written and Unwritten Constitutions)

যখন রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনাসংক্রান্ত মৌলিক নীতিসমূহের অধিকাংশই এক বা একাধিক দলিলে লিপিবদ্ধ তখন তাকে বলা হয় লিখিত সংবিধান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত। সাধারণত কোনও সংবিধান পরিষদ (Constituent Assembly) বা সম্মেলনে (Convention) আলোচনা করে লিখিত সংবিধান রচনা ও গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে যখন কোনও রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা সংক্রান্ত মৌলিক নীতিসমূহের অধিকাংশই ঐ রাষ্ট্রে প্রচলিত রীতিনীতি, প্রথা, সাধারণ আইন, আদালতের সিদ্ধান্ত ইত্যাদিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তখন তাকে অলিখিত সংবিধান বলে। অলিখিত সংবিধান কোনও নির্দিষ্ট সময়ে কোনও সংবিধান পরিষদ বা সম্মেলনে রচনা করা হয় না। এরূপ সংবিধান বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। বর্তমানে ব্রিটেনের সংবিধান হল অলিখিত সংবিধানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তবে বর্তমানে অনেকে লিখিত ও অলিখিত এই দুভাগে সংবিধানসমূহকে ভাগ করার রীতিকে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেন না। কারণ লিখিত সংবিধান যত বৃহৎ আকৃতিবিশিষ্টই হোক না কেন বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঐ সংবিধানকে অলিখিত নিয়মকানুন মানতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের কোনও স্থানেই ক্যাবিনেটের বিষয় উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু সংবিধান প্রচলিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত রাষ্ট্রপতিরাই ক্যাবিনেট গঠন করে থাকেন। সুতরাং মার্কিন ক্যাবিনেট সম্পূর্ণরূপে প্রথাগত বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের সংবিধান পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম লিখিত সংবিধান হলেও এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে সংবিধানে স্পষ্ট করে কিছুই বলা হয় নি। অতএব ঐ বিষয়গুলি প্রথাগত বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ভারতের সংবিধানে কোথাও উল্লেখ করা নেই যে সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করবেন। কিন্তু সংসদীয় শাসনব্যবস্থার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। বস্তুত কোনও লিখিত সংবিধানেই শাসনকার্য পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। যেমন অধিকাংশ লিখিত সংবিধানেই নির্বাচন বা সরকারী আমলাদের বিষয়ে কোন উল্লেখ দেখা যায় না। বর্তমান যুগে রাজনৈতিক দলসমূহ যে কোনও দেশের শাসনব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেও অধিকাংশ রাষ্ট্রের সংবিধানেই দলব্যবস্থা সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ উল্লেখ দেখা যায় না।

আবার ব্রিটেনের সংবিধান প্রধানত অলিখিত হলেও সেখানে কতকগুলি পার্লামেন্ট প্রণীত আইন, দলিল ও ভাষ্যকে সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে গণ্য করা হয়। এইরূপে ১৯১১ ও ১৯৪৯ সনের পার্লামেন্ট আইনসমূহ, ১৯৭২ সনের স্থানীয় সরকার আইন, অধিকারের সনদ, ব্ল্যাকস্টোনের (Blackstone) Commentaries on the Laws of England, বেজহট (Bagehot)-এর The English Constitution প্রভৃতিকে মৌলিক প্রাধান্য দেওয়া হয়ে

থাকে। এই কারণে হার্ভে ও বেথার (Harvey and Bather)-এর মতে ব্রিটেনে অলিখিত সংবিধান প্রচলিত আছে একথা না বলে ব্রিটেনে 'কোনও লিখিত সংবিধান নেই' এই কথা বলাই অধিক সঙ্গত ("It is... more accurate to say that Britain has 'no written Constitution' than to say she has an unwritten one")।

(খ) সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান (Flexible and Rigid Constitutions)

সংবিধানসমূহকে লিখিত ও অলিখিত এই দুভাগে ভাগ করাকে অযৌক্তিক মনে করে অনেকে তাদের সুপরিবর্তনীয় বা নমনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় বা অনমনীয় এই দুভাগে ভাগ করার পক্ষপাতী। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) সর্বপ্রথম সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতিকে ভিত্তি করে সংবিধানসমূহকে সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় এই দুভাগে ভাগ করেন। আইনসভা যদি সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে সংবিধান সংশোধন করতে সমর্থ হয় তবে সেই সংবিধানকে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, যে সব রাষ্ট্রে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান প্রচলিত থাকে সেখানে সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ও সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির মধ্যে কোনরকম পার্থক্য করা হয় না। সাধারণ আইনের মত সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিলও সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পাস করা হয়। ব্রিটেনের সংবিধান সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

যে সকল সংবিধান সংশোধন করার জন্য আইনসভাকে একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় সেগুলিকে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলা হয়। সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতি অনুসারে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থনে সংবিধান সংশোধনের জন্য আইনসভার বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থন ছাড়াও জনগণের অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারসমূহের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়ে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধানও দুষ্পরিবর্তনীয়। সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ভারতের সংবিধান আংশিকভাবে সুপরিবর্তনীয় এবং আংশিকভাবে দুষ্পরিবর্তনীয়।

(গ) লোয়েনস্টাইন প্রদত্ত সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Constitutions as depicted by Loewenstein)

আধুনিক কালে লোয়েনস্টাইন একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে সংবিধানসমূহকে (১) মৌলিক (Original) ও মৌলিকতাবিহীন বা আহৃত (Derivative); (২) নীতিগত কার্যসূচীভিত্তিক (Ideologically programmatic) ও আদর্শনিরপেক্ষ (Neutral) বা উপযোগিতামূলক (Utilitarian) এবং (৩) আদর্শ (Normative), নামসর্বস্ব (Nominal) এবং শব্দগত অর্থযুক্ত (Semantic) এই তিন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন।

যে সকল সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগ ও আদর্শসমূহকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে একটি অভিনব প্রচেষ্টা করা হয় সেগুলিকে মৌলিক সংবিধান বলা যায়। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রের সংবিধান এই শ্রেণীভুক্ত। অপর পক্ষে যে সকল রাষ্ট্রের সংবিধানে কোনও অভিনব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না, যেগুলি প্রধানত অন্যান্য রাষ্ট্রের অনুকরণে রচিত সেগুলিকে মৌলিকতাবিহীন সংবিধানরূপে আখ্যা দেওয়া যায়। ভারত, জাপান, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি রাষ্ট্রের সংবিধান এই শ্রেণীভুক্ত।

যে সব সংবিধান কতকগুলি নীতি ও আদর্শকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সেগুলিকে নীতিগত কার্যসূচীভিত্তিক সংবিধান বলা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সংবিধান দুটিকে এরূপ সংবিধান বলা চলে। অন্যদিকে যে সকল সংবিধান কোনও বিশেষ আদর্শ দ্বারা তাদের বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত না করে সাধারণভাবে রাষ্ট্রে প্রচলিত সামাজিক ও রাজনৈতিক

প্রতিষ্ঠানগুলিকে বজায় রাখার চেষ্টা করে সেগুলিকে নিরপেক্ষ বা উপযোগিতামূলক সংবিধান বলে গণ্য করা হয়। এই ধরনের সংবিধানে কেবলমাত্র সরকারের বিভিন্ন বিভাগের গঠন, ক্ষমতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করা হয়।

সংবিধানসমূহের তাত্ত্বিক মূল্যায়নের জন্য কোনও নির্দিষ্ট সংবিধান রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের সাথে কতদূর সঙ্গতিপূর্ণ তা বিচার করা আবশ্যক। কেবলমাত্র আইনগত কার্যকারিতার সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না করে, কোনও সংবিধানের আদর্শ বাস্তব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার জন্য সমগ্র জাতি যদি ঐ সংবিধানকে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে গ্রহণ করে তবে তাকে আদর্শ সংবিধান বলা যায়। ব্রিটেন ও সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধানকে আদর্শ সংবিধান বলে গণ্য করা যায়। আবার আইনগত দিক দিয়ে কোনও সংবিধান বলবৎযোগ্য হলেও সংবিধানে উল্লেখিত বিষয়সমূহের সঙ্গে যদি যে বাস্তব পরিবেশে ঐ সংবিধান প্রয়োগ করা হয় তার কোন সঙ্গতি না থাকে তবে ঐ সংবিধানকে নামসর্বস্ব সংবিধান বলা যায়।

রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের প্রচলিত কেন্দ্রগুলির অস্তিত্ব আইনসঙ্গত করা এবং সেগুলিকে স্থায়ীভাবে টিকিয়ে রাখাই যদি কোনও সংবিধানের মূল লক্ষ্য হয় তবে ঐ সংবিধানকে শব্দগত অর্থে সংবিধান বলে আখ্যা দেওয়া চলে। লোয়েনস্টাইনের মতে সাম্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের সংবিধানসমূহ এই শ্রেণীভূক্ত।

(ঘ) বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর সংবিধান (Bourgeois and Working class Constitutions)

ইমরে কোভাক্স (Imre Kovaks) মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানসমূহকে বুর্জোয়া সংবিধান ও শ্রমিকশ্রেণীর সংবিধান এই দুভাগে বিভক্ত করেছেন। যে সংবিধানের মাধ্যমে আধুনিক কোনও রাষ্ট্রে উৎপাদনের উপাদানগুলির নিয়ন্ত্রণকারী মালিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা হয় তাকে বুর্জোয়া সংবিধান বলা চলে। অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করাই হল যে সংবিধানের মূল লক্ষ্য তাকে শ্রমিকশ্রেণীর সংবিধান বলা হয়। অনেক লেখক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে বুর্জোয়া সংবিধানরূপে গণ্য করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সংবিধান দুটিকে শ্রমিকশ্রেণীর সংবিধান রূপে গণ্য করা যেতে পারে।

৩। লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের মধ্যে মূল পার্থক্য (Distinction between Written and Unwritten Constitutions)

কোনও সংবিধানের মূলনীতি ও আদর্শসমূহ একটি মাত্র দলিলে লিপিবদ্ধ করা হলে তাকে লিখিত সংবিধান বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান (১৭৮৭) প্রথম লিখিত সংবিধান। ভারতের সংবিধান পৃথিবীর বৃহত্তম লিখিত সংবিধান। কোনও সংবিধানের নীতি ও আদর্শসমূহ যদি একটি নির্দিষ্ট দলিলে লিপিবদ্ধ না থাকে তবে তাকে অলিখিত সংবিধান বলা হয়। ব্রিটেনের সংবিধান হল অলিখিত। দীর্ঘ ইতিহাস সম্বলিত এই সংবিধানকে সংবিধানসমূহের মধ্যে মাতৃস্থানীয়ারূপে আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

পার্থক্য (Distinction)—লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের মধ্যে মূল পার্থক্য হল এরূপ :

প্রথমত, লিখিত সংবিধানসমূহ প্রবর্তন করার পিছনে কয়েকটি কারণ দেখা যায়। (ক) যখন কোনও জাতি নতুনভাবে তাদের রাজনৈতিক জীবন শুরু করে তখন লিখিত সংবিধান প্রচলন করা হয়। যেমন, ১৯৪৭ সনে স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫০ সনে ভারতের সংবিধান প্রবর্তন করা হয়। (খ) কোনও রাষ্ট্রে বিভিন্ন বর্ণ, ধর্ম ও ভাষাভাষী জনগণ বসবাস করলে তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য লিখিত সংবিধান প্রবর্তন করা হয়ে থাকে। সুইজারল্যাণ্ড, সোভিয়েত

ইউনিয়ন ও ভারতে লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যসাধন করা হয়েছে। (গ) বৃহদায়তন রাষ্ট্রসমূহে দেশের বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী জনগণের বিশেষ স্বার্থ ও প্রয়োজন মেটানো দূরে অবস্থিত কেন্দ্রের পক্ষে সম্ভব নয়। এই জন্য ঐ সকল দেশে লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট ও সমজাতীয় জনগণ নিয়ে গঠিত প্রাচীন ও ঐতিহ্যশীল রাষ্ট্রে আলিখিত সংবিধান প্রচলিত থাকতে পারে। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্রিটেনে এই কারণে অলিখিত সংবিধান চিরস্থায়ী হয়ে আছে।

দ্বিতীয়ত, কোনও সংবিধান পরিষদ বা সম্মেলনে আলোচনা ও তর্কবিতর্কের মাধ্যমে রচিত হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও রাষ্ট্রের লিখিত সংবিধান প্রবর্তন করা হয়। এইভাবে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে মার্কিন সংবিধান রচিত হয়। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সন পর্যন্ত সময়ে একটি সংবিধান পরিষদ ভারতের সংবিধান রচনা করে। কিন্তু অলিখিত সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবর্তন করা হয় না। ঐরূপ সংবিধান দীর্ঘকাল ব্যাপী ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে। প্রথা, রীতিনীতি, আইনসভা প্রণীত আইন, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত ইত্যাদির মাধ্যমে অলিখিত সংবিধানের অস্তিত্ব চিহ্নিত করা যায়।

তৃতীয়ত, কোনও রাষ্ট্রের লিখিত সংবিধানকে চরম ও মৌলিক আইন রূপে গণ্য করা হয়। সুতরাং লিখিত সংবিধান সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে সংশোধন করা যায় না। এরূপ সংবিধান সংশোধন করতে হলে বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। এইজন্য লিখিত সংবিধান প্রকৃতিগতভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় হয়ে থাকে। কিন্তু অলিখিত সংবিধান আইনসভার দ্বারা সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা সম্ভব। সেইজন্য এরূপ সংবিধান সুপরিবর্তনীয় হয়ে থাকে। গুরুত্বের দিক দিয়ে অনেকেই লিখিত সংবিধানকে অলিখিত সংবিধানের উর্ধ্বে স্থান দিয়ে থাকেন।

চতুর্থত, কোনও রাষ্ট্রে লিখিত সংবিধান প্রচলিত থাকলে সরকারকে সর্বদা সংবিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়। সরকার যথেচ্ছভাবে কোনও আইন প্রণয়ন করতে পারে না। কিন্তু কোনও রাষ্ট্রে অলিখিত সংবিধান প্রবর্তিত থাকলে আইনসভা আইনসঙ্গতভাবে যে কোনও সময়ে যে কোনও ধরনের আইন প্রণয়ন করতে পারে। এক্ষেত্রে আইনসভার ক্ষমতার ওপর আইনগত কোনও বাধানিষেধ দেখা যায় না।

পঞ্চমত, লিখিত সংবিধানে সরকারের প্রতিটি বিভাগের কার্যাবলী স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা থাকে। কোনও বিভাগ অন্য বিভাগের এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করলে ঐরূপ কার্যকলাপ সংবিধান বিরোধী বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এছাড়া লিখিত সংবিধানে সাধারণত বিচার বিভাগেরপ্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। অলিখিত সংবিধানে স্বভাবতই এই ব্যবস্থাদি অনুপস্থিত।

তবে কোনও সংবিধানই সম্পূর্ণরূপে লিখিত হতে পারে না। প্রতিটি লিখিত সংবিধানেই কিছু কিছু অলিখিত বিষয় বা অংশ দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত হলেও আকারে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এই সংবিধানে কেবলমাত্র শাসন পরিচলনা বিষয়ের রূপরেখা উল্লেখিত আছে। আইনসভা প্রণীত আইন, রাষ্ট্রপতির নির্দেশ ও সুপ্রীমকোর্টের সিদ্ধান্তের দ্বারা অনেক ক্ষেত্রেই সংবিধানে উল্লেখিত বিষয়গুলিকে সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ক্যাবিনেট ও দলব্যবস্থা সম্পর্কে মার্কিন সংবিধানে আদৌ উল্লেখ নেই। প্রথাগত বিধানের ওপর ভিত্তি করে এই বিষয়গুলি গড়ে উঠেছে।

আবার ব্রিটেনের সংবিধান মূলত অলিখিত হলেও এই সংবিধানের বহু লিখিত অংশ দেখা যায়। ১৯১১ ও ১৯৪৯ সনের পার্লামেন্ট আইন, অধিকারের সনদ, মহাসনদ প্রভৃতিকে লিখিত অংশের উদাহরণরূপে উল্লেখ করা যায়।

৪। লিখিত সংবিধানের গুণ (Merits of Written Constitution)

লিখিত সংবিধানের কতকগুলি সুবিধা দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমত, লিখিত সংবিধান কোনও সংবিধান পরিষদ, সম্মেলন বা বিশেষকোনওসংস্থার দ্বারা আলোচনা-সমালোচনা ও তর্কবিতর্কের পর প্রচলন করা হয়। সুতরাং লিখিত সংবিধানে উল্লেখিত বিষয়গুলি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। এর ফলে সরকার ও জনগণ উভয়েই তাদের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংবিধানের দিকে দৃষ্টি রেখে চলে।

দ্বিতীয়ত, লিখিত সংবিধানের কোনও নীতি নিয়ে সংশয় দেখা দিলে বা বিরোধের সৃষ্টি হলে তা সহজেই নিষ্পত্তি করা যায়।

তৃতীয়ত, লিখিত সংবিধান সাধারণত সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে সহজে পরিবর্তন করা যায় না। এরূপ সংবিধান বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে সংশোধন করতে হয়। এর ফলে সংবিধান স্থায়ী ও দৃঢ় হয়। ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দল নিজ স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সহজে এরূপ সংবিধান পরিবর্তন করতে পারে না।

চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় লিখিত সংবিধান অত্যাবশ্যক। যে কোনও যুক্তরাষ্ট্রে লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে সাধারণ সরকার ও আঞ্চলিক সরকারসমূহের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়া হয়। এরূপ শাসনব্যবস্থায় লিখিতভাবে ক্ষমতা ভাগ করা হয় বলে উভয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা প্রয়োগ করাকে কেন্দ্র করে কোনও বিরোধ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

৫। লিখিত সংবিধানের ত্রুটি (Demerits of Written Constitution)

লিখিত সংবিধানের প্রধানতম ত্রুটি হল যে এরূপ সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায় না। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে কোনও রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিবেশ ও জনগণের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা যায়। কিন্তু লিখিত সংবিধান পরিবর্তন করা দুরূহ বলে অনেক সময় এরূপ সংবিধান সহজে পরিবর্তন করে একে যুগোপযোগী করে তোলা সম্ভব হয় না। এর ফলে অনেক সময় এরূপ সংবিধানের প্রতি জনগণের আস্থা থাকে না। সংবিধানের প্রয়োজনীয় ও কাম্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিলম্ব হলে সংবিধানের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলন এমন কি বিপ্লব পর্যন্ত দেখা দিতে পারে।

৬। অলিখিত সংবিধানের গুণ (Merits of Unwritten Constitution)

অলিখিত সংবিধানের অন্যতম প্রধান গুণ হল এর নমনীয়তা। এরূপ সংবিধান সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে সহজে সংশোধন করা যায় বলে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানও পরিবর্তন করা সম্ভব। ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দল জনমত অনুযায়ী সংবিধানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে পারে। অন্যভাবে বলা যায় যে অলিখিত সংবিধান পরিবর্তন করা সহজসাধ্য বলে যুগোপযোগী পরিবর্তনগুলি সংবিধানে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়। এরূপ সংবিধানে কাম্য পরিবর্তন সহজেই করা সম্ভব বলে সংবিধানের প্রতি জনগণের বিরূপ মনোভাব প্রকাশের সম্ভাবনা কম থাকে।

দ্বিতীয়ত, অলিখিত সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায় বলে দেশে সংকটময় অবস্থা দেখা দিলে দ্রুত সংবিধান সংশোধন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

৭। অলিখিত সংবিধানের ত্রুটি (Demerits of Unwritten Constitution)

অলিখিত সংবিধানের প্রধান ত্রুটি হল যে এরূপ সংবিধান সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নয়। সংবিধানের বিভিন্ন বিষয়গুলি সুস্পষ্ট না হওয়ার ফলে সরকার ও জনগণ তাদের ক্ষমতা, অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে না। সরকার অনেক সময় যথেচ্ছভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে।

জনগণও অনেক সময় তাদের অধিকারগুলি সম্পর্কে সজাগ থাকে না। সুতরাং অনেকে বলেন যে অলিখিত সংবিধান গণতন্ত্র বিরোধী।

দ্বিতীয়ত, অলিখিত সংবিধান সহজেই পরিবর্তন করা সম্ভব বলে অনেক সময় ক্ষমতাশীল সরকার নিজ স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য বা জনগণকে স্বল্পে সন্তুষ্ট করার জন্য সংবিধান সংশোধন করতে পারে। এইভাবে যে কোনও অজুহাতে বারবার সংবিধান সংশোধন করা হলে সংবিধানের মূল লক্ষ্য ও আদর্শগুলি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

তৃতীয়ত, সাধারণ লোকে অলিখিত সংবিধানের তাৎপর্য আদৌ উপলব্ধি করতে পারে না।

চতুর্থত, অলিখিত সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সাধারণ ও আঞ্চলিক সরকারসমূহের ক্ষমতাগুলি লিখিতভাবে উল্লেখ করা না হলে উভয় ধরনের সরকারের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে সর্বদা বিরোধ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া সাধারণ বা কেন্দ্রীয় সরকার যথেচ্ছভাবে সংবিধান সংশোধন করে আঞ্চলিক সরকারসমূহের ক্ষমতাগুলিও হস্তগত করতে পারে। এইভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় পরিণত হতে পারে।

৮। সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Flexible and Rigid Constitutions)

সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতি অনুসরণ করে যে সংবিধান সংশোধন করা যায় তাকে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান বলা হয়। অন্যদিকে যে সংবিধান পরিবর্তনের জন্য বিশেষ কোনও পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় তাকে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলে।

পার্থক্য (Distinction)

সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের মধ্যে মূল পার্থক্য হল এরূপ :

প্রথমত সুপরিবর্তনীয় সংবিধান আইনসভায় সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সংশোধন করা সম্ভব। কিন্তু দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের সংশোধনের জন্য আইনসভায় বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থন গ্রহণ করা প্রয়োজন। আইনসভার বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থন ছাড়াও অনেক সময় দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান সংশোধনের জন্য জনগণের বা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার আঞ্চলিক আইনসভাসমূহের অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, সুপরিবর্তনীয় সংবিধান অনুযায়ী সাংবিধানিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে কোনওরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান অনুসারে সাংবিধানিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে পার্থক্য করা হয় এবং সাংবিধানিক আইনকে সাধারণ আইন অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদা প্রদান করা হয়।

তৃতীয়ত, সুপরিবর্তনীয় সংবিধান লিখিত ও অলিখিত যে কোনও ধরনের হতে পারে। ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত ও সুপরিবর্তনীয়। অন্যদিকে আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধান লিখিত এবং সাধারণভাবে সুপরিবর্তনীয়। কিন্তু দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান সর্বদা লিখিত হয়ে থাকে।

চতুর্থত, সুপরিবর্তনীয় সংবিধানে সাধারণত আইনসভার প্রাধান্য দেখা যায়। আইনসভা প্রণীত কোনও আইনকে বিচার বিভাগ অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে না। কিন্তু দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের ক্ষেত্রে আইনসভা সংবিধান বিরোধী কোনও আইন প্রণয়ন করলে বিচার বিভাগ ঐ আইনকে বাতিল বলে গণ্য করতে পারে।

তবে সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানসমূহের পার্থক্যের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। এর কারণ হল কোনও সংবিধান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সংবিধানে উল্লেখিত আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিই একমাত্র উপায় নয়। সংবিধানে বর্ণিত আনুষ্ঠানিক সংশোধন পদ্ধতি ছাড়াও প্রথা,

রীতিনীতি, আইনসভা প্রণীত আইন, বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত, শাসনবিভাগীয় নির্দেশ ইত্যাদির প্রভাবেও কখনও কখনও সংবিধানে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের আনুষ্ঠানিক সংশোধন পদ্ধতি আলোচনা করে এই সংবিধানকে চরম দুষ্পরিবর্তনীয় বলে গণ্য করা হয়। এই সংবিধান সংশোধন করতে হলে কেন্দ্রীয় আইনসভা অর্থাৎ কংগ্রেস ও রাজ্য আইনসভা উভয়ের সম্মতি প্রয়োজন। এই জন্য বিগত প্রায় দুশ বছরের মধ্যে এই সংবিধান মাত্র ২৬ বার আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে সংশোধিত হয়েছে। অন্যদিকে প্রথা, সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত, রাষ্ট্রপতির নির্দেশ ও কংগ্রেস প্রণীত আইনের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনের ফলে এই সংবিধানকে কার্যকর ও সময়োপযোগী রাখা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং আনুষ্ঠানিক সংশোধন পদ্ধতি জটিল হলেও অন্যান্য উপায়ে মার্কিন সংবিধানকে পরিবর্তন করা হয়ে থাকে।

আবার ব্রিটেনের সংবিধান সুপরিবর্তনীয় হওয়া সত্ত্বেও ইংরাজ জাতি রক্ষণশীল বলে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা ও মত-বিনিময় ব্যতীত ব্রিটিশ সংবিধানের কোনও পরিবর্তন সাধন করা হয় না। ব্রিটেনের জনমতও সর্বদা সজাগ বলে পার্লামেন্ট কখনও জনমতকে উপেক্ষা করে সংবিধান পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা করে না।

সুতরাং কোনও সংবিধানের পরিবর্তন সম্পূর্ণরূপে তার সংশোধন পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে না। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান কখনও স্থিতিশীল থাকতে পারে না। এরূপ সংবিধান আনুষ্ঠানিক সংশোধন পদ্ধতি ছাড়া পরিবর্তনের অন্য সহজ উপায় নিজেই সৃষ্টি করে। সুপরিবর্তনীয় সংবিধান সহজে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোনওআইনগত বাধা না থাকলেও এরূপ সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে জনমত, নৈতিকতাবোধ, আন্তর্জাতিক আইন প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। সুতরাং সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের মধ্যে বড়রকমের গুণগত কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। এদের মধ্যে যা পার্থক্য তা হল অনেকটাই মাত্রাগত।

কোনও সংবিধানের চরম সুপরিবর্তনীয়তা বা চরম দুষ্পরিবর্তনীয়তা কোনটাই কাম্য নয়। সুতরাং সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় এই দুটি নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে মধ্যপথ অবলম্বন করাই শ্রেয়।

৯) সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের গুণ (Merits of Flexible Constitution)

সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের দোষগুণ উভয়ই দেখা যায়। এই সংবিধানের গুণাবলীর মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি সহজ ও সরল বলে এরূপ সংবিধান সময় ও সমাজের সাথে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তন করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রে কোন সংকটময় অবস্থা দেখা দিলে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান খুব উপযোগী। কারণ এরূপ সংবিধানের মাধ্যমে দ্রুত প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধন করে সংকটকালীন অবস্থার মোকাবিলা করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত, জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এই সংবিধান পরিবর্তন করা সম্ভব বলে এই সংবিধানের প্রতি জনগণের অধিকতর আস্থা দেখা যায় এবং এতে বিপ্লবের আশঙ্কা থাকে না।

চতুর্থত, প্রগতিশীল রাষ্ট্রসমূহে সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব।

১০। সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের দোষ (Demerits of Flexible Constitution)

নিম্নলিখিত কারণে সুপরিবর্তনীয় সংবিধানসমূহের সমালোচনা করা হয়ে থাকে :

প্রথমত, সুপরিবর্তনীয় সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা সম্ভব বলে এরূপ সংবিধানকে অনেকে

অস্থায়ী বলে গণ্য করেন। এরূপ সংবিধান ঘনঘন পরিবর্তন করা সহজসাধ্য বলে শাসনব্যবস্থায় স্থিতিশীলতার অভাব দেখা দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য বারবার এরূপ সংবিধান সংশোধন করতে পারে। এর ফলে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে। জনমতের চাপে পড়েও অনেকসময় এরূপ সংবিধান অযথা পরিবর্তন করা হয়।

তৃতীয়ত, সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের মাধ্যমে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সংবিধান পরিবর্তন করে জনগণের অধিকার ও সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সহজেই ক্ষুণ্ণ করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল অতি সহজেই সুপরিবর্তনীয় সংবিধান সংশোধন করতে পারে বলে এই সংবিধানের ওপর জনগণের আস্থা সহজেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

১১। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের গুণ (Merits of Rigid Constitution)

দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের কতকগুলি দোষগুণ দেখা যায়। এই সংবিধানের গুণাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

প্রথমত, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান লিখিত হয় বলে এরূপ সংবিধান নির্দিষ্ট এবং অস্পষ্টতামুক্ত। এই কারণে এই ব্যবস্থায় স্বভাবতই জনগণ ও সরকার সবসময় তাদের ক্ষমতা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকে। সরকারের পক্ষে নাগরিকদের অধিকার ও সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা সম্ভব হয় না। এই কারণে অনেকে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানকে গণতন্ত্রের সাথে বিশেষ সঙ্গতিপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়ত, স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের একটি প্রধান গুণ। এরূপ সংবিধান প্রচলিত হওয়ার পর একে মৌলিক আইন রূপে গণ্য করা হয়। এছাড়া এরূপ সংবিধান কখনও সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে যথেচ্ছভাবে সংশোধন করা যায় না। সুতরাং জনমতের চাপে অথবা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ক্ষমতাশীল সরকার কখনও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান সংশোধন করতে পারে না।

তৃতীয়ত, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানকে দেশে প্রচলিত সাধারণ আইন অপেক্ষা অনেক বেশি মৌলিক ও মর্যাদাসম্পন্ন বলে গণ্য করা যায়। এই কারণে এরূপ সংবিধান জনগণের ব্যাপক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে। চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান অপরিহার্য। যুক্তরাষ্ট্রে লিখিত সংবিধান দ্বারা সাধারণ সরকার ও আঞ্চলিক সরকারসমূহের ক্ষমতা পৃথকভাবে উল্লেখ করে দেওয়া হয়। সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় করা না হলে সাধারণ সরকার সহজেই সংবিধান পরিবর্তন করে আঞ্চলিক সরকারসমূহের ক্ষমতা গ্রাস করে তাদের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করতে পারে।

১২। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের দোষ (Demerits of Rigid Constitution)

দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের কতকগুলি গুণ থাকা সত্ত্বেও এরূপ সংবিধানকে নানাভাবে সমালোচনা করা হয়ে থাকে।

প্রথমত, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের প্রধান ত্রুটি হল এই যে এরূপ সংবিধান সময় ও পরিবর্তিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে পারে না। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে কাম্য সংস্কারসাধন সম্ভব নয় বলে জনগণের মধ্যে এরূপ সংবিধানের প্রতি অনাস্থার মনোভাব গড়ে ওঠে। এইভাবে বিপ্লব পর্যন্ত ঘটতে পারে। মেকলের মতে জাতির অগ্রগতির সময় সংবিধানের স্থিতিশীলতা বিপ্লবের একটি অন্যতম প্রধান কারণ।

দ্বিতীয়ত, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের মধ্য দিয়ে প্রগতিশীল চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয় না। সুতরাং অনেকে এরূপ সংবিধানকে রক্ষণশীলতার বাহক বলে মনে করেন।

তৃতীয়ত, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের ব্যাখ্যার দায়িত্ব বিচার বিভাগের ওপর প্রদান করা হয় বলে

এরূপ সংবিধান শেষ পর্যন্ত বিচার বিভাগের প্রাধান্যের সৃষ্টি করে।

১৩। ভারতের সংবিধানের প্রকৃতি (Nature of the Indian Constitution)

স্বাধীনতালাভের পূর্বে ভারতে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে দাবি করেন যে স্বাধীন ভারতে ভারতীয়গণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি সংবিধান পরিষদের দ্বারা ভারতের সংবিধান রচনা করতে হবে। জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যখন পূর্ণ স্বাধীনতা ও একটি সংবিধান পরিষদ রচিত সংবিধানের দাবি করছিলেন তখন তাঁদের বহু বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমে ইংরাজগণ এই দাবি স্বীকার করতে অনিচ্ছুক ছিলেন, পরবর্তী কালে মুসলিম লীগ এর বিরোধিতা করে। ১৯৪৫ সনে ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনের পর শ্রমিকদল সরকার গঠন করলে তাঁরা ভারতে একটি ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণ করেন। ভারতীয়দের নিজস্ব সংবিধান প্রণয়ন কাজে সহায়তা করা এবং জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বিরোধ দূর করাই ছিল এই ক্যাবিনেট মিশনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৪৫ সনের ডিসেম্বর মাসে ভারতে প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই নির্বাচনে কয়েকটি বিশেষ যোগ্যতার ভিত্তিতে জনগণকে ভোটদান ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ফলে ভারতীয় জনগণের মাত্র শতকরা ১৪ ভাগ এই নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী হন। এইরূপে গঠিত প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের সদস্যদের মধ্য থেকে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে ভারতের সংবিধান রচনা করার জন্য একটি সংবিধান পরিষদ গঠন করা হয়। কংগ্রেসের সদস্যগণ এই সংবিধান পরিষদে যোগদান করেন। কিন্তু মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলি নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে গণপরিষদ বর্জন করে। ১৯৪৭ সনের ৩রা জুন লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতীয় উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করা হবে বলে ঘোষণা করলে এই অচলাবস্থার অবসান ঘটে।

যে সব অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয় তার বহির্ভূত সব এলাকায় ১৯৪৫ সনের নির্বাচনে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, ফলে দেশ বিভাগের পর ২৯৮ জন সদস্য সম্বলিত ভারতের সংবিধান পরিষদে কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা দাঁড়ায় ২০৮ জনে। এই জন্য গ্রেনভিল অস্টিন ভারতীয় সংবিধান পরিষদকে 'একটি এক দলীয় দেশের একদলীয় সংস্থা' রূপে আখ্যা দিয়েছেন।

এই সংবিধান পরিষদ ১৯৫১ সনে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত দেশের অস্থায়ী সংসদরূপেও কাজ করে। একই ব্যক্তিরা একই সময়ে সংবিধান রচনা ও দেশের শাসন কাজে যুক্ত থাকার ফলে তাঁরা দৈনন্দিন শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যাগুলি উপলব্ধি করেন এবং সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁদের এই বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করেন।

সুদীর্ঘ তিন বছরের অধিককাল অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর ১৯৪৯ সনের ২৬শে নভেম্বর সংবিধান পরিষদ এই সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে এবং ১৯৫০ সনের ২৬শে জানুয়ারী থেকে এই সংবিধান কার্যকরী করা হয়।

ভারতের সংবিধান কার্যকরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র রূপে পরিগণিত হয়। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যা নিয়ে গঠিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনগ্রসর, জাতি, ভাষা, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ এই উপমহাদেশে বিগত দেড়শো বছরের মধ্যে প্রথম প্রকৃতার্থে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা হয় যার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সংবিধানের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক একত্রীকরণ প্রতিষ্ঠা করা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা। এই সংবিধান একাধারে জাতীয় আদর্শসমূহের ইস্তাহার ও দেশের শাসনকার্য পরিচালনার সংহিতা।

আয়তনের দিক দিয়ে বিচার করলে ভারতের সংবিধান আজও পর্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম লিখিত সংবিধানরূপে পরিচিত। ভারতের সংবিধান পরিষদের সদস্যদের মধ্যে আইনজ্ঞ-রাজনীতিবিদদের প্রভাব ও প্রাধান্য থাকার ফলে এই সংবিধান কেবলমাত্র আয়তনেই সর্ববৃহৎ নয় এর বিষয়বস্তুও অত্যন্ত জটিল। অনেক সমালোচকের মতে একমাত্র আইনজ্ঞরাই এই সংবিধানের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর তাৎপর্য যথার্থভাবে অনুধাবন করতে পারেন। সাধারণ লোকের পক্ষে এই সংবিধানের অনেক বিষয়বস্তুর প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করা অসম্ভব। এই সংবিধান জটিল হওয়ার ফলে এর বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে বহু মামলার সৃষ্টি হয়েছে। এই জন্যই স্যার আইভর জেনিংস এই সংবিধানকে 'আইনজ্ঞদের স্বর্গ' (Lawyer's Paradise) বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।

ভারতের সংবিধানে ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন এবং গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রের সংবিধানের প্রভাব দেখা যায়। তবে সংবিধান রচয়িতাগণ সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে কোনও একটি বিশেষ মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হন নি। এই জন্য ভারতের সংবিধানকে একটি মতাদর্শ নিরপেক্ষ দলিল (Ideologically neutral document) বলে গণ্য করা হয়। বস্তুত এই সংবিধানে বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথমত, সংবিধান পরিষদের সদস্যদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থক। তাঁদের প্রচেষ্টায় সংবিধানে ব্যক্তিস্বাধীনতা, আইনের অনুশাসন, দায়িত্বশীল সরকার প্রভৃতি কতকগুলি উদারনৈতিক নীতি সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, নেহরু ও কয়েকজন নবীন কংগ্রেসী সদস্য ভারতে গণতন্ত্রের মাধ্যমে ধীরে ধীরে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানে কয়েকটি ব্যবস্থা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে সংবিধান পরিষদকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হন। তৃতীয়ত, সংবিধানে উল্লেখিত অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, নারীদের সমানাধিকার, সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, মাদক দ্রব্য বর্জন, গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন, কুটির শিল্পের প্রসার প্রভৃতি বিষয়গুলির মধ্যে গান্ধীবাদের প্রভাব দেখা যায়। চতুর্থত, সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সংবিধান পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণ করার ফলে দেশ বিভাগের পর এতে হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংবিধান পরিষদে সংবিধান প্রণয়নের কাজে কোনও সাম্প্রদায়িক মনোভাব স্থান পায় নি কারণ এই পরিষদে কংগ্রেস সদস্যরা সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি কার্যকর করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেন। ভারতের সংবিধান সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এ ছাড়া আরও তিনটি নীতি ভারতের সংবিধানে স্থান পেয়েছে। প্রথমটি হল যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের সরকার। বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র সহজ সমাধান রূপে সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। তবে অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা ও বিভিন্ন ভেদমূলক শক্তিগুলিকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে এই সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারকে যথেষ্ট শক্তিশালী করা হয়েছে।

দ্বিতীয়টি হল কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার অনুকরণে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন। বিশাল জনসংখ্যা নিয়ে গঠিত এই দেশে প্রাপ্তবয়স্ক জনগণ কর্তৃক সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সুশাসন সম্ভব হবে এবং দ্রুত ও সুষ্ঠু সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই ধরনের শাসনব্যবস্থা অধিকতর ফলপ্রসূ হবে বলে বিবেচিত হয়।

তৃতীয়টি হল ভারতের সংবিধানের মধ্য দিয়ে আইন বিভাগের প্রাধান্য ও বিচার বিভাগের প্রাধান্যের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ও সংবিধান পরিষদ কর্তৃক সংবিধান প্রণয়ন ও গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে

রাজনৈতিক বিপ্লবের কাজ সমাপ্ত হয়ে যায়। সংবিধান রচয়িতাদের উদ্দেশ্য ছিল পরবর্তী পর্যায়ে এই সংবিধানের মধ্য দিয়ে সমগ্র দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জাগরণ আনা অর্থাৎ সাধারণ মানুষের অতি প্রয়োজনীয় অভাব অভিযোগ দূর করা যাতে ভারতীয় সমাজের কাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তন আনা যায়। সংবিধান পরিষদে বির্তককালে একসময় নেহরু বলেন যে, "এই সভার প্রধান কাজ হচ্ছে একটি নতুন সংবিধানের মাধ্যমে ভারতকে স্বাধীন করা, বুভুক্ষু জনসাধারণের ক্ষুধা নিবারণ করা ও নগ্ন জনগণকে বস্ত্রায়িত করা। অতঃপর প্রত্যেক ভারতবাসীকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেকে বিকাশ করার পূর্ণ সুযোগসুবিধা দেওয়া। বর্তমানে ভারতে প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে কি ভাবে দরিদ্র ও বুভুক্ষুদের সমস্যা' সমাধান করা যায়। আমরা যদি শীঘ্র এই সমস্যার সমাধান করতে না পারি তাহলে আমাদের লিখিত সংবিধান মূল্যহীন ও উদ্দেশ্যবিহীন বলে পরিগণিত হবে।" নেহরুর এই উক্তি থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে সুদীর্ঘ ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতের সমাজ জীবনে যে নিষ্ক্রিয়তা সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলি এবং জনজীবনের সমস্ত অনগ্রসরতা দূর করতে চাওয়া হয়েছিল এই সংবিধানের মাধ্যমে। এই কারণে গ্রেনভিল অস্টিন ভারতীয় সংবিধানকে একটি সামাজিক দলিল (Social Document) বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে এই সংবিধানের বেশির ভাগ অংশেই বিশেষ করে মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মাধ্যমে সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার সূচনা করা হয়েছে।

সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর তিন দশকের অধিককাল এই সংবিধান অনুযায়ী দেশের শাসন কার্য পরিচালিত হচ্ছে এবং সংবিধানে উল্লেখিত লক্ষ্য অনুসারে দেশ ধীরে ধীরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে জনকল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই সংবিধান রচনার কাজে যদিও ভারতীয় জনগণের শতকরা ১৪ ভাগ ব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন তথাপি এই সংবিধানের স্থায়িত্ব এর প্রতি সমগ্র ভারতীয় জনগণের আস্থার পরিচায়ক বলে গণ্য করা যেতে পারে।

সংবিধান প্রচলিত হওয়ার পর বিগত কয়েক বছরে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বহু সংকট দেখা গিয়েছে এবং এই সংবিধানের মাধ্যমে অনেক সমস্যার স্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে এই সংবিধানের মাধ্যমেই সংবিধানে বর্ণিত অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী উদ্দেশ্যগুলি কার্যকর করতে হবে। এই উদ্দেশ্যগুলি হল একটি সহযোগিতামূলক অথচ কেন্দ্রমুখী যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা সফল করা, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে রূপায়িত করা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বোধ প্রতিষ্ঠা করা, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শ সুদৃঢ় করা ও দৃঢ় পদক্ষেপে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া। এই আদর্শগুলির সফল রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন হল জাতীয় সংহতি, স্বদেশানুরাগ, প্রশাসনিক দক্ষতা, উৎসর্গীকৃত নেতৃত্ব এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে সহযোগিতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের সদিচ্ছা।

১৪। ভারতের সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ (Chief features of the Constitution of India)

স্বাধীনতালাভের পর ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত একটি সংবিধান পরিষদ ভারতীয় জনগণের পক্ষে ভারতীয় জনগণের জন্য একটি সংবিধান রচনা করে। বর্তমানে এই সংবিধান একাধারে দেশের শাসনকাজ পরিচালনার প্রতিচিত্র ও জাতীয় আদর্শসমূহের ইস্তাহার।

ভারতের সংবিধান রচনা করার সময় সংবিধান রচয়িতাগণ গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সংবিধান ও ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন পর্যালোচনা করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন দেশের সংবিধানসমূহের অভিনবত্বগুলি ভারতের

বাস্তব অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী কার্যোপযোগী করে সংবিধানের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা। ভারতের সংবিধানে বিভিন্ন দেশের সংবিধানের প্রভাব থাকলেও একথা অনস্বীকার্য যে সংবিধান রচয়িতাগণ অন্ধভাবে বিদেশী সংবিধানসমূহকে অনুকরণ করেন নি। এইজন্য ভারতের সংবিধানে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় যেগুলি এই সংবিধানকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে। ভারতের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১। বিশ্বের সর্ববৃহৎ লিখিত সংবিধান (Largest written Constitution in the World)

আয়তনের দিক দিয়ে বিচার করলে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত সংবিধান প্রণীত হয়েছে তাদের মধ্যে ভারতের সংবিধান সর্ববৃহৎ। একটি প্রস্তাবনা (Preamble) দিয়ে এই সংবিধান শুরু করা হয়েছে। প্রস্তাবনায় সংবিধানের উৎস, ভারত রাষ্ট্রের প্রকৃতি, সংবিধানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ ও সংবিধান গ্রহণের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রস্তাবনাকে আইনের দৃষ্টিতে মূল সংবিধানের অংশ বলে গণ্য করা হয় না এবং প্রস্তাবনায় বর্ণিত বিষয়গুলিও আদালতের দ্বারা বলবৎযোগ্য নয়। প্রস্তাবনার পরে ১ ধারা থেকে ৩৯৫ ধারা পর্যন্ত মোট ২২ টি ভাগে (Part) সংবিধানের বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এটি হল মূল সংবিধান। অতঃপর সংবিধানে ৯টি তালিকা (Schedule) যুক্ত করা হয়েছে। তালিকাগুলিতে সংবিধানে বর্ণিত অনেক বিষয়, যেমন, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের নাম, স্বীকৃত ভাষাসমূহ, পার্লামেন্ট ও রাজ্য আইনসভাসমূহের আইন প্রণয়নের বিষয়সমূহ ইত্যাদি সূচী আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতের সংবিধান অতি বৃহৎ হওয়ার কতকগুলি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, সংবিধান রচয়িতাগণ সংবিধানে উল্লেখিত অধিকাংশ বিষয়ই যতদূর সম্ভব বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে সংবিধানের জরুরী অবস্থার ব্যবস্থা সংক্রান্ত অংশে বিভিন্ন ধরণের জরুরী অবস্থার কারণ, কার্যকাল, অনুমোদন পদ্ধতি, ফলাফল প্রভৃতি সকল বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলেও রাজ্যগুলির শাসনকাজ পরিচালনার জন্য পৃথক কোন সংবিধানের ব্যবস্থা করা হয় নি। ভারতের সংবিধানেই কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের গঠন ও ক্ষমতা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয়ত, কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারসমূহের মধ্যে সম্পর্কও অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান অপেক্ষা ভারতের সংবিধানে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো, কেন্দ্র-রাজ্য আইন প্রণয়ন সম্পর্ক, কেন্দ্র-রাজ্য প্রশাসনিক সম্পর্ক, কেন্দ্র রাজ্য রাজস্ব সম্পর্ক, আন্তঃরাজ্য ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়গুলি স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থত, ভারতের সংবিধানে এমন অনেক বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায় যেগুলি অন্যান্য রাষ্ট্রের সংবিধানে স্থান পায় নি। অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রে আইনসভা প্রণীত আইনের দ্বারা এই বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এক্ষেত্রে উদাহরণ স্বরূপ সরকারীভাষা, নির্বাচন, সরকারী কৃত্যক,কোনও কোনও শ্রেণী সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ, বিবিধ, অস্থায়ী, অন্তর্বর্তীকালীন ও বিশেষ ব্যবস্থা সমূহকে উল্লেখ করা যেতে পারে।

কিন্তু ভারতের সংবিধান এত বৃহৎ হওয়া সত্ত্বেও এতে অনেক বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করা হয় নি। যেমন, ভারতীয় নাগরিকতা অর্জন ও বিলোপসাধনের বিস্তারিত পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে পার্লামেন্ট প্রয়োজন মত আইন প্রণয়ন করে বিষয়টি স্থির করবে। আইনসভাসমূহের সদস্যদের অধিকার ও অব্যাহতি সম্পর্কেও সংবিধানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখা যায় না।

অনেক রাষ্ট্রের সংবিধানে জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় প্রতীক, রাজধানী প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু ভারতের সংবিধানে এই বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয় নি।

২। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ঝোঁক সম্বলিত যুক্তরাষ্ট্র (Federation with a strong Unitary bias)

'যুক্তরাষ্ট্র' শব্দটি ভারতের সংবিধানের কোনও স্থানে প্রয়োগ করা না হলেও কাঠামোর দিক দিয়ে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলে বর্ণনা করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতের সংবিধানে দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি হল কেন্দ্র ও রাজ্য দুই ধরনের সরকারের পাশাপাশি অস্তিত্ব, লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন, কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ মীমাংসা ও সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় এবং উভয় সরকারের স্বতন্ত্র রাজস্বের ব্যবস্থা। কিন্তু এইগুলির পাশাপাশি ভারতের সংবিধানে এমন কতকগুলি বিষয় দেখা যায় যেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক ক্ষমতাশালী করে তুলেছে বা রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য খর্ব করে থাকে। রাজ্যগুলিতে পৃথক সংবিধানের অনুপস্থিতি, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যের শাসকপ্রধান রাজ্যপালের নিয়োগ, রাজ্যসভায় রাজ্যগুলির সমপ্রতিনিধিত্বের অনুপস্থিতি, এক নাগরিকতা, রাজ্যপুনর্গঠন বিষয়ে কেন্দ্রের প্রাধান্য, জরুরী অবস্থায় রাজ্যগুলির ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যবস্থামূহকে ভারতের সংবিধানের অ-যুক্তরাষ্ট্রসুলভ (Non-federal) বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা যেতে পারে। এই কারণেই অনেক লেখক ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র না বলে 'আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়' বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন।

৩। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা (Parliamentary Government)

ভারতের সংবিধানের কোনও স্থানে ভারতে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু সংবিধানের কয়েকটি ব্যবস্থা ও শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে কয়েকটি প্রচলিত প্রথা দেখে সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে ভারতে সংসদীয় ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। সংবিধান পরিষদে বিতর্ক চলাকালেও ডঃ আম্বেদকর একাধিকবার উল্লেখ করেন যে সংবিধান অনুযায়ী ভারতে ব্রিটেনের মত সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। ভারতের সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি হলেন ব্রিটেনের রাজা বা রানীর ন্যায় নামসর্বস্ব শাসক প্রধান। প্রকৃত শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করেন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীপরিষদ। মন্ত্রীপরিষদ আবার তার কার্যকলাপের জন্য পার্লামেণ্টের নিম্নকক্ষ অর্থাৎ লোকসভার নিকট সমবেতভাবে দায়ী থাকে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ—শাসনবিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং প্রকৃত শাসন কর্তৃপক্ষের আইনসভার জনপ্রিয় কক্ষের নিকট দায়িত্বশীলতা—ভারতে দেখা যায়। অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ভারতে কেন্দ্রে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। রাজ্যগুলিতেও অনুরূপভাবে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলন হয়েছে।

৪। প্রজাতান্ত্রিক বা সাধারণতান্ত্রিক (Republican)

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে 'প্রজাতন্ত্র' রূপে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধানের পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত করা হয় তাকে প্রজাতন্ত্র বলে। ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের ও রাজ্য আইনসভাসমূহের নিম্নকক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি নির্বাচনী সংস্থার দ্বারা নির্বাচিত হন। অন্যভাবে বললে ভারতের রাষ্ট্রপতি জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তাঁর পদটি ব্রিটেনের রাজা বা রানীর পদের ন্যায় বংশানুক্রমিক নয়। অতএব ভারত একটি প্রজাতন্ত্র।

৫। ধর্মনিরপেক্ষ (Secular)

ভারতের সংবিধানের বিভিন্ন ব্যবস্থাসমূহের মধ্য দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ প্রতিফলিত হলেও

১৯৫০ সনে যখন এই সংবিধান প্রবর্তন করা হয় তখন সংবিধানের কোনও স্থানে 'ধর্মনিরপেক্ষ' এই শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি। ১৯৭৬ সনে সংবিধান (৪২তম সংশোধন) আইনের মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি সংযোজন করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধারণা অনুযায়ী বলা হয় যে ব্যক্তির সাথে ঈশ্বরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতশূন্য মনোভাব পোষণ করবে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে রাষ্ট্র কোনও বিশেষ ধর্মকে সরকারী ধর্মরূপে স্বীকৃতি প্রদান করে না এবং ধর্মীয় বিষয়ে ব্যক্তিদের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সাম্য প্রদান করা হয়। এরূপ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে একদিকে যেমন কোনও নির্দিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রদান করা হয় না অন্যদিকে তেমন কোনও নির্দিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় না।

সংক্ষেপে বলা যায় যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ, ধর্মীয় কারণে বৈষম্যমূলক আচরণ না করা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস, আচরণ ও প্রচারের স্বাধীনতা হল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্র ধর্মীয় কারণে নাগরিকদের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারে না। সকল ব্যক্তি বিবেকের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে ধর্ম স্বীকার, আচরণ ও প্রচার করার অধিকার সমভাবে উপভোগ করে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ধর্মীয়, দাতব্য বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করার অধিকার উপভোগ করে থাকে এবং তাদের স্বার্থ কখনও ক্ষুণ্ণ করা হয় না।

৬। সমাজতান্ত্রিক (Socialistic)

সংবিধান প্রবর্তন করার সময় সমাজতন্ত্র শব্দটিও সংবিধানের কোনও স্থানে উল্লেখ করা ছিল না। তবে সংবিধানের প্রস্তাবনায় বর্ণিত আদর্শসমূহ ও রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির অংশে উল্লেখিত কয়েকটি নীতি থেকে সুস্পষ্টরূপে এই ধারণা পাওয়া যায় যে সংবিধান রচয়িতাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতে একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৫৫ সনে আবাদীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের বার্ষিক অধিবেশনে ঘোষণা করা হয় যে ভারতে একটি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ (Socialistic pattern of Society) প্রতিষ্ঠা করা হবে। এছাড়া সংবিধান প্রবর্তনের পর থেকেই দেখা যায় যে ভারত সরকার আইন প্রণয়ন বা সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কয়েকটি পরিবর্তন সাধন করেন যেগুলিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ রূপে গণ্য করা যায়। এ সম্পর্কে জমিদারী প্রথা বিলোপসাধন, রাজন্যভাতা বিলোপসাধন, বিভিন্ন শিল্পসংস্থার জাতীয়করণ ইত্যাদিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭৬ সনে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন আইনের মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনায় সমাজতান্ত্রিক শব্দটি সংযোজন করা হয়েছে। এই সঙ্গে নির্দেশমূলক নীতির অংশেও দুটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুটি নীতি হল—দরিদ্রদের বিচারের ক্ষেত্রে আইনগত সহায়তা প্রদান (Legal Aid to the poor) এবং শিল্প পরিচালনা সংক্রান্ত কাজে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা (Workers' participation in the mangagement of Industry)। সংবিধান (৪২তম সংশোধন) আইন, ১৯৭৬-এর মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকারকে সংবিধানের মৌলিক অধিকারের অংশ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সংবিধানেও সমাজতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে ভারতে সমাজতন্ত্রের প্রকৃতি ঐ দুটি রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে বৈপ্লবিক উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে ভারতে ধীরে ধীরে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। সুতরাং ভারতে প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্ররূপে অভিহিত করা যায়।

৭। সুপরিবর্তনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তার মধ্যে সমন্বয় সাধন (Balance between flexibility and rigidity)

ভারতের সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি আলোচনা করলে এই সংবিধানকে স্পষ্টভাবে সুপরিবর্তনীয় বা স্পষ্টভাবে দুষ্পরিবর্তনীয়রূপে আখ্যা দেওয়া যায় না। ভারতের সংবিধান সংশোধন করার দুটি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি সংবিধানে বর্ণনা করা আছে। প্রথম পদ্ধতি অনুসারে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধন করা যায়। দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে সংবিধানে উল্লেখিত কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয় সংশোধনের জন্য পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতার সমর্থন ছাড়াও রাজ্য আইসভাসমূহের অন্তত অর্ধেকের অনুমোদন আবশ্যক। এই বিষয়গুলির মধ্যে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি, পার্লামেন্ট ও রাজ্য আইনসভাসমূহের আইন প্রণয়ন তালিকা, কেন্দ্র, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিচারব্যবস্থা, পার্লামেন্টে রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিত্ব, সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। সংবিধান সংশোধনের প্রথম পদ্ধতিটিকে সাধারণভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিটিকে চরম দুষ্পরিবর্তনীয় রূপে গণ্য করা যেতে পারে। এইগুলি ছাড়া সংবিধানে উল্লেখিত অনেক বিষয় আছে যেগুলি পার্লামেন্ট সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থনে পরিবর্তন করতে পারে। এই সব বিষয়গুলির পরিবর্তন করাকে সংবিধান সংশোধনরূপে গণ্য করা হয় না। রাজ্যসমূহের নাম, সীমানা ইত্যাদির পরিবর্তন ও পুনর্গঠন, রাজ্য আইনসভাসমূহে দ্বিতীয়কক্ষ প্রতিষ্ঠা বা বিলোপসাধন ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এইভাবে সংবিধান পরিবর্তন করাকে সুপরিবর্তনীয় পর্যায়ভুক্ত করা যায়। অতএব ভারতের সংবিধানের সংশোধনের ক্ষেত্রে সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় উভয় পদ্ধতিই সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

৮। পার্লামেন্টের প্রাধান্য ও সেই সঙ্গে সীমায়িত বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য (Parliamentary supremacy with limited judicial review)

ব্রিটেনে আইনগতভাবে পার্লামেন্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত এবং পার্লামেন্ট প্রণীত কোনও আইনকে বিচার বিভাগ অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় আইনসভা অর্থাৎ কংগ্রেস প্রণীত কোনও আইনকে সুপ্রীম কোর্ট তার বিচার বিভাগীয় পুনর্বিবেচনা (Judicial review)-এর ক্ষমতা বলে পর্যালোচনা করার পর প্রয়োজন হলে অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট কংগ্রেস প্রণীত কোনও আইন কেবলমাত্র যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা তাই বিচার করে না, ঐ আইনটি ন্যায়নীতি সঙ্গত কিনা তাও বিচার করে দেখে। অতএব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচার বিভাগের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে সাধারণভাবে পার্লামেন্ট সার্বভৌম। কিন্তু আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে যদি পার্লামেন্ট সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার বা অধিক ব্যবহার করে সে ক্ষেত্রে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট বিচার বিভাগীয় পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা বলে ঐরূপ আইনকে বাতিল বলে গণ্য করতে পারে। তবে পার্লামেন্ট প্রণীত কোনও আইন ন্যায়নীতি বিরুদ্ধ কিনা তা ভারতের সুপ্রীম কোর্ট বিচার করতে পারে না। সুতরাং দেখা যায় যে ভারতের সংবিধান অনুসারে পার্লামেন্টের প্রাধান্য ও বিচার বিভাগীয় প্রাধান্যের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৯। মৌলিক অধিকারসমূহ, রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ ও মৌলিক কর্তব্যসমূহ (Fundamental Rights, Directive Principles of State Policy and Fundemantal Duties)

ভারতের সংবিধানের তৃতীয়, চতুর্থ ও চতুর্থ 'ক' ভাগে যথাক্রমে মৌলিক অধিকারসমূহ,

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ ও নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানে বর্তমানে ছটি মৌলিক অধিকারের উল্লেখ দেখা যায়। এই অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হলে সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্টসমূহ লেখ, আদেশ বা নির্দেশ জারী করে এগুলিকে রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা করতে পারে। একমাত্র পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধন করে এই অধিকারগুলিকে পরিবর্তন করতে পারে। একমাত্র রাষ্ট্রপতি ঘোষিত জরুরী অবস্থার ঘোষণা ব্যতীত এই অধিকারগুলির ওপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা যায় না। তবে সাধারণ অবস্থাতেও মৌলিক অধিকারগুলি অবাধ বা নিরঙ্কুশ নয়। সামাজিক স্বার্থে প্রয়োজন হলে রাষ্ট্র যুক্তিসঙ্গত কারণে এই অধিকারগুলির ওপর বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহীত একটি বিস্তারিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম বলে গণ্য করা যায়। যদিও এই নীতিসমূহ আদালতের সাহায্যে বলবৎ করা যায় না কিন্তু এগুলিকে দেশ শাসনের পক্ষে অপরিহার্য বলে গণ্য করা হয়েছে। রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই নীতিসমূহকে বাস্তবে প্রয়োগ করা। সংবিধানের রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের অংশটিকে মৌলিক অধিকারসমূহের অংশের পরিপূরক অংশ বলা হয়ে থাকে। এর কারণ হল, মৌলিক অধিকারসমূহের মাধ্যমে ভারতে রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে এবং নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে।

সংবিধান (৪২তম সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ দ্বারা সংবিধানে চতুর্থ 'ক' নামে একটি নতুন ভাগে নাগরিকদের দশটি মৌলিক কর্তব্যের উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও এই কর্তব্যসমূহ আদালতের দ্বারা বলবৎ করা যায় না কিন্তু নাগরিকদের মধ্যে ঐক্য ও স্বদেশপ্রীতির মনোভাব জাগ্রত করার জন্য এগুলির একটি বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য রয়েছে।

অধ্যায় ২

সরকারের বিভিন্ন রূপ

১। ভূমিকা (Introduction)

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজ কবি আলেকজাণ্ডার পোপ (Alexander Pope) তাঁর Essay on Man গ্রন্থের একস্থানে বলেন যে শুধুমাত্র সরকারের বিভিন্ন রূপ নিয়ে বিতর্ক করা একটি গৌণ বিষয় কারণ যে সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে সেই হল সর্বশ্রেষ্ঠ। এ সম্পর্কে তাঁর বহুল প্রচলিত শ্লোকটি হল :

For forms of government let fools contest;
What'er is best administered is best.

কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এবিষয়ে খুব কম লেখকই পোপের সাথে একমত। এইজন্য হ্যামিলটন (Hamilton) এই নীতিটিকে প্রচলিত রাজনৈতিক মতের বিরুদ্ধ বিশ্বাস (Political heresy) বলে সমালোচনা করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নিয়ে চর্চার শুরু থেকেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে প্রচেষ্টা দেখা যায়। পৃথক পৃথক রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা রাজতন্ত্রের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখানোর একটি উপায় হল সরকারের শ্রেণী বিভাগের পর্যালোচনা। তবে একটি সরল অথচ বিজ্ঞানসম্মত ও সন্তোষজনক ভিত্তিতে সরকারসমূহের বিভিন্ন রূপ ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা করা দুরূহ ব্যাপার।

২। অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ (Aristotle's Classification)

সরকারের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনার প্রথম প্রচেষ্টা করেন অ্যারিস্টটল। লীককের মতে অ্যারিস্টটলের রাজনীতিতে প্রদত্ত প্রসিদ্ধ শ্রেণীবিভাগে পরবর্তী সমস্ত আলোচনার সূত্রস্থল পাওয়া যায় ("The starting point for all later discussion is found in the celebrated classification given by Aristotle in his Politics")। অ্যারিস্টটল প্রাচীন গ্রীস দেশের ১৫০টি সংবিধান পর্যালোচনা করার পর সরকারের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তবে তিনি রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোনও পার্থক্য করেন নি। এইজন্য তাঁর লেখায় সরকারের শ্রেণীবিভাগকে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ বলে গণ্য করা হয়েছে। শাসনের উদ্দেশ্য এবং শাসকের সংখ্যা এই দুটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তিনি শাসন ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ করেন। তাঁর মতে শাসনের উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে সরকারকে স্বাভাবিক ও বিকৃত এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যদি জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় তবে সেই সরকারকে স্বাভাবিক বলা হয়। আর যদি জনকল্যাণের পরিবর্তে শুধুমাত্র শাসকদের ব্যক্তিগত স্বার্থে শাসন ক্ষমতা পরিচালিত হয় তবে সেই শাসন ব্যবস্থাকে বিকৃত শাসন ব্যবস্থা বলে। শাসকের সংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করে অ্যারিস্টটল স্বাভাবিক শাসন ব্যবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যদি একজন ব্যক্তি শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং জনসাধারণের মঙ্গল করা তাঁর উদ্দেশ্য হয় তবে সেই শাসন ব্যবস্থাকে রাজতন্ত্র (Monarchy) বলে। যদি কয়েকজন ব্যক্তি জনসাধারণের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তবে সেই শাসন ব্যবস্থাকে অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) বলা হয়। বহু ব্যক্তির দ্বারা যদি শাসন ক্ষমতা পরিচালিত হয় এবং তাঁরা যদি জনগণের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখেন তবে সেই শাসন ব্যবস্থা নিয়মতন্ত্র (Polity) নামে পরিচিত। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও নিয়মতন্ত্রের বিকৃত রূপ হল যথাক্রমে স্বৈরতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র ও গণতন্ত্র বা জনতাতন্ত্র। একজন ব্যক্তি যদি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তবে ঐ শাসন

ব্যবস্থাকে স্বৈরতন্ত্র (Tyranny) বলা হয়। কয়েকজন ব্যক্তি যদি নিজেদের স্বার্থে শাসন পরিচালনা করেন তবে এরূপ শাসন ব্যবস্থাকে ধনিকতন্ত্র (Oligarchy) বলা হয়। বহু সংখ্যক ব্যক্তি যদি নিজেদের স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তাহলে ঐ ধরনের শাসনব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বা জনতাতন্ত্র (Democracy) আখ্যা দেওয়া হয়। অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগকে নিম্নলিখিত ছকের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে :

১ শাসকের সংখ্যা	২ শাসনের উদ্দেশ্য	
	স্বাভাবিক রূপ (জনসাধারণের স্বার্থে শাসন ক্ষমতা পরিচালিত হয়)	বিকৃত রূপ (শাসকদের স্বার্থে শাসন ক্ষমতা পরিচালিত হয়)
একজন	রাজতন্ত্র	স্বৈরতন্ত্র
কয়েকজন	অভিজাততন্ত্র	ধনিকতন্ত্র
বহুজন	নিয়মতন্ত্র	গণতন্ত্র

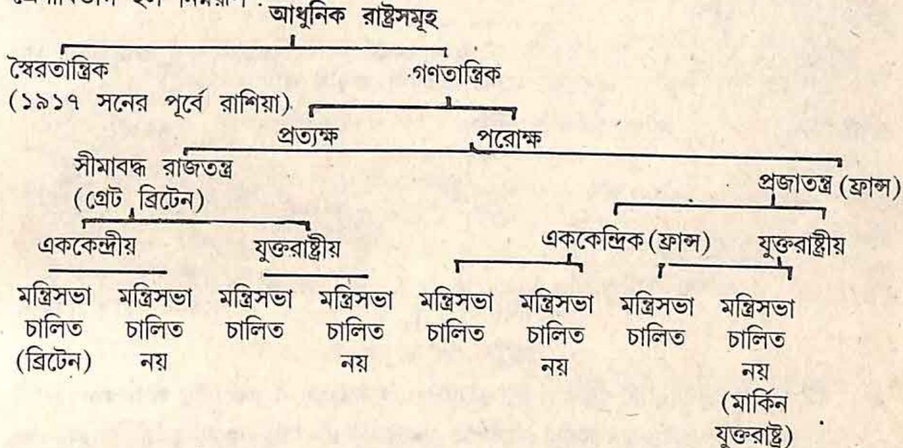
অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগকে মৌলিক বলে গণ্য করা হলেও বর্তমান যুগের শাসনব্যবস্থাসমূহের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ঐ শ্রেণীবিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়। বর্তমানে ব্রিটেনে বা জাপানে রাজতন্ত্র প্রচলিত থাকলেও ঐ শাসনব্যবস্থা অ্যারিস্টটলের ধারণা অনুযায়ী রাজতন্ত্র নয়। এইসব রাষ্ট্রে রাজার নামে শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করা হলেও প্রকৃত শাসন ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত। এই ধরনের রাজতন্ত্রকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলা হয়। অ্যারিস্টটল গণতন্ত্রকে বিকৃত শাসন রূপে আখ্যা দিয়েছেন কিন্তু বর্তমান যুগে গণতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ শাসন বলে বর্ণনা করা হয়। অনেকের মতে অ্যারিস্টটল প্রদত্ত রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের ধারণাগুলির দ্বারা একজন, কয়েকজন বা বহুজনের শাসনের পরিবর্তে একজন, কয়েকজন বা বহুজনের হাতে সার্বভৌমিকতা ন্যস্ত বোঝানো হয়েছে। অতএব এগুলি হল রাষ্ট্রের বিভিন্ন রূপ, সরকারের বিভিন্ন রূপ নয়। অ্যারিস্টটল প্রাচীন গ্রীসদেশের নগর রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আধুনিক রাষ্ট্রগুলির অসীম ব্যাপ্তি ও জটিলতা সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কোনও ধারণা ছিল না। এই কারণে তাঁর শ্রেণীবিভাগের মাধ্যমে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং সংসদচালিত ও রাষ্ট্রপতিচালিত ধরনের শাসনব্যবস্থার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

৩। আধুনিক শ্রেণীবিভাগ (Modern Classification)

আধুনিক কালে ম্যারিয়ট (Marriot) তিনটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারসমূহকে বিভক্ত করেছেন। প্রথমত সরকারের ক্ষমতা বন্টনের দিক দিয়ে তিনি সরকারকে এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় এই দুভাগে ভাগ করেছেন। দ্বিতীয়ত, সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি সরকারকে সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তৃতীয়ত, শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে তিনি সরকারকে সংসদ পরিচালিত ও রাষ্ট্রপতি চালিত এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

লীকক (Leacock) আধুনিক সরকারসমূহকে প্রথমে স্বৈরতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক এই দুভাগে ভাগ করেছেন। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে আবার তিনি সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। অতঃপর সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র এই উভয় ধরনের সরকারকে এককেন্দ্রীয়

ও যুক্তরাষ্ট্রীয় এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। পরিশেষে এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় এই দুটির প্রত্যেককে সংসদ চালিত ও সংসদ চালিত নয় এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। লীকক প্রদত্ত শ্রেণীবিভাগ হল নিম্নরূপ :



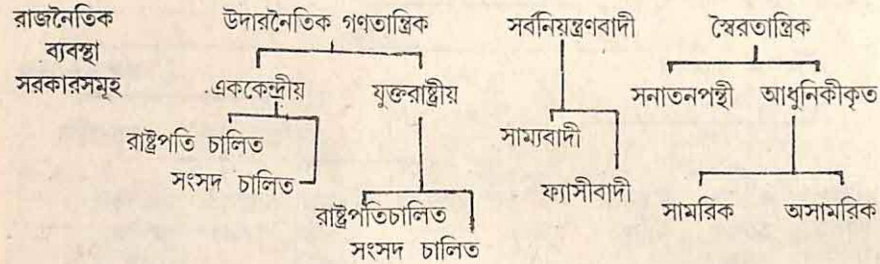
৪। সরকারের শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে অসুবিধাসমূহ (Difficulties in classification of Governments)

সরকারের শ্রেণীবিভাগ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাস্তবে কতকগুলি অসুবিধা দেখা যায়। প্রথমত, একই নামধারী বা একই ধরনের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা পদগুলি বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত উভয় রাষ্ট্রেই রাষ্ট্রপতির অস্তিত্ব দেখা যায়। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন নামসর্বস্ব শাসকপ্রধান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হলেন একাধারে নামসর্বস্ব শাসকপ্রধান ও প্রকৃত শাসক। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশেই দ্বিদলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা গেলেও এই দুই দেশের দলব্যবস্থার প্রকৃতি একরূপ নয়। দ্বিতীয়ত, সরকার বা রাজনৈতিক কাঠামোর শ্রেণীবিভাগ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় কোনও রাজত্ব বা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রশংসা করা হয় বা নিন্দা করা হয়। সুতরাং সরকারের শ্রেণীবিভাগ করার সময় অনেক ক্ষেত্রেই কোনও নির্দিষ্ট ধরনের শাসনব্যবস্থার প্রতি লেখকের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনব্যবস্থাকে অনেকে 'গণতান্ত্রিক' বলে আখ্যা দেন, আবার অনেকে 'সর্বনিয়ন্ত্রণতন্ত্র' (Totalitarian) বলে গণ্য করেন। তৃতীয়ত, অনেক রাষ্ট্রে মিশ্র প্রকৃতির শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকে। এগুলিকে নির্দিষ্ট কোনও শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। যেমন, ভারতকে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র বলেও আখ্যা দেওয়া যায় না, আবার বাস্তবে ভারত এককেন্দ্রীয় রাষ্ট্রও নয়। একইভাবে সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থাকে মন্ত্রিসভাচালিত ও রাষ্ট্রপতিচালিত শাসনব্যবস্থার সংমিশ্রণ বলে গণ্য করা হয়।

অ্যালান বল (Alan Ball)-এর মতে বিভিন্ন ধরনের সরকারের শ্রেণীবিভাগ করার পরিবর্তে বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ করলে আলোচনা অনেক বেশী ফলপ্রসূ হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা (Political system) বলতে কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বোঝায় না। কোনও সমাজের প্রচলিত সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও প্রক্রিয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত। এছাড়া রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে ব্যবস্থার অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে বোঝায় এবং এর ফলে ব্যবস্থার একটি অংশে পরিবর্তন দেখা দিলে

সেই সঙ্গে অন্যান্য অংশেও পরিবর্তন দেখা যায়। আধুনিক কালে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমূহকে—উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Liberal Democratic system), স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Autocratic system) এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Socialist system) এই তিন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়।

অ্যালান বল রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক, সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ও স্বৈরতান্ত্রিক এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করে নিম্নলিখিত ছকের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন :



৫। প্রচলিত সরকারসমূহের বিভিন্ন রূপ (Different forms of existing Governments)

আধুনিক কালে পৃথিবীর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে যে সকল ধরনের শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায় সেগুলিকে আলোচনার সুবিধার জন্য তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, সরকারের ক্ষমতা বিভাজনের ভিত্তিতে সরকারসমূহকে এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এককেন্দ্রীয় সরকারে সরকারের ক্ষমতা একটি মাত্র সরকার দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সমগ্র রাষ্ট্রে ঐ সরকারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা হল এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার উদাহরণ। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে একটি সাধারণ সরকার ও একাধিক আঞ্চলিক সরকারসমূহের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করা হয় এবং এই উভয় ধরনের সরকার সমমর্যাদা সম্পন্ন হয়ে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

দ্বিতীয়ত, শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সরকারসমূহকে মন্ত্রিসভা চালিত ও রাষ্ট্রপতি চালিত এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। মন্ত্রিসভা চালিত সরকারে শাসন ও আইন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রয়োগ করা হয় না। উভয় বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। এছাড়া একই ব্যক্তিরা শাসন ও আইন উভয় বিভাগের কাজের সাথে যুক্ত থাকেন। ব্রিটেন ও ভারতের শাসনব্যবস্থা হল মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থার উদাহরণ। রাষ্ট্রপতি চালিত সরকারের শাসন ও আইন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রযুক্ত হয়। একই ব্যক্তিরা শাসন ও আইন উভয় বিভাগের কাজের সাথে জড়িত থাকতে পারেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা হল রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থার উদাহরণ।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপ্রধানের পদটি বংশানুক্রমিক ও স্থায়ী অথবা রাষ্ট্রপ্রধানকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত করা হয়—এর ভিত্তিতে সরকারকে রাজতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক এই দুইভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। রাজতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান অর্থাৎ রাজার পদটি বংশানুক্রমিক। ব্রিটেন ও জাপানের শাসনব্যবস্থা হল সীমাবদ্ধ বা সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের উদাহরণ। অন্যদিকে প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একটি নির্দিষ্ট কার্যকালের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের শাসনব্যবস্থাকে প্রজাতান্ত্রিক বলে আখ্যা দেওয়া যায়।

৬। এককেন্দ্রীয় সরকার (Unitary Government)

এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় সমস্ত ক্ষমতা একটি মাত্র সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং ঐ সরকার পূর্ণ প্রাধান্য উপভোগ করে। সমগ্র দেশের শাসন কার্য ঐ সরকারের দ্বারা বা তার নির্দেশে পরিচালিত হয়। তবে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় একটি মাত্র কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া অন্য কোনও সরকারের অস্তিত্ব থাকবে না এরূপ ধারণা ঠিক নয়। কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন হলে শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য স্থানীয় বা আঞ্চলিক সরকার সৃষ্টি করে তাদের হাতে কিছু ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে। সংবিধান দ্বারা স্থানীয় বা আঞ্চলিক সরকারগুলিকে ক্ষমতা প্রদান করা হয় না। সুতরাং স্থানীয় সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সৃষ্টি ও তারা সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ। স্থানীয় সরকারগুলির ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ প্রাধান্য থাকে বলে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের ক্ষমতা হ্রাসবৃদ্ধি করতে পারে, তাদের পুনর্গঠন করতে পারে, এমন-কি তাদের অস্তিত্বের বিলোপসাধন করতে পারে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, জাপান, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি রাষ্ট্রে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

৭। এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of Unitary Government)

এককেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান বৈশিষ্টসমূহ হল এরূপ :

প্রথমত, এককেন্দ্রীয় সরকারে একটি মাত্র সরকার দ্বারা সমগ্র দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমেই প্রয়োগ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য স্থানীয় সরকার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু স্থানীয় সরকারসমূহ সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ থাকে।

দ্বিতীয়ত, এককেন্দ্রীয় সরকারে সাধারণত কেন্দ্রীয় আইনসভার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সংবিধানের প্রাধান্য দেখা যায় এবং ঐরূপ শাসনব্যবস্থায় সমস্ত ক্ষমতার উৎস হল সংবিধান। এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় সাধারণত সংবিধানের প্রাধান্যের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

তৃতীয়ত, এককেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতা বন্টনের কোনও প্রশ্ন না থাকায় সংবিধান লিখিত বা অলিখিত যে কোনও প্রকার হতে পারে। ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত কিন্তু অন্যান্য এককেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত। স্বয়ংশাসিত দুই শ্রেণীর সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের প্রশ্ন থাকলে সংবিধান লিখিত হওয়া আবশ্যক হয়।

চতুর্থত, এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান সুপরিবর্তনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় যে কোনও ধরনের হতে পারে। তবে এককেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সংবিধান সাধারণত সুপরিবর্তনীয় হয়ে থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধানের সাথে দুই ধরনের সরকারের স্বার্থ জড়িত থাকে বলে সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়া অত্যাবশ্যক।

পঞ্চমত, এককেন্দ্রীয় সরকারে বিচার বিভাগকে কোনও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় শাসন ও আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টন করা হয় না। ফলে ক্ষমতা বন্টন নিয়ে কোনও বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না বলে বিচারবিভাগকে ঐ ধরনের বিরোধ মীমাংসার জন্য অধিক ক্ষমতা প্রদানের প্রশ্ন ওঠে না।

৮। এককেন্দ্রীয় সরকারের সুবিধা (Advantages of Unitary Government)

এককেন্দ্রীয় সরকারের সুবিধাগুলি নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করা যেতে পারে :

প্রথমত, এককেন্দ্রীয় সরকারে সর্বোচ্চ ক্ষমতা একটি মাত্র সরকারের উপর ন্যস্ত থাকে বলে সমগ্র দেশে একই ধরনের শাসন ও আইন প্রচলিত থাকে। সমস্ত ক্ষমতার প্রয়োগকারী এই সরকার জনগণের মধ্যে একতাবোধের প্রতীকরূপে কাজ করে। সমগ্র দেশে একই ধরনের আইন ও নীতি

প্রযুক্ত হওয়ার ফলে জনগণের মধ্যে ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয়ত, এককেন্দ্রিক সরকারে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশের জন্য আইন প্রণয়ন ও শাসনকার্য পরিচালনা করে বলে শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও জটিলতার সৃষ্টি হয় না।

তৃতীয়ত, এককেন্দ্রীয় সরকারে একটি মাত্র প্রধান সরকার থাকে বলে সরকার পরিচালনার ব্যয়ও অনেক কম।

চতুর্থত, সঙ্কটময় মুহূর্তে বা জরুরী অবস্থার সময় এককেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ কার্যকরী। একটি মাত্র সরকার থাকে বলে সঙ্কটময় অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য দ্রুত যে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

পঞ্চমত, এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা সম্ভব বলে প্রগতিমূলক কাজের জন্য যে কোনও সময়ে দ্রুত সংবিধান সংশোধন করা যেতে পারে। পরিবর্তনশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সংবিধান সুপরিবর্তনীয় হওয়া একান্ত আবশ্যক। সুতরাং এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার সুপরিবর্তনীয়তা প্রগতির পক্ষে সহায়ক।

৯। এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অসুবিধা (Disadvantages of Unitary Government)

এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলি পরিলক্ষিত হয়:

প্রথমত এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সর্ববিষয়ে প্রাধান্য থাকার ফলে আঞ্চলিক সরকারগুলির কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে না। এই জন্য জনসাধারণের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের উৎসাহ হ্রাস পায়। অতএব গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে আদর্শ শাসনব্যবস্থারূপে গণ্য করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নানাবিধ সমস্যাগুলির স্বরূপ সম্যকভাবে উপলব্ধি করা সহজ নয়। এর ফলে আঞ্চলিক সমস্যাগুলির ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না এবং ঐ সব সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধান করা হয় না। সুতরাং অনেক সময় এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা সুশাসনের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে থাকে।

তৃতীয়ত, এককেন্দ্রিক সরকারে একটি মাত্র সরকারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা থাকার ফলে ঐ সরকারের স্বৈরাচারী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া একটি মাত্র সরকারের পক্ষে শাসন সংক্রান্ত সমস্ত কাজ পরিচালনা করা সম্ভব হয় না বলে সরকারকে আমলাদের ওপর যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করতে হয়। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে জনস্বার্থ ব্যাহত হতে পারে। এজন্য এককেন্দ্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভ, এমন-কি বিদ্রোহেরও সম্ভাবনা থাকে।

চতুর্থত, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে অংশগ্রহণ করার সুযোগ খুব কম থাকে। এর ফলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিকশিত হয় না এবং স্থানীয় শাসন ব্যাপারেও তাদের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায় না।

পরিশেষে বলা যায় যে, ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রে এককেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব। কিন্তু বৃহদায়তন রাষ্ট্রে একটি মাত্র সরকারের পক্ষে আধুনিক কল্যাণকর রাষ্ট্রের যাবতীয় দায়িত্ব সম্পাদন করা কঠিন। সুতরাং বৃহদায়তন রাষ্ট্রে এককেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

১০। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার (Federal Government)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতাসমূহ জাতীয়, কেন্দ্রীয় বা সাধারণ সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারসমূহের মধ্যে বিভক্ত করা হয়। দুই শ্রেণীর সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের বিষয়ে সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে লিখিত সংবিধানের প্রাধান্য দেখা যায়।

সাধারণ ও আঞ্চলিক—উভয়শ্রেণীর সরকারই সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং উভয় শ্রেণীর সরকারই সমমর্যাদাসম্পন্ন হয়ে থাকে। ডাইসী (Diecy) বলেন যে যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্র হল একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে জাতীয় ঐক্য ও শক্তি এবং অঙ্গরাজ্যগুলির অধিকার রক্ষার মধ্যে সমন্বয়সাধন করা হয়। হোয়্যার (Wheare)-এর মতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা তখনই বিদ্যমান থাকে যখন কোনও সমাজে সরকারের ক্ষমতা বাস্তবে এই নীতি অনুসারে ভাগ করা হয় যাতে কিছু বিষয়ের জন্য সমগ্র এলাকায় একটি একক স্বাধীন কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য স্বাধীন আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষসমূহ থাকে, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষই তার নিজের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে অন্যের সমপর্যায়ভুক্ত, অধস্তন নয় (Federal Government exists when the powers of government for a community are divided substantially according to the principle that there is a single indedependent authority for the whole area in respect of some matters and that there are independent regional authorities for other matters, each sets of authorities being co-ordinate with and not subordinate to the others within its own prescribed sphere)। বার্চ (Birch)-এর মতে যুক্তরাষ্ট্র হল এরূপ একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে একটি সাধারণ সরকার ও কয়েকটি আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে এমনভাবে ক্ষমতা বণ্টন করা হয় যে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ এক্তিয়ারে অন্যের পরিপূরকরূপে কাজ করে এবং তাদের প্রত্যেকে নিজ প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে জনগণকে শাসন করে।

১১। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of Federal Government)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে এক ধরনের বিশেষ ও স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থারূপে গণ্য করা হয়। এই শাসনব্যবস্থা যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য এর কতকগুলি বিশেষ ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথমত দুই ধরনের সরকারের অবস্থিতি—একটি সাধারণ বা কেন্দ্রীয় সরকার এবং কয়েকটি আঞ্চলিক সরকার। আঞ্চলিক সরকারগুলি বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যথা, রাজ্য, প্রদেশ, ক্যান্টন, ইউনিয়ান রিপাবলিক ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, সংবিধান দ্বারা সাধারণ সরকার ও আঞ্চলিক সরকার সমূহের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রে উভয় শ্রেণীর সরকারই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী। তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান লিখিত হওয়া অত্যাবশ্যক। লিখিত সংবিধানে উভয় সরকারের ক্ষমতাসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে। সুতরাং সংবিধান লিখিত হওয়ার ফলে কোনও সরকার অন্য সরকারের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না। চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হয়ে থাকে। সাধারণ আইন যে পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয় সেই পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধন করা যায় না। যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান সংশোধনের জন্য বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। সংবিধান পরিবর্তনের পদ্ধতি জটিল হওয়ার ফলে কোনও সরকারের পক্ষেই সহজে সংবিধান পরিবর্তন করে অন্য সরকারের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করা সম্ভব হয় না। পঞ্চমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার বা আঞ্চলিক সরকারের প্রাধান্যের পরিবর্তে সংবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারসমূহ সকলেই সংবিধান অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করতে বাধ্য থাকে। ষষ্ঠত, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের চরম ব্যাখ্যাকর্তা ও অভিভাবক রূপে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত অপরিহার্য। উভয় শ্রেণীর সরকার সংবিধানে উল্লেখিত ক্ষমতা অনুসারে কাজ করছে কিনা তা দেখা এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে কোনও বিরোধ দেখা দিলে তা মীমাংসা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতকে।

উপরে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় উভয় ধরনের সরকারের যথোপযুক্ত আর্থিক সঙ্গতি থাকা

প্রয়োজন। উভয় শ্রেণীর সরকারের পর্যাপ্ত আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে তারা তাদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে না। আর্থিক বিষয়ে কোনও সরকার অন্য সরকারের ওপর নির্ভরশীল হলে তার স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হতে পারে। দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন এবং আঞ্চলিক সরকার সমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত উচ্চকক্ষের মাধ্যমে অঞ্চলগুলির স্বার্থ রক্ষা করা ও তাদের সমস্যাসমূহ সমাধান করা যেতে পারে। আরও বলা হয় যে কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষে আয়তন ও জনসংখ্যা নির্বিশেষে সমস্ত অঞ্চলগুলি থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করা আবশ্যক। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়ে সমস্ত আঞ্চলিক সরকারসমূহকে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ প্রদান করা যেতে পারে। তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক সরকারগুলির প্রতিটিতে পৃথক সংবিধান প্রচলন করা যেতে পারে। তবে এইসব সংবিধান সর্বদাই যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া দরকার। চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের সাধারণত দ্বৈত নাগরিকতা প্রদান করা হয়। প্রথমটি হল যুক্তরাষ্ট্রীয় বা সমগ্রদেশের নাগরিকতা এবং অন্যটি হল ঐ ব্যক্তি যে অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করে সেই অঞ্চলের নাগরিকতা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই সর্বপ্রথম (১৭৮৭ সনে) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, সোভিয়েত রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রেও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

১২। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সুবিধা (Advantages of Federal Government)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সপক্ষে অনেক যুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় জাতীয় ঐক্যের সঙ্গে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় সাধন করা সম্ভব। এই শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলগুলির নিজস্ব ভাষা, ধর্ম সাহিত্য, সংস্কৃতি, আচারব্যবহার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলিকে অক্ষুণ্ণ রেখে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা যায়।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারসমূহ স্থানীয় সমস্যা ও অভাব-অভিযোগের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেয় এবং এইসব সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এককেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অনেক সময় দেশের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত অঞ্চলগুলির সমস্যাসমূহ দ্রুত সমাধান করা সম্ভব হয় না।

তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় অঞ্চলগুলিকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করা হয়। প্রতিটি অঞ্চলই স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে নিজ নিজ এলাকায় শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সরকার গঠন করতে পারে। স্বায়ত্তশাসনকে গণতন্ত্রের ভিত্তিরূপে গণ্য করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ প্রদান করা হয় বলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের অনুকূল বলে বিবেচনা করা হয়।

চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকার সমূহের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়ার ফলে কোনও সরকারের ওপর বেশি কাজের চাপ পড়ে না। এইজন্য উভয় সরকারই নিজ নিজ এলাকায় সুষ্ঠুভাবে কার্যসম্পাদন করতে পারে।

পঞ্চমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারসমূহের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়া হয় বলে কেন্দ্রীয় সরকার কখনও অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে স্বৈরাচারী হতে পারে না, কিন্তু এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার চরম ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হয় বলে ঐ সরকারের পক্ষে স্বৈরাচারী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ষষ্ঠত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র, দুর্বল, অনগ্রসর এবং নির্ভরশীল নয় এরূপ অঞ্চলগুলি নিজেদের অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নানাধরনের

সুযোগসুবিধা লাভ করে। অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলি কোনও যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত না হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলে তারা প্রত্যেকে দুর্বল রাষ্ট্র বলে গণ্য হত।

সপ্তমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং একাধিক আঞ্চলিক সরকার থাকার ফলে অধিকসংখ্যক ব্যক্তি শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। নাগরিকরা প্রথমে আঞ্চলিক সরকারের শাসনকার্যের সঙ্গে জড়িত থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করলে পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে তারা আরও বেশী দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে কাজ করতে পারে। সুতরাং দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি হয়।

অষ্টমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসন সংক্রান্ত ও আইন প্রণয়ন বিষয়ে কোনও নতুন প্রকল্প প্রথমে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রয়োগ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো যেতে পারে। প্রকল্পটি ঐ অঞ্চলে সাফল্য অর্জন করলে এরূপ ব্যবস্থা সমগ্র দেশে প্রচলন করা যেতে পারে। সমগ্র দেশ জুড়ে এরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো বিপজ্জনক কারণ এরূপ পরীক্ষা ব্যর্থ হলে সমগ্র দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

১৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অসুবিধা (Disadvantages of Federal Government)

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দুইশ্রেণীর সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের ফলে উভয় ধরনের সরকারই দুর্বল হয়। অন্যদিকে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে বলে ঐ সরকার অনেক বেশী শক্তিশালী হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয় ছাড়া প্রতিটি আঞ্চলিক সরকার পরিচালনার জন্য পৃথক পৃথক ব্যয় হয়। সুতরাং এককেন্দ্রীয় সরকারের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার অনেক ব্যয়বহুল।

তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রে ও অঞ্চলগুলিতে পৃথক পৃথক সরকার থাকার ফলে এই শাসন ব্যবস্থা অনেক সময় জটিল হয়ে পড়ে। দুটি সরকারের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক সময় এই জটিলতা পরিলক্ষিত হয়। একাধিক সরকার থাকার ফলে এই শাসন ব্যবস্থায় জাতীয় স্বার্থ সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে আঞ্চলিক সরকারগুলিকে পরামর্শ না করে কেন্দ্রের পক্ষে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন আঞ্চলিক আইনসভাসমূহ হয়ত একই বিষয়ে পরস্পর বিরোধী আইন প্রণয়ন করতে পারে। আবার কেন্দ্রীয় সরকার গৃহীত কোনও নীতি আঞ্চলিক সরকারসমূহ কর্তৃক গৃহীত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। এইভাবে কোনও যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আইন ও নীতি প্রচলিত থাকতে পারে।

পঞ্চমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাবে অনেক সময় কেন্দ্র ও আঞ্চলিক উভয় সরকারের সম্মতি পাওয়া যায় না। সুতরাং দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান অনেক সময় প্রগতির ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

ষষ্ঠত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রের সঙ্কটময় মুহূর্তে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সঙ্কটময় অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যক। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক সরকার থাকার ফলে অনেকসময় তাদের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অযথা সময় নষ্ট হয়।

১৪। এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Unitary and Federal Governments)

আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টনের নীতি অনুসারে সরকারসমূহকে এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমত, এককেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সমগ্র দেশের শাসনকার্য একটি মাত্র সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং এই সরকারের পূর্ণ প্রাধান্য বজায় থাকে। তবে প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় সরকার শাসন কাজ পরিচালনার সুবিধার জন্য স্থানীয় বা আঞ্চলিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এই সব স্থানীয় সরকারসমূহের নিজস্ব কোন সত্তা থাকে না। এরা সকল বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার এই সরকারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এদের বিলোপসাধন পর্যন্ত করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সমমর্যাদা সম্পন্ন দুই শ্রেণীর সরকারের অস্তিত্ব অপরিহার্য—কেন্দ্রে সাধারণ সরকার এবং বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক সরকারসমূহ। এই শাসনব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীনে থাকে না। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক উভয় শ্রেণীর সরকারই সংবিধান অনুসারে যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে থাকে।

দ্বিতীয়ত, এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় একটি সরকার শাসন ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী বলে ক্ষমতা বণ্টনের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আইন প্রণয়ন ও শাসন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।

তৃতীয়ত, এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান লিখিত বা অলিখিত যে কোনও ধরনের হতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় যেহেতু দুই শ্রেণীর সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয় সেইজন্য সংবিধান লিখিত হওয়া আবশ্যক।

চতুর্থত, এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় একটি মাত্র সরকারের দ্বারা বা নির্দেশে সমগ্র দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করা হয় বলে সংবিধান সুপরিবর্তনীয় হয়ে থাকে। সাধারণত কেন্দ্রীয় সরকার এককভাবে এই ধরনের সংবিধান পরিবর্তন করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক উভয় সরকারের ক্ষমতা ও স্বার্থ বজায় রাখার জন্য সংবিধান সংশোধনের দায়িত্ব এককভাবে কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক সরকারের হাতে দেওয়া হয় না। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান সংশোধনের জন্য কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক উভয় সরকারের সম্মতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এইজন্য সংবিধান সংশোধনের জন্য বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। অতএব যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়া আবশ্যক।

পঞ্চমত, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বময় প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক উভয় সরকারসমূহ সংবিধানে উল্লেখিত ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করে থাকে। যে কোনও সরকার সংবিধান বিরোধী কোনও আইন প্রণয়ন করলে ঐ আইনকে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় দু ধরনের সরকারের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না বলে ক্ষমতা বণ্টনের কোনওপ্রশ্ন ওঠে না এবং সংবিধানের প্রাধান্য না থাকায় সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভূত হয় না। সুতরাং ক্ষমতা বণ্টনকে কেন্দ্র করে কোনও বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসা করার জন্য ও সংবিধানের চরম ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবেকোনওআদালতের প্রয়োজন দেখা যায় না।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার দুই ধরনের সরকারের মধ্যে রিরোধ মীমাংসা এবং সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যার দায়িত্ব পালন করে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। সুতরাং একটি শক্তিশালী

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত শাসন ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়।

সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর প্রতিটি যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমাগত ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। উইলোবী, সায়েট, লোয়েনস্টাইন প্রমুখ লেখকগণ মনে করেন যে যুক্তরাষ্ট্রের এইরূপ কেন্দ্র প্রবণতার ফলে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যের মাত্রা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

হোয়্যার (Wheare) বলেন যে, যুদ্ধ, অর্থনৈতিক মন্দা, সেবামূলক কাজের সম্প্রসারণ এবং পরিবহন ও শিল্পের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক বিপ্লব এই চারটি কারণে যে কোনও যুক্তরাষ্ট্রে অঞ্চলগুলি অপেক্ষা সাধারণ সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে তাঁর মতে এর থেকে এরূপ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। পরিবর্তনশীল সমাজে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য সাধারণ সরকার কর্তৃক অধিক ক্ষমতা প্রয়োগের নীতিকে সর্বদা সমর্থন করা যায়। এর ফলে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য কোনও মতে বিনষ্ট হয় না, বরং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ভিত্তি দৃঢ় হয়।

১৫। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি (Nature of the Indian Federation)

'যুক্তরাষ্ট্র' এই শব্দটি ভারতের সংবিধানের কোনও স্থানে দেখা যায় না। সংবিধানের প্রথম ধারায় ভারতকে একটি 'রাজ্যসমূহের সংঘ' (Union of States) বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ভারতের সংবিধান এবং শাসনব্যবস্থা কতখানি যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতির সে সম্পর্কে যথেষ্ট বিতর্ক দেখা যায়। বিভিন্ন সংবিধান বিশারদ ও আইনজ্ঞগণ ভারতের শাসনব্যবস্থাকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। পূর্ণ অর্থে যুক্তরাষ্ট্ররূপে গণ্য করার পরিবর্তে ভারতের শাসনব্যবস্থাকে 'আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়' (quasi-federal), 'যুক্তরাষ্ট্রীয়ও নয় আবার এককেন্দ্রিকও নয়' (neither federal nor unitary), 'প্রবল কেন্দ্রীয় ঝোঁক সম্বলিত যুক্তরাষ্ট্র' (federation with strong unitary bias) , 'সম্পূর্ণরূপে যুক্তরাষ্ট্রীয় বা সম্পূর্ণরূপে এককেন্দ্রিক নয় কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণ' (neither purely federal nor purely unitary but is a combination of both) , 'সহায়ক এককেন্দ্রিক নীতি সম্বলিত যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রের পরিবর্তে সহায়ক যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি সম্বলিত এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র' (a Unitary state with subsidiary federal principles rather than a federal state with subsidiary Unitary principles), ইত্যাদি নানা ধরনের আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

সংবিধানের প্রথম ধারায় ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র রূপে আখ্যা দেওয়ার পরিবর্তে কেন 'রাজ্যসমূহের সংঘ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে বিষয়ে সংবিধান পরিষদে ডঃ আম্বেদকর প্রদত্ত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। ডঃ আম্বেদকরের মতে দুটি কারণে ভারতকে রাজ্যসমূহের সংঘ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, অন্যান্য অনেক যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় অঞ্চলগুলির মধ্যে চুক্তির ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সৃষ্ট হয় নি। দ্বিতীয়ত, কোনও রাজ্যের ভারতীয় সংঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার নেই। তবে পৃথিবীর অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও 'সংঘ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রূপে গণ্য করা হলেও ঐ দেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সংঘ' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র হলেও ঐ দেশ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের সংঘ (Union of Soviet Socialist Republics) নামে পরিচিত। ভারতের সংবিধানে ব্যবহৃত 'সংঘ' শব্দটি বলতে বোঝায় যে ভারতীয় সংঘ একটি চিরন্তন ও অভঙ্গুর সংঘ। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যগুলি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তা এই রাজ্যসমূহের সংঘ এই বাক্যাংশটির দ্বারা উপলব্ধি করা যেতে পারে। কারণ রাজ্যগুলিকে বাদ দিয়ে ভারতীয় সংঘের অস্তিত্বই কল্পনা করা অসম্ভব।

ভারতের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্র শব্দটি উল্লেখ করা না হলেও এই সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন

ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির অস্তিত্ব দেখা যায়। প্রথমত, ভারতের সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রে একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও বর্তমানে ২২টি রাজ্যে রাজ্যসরকারসমূহের সহঅবস্থান দেখা যায়। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে ৯টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভারতের সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারসমূহের মধ্যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বিস্তারিত ভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত, ভারতের সংবিধান লিখিত সংবিধান। এই সংবিধানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারসমূহের ক্ষমতা ও উভয় শ্রেণীর সরকারের মধ্যে আইন প্রণয়ন, প্রশাসনিক ও রাজস্বসংক্রান্ত সম্পর্কের বিষয় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থত, ভারতের সংবিধান আংশিকভাবে দুষ্পরিবর্তনীয়। সংবিধানে উল্লেখিত যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়, যেমন কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসন ক্ষমতার প্রসার, কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বণ্টনের তালিকা, পার্লামেণ্টে রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি পার্লামেণ্ট একাকী সংশোধন করতে পারে না। এই সব বিষয়গুলি সংশোধন করতে হলে পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন ছাড়াও রাজ্য আইনসভাসমূহের অন্তত অর্ধেকের অনুমোদন আবশ্যক। পঞ্চমত, ভারতের সংবিধানের চরম ব্যাখ্যা করা এবং কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে কোন বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের ওপর। অতএব ভারতের সুপ্রীম কোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের ভূমিকা পালন করে থাকে। ষষ্ঠত, ভারতের সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় শ্রেণীর সরকারের স্বতন্ত্র রাজস্বের বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আর্থিক কারণে কেন্দ্র বা রাজ্য কোনও সরকারকেই অন্য সরকারের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হতে হয় না।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে ভারতের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলির সন্ধান মেলে। তবে এই সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্যসমূহ অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এবং বহু ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্যসরকার সমূহের ক্ষমতা ও কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী কয়েকটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারসমূহের ওপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে এবং কয়েকটি সাংবিধানিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে রাজ্যগুলির অধস্তন পদমর্যাদার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিষয়গুলির মধ্যে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত, ভারতে রাজ্যসমূহের কোন স্বতন্ত্র সংবিধান নেই। ভারতের সংবিধানেই কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহ উভয়ের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি অঞ্চলের পৃথক সংবিধানের অস্তিত্ব দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, ভারতের সংবিধান অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা এরূপভাবে ভাগ করা হয়েছে যার ফলে কেন্দ্রের হাতে রাজ্যসমূহের তুলনায় অনেক বেশী ক্ষমতা দেখা যায়। কেন্দ্রীয় তালিকা ও অনুল্লেখিত বিষয়গুলির ওপর আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা একমাত্র পার্লামেণ্টের। যুগ্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির ক্ষেত্রেও পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনের প্রাধান্য দেখা যায়। রাজ্যতালিকার অন্তর্গত বিষয়সমূহের ওপর স্বাভাবিক অবস্থায় জাতীয় স্বার্থে এবং জরুরী অবস্থা জারি থাকা কালীন পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করতে পারে। অতএব আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। তৃতীয়ত, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষে প্রতিটি অঞ্চল থেকে আয়তন ও জনসংখ্যা নির্বিশেষে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ছোট বড় সব অঙ্গগুলি সমান অধিকার ভোগ করে। কিন্তু ভারতে পার্লামেণ্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় রাজ্যসমূহের জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধি প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে ঐ কক্ষে বড় রাজ্যগুলি থেকে অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি এবং ছোট

রাজ্যগুলি থেকে কমসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে উত্তর প্রদেশ থেকে রাজ্যসভায় ৩৪ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয় এবং নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা ও মেঘালয় থেকে ১ জন করে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়। সুতরাং ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষে অঞ্চলগুলির সম-প্রতিনিধিত্বের নীতিটি গ্রহণ করা হয় নি। চতুর্থত, রাজ্যসমূহের শাসকপ্রধান রাজ্যপালগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুযায়ী কাজে বহাল থাকেন। পঞ্চমত, অনেক ক্ষেত্রেই রাজ্য আইনসভা প্রণীত কোনও বিল রাজ্যপালের নিকট স্বাক্ষরের জন্য প্রেরণ করা হলে তিনি ঐ বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য আটক রাখতে পারেন। রাষ্ট্রপতি যদি ঐ বিলে সম্মতি প্রদান না করেন তাহলে ঐ বিল আইনে পরিণত হতে পারে না। ষষ্ঠত, পার্লামেন্ট সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন করে যে কোনও রাজ্যকে পুনর্গঠন করতে পারে বা তার সীমানা পরিবর্তন করতে পারে। এরূপ বিষয়ে রাজ্যসমূহের অভিমত গ্রহণ করা হলেও কেন্দ্রীয় সরকার ঐ অভিমত অনুসারে চলতে বাধ্য থাকে না। সপ্তমত, যুক্তরাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও ভারতে এক-নাগরিকতা প্রবর্তন করা হয়েছে। নাগরিকদের ভারতীয় নাগরিকতা ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে রাজ্যের নাগরিকতা প্রদান করা হয় না। অষ্টমত, রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রের যাবতীয় নির্বাচন পরিচালনা করা ছাড়াও সমস্ত রাজ্যের আইনসভাসমূহের নির্বাচন পরিচালনা করে। নবমত, রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত ভারতের কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল কেন্দ্রীয় সরকার ও সকল রাজ্যসরকারসমূহের আয়ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করেন। দশমত, সমগ্র ভারতের জন্য অখণ্ড বিচার ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়েছে। রাজ্যের উচ্চ আদালতসমূহের বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং পার্লামেন্টে তাঁদের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা বা অসদাচরণের অভিযোগের জন্য প্রস্তাব পাশ করা হলে রাষ্ট্রপতি তাঁদের অপসারণ করতে পারেন। একাদশত, ভারতের সংবিধানের অধিকাংশ ধারাই পার্লামেন্ট একাকী সংশোধন করতে পারে। এইসব বিষয়ে রাজ্যগুলির সম্মতি গ্রহণ করতে হয় না। পরিশেষে বলা যায় যে, বিভিন্ন ধরনের জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হলে ভারতের শাসনব্যবস্থা প্রায় এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। রাষ্ট্রপতি রাজ্যসমূহে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার কারণে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে রাজ্যসরকারসমূহকে যে কোনও সময়ে ভেঙে দিতে পারেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও কোনও দুটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতির মধ্যেই মিল দেখতে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ এবং অবস্থা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতিও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে দিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতীয় উপমহাদেশে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র সহজ সমাধানরূপে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। তবে অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা ও বিভিন্ন ভেদমূলক শক্তিগুলিকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারকে যথেষ্ট শক্তিশালী করা হয়েছে। এই জন্য ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা সত্ত্বেও জাতীয় স্বার্থকে সর্বদা প্রাধান্য দেওয়া হয়। জর্জ অস্টিনের ভাষায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হল 'একটি নতুন ধরনের যুক্তরাষ্ট্র যার মাধ্যমে ভারতের স্বাতন্ত্র্যসূচক প্রয়োজনসমূহ মেটানো যাবে' ('a new kind of federalism to meet India's peculiar needs')।

উপসংহারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে ভারতের প্রধান বিচারপতি বেগ রাজস্থান বনাম সংঘ (১৯৭৮) মামলায় যে মন্তব্য করেছিলেন তা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন যে "এক অর্থে ভারতীয় সংঘ হল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু এখানে যুক্তরাষ্ট্রকে সীমাবদ্ধ করতে হয়েছে দেশের প্রগতি ও উন্নয়নের স্বার্থে এবং এটি এমনই একটি দেশ যেখানে জাতীয় সংহতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমন্বয় এবং সামাজিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি একান্তই জরুরী।" (In a sense... the Indian Union is federal. But, the extent of federalism in it is

largely watered down by the needs of progress and development of a country which has to be nationally integrated, politically and economically co-ordinated, and socially, intellectually and spiritually uplifted)।

১৬। মন্ত্রিসভাচালিত শাসনব্যবস্থা—প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ (Parliamentary Government—Nature and characteristics)

মন্ত্রিসভাচালিত শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগসূত্র থাকে। এই শাসনব্যবস্থায় আইনসভায় জনপ্রিয় কক্ষের নির্বাচনে যে দল বা দলগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তাদের নেতা প্রধানমন্ত্রী রূপে নিযুক্ত হন এবং তাঁরই নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হয়। এই মন্ত্রিপরিষদ হল প্রকৃত শাসক। মন্ত্রিপরিষদ তার কাজের জন্য সর্বদা আইনসভার কাছে দায়ী থাকে এবং আইনসভা যে কোনও সময়ে মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাশ করে তাকে অপসারণ করতে পারে। এই শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত শাসনক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকলেও একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে আনুষ্ঠানিকভাবে শাসনকার্য পরিচালন করেন।

মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থার উৎপত্তি হয় ব্রিটেনে। ঐ দেশে এই শাসনব্যবস্থা ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে।। বস্তুত এর প্রতিষ্ঠার পিছনে কোনওপূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা ছিল না। ভারত, জাপান, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে। এই শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা শাসনকাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে বলে একে মন্ত্রিসভাচালিত শাসনব্যবস্থা (Cabinet Government) বলা হয়। আবার এই শাসনব্যবস্থায় আইনসভার সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রীরা নিযুক্ত হন এবং আইনসভা মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োজন হলে পদচ্যুত করতে পারে বলে একে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা (Parliamentary Government) বলা হয়। আইনসভার নিকট প্রকৃত শাসন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মন্ত্রিসভা দায়ী থাকে বলে এই শাসনব্যবস্থাকে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা (Responsible Government) বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত শাসনকর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মন্ত্রিসভার গঠন ও পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করে বলে সাম্প্রতিক কালে অনেকে এই শাসন ব্যবস্থাকে প্রধানমন্ত্রী চালিত শাসনব্যবস্থা (Primeministerial Government) বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন।

মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি হল এরূপ :

প্রথমত, এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান ও প্রকৃত শাসকের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। নিয়মতান্ত্রিক শাসকের নামে শাসনকার্য পরিচালনা করা হয়। তাঁকে রাষ্ট্রের প্রধান বা জাতির প্রতীকরূপে গণ্য করা হয়। ব্রিটেনের রাজা বা রানী এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান। মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসন পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদান করা হয় মন্ত্রিপরিষদের ওপর। রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান সর্বদা প্রকৃত শাসক অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা করেন। মন্ত্রিপরিষদের নেতৃত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীকে সরকারের প্রধানরূপে গণ্য করা হয়।

দ্বিতীয়ত, আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যদের মধ্য থেকেই মন্ত্রীদের নিয়োগ করা হয় এবং মন্ত্রীরা সকলেই আইনসভার সদস্যরূপে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।

তৃতীয়ত, মন্ত্রিসভা তার কার্যকলাপের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভার জনপ্রিয় কক্ষ অর্থাৎ নিম্নকক্ষ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাশ করলে মন্ত্রিসভাকে সমষ্টিগতভাবে পদত্যাগ করতে হয়। এছাড়া প্রশ্ন, সমালোচনা, মুলতুবী প্রস্তাব ইত্যাদির মাধ্যমেও

আইনসভার সদস্যরা মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

চতুর্থত, মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা রূপে প্রধানমন্ত্রী আইনসভা ও মন্ত্রিসভা উভয় স্থানেই নেতৃত্ব প্রদান করেন। এছাড়া রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধান উপদেষ্টার ভূমিকাও গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

পঞ্চমত, এই শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য একটি বিরোধীদলের অস্তিত্ব অনেকে অপরিহার্য বলে মনে করেন। কারণ আইনসভায় একটি শক্তিশালী ও সুসংগঠিত বিরোধী দল না থাকলে মন্ত্রিসভার দোষত্রুটিগুলি তুলে ধরা যায় না। বিরোধী দল শক্তিশালী হলে মন্ত্রিসভা গঠনকারী ক্ষমতাসীন দল স্বৈরাচারী হতে পারে না। এছাড়া কোনও সময়ে হঠাৎ মন্ত্রিসভার পতন ঘটলে বিরোধী দল প্রয়োজন হলে সরকার গঠন করতে পারে।

১৭। মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থার সুবিধা (Advantages of Parliamentary Government)

মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার ফলে সুশাসন সম্ভব হয়। একই ব্যক্তিরা একাধারে মন্ত্রীরূপে শাসন বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান রূপে কাজ করেন ও অন্য দিকে আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রভাবশালী নেতা রূপে আইন প্রণয়নের কাজে অংশগ্রহণ করেন। মন্ত্রিসভা আইনসভাকে নেতৃত্ব প্রদান করে এবং আইনসভা প্রণীত আইন অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করে। আইনসভা সরকারের ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদন ও মঞ্জুর করে এবং মন্ত্রিসভার নির্দেশে শাসন বিভাগ ঐ অর্থ ব্যয় করে।

দ্বিতীয়ত, মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় সরকারের পক্ষে স্বেচ্ছাচারী হওয়া সম্ভব নয়। মন্ত্রীরা সকলেই আইনসভার সদস্যরূপে আইনসভায় অংশ গ্রহণ করেন। আইনসভার সদস্যরা মন্ত্রীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে যে কোনও বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারেন। সুতরাং মন্ত্রীরা প্রত্যেকেই তাঁদের কাজকর্মের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। এইজন্য তাঁদের পক্ষে যথেচ্ছভাবে কাজ করা সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা সমষ্টিগতভাবে আইনসভার জনপ্রিয় কক্ষের নিকট দায়ী থাকে। আইনসভার নিম্নকক্ষ যদি কখনও মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাশ করে সে ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। আইনসভার নিম্নকক্ষের প্রতিনিধিরা জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। সুতরাং দেখা যায় যে মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণ তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রকৃত শাসক অর্থাৎ মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন, এমন-কি পদচ্যুত পর্যন্ত করতে পারেন। এইজন্য এই শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীরা সর্বদা জনমতের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাসন কার্য পরিচালনা করেন। এই কারণে মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থাকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থারূপে গণ্য করা যায়।

চতুর্থত, মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনের সময়ে বিভিন্ন দলগুলি জনসমর্থন লাভের জন্য তাদের নীতি ও কার্যসূচী জনগণের মধ্যে প্রচার করে। এছাড়া আইনসভায় মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বিরোধীদল আনীত অভিযোগ ও তার উত্তরে সরকারের জবাব, মন্ত্রীদের কাজকর্ম ও আচরণ সম্পর্কে আইনসভার সদস্যদের প্রশ্ন ও মন্ত্রীদের প্রত্যুত্তর বেতার, দূরদর্শন ও পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে এসে পৌঁছায়। এইভাবে দলীয় প্রচার ও মন্ত্রীদের কার্যকলাপের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে ধারণালাভের ফলে নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে।

পঞ্চমত, মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার একটি নির্দিষ্ট কার্যকাল থাকলেও প্রকৃতপক্ষে আইনসভার নিম্নকক্ষের আস্থার ওপর মন্ত্রিসভার কার্যকাল নির্ভর করে। সুতরাং সরকারের প্রধানরূপে প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রকৃত শাসনকর্তৃপক্ষ মন্ত্রিসভা যদি জনমতের বা বৃহত্তর স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেন তবে যে কোনও সময়ে তাঁদের অপসারণ করা যায়। আইনসভা যে

কোনও সময়ে একটি মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়ে নতুন এক মন্ত্রিসভার আবির্ভাব ঘটাতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়। ব্রিটেনে নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধানরূপে রাজা বা রানী রাজত্ব করেন কিন্তু প্রকৃত শাসন কাজ পরিচালনা করে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা।

১৮। মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থার অসুবিধা (Disadvantages of Parliamentary Government)

মন্ত্রিসভা চালিত শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয় না। ফলে একদল ব্যক্তিই শাসন সংক্রান্ত ও আইন প্রণয়ন উভয় ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এর ফলে স্বৈরাচারিতার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। অনেকের মতে ব্রিটেনে মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থা বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর একনায়কত্বে পরিণত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় আইনসভার নিম্নকক্ষের আস্থা হারালে যে কোনও সময়ে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। এর ফলে মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় সরকারের স্থিতিশীলতা যথেষ্ট দৃঢ় হয় না। আবার আইনসভায় কোনও রাজনৈতিক দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারলে অনেক সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে সম্মিলিত মন্ত্রিসভা (coalition Ministry) গঠন করা হয়। বিভিন্ন দলের মতাদর্শের পার্থক্যের জন্য অনেক সময় এরূপ মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব স্বল্প হয়।

তৃতীয়ত, মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থা অনেক সময় দলীয় শাসনে পরিণত হয়। দলীয় নিয়মানুবর্তিতা প্রয়োগ করার ফলে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যদের সর্বদা মন্ত্রিসভা গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহকে বিনা প্রতিবাদে সমর্থন করতে বাধ্য থাকতে হয়। সুতরাং এই শাসনব্যবস্থায় আইনসভার সদস্যদের ও মন্ত্রীদের অনেকসময় নিজেদের বিচার বিবেচনার ওপরে দলীয় স্বার্থকে স্থান দিতে হয়।

চতুর্থত, জরুরী অবস্থায় মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থা উপযুক্ত নয়। এর কারণ হল একাধিক ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত মন্ত্রিসভায় কোনও বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসন সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব একজন ব্যক্তির ওপর থাকে বলে সংকটময় সময়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ।

পঞ্চমত, মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় আইনসভার গুরুত্ব হ্রাস পায়। আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মন্ত্রিসভা গৃহীত যে কোনও সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রমকে আইনসভায় অনুমোদন ও সমর্থন করা হয়। সুতরাং মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় তত্ত্বগতভাবে মন্ত্রিসভা আইনসভার নিয়ন্ত্রণাধীন হলেও বাস্তবে দলীয় নিয়মশৃঙ্খলা প্রবর্তনের ফলে মন্ত্রিসভা অনেক বেশী শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায় যে মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় আইনসভার সদস্যদের মধ্য থেকে দলীয় রাজনীতির ভিত্তিতে মন্ত্রীদের নিয়োগ করা হয়। এর ফলে অনেক সময় অযোগ্য ব্যক্তিরা মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন। সুতরাং মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীরা অনেক সময় শাসকরূপে দক্ষ হন না। এইজন্য এই ধরনের সরকার অনেক সময় দুর্বল হয়ে থাকে।

১৯। রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থা—প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ (Presidential Government—Nature and Characteristics)

রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থা আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ভিত্তিতে গঠিত হয়। এই শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগের পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রপতিকে প্রদান করা হয়।

তিনি জনগণের দ্বারা নির্দিষ্ট কার্যকালের জন্য নির্বাচিত হন এবং আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন না। রাষ্ট্রপতি তাঁর শাসন কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়তা গ্রহণ করার জন্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করে থাকেন। তবে তিনি মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে বাধ্য থাকেন না। মন্ত্রীদের রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারীরূপে গণ্য করা হয়। একমাত্র রাষ্ট্রপতিই মন্ত্রীদের নিয়োগ করতে পারেন। তাঁরা কেউ আইনসভার সদস্য হতে পারেন না এবং আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন না।

রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন করার দায়িত্ব প্রদান করা হয় আইনসভার ওপর। রাষ্ট্রপতি ও তাঁর মন্ত্রীরা আইনসভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন না ও আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা হল রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় :

প্রথমত, এই শাসনব্যবস্থায় নামসর্বস্ব শাসক-প্রধান ও প্রকৃত শাসকের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না। রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্রের প্রতীক প্রধান ও শাসন বিভাগের সর্বাধিনায়ক রূপে কাজ করেন।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতি জনগণের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট কার্যকালের জন্য নির্বাচিত হন।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি তাঁর শাসন সংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করার জন্য কয়েকজন আস্থাভাজন ব্যক্তি নিয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মন্ত্রিরা রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত ইচ্ছানুযায়ী পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। রাষ্ট্রপতি কোনও বিষয়ে মন্ত্রিদের পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য থাকেন না। মন্ত্রিদের তাঁর অধস্তন কর্মচারীরূপে গণ্য করা হয়।

চতুর্থত, এই শাসনব্যবস্থায় আইন সংক্রান্ত কাজ পরিচালনার দায়িত্ব নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত আইনসভার ওপর প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রপতি ও তাঁর মন্ত্রিরা কেউ আইনসভার সদস্য হতে পারেন না এবং আইনসভার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতি ও তাঁর মন্ত্রিরা আইনসভার নিকট কোনও ভাবে দায়ী থাকেন না। অন্যভাবে বলা যায় যে আইনসভা রাষ্ট্রপতি বা তাঁর মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

পঞ্চমত, রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায় না।

২০। রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থার সুবিধা (Advantages of Presidential Government)

প্রথমত, রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হল এর স্থায়িত্ব। রাষ্ট্রপতি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন। আইনসভা তাঁকে বা তাঁর মন্ত্রিদের অনাস্থা সূচক প্রস্তাব পাশ করে অপসারণ করতে পারে না। সুতরাং এর ফলে শাসন বিভাগ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করতে পারে। শাসন কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরা যদি প্রায়ই পরিবর্তিত হন সেক্ষেত্রে সরকারের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও প্রায় পরিবর্তন দেখা দেবে। সুতরাং স্থায়ী সরকার গঠনের জন্য রাষ্ট্রপতি চালিত সরকার অধিকতর কাম্য।

দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ ও সংকটময় সময়ে রাষ্ট্রপতি চালিত সরকারকে বিশেষ কার্যকরী বলে গণ্য করা যায়। এই শাসনব্যবস্থায় শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত থাকার ফলে জরুরী অবস্থায় তিনি নিজ বিবেচনা অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত ও জরুরী কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেন।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রয়োগ করা হয় বলে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগেব মধ্যে ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে কোনও বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না। এই শাসনব্যবস্থায় শাসন ও আইন উভয় বিভাগই তাদের নিজ নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে ক্ষমতা প্রয়োগ

করে।

চতুর্থত, রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি দলমত নির্বিশেষে তাঁর নিজ অভিরুচি অনুযায়ী দক্ষ ব্যক্তিদের শাসন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিয়োগ করতে পারেন।

পঞ্চমত, রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায় আইনসভার শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকে না বলে আইনসভা সবসময় দলীয় মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হয় না।

২১। রাষ্ট্রপতি চালিত সরকারের অসুবিধা (Disadvantages of Presidential Government)

প্রথমত, রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি একটি নির্দিষ্ট কার্যকালের জন্য নির্বাচিত হন এবং তিনি তাঁর কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন না। একমাত্র সংবিধান ভঙ্গ বা গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁকে এক বিশেষ জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করে অপসারণ করা যেতে পারে। সুতরাং কার্যকালের মধ্যে রাষ্ট্রপতি যদি শাসন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেন তবে তাঁকে আইনসভা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এই কারণে এই শাসনব্যবস্থাকে অনেকে বিপজ্জনক বলে গণ্য করেন।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ প্রযুক্ত হওয়ার ফলে উভয় বিভাগের মধ্যে কোনও সহযোগিতা দেখা যায় না। এই শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইনবিভাগ—কোনওবিভাগই অন্য বিভাগের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না বা অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় না থাকার ফলে রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায় সুশাসনের অভাব দেখা যায়।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রযুক্ত হওয়ার ফলে উভয় বিভাগের ক্ষমতার সীমা স্থির করার দায়িত্ব বিচার বিভাগের ওপর প্রদান করা হয়। শাসন ও আইন বিভাগের কার্যকলাপের চরম ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব সম্পাদন করার মধ্য দিয়ে কালক্রমে বিচার বিভাগ এই দুই বিভাগের ওপর তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। বিচার বিভাগের প্রাধান্যকে সর্বদা কাম্য বলে গণ্য করা যায় না।

চতুর্থত, রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায় কোনও অযোগ্য ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত হলে তাঁকে তাঁর কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে অপসারণ করা যায় না। রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণ করার যথাযথ ব্যবস্থা না থাকার ফলে অনেক সময় জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হয়। শাসন বিভাগ যাঁরা পরিচালনা করেন তাঁরা যদি সক্রিয় ও উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন না হন তাহলে সরকার স্থায়ী হলেও দুর্বল হয়ে থাকে।

২২। মন্ত্রিসভা চালিত ও রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Parliamentary and Presidential Governments)

শাসন বিভাগের সঙ্গে আইন বিভাগের সম্পর্ককে ভিত্তি করে সরকারসমূহকে মন্ত্রিসভা চালিত ও রাষ্ট্রপতি চালিত এই দু ভাগে ভাগ করা হয়। এই দু ধরনের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়।

প্রথমত, মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয় না। এই শাসনব্যবস্থায় শাসন কর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দেখা যায় এবং প্রকৃত শাসন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মন্ত্রিসভা আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে কাজ করে। একই ব্যক্তিরা শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ উভয়ের কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকেন। কোনও ব্যক্তি একদিকে মন্ত্রীরূপে শাসন বিভাগের কাজের সাথে যুক্ত

থাকেন এবং অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য রূপে আইনসভাতেও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই শাসনব্যবস্থায় শাসন কর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে কোনও যোগসূত্র থাকে না বলে শাসন ও আইন উভয় বিভাগই স্বাধীনভাবে কাজ করে। এরূপ সরকারে একই ব্যক্তিরা শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ উভয়ের কাজে জড়িত থাকতে পারেন না। এই শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি বা তাঁর মন্ত্রীরা কেউই আইনসভার সদস্য হতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত, মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রধান ও সরকারের প্রধানের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। এরূপ শাসনব্যবস্থায় একজন নামসর্বস্ব বা নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধানের নামে সমস্ত শাসনকার্য পরিচালনা করা হয়। কিন্তু বাস্তবে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রকৃত শাসন কর্তৃপক্ষ বা মন্ত্রিসভা।

রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি একাই রাষ্ট্রের প্রধান ও শাসন বিভাগের প্রধানরূপে কাজ করেন। এই শাসনব্যবস্থায় কোনও নামসর্বস্ব বা নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধান থাকেন না।

তৃতীয়ত, মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত শাসন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য সর্বদা আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভায় অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাশ করে মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করা যায়।

রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি অথবা তাঁর মন্ত্রীরা তাঁদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন না।

চতুর্থত, মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার কার্যকালের স্থায়িত্ব আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের সমর্থনের ওপর নির্ভর করে।

রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি তাঁর কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন না বলে আইনসভা অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাশ করে তাঁকে কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে পদচ্যুত করতে পারে না। এরূপ শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীরা কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতির নিকট ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকেন।

পঞ্চমত, মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা হল প্রকৃত শাসন কর্তৃপক্ষ। এরূপ শাসনব্যবস্থায় বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব স্বীকার করা হলেও তত্ত্বগতভাবে সমস্ত মন্ত্রীরা সমপর্যায়ভুক্ত। মন্ত্রীদের প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মীরূপে গণ্য করা হয়।

রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। সমস্ত শাসন ক্ষমতা তাঁর নির্দেশেই পরিচালনা করা হয়। এরূপ শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে বাধ্য থাকেন না। মন্ত্রীদের রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী রূপে গণ্য করা হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীরা এবং আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা একই রাজনৈতিক দলের সমর্থক হয়ে থাকেন।

রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি ও তাঁর মন্ত্রীগণ এবং আইনসভার সদস্যগণ ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক হতে পারেন।

মন্ত্রিসভা চালিত ও রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থার মধ্যে মূল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় আইন বিভাগ ও শাসনবিভাগের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে। মন্ত্রীসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় এই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ মানা হয় না। তবে আধুনিক কালে পুলিসী রাষ্ট্রের ধারণার পরিবর্তে কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণার প্রবর্তন হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের কার্যাবলী বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে ও জটিলতর হয়েছে। এর ফলে সরকারের প্রতিটি বিভাগ পরস্পরের সঙ্গে এরূপভাবে জড়িত যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রয়োগ করে শাসন কার্য পরিচালনা করা বর্তমানে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সুতরাং রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থাতেও শাসন কর্তৃপক্ষ আইনসভার নিকট দায়ী না থাকলেও সাম্প্রতিক কালে এই শাসনব্যবস্থাতেও সুষ্ঠুভাবে শাসন কাজ পরিচালনা করার জন্য শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৩। ভারতীয় শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি—রাষ্ট্রপতি চালিত অথবা মন্ত্রিসভা চালিত ? (Nature of Indian Government—Presidential or Parliamentary?)

ভারতের সংবিধান পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম লিখিত সংবিধান হলেও এই সংবিধানের কোনও স্থানে ভারতীয় শাসনব্যবস্থা মন্ত্রিসভা চালিত না রাষ্ট্রপতি চালিত এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি। ভারতের রাষ্ট্রপ্রধানের নামকরণ করা হয়েছে রাষ্ট্রপতি এবং ১৯৭৬ সনে সংবিধান ৪২তম সংশোধন আইন প্রবর্তিত হওয়ার আগে পর্যন্ত সংবিধানে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোথাও উল্লেখ করা ছিল না যে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে বাধ্য। সুতরাং অনেক সমালোচকই মনে করতেন যে রাষ্ট্রপতি ব্রিটিশ রাজা বা রানীর মত নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধান নন। তাঁদের মতে, ভারতের শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থা রূপে গণ্য করা যেত না।

সংবিধান রচনার সময় সংবিধান পরিষদে ভারতের শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। সংবিধান পরিষদে খসড়া সংবিধান উত্থাপন করে ডঃ আম্বেদকর বলেন যে, "খসড়া সংবিধানে ভারতীয় সংঘের প্রধান পদে যে ব্যক্তিকে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে তাঁকে সংঘের রাষ্ট্রপতি বলা হয়েছে। এই পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির নামকরণটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির নাম স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু নামের সাদৃশ্য ব্যতীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি ও খসড়া সংবিধানে প্রস্তাবিত শাসনব্যবস্থার প্রকৃতির মধ্যে কোনও মিল দেখা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন শাসন বিভাগের প্রধান কর্তা। শাসন পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত। খসড়া সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ব্রিটিশ সংবিধানে রাজার ন্যায় মর্যাদা উপভোগ করেন। তিনি হলেন রাষ্ট্রের প্রধান, শাসন বিভাগের নন। তিনি জাতিকে প্রতিনিধিত্ব করেন, কিন্তু শাসন করেন না। তিনি হলেন জাতির প্রতীক।"

সংবিধান প্রবর্তনের পর ভারতের সুপ্রীম কোর্টের পক্ষ থেকেও বিভিন্ন মামলায় রায়দান কালে সংবিধান ব্যাখ্যা করে এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে ভারতে মন্ত্রিপরিষদ চালিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ১৯৫৫ সনে রাম জবাইয়া কাপুর বনাম পাঞ্জাব মামলার রায়ের একস্থানে বলা হয় যে 'ভারতীয় সংবিধানে আমাদের ইংল্যাণ্ডের মত একই ধরনের সংসদীয় শাসন কর্তৃপক্ষ আছে' (In the Indian Constitution... We have the same system of parliamentary executive as in England)। রাও বনাম ইন্দিরা (১৯৭১) মামলায় সুপ্রীম কোর্টের পক্ষ থেকে সর্ববাদিসম্মত এক রায়ে বলা হয় যে সংবিধান পরিষদ রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করে নি (The Constituent Assembly did not choose the Presidential system of Government)। শ্যামসের সিং বনাম পাঞ্জাব (১৯৭৪) মামলার রায়ের একস্থানে বলা হয় যে 'আমাদের সংবিধান সাধারণভাবে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ ধাঁচের সংসদীয় বা মন্ত্রিসভা চালিত ব্যবস্থা কার্যকরী করেছে (Our constitution embodies generally the Parliamentary or Cabinet system of British model both for the Union and the States)।

১৯৭৬ সনে সংবিধান ৪২তম সংশোধন আইনের দ্বারা রাষ্ট্রপতির সাথে মন্ত্রিপরিষদের সম্পর্ক বিষয়ক সংবিধানের ধারাটি সংশোধন করা হয়। বর্তমানে এই ধারায় বলা আছে যে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করবার ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকবে এবং রাষ্ট্রপতি ঐরূপ পরামর্শ অনুসারে কাজ করবেন (৭৪(১) ধারা)। সুতরাং সংবিধানের বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হলেন সম্পূর্ণরূপে একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধান এবং তিনি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করতে বাধ্য থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিপরিষদ

হল প্রকৃত শাসন কর্তৃপক্ষ।

ভারতের সংবিধানে মন্ত্রিপরিষদ চালিত শাসনব্যবস্থার যে সব নীতি সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে এবং এই ধরনের শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য এই দেশে যে সব রীতিনীতি ও প্রথাগত বিধান গড়ে উঠেছে সেইগুলিকে বিশ্লেষণ করলে ভারতে মন্ত্রিপরিষদ চালিত শাসনব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

প্রথমত, সংবিধান অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন নামসর্বস্ব শাসক-প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিপরিষদ হল প্রকৃত শাসকসংস্থা। রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্রের প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারের প্রধান। সুতরাং ভারতের সংবিধানে শাসক-প্রধান এবং প্রকৃত শাসকের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ভারতের সংবিধান অনুযায়ী শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রধানমন্ত্রীসহ সমস্ত মন্ত্রীদের অবশ্যই পার্লামেন্টের যে কোনও কক্ষের সদস্য হতে হয় এবং তাঁরা সকলে পার্লামেন্টে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। সংবিধানে বলা আছে যে কোনও মন্ত্রী যিনি ক্রমান্বয়ে ছমাস কাল পার্লামেন্টের কোনও কক্ষের সদস্য থাকেন না তিনি ঐ সময়ের পর আর মন্ত্রী থাকবেন না। পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদ্যদের নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। সুতরাং ভারতের শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটি প্রয়োগ করা হয় নি।

তৃতীয়ত, সাধারণত একই নীতির সমর্থক একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সদস্যদের নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হয়। সরকারের নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ে মন্ত্রীদের সমমতাবলম্বী হতে হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের সমন্বয়ে মন্ত্রিপরিষদ (Coalition Government) গঠন করা হলে সরকার গঠনের পূর্বে দলীয় নেতারা সরকারের নীতি ও কার্যক্রম স্থির করে নেন।

চতুর্থত, সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ তাঁদের কাজের জন্য লোকসভার নিকট সমষ্টিগতভাবে দায়ী থাকেন। লোকসভায় যে কোনও সময়ে মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাশ করে মন্ত্রিপরিষদকে পদচ্যুত করা যায়।

পঞ্চমত, মন্ত্রিপরিষদের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা মন্ত্রিপরিষদ চালিত শাসনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য নীতি। ভারতে মন্ত্রিপরিষদের মধ্য থেকে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি ক্যাবিনেট গঠন করেন। এই ক্যাবিনেটেই সরকারের নীতি নির্ধারণ করা হয়। ক্যাবিনেটের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন এবং মন্ত্রিদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে প্রধানমন্ত্রী আলাপ-আলোচনার দ্বারা মতানৈক্যের অবসান ঘটিয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। মন্ত্রীরা কখনও জনসমক্ষে তাঁদের মধ্যে মতভেদের বিষয় প্রকাশ করতে পারেন না।

ষষ্ঠত, মন্ত্রিপরিষদের ঐক্য রক্ষা করার জন্য মন্ত্রিপরিষদের কার্যসূচী ও আলোচনার গোপনীয়তা রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। মন্ত্রীদের মধ্যে মতভেদ ঘটতে পারে, কিন্তু এই মতভেদের বিষয় বা মন্ত্রিপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের বিষয় যদি প্রকাশ পায় তাহলে শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা সূচিত হয়। এইজন্য ভারতের সংবিধানের তৃতীয় তপসিলে বর্ণিত ফর্ম্ অনুযায়ী প্রত্যেক মন্ত্রীকে গোপনীয়তা রক্ষা বা মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণ করতে হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে মন্ত্রিপরিষদের ঐক্য ও সংহতি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কার্যকরী হয়। ভারতের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীকে সরকারের প্রধানরূপে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রীদের নিয়োগ, তাঁদের মধ্যে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর বণ্টন, প্রয়োজন হলে কোনও মন্ত্রীকে অপসারণ ও সমগ্র শাসনব্যবস্থা তদারকের মুখ্য দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর ওপর ন্যস্ত। রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে

যোগসূত্র রক্ষা করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু হলে বা তিনি পদত্যাগ করলে মন্ত্রিপরিষদের পতন ঘটে। সুতরাং মন্ত্রিপরিষদের গঠন থেকে শুরু করে তার পরিসমাপ্তি পর্যন্ত তাকে সঠিকভাবে পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের শাসনব্যবস্থাকে নিঃসন্দেহে মন্ত্রিপরিষদ চালিত শাসনব্যবস্থা রূপে গণ্য করা যেতে পারে।

২৪। রাজতন্ত্র (Monarchy)

যদি কোনও রাষ্ট্রের শাসন সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব বংশানুক্রমিকভাবে একের পর এক শাসকের একক কর্তৃত্বে পরিচালিত হয় তবে ঐরূপ শাসনব্যবস্থাকে রাজতন্ত্র বলা হয়। এরূপ শাসনব্যবস্থায় রাজা স্বয়ং রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচার সংক্রান্ত কাজগুলি সম্পাদন করে থাকেন। রাজতন্ত্রকে সরকারের একটি প্রাচীনতম রূপ বলে গণ্য করা যায়। প্রাচীনকালে পৃথিবীর বহু দেশেই রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। অতীতে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা এবং শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য অনেক রাষ্ট্রেই রাজতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। স্থায়িত্ব হল রাজতন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সংগঠনের দিক দিয়েও রাজতন্ত্র সরল এবং এই শাসনব্যবস্থায়কোনওবিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হত। কিন্তু রাজতন্ত্রের প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে এই শাসনব্যবস্থায় রাজারা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার বলে অনেকসময় জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন না। এর ফলে এই শাসনব্যবস্থাকে জনস্বার্থ বিরোধী শাসনব্যবস্থা বলে গণ্য করা হত।

প্রকৃতির দিক দিয়ে বিচার করলে রাজতন্ত্রকে—চরম (Absolute) এবং সীমাবদ্ধ বা নিয়মতান্ত্রিক (Limited or Constitutional)—এই দুভাগে ভাগ করা যায়। চরম রাজতন্ত্রে রাজাই সর্বেসর্বা—তিনি একাই রাষ্ট্রকে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং নিজের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোনও ইচ্ছার দ্বারা তিনি নিয়ন্ত্রিত হন না। এই শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। ফরাসী দেশের রাজা চতুর্দশ লুই এর বিখ্যাত উক্তি—'আমিই রাষ্ট্র' (I am the State) থেকে চরম রাজতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

পৃথিবীর কোনও কোনও রাষ্ট্রে এখনও পর্যন্ত রাজতন্ত্র প্রচলিত আছে। তবে বেশীর ভাগ রাষ্ট্রেই বর্তমানে সীমাবদ্ধ বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব দেখা যায়। এরূপ শাসনব্যবস্থায় জনগণের প্রতিনিধিরাই রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। নামসর্বস্ব শাসক-প্রধান রূপে বংশানুক্রমিকভাবে রাজারা শাসনব্যবস্থার ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। রাজার নামে শাসন কার্য পরিচালিত হয়। এরূপ শাসনব্যবস্থায় রাজার ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি রাজত্ব করেন, কিন্তু শাসন করেন না। সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রে রাজার ক্ষমতা অলিখিত সংবিধানে প্রথাগত বিধান দ্বারা এবং লিখিত সংবিধানে সাংবিধানিক ব্যবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ।

চরম রাজতন্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিকরাজতন্ত্র—উভয়ক্ষেত্রেই রাজারা উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা লাভ করলেও এই দু ধরনের শাসনব্যবস্থার মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, চরম রাজতন্ত্রে রাজা নিজের ইচ্ছানুযায়ী সমগ্র শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজার নামে আনুষ্ঠানিকভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করা হলেও জনগণের দ্বারা নির্বাচিত আইনসভা এবং মন্ত্রিপরিষদ প্রকৃত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। দ্বিতীয়ত, চরম রাজতন্ত্রে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয় না। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা হলেন রাষ্ট্রের প্রধান, তিনি সরকারের প্রধান নন। তৃতীয়ত, চরম রাজতন্ত্রে জনগণের রাজা-প্রণীত আইনের বিরোধিতা করার কোনও অধিকার থাকে না। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত আইনসভা প্রণীত আইন জনস্বার্থ বিরোধী হলে নাগরিকরা ঐ আইনের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন।

আধুনিক কালেও রাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে নি। ব্রিটেন, সুইডেন ও ডেনমার্কে বহু শতাব্দী

ধরে রাজতন্ত্র টিকে আ
আফগানিস্তান প্রভৃতি রা
আছে। তবে এই দুটি রা
আবার বিংশ শতকে
যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া,
সত্তর দশকের পরেও গ্রী
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও
না হয় তাহলে রাজত

২৫। প্রজাতন্ত্র বা সা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'প্রজাত
ধারণা সম্বলিত গ্রন্থের ন
আদর্শের মধ্যে সমন্বয় স
হল প্রজাতান্ত্রিক। তি
শাসনব্যবস্থা যদি সাধার
শাসনব্যবস্থাকে প্রজাত

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞা
রাজতন্ত্রের বিপরীত
ব্যক্তির পরিবর্তে বহু ব
ধরনের কোনও শাস
দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনি
মতে প্রজাতান্ত্রিক শাস
জন্য প্রত্যক্ষ বা পরো

ব্লুণ্টস্লি (Bluntsc
শাসনব্যবস্থায় কোনও
রাখা হয় তা হল প্রজাত
নাগরিক। ব্যক্তিরা শা
শাসন কার্য পরিচালনা

প্রজাতন্ত্রের উপরিউ
যায়। প্রথমত, প্রজাত
জনগণের দ্বারা নির্দিষ্ট
রাষ্ট্রপ্রধান পদে উত্তরা
বৈশিষ্ট্য। এই শাসনব
পরোক্ষভাবে নির্বাচিত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্র
দ্বারা পরোক্ষভাবে ৪ ব
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবি
সংবিধানের প্রস্তাবনা '
এছাড়া জনগণের প্র

বলেন যে ভারতকে পূর্ণ অর্থে প্রজাতন্ত্র বলা যায় না কারণ ভারত
...সর-এর সদস্য। ব্রিটেন ও পূর্বতন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ কয়েকটি
...জন গঠিত। এই সংস্থার প্রধান হলেন ব্রিটিশ রাজা বা রানী। এইজন্য
...ত সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করার অর্থ হল ব্রিটিশ রাজা বা রানীর প্রতি কিছু
...রিকরা, সুতরাং কমনওয়েলথ্-এর সদস্যপদ গ্রহণ করার ফলে ভারতের
...য়েছে।

...মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ্-এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রধানমন্ত্রীদের
...ত ভারতের সঙ্গে কমনওয়েলথ্ অভ্ নেশনের সম্পর্ক বিষয়ে সুস্পষ্ট
...ম্মেলনে প্রধানত ভারতের প্রচেষ্টাতেই এই সংস্থার নাম থেকে 'ব্রিটিশ'
...র্ এই সংস্থা ব্রিটিশ কমনওয়েলথ্ অভ্ নেশনস্ নামে পরিচিত ছিল।
...থেকে ঘোষণা করা হয় যে নতুন সংবিধান অনুসারে ভারতে প্রজাতন্ত্র
...মনওয়েলথ্-এর পূর্ণ সদস্যরূপে অধিষ্ঠিত থাকবে। কমনওয়েলথ্-এর
...খা যায় যে ব্রিটিশ রাজা বা রানী হলেন এই সংস্থার প্রতীকমূলক
...্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর আদৌ কোন
...রতের রাষ্ট্রপতি হলেন ভারত রাষ্ট্রের একমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান। এছাড়া,
...নিজ ইচ্ছায় কমনওয়েলথ্-এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছে এবং যে
...সদস্যপদ পরিত্যাগ করতে পারে। অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক,
...বিষয়ে সুযোগসুবিধা পাওয়ার জন্য ভারত এই সংস্থার সদস্যপদ
...মনওয়েলথ্-এর সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকার জন্য ভারতের
...এবং ব্রিটিশ রাজা বা রানী এই সংস্থার প্রতীক প্রধান থাকার ফলে
...ক্ষুণ্ণ হয় নি।

যোগসূত্র রক্ষা করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু হলে বা তিনি পদত্যাগ করলে মন্ত্রিপরিষদের পতন ঘটে। সুতরাং মন্ত্রিপরিষদের গঠন থেকে শুরু করে তার পরিসমাপ্তি পর্যন্ত তাকে সঠিকভাবে পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের শাসনব্যবস্থাকে নিঃসন্দেহে মন্ত্রিপরিষদ চালিত শাসনব্যবস্থা রূপে গণ্য করা যেতে পারে।

২৪। রাজতন্ত্র (Monarchy)

যদি কোনও রাষ্ট্রের শাসন সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব বংশানুক্রমিকভাবে একের পর এক শাসকের একক কর্তৃত্বে পরিচালিত হয় তবে ঐরূপ শাসনব্যবস্থাকে রাজতন্ত্র বলা হয়। এরূপ শাসনব্যবস্থায় রাজা স্বয়ং রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচার সংক্রান্ত কাজগুলি সম্পাদন করে থাকেন। রাজতন্ত্রকে সরকারের একটি প্রাচীনতম রূপ বলে গণ্য করা যায়। প্রাচীনকালে পৃথিবীর বহু দেশেই রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। অতীতে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা এবং শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য অনেক রাষ্ট্রেই রাজতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। স্থায়িত্ব হল রাজতন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সংগঠনের দিক দিয়েও রাজতন্ত্র সরল এবং এই শাসনব্যবস্থায়কোনওবিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হত। কিন্তু রাজতন্ত্রের প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে এই শাসনব্যবস্থায় রাজারা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার বলে অনেকসময় জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন না। এর ফলে এই শাসনব্যবস্থাকে জনস্বার্থ বিরোধী শাসনব্যবস্থা বলে গণ্য করা হত।

প্রকৃতির দিক দিয়ে বিচার করলে রাজতন্ত্রকে—চরম (Absolute) এবং সীমাবদ্ধ বা নিয়মতান্ত্রিক (Limited or Constitutional)—এই দুভাগে ভাগ করা যায়। চরম রাজতন্ত্রে রাজাই সর্বেসর্বা—তিনি একাই রাষ্ট্রকে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং নিজের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোনও ইচ্ছার দ্বারা তিনি নিয়ন্ত্রিত হন না। এই শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। ফরাসী দেশের রাজা চতুর্দশ লুই এর বিখ্যাত উক্তি—'আমিই রাষ্ট্র' (I am the State) থেকে চরম রাজতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

পৃথিবীর কোনও কোনও রাষ্ট্রে এখনও পর্যন্ত রাজতন্ত্র প্রচলিত আছে। তবে বেশীর ভাগ রাষ্ট্রেই বর্তমানে সীমাবদ্ধ বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব দেখা যায়। এরূপ শাসনব্যবস্থায় জনগণের প্রতিনিধিরাই রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। নামসর্বস্ব শাসক-প্রধান রূপে বংশানুক্রমিকভাবে রাজারা শাসনব্যবস্থার উর্ধ্বে অবস্থান করেন। রাজার নামে শাসন কার্য পরিচালিত হয়। এরূপ শাসনব্যবস্থায় রাজার ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি রাজত্ব করেন, কিন্তু শাসন করেন না। সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রে রাজার ক্ষমতা অলিখিত সংবিধানে প্রথাগত বিধান দ্বারা এবং লিখিত সংবিধানে সাংবিধানিক ব্যবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ।

চরম রাজতন্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র—উভয়ক্ষেত্রেই রাজারা উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা লাভ করলেও এই দু ধরনের শাসনব্যবস্থার মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, চরম রাজতন্ত্রে রাজা নিজের ইচ্ছানুযায়ী সমগ্র শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজার নামে আনুষ্ঠানিকভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করা হলেও জনগণের দ্বারা নির্বাচিত আইনসভা এবং মন্ত্রিপরিষদ প্রকৃত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। দ্বিতীয়ত, চরম রাজতন্ত্রে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয় না। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা হলেন রাষ্ট্রের প্রধান, তিনি সরকারের প্রধান নন। তৃতীয়ত, চরম রাজতন্ত্রে জনগণের রাজা-প্রণীত আইনের বিরোধিতা করার কোনও অধিকার থাকে না। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত আইনসভা প্রণীত আইন জনস্বার্থ বিরোধী হলে নাগরিকরা ঐ আইনের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন।

আধুনিক কালেও রাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে নি। ব্রিটেন, সুইডেন ও ডেনমার্কে বহু শতাব্দী

করা আবশ্যক।

অনেক সমালোচক বলেন যে ভারতকে পূর্ণ অর্থে প্রজাতন্ত্র বলা যায় না কারণ ভারত কমনওয়েল্থ্ অভ্ নেশন্স্-এর সদস্য। ব্রিটেন ও পূর্বতন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ কয়েকটি রাষ্ট্রকে নিয়ে কমনওয়েল্থ্ গঠিত। এই সংস্থার প্রধান হলেন ব্রিটিশ রাজা বা রানী। এইজন্য সমালোচকরা বলেন যে এই সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করার অর্থ হল ব্রিটিশ রাজা বা রানীর প্রতি কিছু পরিমাণে আনুগত্য প্রদর্শন করা, সুতরাং কমনওয়েল্থ্-এর সদস্যপদ গ্রহণ করার ফলে ভারতের প্রজাতান্ত্রিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

১৯৪৯ সনের এপ্রিল মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েল্থ্-এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলনের আলোচনা থেকে ভারতের সঙ্গে কমনওয়েল্থ্ অভ্ নেশ্নের সম্পর্ক বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এই সম্মেলনে প্রধানত ভারতের প্রচেষ্টাতেই এই সংস্থার নাম থেকে 'ব্রিটিশ' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। পূর্বে এই সংস্থা ব্রিটিশ কমনওয়েল্থ্ অভ্ নেশন্স্ নামে পরিচিত ছিল। এই সম্মেলনে ভারতের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে নতুন সংবিধান অনুসারে ভারতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হলেও ভারত কমনওয়েল্থ্-এর পূর্ণ সদস্যরূপে অধিষ্ঠিত থাকবে। কমনওয়েল্থ্-এর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায় যে ব্রিটিশ রাজা বা রানী হলেন এই সংস্থার প্রতীকমূলক প্রধান। ভারত সরকারের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর আদৌ কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন ভারত রাষ্ট্রের একমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান। এছাড়া, সার্বভৌম ক্ষমতা বলে ভারত নিজ ইচ্ছায় কমনওয়েল্থ্-এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছে এবং যে কোনও সময়ে স্বেচ্ছায় এই সদস্যপদ পরিত্যাগ করতে পারে। অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, শিক্ষাসংক্রান্ত, ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ে সুযোগসুবিধা পাওয়ার জন্য ভারত এই সংস্থার সদস্যপদ অক্ষুণ্ণ রেখেছে। অতএব কমনওয়েল্থ্-এর সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকার জন্য ভারতের সার্বভৌমিক মর্যাদা বিনষ্ট হয় নি এবং ব্রিটিশ রাজা বা রানী এই সংস্থার প্রতীক প্রধান থাকার ফলে ভারতের প্রজাতান্ত্রিক প্রকৃতিও ক্ষুণ্ণ হয় নি।

অধ্যায় ৩

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

১। গণতন্ত্র—প্রকৃতি ও সংজ্ঞা (Democracy—Nature and Definition)

বার্ণার্ড ক্রিক (Bernard Crick)-এর ভাষায় 'সরকার সম্পর্কিত আলোচনার জগতে গণতন্ত্র সম্ভবত সর্বাপেক্ষা বাছবিচারহীন শব্দ' (Democracy is perhaps the most promiscuous word in the world of public affairs)। তাঁর মতে 'গণতান্ত্রিক' এই পবিত্র বর্ণনাটির দ্বারা বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার শুদ্ধতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। অনেকেই নিজেদের 'প্রকৃত গণতন্ত্র' প্রতিপন্ন করার জন্য গণতন্ত্র শব্দটির আগে কোনও বিশেষণ যুক্ত করে থাকেন। এই কারণে উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal Democracy), শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্র (Proletarian Democracy), বুর্জোয়া গণতন্ত্র (Bourgeois Democracy), জনগণের গণতন্ত্র (Peoples' Democracy), সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র (Socialist Democracy), নয়া গণতন্ত্র (New Democracy), পশ্চিমী গণতন্ত্র (Western Democracy), নির্দেশিত গণতন্ত্র (Guided Democracy), প্রকৃত গণতন্ত্র (True Democracy) ইত্যাদির ব্যবহার ও প্রয়োগ দেখা যায়।

গণতন্ত্র শব্দটি প্রায় সকলে ব্যবহার করার ফলে এর প্রকৃতি সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গণতন্ত্র শব্দটি এখনও টিকে আছে এবং ভবিষ্যতে রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

আদর্শরূপে গণতন্ত্র বলতে কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় না। এর দ্বারা গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রকেও বোঝানো হয়ে থাকে। সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি ব্যক্তির পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশ সাধন করা হল গণতান্ত্রিক আদর্শের মূল লক্ষ্য। বার্নস্ (Burns)-এর মতে আদর্শরূপে গণতন্ত্র হল এক ধরনের সমাজ যা একই ধরনের ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত নয় কিন্তু যেখানে প্রত্যেকেই সমগ্রের এক অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অংশ এই অর্থে সমান (Democracy as an ideal is a society not of similar persons but of equals in the sense that each is an integral and irreplaceable part of the whole)। স্বাধীনতা ও সাম্য এই দুটি আদর্শ গণতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র বলতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাকে বোঝায়।

বর্তমানে গণতন্ত্র বলতে একটি নির্দিষ্ট ও বিশেষ ধরনের শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়। দুটি গ্রীক শব্দ—demos অর্থাৎ জনগণ এবং Kratia অর্থাৎ শাসনক্ষমতা—সংমিশ্রণ করে গণতন্ত্র শব্দটির সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং গণতন্ত্র শব্দটির আদি অর্থ হল এমন এক শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসনক্ষমতা জনগণের ওপর ন্যস্ত। গণতন্ত্র শব্দটিই কেবলমাত্র 'গ্রীক' থেকে উদ্ভূত হয় নি, গণতান্ত্রিক ধারণাও উদ্ভব হয় খ্রীষ্টের জন্মের ৪০০ থেকে ৬০০ বছর পূর্বে গ্রীস দেশে, বিশেষত নগর রাষ্ট্র অ্যাথেন্সে।

বিস্তারিত ও সাধারণ অর্থে ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কনের বহুল প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী গণতন্ত্র হল জনগণকে নিয়ে গঠিত, জনগণের দ্বারা ও জনগণের জন্য পরিচালিত শাসনব্যবস্থা (Government of the people, by the people and for the people)। এই সংজ্ঞায় দুটি উপাদান দেখা যায়—জনগণ ও শাসনব্যবস্থা বা সরকার। জনগণ হল রাজনৈতিক কর্তৃত্বের

উৎস। তারা আবার রাজনৈতিক কর্তৃত্বের লক্ষ্যবস্তুও। জনগণ শাসন কার্যে অংশ গ্রহণ করতে পারে। আবার তারা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

যদিও এই সংজ্ঞায় জনগণের দ্বৈত ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু এতে অনেক প্রশ্নই অনুত্তরিত ও অজিজ্ঞাসিত থেকে যায়। কি ভাবে সরকার গঠন করা হবে সে সম্পর্কে এই সংজ্ঞায় কিছু বলা হয় নি। সরকার সীমিত ক্ষমতা প্রয়োগ করবে না সর্বশক্তিমান হবে এবিষয়ে এর থেকে কিছু জানা যায় না। সমস্ত জনগণ প্রত্যক্ষভাবে মিলিত হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করবে না নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসন কার্য পরিচালনা করা হবে এ সম্পর্কেও কিছু বোঝা যায় না। পরিশেষে জনগণ বলতে কাদের বোঝায়—রাষ্ট্রে বসবাসকারী সমস্ত ব্যক্তি অথবা তাদের একাংশ—এ সম্পর্কেও স্পষ্ট কোনও ধারণা পাওয়া যায় না।

অস্টিন রেনী (Austin Ranney) বলেন যে সরকারের একটি ধরন রূপে গণতন্ত্র জনগণের সার্বভৌমিকতা, রাজনৈতিক সাম্য, জনগণের সঙ্গে পরামর্শ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন এই নীতিগুলির দ্বারা পরিচালিত হয় (Democracy is a form of government organised in accordance with the principles of popular sovereignty, political equality, popular consultation, and majority rule)।

শাসন ব্যবস্থারূপে গণতন্ত্রের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে এই চারটি নীতি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

প্রথমত, জনগণের সার্বভৌমিকতা বলতে বোঝায় যে সরকারী নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব সমাজের সমস্ত জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকবে। বিশেষ কোনও ব্যক্তি বা শাসকশ্রেণীর হাতে এই ক্ষমতা প্রদান করা হবে না। জনগণ শর্তসাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষমতা আইন প্রণয়নকারী, শাসক, বিচারক বা অন্য কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পণ করতে পারে। জনগণ বলতে এখানে প্রাপ্তবয়স্ক স্বাভাবিক নাগরিকদের বোঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক সাম্য বলতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেকের সমান অংশ গ্রহণ করাকে বোঝায় না। এই নীতি অনুসারে সমাজে প্রতিটি ব্যক্তিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করাকে বোঝায়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ স্ত্রীপুরুষ-ধনদৌলত ও প্রভাব নির্বিশেষে জন প্রতি এক ভোট, বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সরকারীপদসমূহে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমানাধিকার ইত্যাদির মাধ্যমে রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

তৃতীয়ত, জনগণের সঙ্গে সংযোগ রাখার নীতিটি জনগণের সার্বভৌমিকতার নীতির সঙ্গে জড়িত। সরকারের কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা যদি জনসাধারণের ইচ্ছার পরিবর্তে তাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে তবে জনগণকে সার্বভৌম না বলে তাদেরই সার্বভৌম আখ্যা দেওয়া যায়। গণতন্ত্র হল জনগণের দ্বারা শাসন। সুতরাং জনগণের সাথে যোগাযোগ বলতে বোঝায় যে যাঁরা সরকারের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন তাঁদের দায়িত্ব হল সর্বদা জনগণের ইচ্ছা, চাহিদা ও আশা আকাঙ্ক্ষাকে সরকারী নীতির মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত করা। সরকারী নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শাসকদের সর্বদা তাঁদের নিজস্ব দলীয় বা অন্য কোন বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থের পরিবর্তে বৃহত্তর জনকল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।এই কারণে জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা হল সরকারী কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

চতুর্থত, গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠদের শাসনের নীতি বলতে বোঝায় যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকার কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধারণাটি পরিবর্তনশীল। জনৈক ব্যক্তি কোনও একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠদের অভিমতের প্রতি সমর্থন জানানোর ফলে

সংখ্যাগরিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। আবার ঐ একই ব্যক্তি অন্য কোনও বিষয়ে সংখ্যালঘুদের সঙ্গে একমত পোষণ করলে সংখ্যালঘু বলে গণ্য হবেন। সুতরাং কোনও একটি নির্দিষ্ট বিষয় স্থির করার সময় ঐ বিষয়টির প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠদের সমর্থন আছে কি না তা লক্ষ্য রাখা আবশ্যক

গণতন্ত্রে অধিকাংশ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরনের বিকল্প মতামত থেকে একটিকে বাছাই করতে হয়। অতএব প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেই একদল ব্যক্তির মতামত প্রাধান্য লাভ করে ও অন্যদের মতামত অগ্রাহ্য হয়। প্রকৃত গণতন্ত্রে সরকারকে সর্বদাই সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামত অনুযায়ী চলতে হয়। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সমর্থনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য প্রকৃত গণতন্ত্রে সরকার এরূপ কোনও কার্যকলাপ করবে না যা জনস্বার্থবিরোধী। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের শাসনের নামে সরকার কখনও সার্বভৌমিকতা জনগণের হাত থেকে একনায়কের হাতে প্রদান করে, কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে একাধিক ভোট দানের ক্ষমতা প্রদান করে, কিছু ব্যক্তিকে রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা দান করে, নির্বাচন বাতিল করে বা জনসাধারণের অধিকার ক্ষুণ্ণ করে গণতান্ত্রিক আদর্শসমূহ বিনষ্ট করতে পারে না। অতএব গণতন্ত্রে যথেচ্ছভাবে শাসন করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হলেও কাম্য নয়। কারণ অবাধ সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক নীতি বলে গণ্য করা যায় না। প্রকৃত গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠরা সর্বদা তাঁদের ক্ষমতা ও কার্যকলাপ স্বেচ্ছায় এরূপভাবে প্রয়োগ করেন যাতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও স্বীকৃত আদর্শসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। অতএব স্বনিয়ন্ত্রিত সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনই (Self-Limited Majority rule) হল প্রকৃত গণতান্ত্রিক নীতি।

২। গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ (Different forms of Democracy—Direct and Indirect)

গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক—এই দু ধরনের হয়ে থাকে। গণতন্ত্রের ধারণাটির প্রথম উদ্ভব হয় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে ব্যক্তিরা সরাসরিভাবে শাসনসংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ করেন। প্রাচীন গ্রীস দেশের নগর রাষ্ট্রগুলিতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। গ্রীক নগর রাষ্ট্রগুলি আয়তনে খুব ছোট ছিল। এগুলির নাগরিকদের সংখ্যাও স্বল্প হত। ফলে নাগরিকরা একটি নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হয়ে আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচার সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করতেন। এই ধরনের গণতন্ত্রকে অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্র (Participatory Democracy) বলেও আখ্যা দেওয়া যায়। বর্তমানে সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি ক্যান্টনে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত আছে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে নাগরিকগণ প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে অংশ গ্রহণ করার ফলে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধও বৃদ্ধি পায়। বর্তমান যুগের রাষ্ট্রগুলি কেবলমাত্র বৃহদায়তন বিশিষ্টই নয় জনসংখ্যার দিক দিয়েও এগুলি বিশাল। এছাড়া রাষ্ট্রগুলি নানাবিধ জটিল সমস্যাসম্বলিত। সুতরাং আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র চালু রাখা সম্ভব নয়।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বলতে বর্তমানে সাধারণত পরোক্ষ গণতন্ত্রকে বোঝায়। পরোক্ষ গণতন্ত্রের নাগরিকরা নির্বাচনের মাধ্যমে শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত স্বল্প ও বাছাই করা ব্যক্তিদের হাতে অর্পণ করে। জনগণের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করা হয় বলে এই ধরনের শাসনব্যবস্থাকে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র (Representative Democracy) বলেও গণ্য করা হয়। জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)-এর মতে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থায় সমগ্র জনগণ বা তাদের একাংশ নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রতিনিধিদের

নির্বাচনের মাধ্যমে শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। বর্তমান যুগে সাধারণ নাগরিকদের পক্ষে জটিল প্রকৃতির সরকারী কাজকর্ম পরিচালনার যোগ্যতাও নেই এবং তাদের হাতে পর্যাপ্ত সময়ও নেই। এর ফলে আজকের দিনে সর্বত্রই পরোক্ষ গণতন্ত্র দেখা যায়। পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে বাছাই করা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির শাসনও (Elite Rule) বলা হয়ে থাকে। কারণ কিছু সংখ্যক সক্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তি এরূপ শাসন ব্যবস্থায় শাসন পরিচালনার কাজ সম্পাদন করার জন্য জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন। তবে পরোক্ষ গণতন্ত্র মুষ্টিমেয় বাছাই করা ব্যক্তিদের শাসন বলে পরিগণিত হলেও এই শাসন ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অপেক্ষা কোনমতেই নিকৃষ্ট নয়। এই শাসনব্যবস্থায় শাসনকাজে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মধ্যে পদ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সময়ান্তরে নির্বাচন ও জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করলে অপসারণ ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণ তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অতএব পরোক্ষ গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিগণ জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশীল থাকে। প্রাচীন গ্রীক নগর রাষ্ট্র বা বর্তমানে সুইজারল্যাণ্ডের ছোট ছোট ক্যান্টনগুলিতে 'শহর সভা গণতন্ত্র' (Town meeting Democracy) সুষ্ঠুভাবে কাজ করলেও পরোক্ষ গণতন্ত্রও সমভাবে গণতান্ত্রিক এবং আধুনিক বিশ্বের বৃহদায়তন বিশিষ্ট ও সমস্যা-জর্জরিত রাষ্ট্রসমূহের শাসনকাজ পরিচালনার উপযুক্ত।

পরোক্ষ গণতন্ত্রের প্রধান অসুবিধা হল এই যে জনপ্রতিনিধিরা জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করলে সাধারণত নির্বাচনের আগে তাদের অপসারণ করা যায় না। এছাড়া এরূপ শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণও অনেক সময় শাসন সংক্রান্ত কাজে কোনও উৎসাহ দেখান না। পরোক্ষ গণতন্ত্রের অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য কয়েকটি উপায় আছে। এগুলিকে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Direct Democratic Devices) বলা হয়। এই পদ্ধতিগুলি হল— গণভোট (Referendum), গণ উদ্যোগ (Initiative), প্রত্যাহ্বান (Recall) ও গণ অভিমত (Plebiscite)। গণভোটের ক্ষেত্রে কোনও প্রস্তাবিত আইন বা সাংবিধানিক প্রশ্ন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে ঐ বিষয়টি জনগণের নিকট প্রেরণ করা হয়। জনগণ যদি ভোটের মাধ্যমে বিষয়টি সমর্থন করে তবে ঐ বিষয়টি আইনে পরিণত করে কার্যকরী করা হয়। গণ উদ্যোগের ক্ষেত্রে নির্বাচক মণ্ডলী কোনও প্রয়োজনীয় বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য আইনসভার নিকট তাদের মতামত বা বক্তব্য পেশ করতে পারে। সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থায় গণভোট ও গণ উদ্যোগের ব্যবস্থা রয়েছে। কোনও জনপ্রতিনিধি যদি জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী বা প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ না করে সে ক্ষেত্রে প্রত্যাহ্বান পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণ নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে তাকে অপসারণ করতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান অনুসারে বিচারপতি ও জনগণের এসেসরগণ তাঁদের কাজের জন্য নির্বাচকদের কাছে বা নির্বাচনকারী সংস্থার কাছে দায়ী থাকেন এবং আইনে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুযায়ী জনগণ এদের প্রত্যাহ্বান করতে পারেন। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সংবিধান অনুসারে বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় গণ কংগ্রেসসমূহ ও স্থানীয় গণ সরকারসমূহের প্রতিনিধিদের জনগণ প্রত্যাহ্বান করতে পারেন। কোনও একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে জনগণের অভিমত গ্রহণ করাকে গণ অভিমত বলে। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি প্রচলিত থাকলে জনসাধারণ রাজনৈতিক ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারে না। জনগণের প্রতিনিধিরাও নির্বাচক মণ্ডলীকে উপেক্ষা করতে পারে না। কিন্তু বর্তমান যুগে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্রেও যদি জনগণ রাজনৈতিক দল সমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহলে তাদের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক সচেতনতা জাগ্রত হয় না।

৩। গণতন্ত্রের সুবিধা (Advantages of Democracy)

১৯৪৯ সনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষামূলক, বিজ্ঞান সম্পর্কিত ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO) এক সমীক্ষায় বিশ্বের ১০৪ জন রাজনৈতিক ও সামাজিক দার্শনিকের কাছ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে গণতন্ত্রের প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অভিমত সংগ্রহ করে। এই সমীক্ষার উত্তরগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে কেউই গণতন্ত্র বিরোধী অভিমত প্রদান করেন নি এবং সকলেই গণতন্ত্রকে রাজনৈতিক বা সামাজিক সংগঠনের শ্রেষ্ঠরূপ বলে গ্রহণ করেছেন। গণতন্ত্রের প্রধান সুবিধাগুলি হল এরূপ :

প্রথমত, গণতন্ত্রে সকল ব্যক্তির স্বার্থ ও কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করা হয়। এই শাসনব্যবস্থায় শাসক ও শাসিতের স্বার্থকে অভিন্ন বলে গণ্য করা হয় বলে সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকার যদি সর্বসাধারণের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাসনকাজ পরিচালনা করতে সচেষ্ট না হন তাহলে পরবর্তী নির্বাচনে তাঁরা জনগণের সমর্থন লাভ থেকে বঞ্চিত হবেন।

দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা। এই শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিত্বের যথার্থ বিকাশের জন্য সমান মর্যাদা ও সুযোগসুবিধা প্রদান করা হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিদের কতকগুলি অধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। এই অধিকারসমূহ উপভোগ করার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভ করে। সুতরাং গণতন্ত্র এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনতা উপভোগ করে। এই শাসনব্যবস্থায় নাগরিকদের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করা হয় না এবং কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় না। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনসম্পদ বা প্রভাব নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকে সমান সুযোগসুবিধা প্রদান করা হয়। গণতন্ত্রে সকল ব্যক্তিই স্বাধীনতা উপভোগ করে এবং সকলকে সমান মর্যাদা দেওয়া হয় বলে এই শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

তৃতীয়ত, গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বোধের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কারণ এই শাসনব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিগত কল্যাণের সঙ্গে সামাজিক কল্যাণের সমন্বয় সাধন করা। এই শাসন ব্যবস্থায় একদিকে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার চেষ্টা করা হয় এবং অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে সামাজিক কল্যাণের দিকেও দৃষ্টি রাখা হয়।

চতুর্থত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, প্রভাব, সম্পদ নির্বিশেষে রাষ্ট্রপরিচালনার কাজে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। এর ফলে নাগরিকগণ শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারে না। গণতন্ত্রে সরকারের নীতি ও কার্যকলাপ সম্পর্কেও জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করা হয়। ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলসমূহ তাদের নিজ নিজ বক্তব্য সর্বদা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে।

পঞ্চমত, গণতন্ত্রে জনগণের দ্বারা শাসকগণ নির্বাচিত হন বলে বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁদের অপসারণ করার প্রয়োজন হয় না। সরকার যদি জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে শান্তিপূর্ণ ও আইনসঙ্গত ভাবে তার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। সুতরাং গণতন্ত্রে বিপ্লবের আশঙ্কা থাকে না।

৪। গণতন্ত্রের অসুবিধা (Disadvantages of Democracy)

অনেক লেখকের মতে গণতন্ত্র গোলাপ ফুলের সঙ্গে তুলনীয়। গোলাপের যেমন সৌন্দর্য ও সুগন্ধ থাকা সত্ত্বেও কাঁটা থাকে গণতন্ত্রেরও সেরূপ বহু গুণ থাকলেও কতকগুলি অসুবিধা দেখা

যায়। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো গণতন্ত্রকে অপছন্দ করতেন। অ্যারিস্টটলও গণতন্ত্রকে বিকৃত শাসনব্যবস্থার পর্যায়ভুক্ত করেছেন। বস্তুত, গ্রীক যুগে গণতন্ত্র ধারণাটির উদ্ভব হওয়ার পর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বহু লেখকই গণতন্ত্রের ওপর সম্পূর্ণরূপে আস্থাশীল হতে পারেন নি। গণতন্ত্রের ত্রুটিগুলিকে এইভাবে দেখানো যেতে পারে।

প্রথমত, গণতন্ত্রে ব্যক্তিদের যোগ্যতা অপেক্ষা তাদের সংখ্যার ওপর অধিক জোর দেওয়া হয়। এইজন্য অনেকসময় দেখা যায় যে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন, শিক্ষিত, কর্মদক্ষ, ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের পরিবর্তে অযোগ্য, অশিক্ষিত ও অজ্ঞ ব্যক্তিরা শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং এঁরা সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে অনেক সময়েই ব্যর্থ হন। এইজন্যই সমালোচকদের মতে, গণতন্ত্র অনেকসময় উচ্ছৃঙ্খল জনতার শাসনে পর্যবসিত হয়।

দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রে বহু সংখ্যক ব্যক্তি শাসনকার্যের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য সকলের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করে কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অনেক সময় লাগে। এছাড়া শাসকগণ জনগণের নিকট দায়ী থাকেন বলে তাঁরা কোনও বিষয়ে যথাযথভাবে বিচার বিবেচনা না করে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চান না। এই কারণে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন আনা সম্ভব হয় না। একই কারণে জাতীয় সংকটকালেও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না।

তৃতীয়ত, আধুনিককালে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে দলপ্রথার ওপর নির্ভরশীল। রাজনৈতিক দল ব্যতীত গণতন্ত্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা অসম্ভব। রাজনৈতিক দলগুলি সরকারের স্থায়িত্ব রক্ষায় সাহায্য করে ও জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু দলগুলি অনেকসময় জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থের ওপর অধিক প্রাধান্য আরোপ করে। এছাড়া দলীয় ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে অযথা উত্তেজনা ও ভেদাভেদ সৃষ্টি করে যার ফলে জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও প্রগতি বিনষ্ট হতে পারে। এইভাবে গণতন্ত্রে অনেকসময় দলপ্রথার কুফলগুলি অধিকতর প্রাধান্য লাভ করে।

চতুর্থত, গণতন্ত্রের একটি প্রধান দুর্বলতা হল এর স্থায়িত্বের অভাব। গণতন্ত্রে সরকার জনমতের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং জনমতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারেরও পরিবর্তন ঘটে। আবার অনেকসময় দেখা যায় যে এই শাসনব্যবস্থায় একদল স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী জনমতকে নিজেদের অনুকূলে এনে ক্ষমতা দখল করতে তৎপর।

পঞ্চমত, গণতন্ত্রকে ব্যয়বহুল শাসনব্যবস্থা বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন ও উপনির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় হয়। গণতন্ত্রে শাসন কার্যের সাথেও বহু ব্যক্তি জড়িত থাকে। এইজন্যও অন্য শাসনব্যবস্থা অপেক্ষা এই শাসনব্যবস্থায় অধিক ব্যয় হয়ে থাকে। এছাড়া নির্বাচনী প্রচার, জনমত গঠন ইত্যাদির জন্যও প্রচুর অর্থের অপব্যয় হতে দেখা যায়।

ষষ্ঠত, অনেকে বলেন যে গণতন্ত্রে শিক্ষা, বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ইত্যাদির যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা হয় না বলে এই শাসনব্যবস্থায় শিল্পকলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি ঘটে না। গণতন্ত্রে সমস্ত ব্যক্তিকে সমান বলে গণ্য করার ফলে প্রতিভাবান ব্যক্তিরা উপযুক্ত মর্যাদা ও স্বীকৃতি অর্জন করেন না। রাজতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্রে জ্ঞানীগুণী ও প্রতিভাবান ব্যক্তিদের বিশেষ মর্যাদা ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করা হত। গণতন্ত্রে যাঁরা শাসন কার্যের সঙ্গে যুক্ত থাকেন তাঁদের অধিকাংশই মাঝারিমানের অথবা নিম্নমানের ব্যক্তি বলে তাঁরা এই সকল প্রতিভাবান ব্যক্তিদের যোগ্যতার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন না।

পরিশেষে দেখা যায় যে অনেক সমালোচকের মতে, প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র হল একটি কাল্পনিক ধারণা যা কখনও বাস্তবে রূপায়ণ করা সম্ভব নয়। এঁদের মতে প্রচলিত গণতান্ত্রিক সরকারসমূহ প্রকৃতপক্ষে অল্পসংখ্যক নির্দিষ্ট ব্যক্তির শাসনের বেশী কিছু নয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে বাস্তবে রাজনৈতিক ক্ষমতা কোনও ছোট শাসক গোষ্ঠী বা শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত হয়। এই কারণে একজন লেখক গণতন্ত্রকে জনগণের নিকট থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত বাছাই করা ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত জনগণের সরকার বলে আখ্যা দিয়েছেন। গণতন্ত্রে জনগণ প্রকৃতপক্ষে শাসনকার্যে অশংগ্রহণ করে না, তারা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সময় অন্তর ভোটদান করে শাসকদের বাছাই করার কাজই করে থাকে। এই শাসনব্যবস্থায় বহু ব্যক্তিই নির্বাচনে ভোট প্রদান করেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণতন্ত্র সত্যই জনগণের স্বায়ত্তশাসন কিনা যে বিষয়ে তর্কের অবকাশ থেকে যায়।

৫। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ (Future of Democracy)

গণতন্ত্র সম্পর্কে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক রুশো এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে আসল অর্থে কখনও কোথাও প্রকৃত গণতন্ত্র ছিল না এবং কখনও তা হবে না (In the strict sense of the term, there has never been a true democracy and there never will be)। পৃথিবীর কোনও স্থানে এখনও পর্যন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলেও সুদূর অতীতে খ্রীস্ট জন্মের পাঁচ শতাব্দী পূর্বে গ্রীসদেশে গণতন্ত্রের যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল তা আজও পর্যন্ত অব্যাহত আছে। আধুনিক গণতন্ত্রসমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ দীর্ঘকালব্যাপী ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। প্রথম দিকে বিপ্লব ও বিদ্রোহের মাধ্যমে কয়েকটি রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অন্যান্য স্থানে অপেক্ষাকৃত সহজতর বা কম হিংসাত্মক উপায়ে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলন করার সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নিখুঁত ও উন্নত করার প্রয়াস দেখা যায়। এইভাবে বিংশ শতকের প্রারম্ভে গণতন্ত্রের সমর্থকরা সাধারণভাবে সুনিশ্চিত হয়ে পড়েন যে গণতন্ত্র সাফল্য অর্জন করেছে এবং কালক্রমে এই শাসনব্যবস্থা সর্বজনীন শাসনব্যবস্থা রূপে পরিগণিত হবে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় সারা পৃথিবীতে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। গণতন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, উৎকট ধনবৈষম্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের যথাযথ ভাবে সমাধান না হওয়ার ফলে মানুষের মনে হতাশা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। গণতন্ত্রের এই সব দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে এই সময় কতকগুলি রাষ্ট্রে একনায়কতন্ত্রের অভ্যুত্থান ঘটে। তবে কোনও রাষ্ট্রে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা বা জরুরী অবস্থার সমস্যা সমাধানের জন্য একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা গেলেও এই শাসনব্যবস্থাকে কখনও গণতন্ত্রের বিকল্প শাসনব্যবস্থারূপে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করা যায় না। গণতন্ত্রের মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হলেও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সুশাসন কখনও স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প হতে পারে না। এই যুক্তি অনুসারে একনায়কতন্ত্র কখনও গণতন্ত্রের পরিবর্ত শাসন রূপে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং গণতন্ত্রের দুর্বলতা যাই হোক না কেন ঐগুলি থাকা সত্ত্বেও গণতন্ত্র লক্ষ্য অনুযায়ী সর্বজনীন হতে চলেছে। গণতন্ত্রের উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য গণতন্ত্রের বিরোধীরাও আজকে তাঁদের শাসনকে গণতান্ত্রিক বলে প্রচার করে থাকেন। অতএব যতদিন পর্যন্ত মানুষ গণতন্ত্র অপেক্ষা কোনও শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে না পারছে ততদিন পর্যন্ত অতীতের অন্যান্য ধরনের শাসনব্যবস্থার তুলনায় গণতন্ত্র তার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী বজায় রাখতে পারবে। লিপসনের ভাষায় বলা যায় যে, গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ ও বিচক্ষণতমদের শাসনব্যবস্থা নয়। কিন্তু সকল ধরনের পরিচিত ও প্রচলিত শাসনব্যবস্থার মধ্যে গণতন্ত্র হল সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ ও শ্রেষ্ঠ (Democracy is not a Government by the best

and wisest. But, of all forms of Government known and tried, democracy is the wisest and the best)।

৬। গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলী (Conditions for the success of Democracy)

গণতন্ত্রের সাফল্য কয়েকটি শর্তের ওপর নির্ভর করে। কোনও রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা করার জন্য এইসব প্রয়োজনীয় শর্ত অনুসরণ করা প্রয়োজন। অনেকসময় এইসব শর্ত যথাযথভাবে অনুসরণ না করার জন্য অনেক রাষ্ট্রেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে।

গণতন্ত্র হল জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা শাসিত জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে গঠিত সরকার। অতএব গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য জনগণের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হওয়া একান্ত আবশ্যক। এছাড়া রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ এবং পরিস্থিতি সুষ্ঠুভাবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কার্যকর করার অনুকূল হওয়া প্রয়োজন।

বার্কার, হার্নশ, মিল, লর্ড ব্রাইস প্রমুখ লেখকগণ গণতন্ত্রকে সার্থক করে তোলার জন্য কয়েকটি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর 'প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা' (Representative Government) গ্রন্থে বলেছেন যে গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন : প্রথমত, জনগণের মধ্যে গণতন্ত্রকে গ্রহণ করার ইচ্ছা ও প্রবণতা ; দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য জনগণের মধ্যে সংগ্রামী মনোভাব ; তৃতীয়ত, গণতন্ত্রকে বজায় রাখার জন্য নাগরিকদের মধ্যে যথাযথভাবে কর্তব্যপালনে আগ্রহ।

গণতন্ত্রের সাফল্য যে সকল শর্তের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সেগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শর্ত হল এরূপ :

প্রথমত, গণতন্ত্রকে জনমতের ওপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা বলা হয়। অতএব সদাজাগ্রত ও সচেতন জনমত গণতন্ত্রের সাফল্যের একটি অপরিহার্য শর্ত। জনগণ যদি রাজনৈতিক ব্যাপারে উদাসীন হন তাহলে শাসকগণ যথেচ্ছভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ পান। এর ফলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ব্যর্থ হতে পারে। জনসাধারণকে বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সমবেত হওয়ার স্বাধীনতা, সংঘ বা সমিতি গঠনের স্বাধীনতা, আইনের সমক্ষে সমতা ইত্যাদি অধিকারগুলি প্রদান করা আবশ্যক। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগসুবিধা প্রদানের মাধ্যমেও নাগরিকদের রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতন করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, পরমতসহিষ্ণুতা ও সাধারণ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করাও গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য আবশ্যক। আলোচনা, সমালোচনা, যুক্তিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিরূপে গণ্য করা যায়। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে রাজনৈতিক দলগুলি জনগণের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে। রাজনৈতিক দলগুলির মাধ্যমে জনমত সুসংগঠিত আকারে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত, গণতন্ত্রের সাফল্যের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হল জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা। যে সব রাষ্ট্রে দীর্ঘকাল ধরে সাফল্যের সঙ্গে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কাজ করছে সেখানে নিরক্ষর ব্যক্তি নেই বললেই চলে। জনগণ শিক্ষাপ্রাপ্ত না হলে তাদের মধ্যে অধিকার-কর্তব্য, ভোটদানের তাৎপর্য, রাষ্ট্রের কার্যকলাপ ইত্যাদি বিষয়ে উৎসাহের সৃষ্টি হয় না। সুতরাং যে সব রাষ্ট্রে শিক্ষিতের হার খুব কম সেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা আবশ্যক।

চতুর্থত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসক ও শাসিতের অর্থাৎ জনগণের মধ্যে সংযোগ থাকা একান্ত

আবশ্যক। নাগরিকগণের সরকারী নীতি ও সমস্যাসমূহ সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকা প্রয়োজন। আধুনিক বৃহদায়তন রাষ্ট্রসমূহে মুদ্রাযন্ত্র, বেতার, দূরদর্শন ইত্যাদি সংযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ কমে আসছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমগুলির মারফৎ জনসাধারণ যাতে সঠিক ও পক্ষপাতশূন্য সংবাদ পান তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

পঞ্চমত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর শাসকদের পরিবর্তন ঘটে। এইজন্য অনেক সময় সরকারী নীতি ও কার্যক্রমের কোন স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা থাকে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসনের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও সরকারের দৈনন্দিন কার্যকলাপ পরিচালনার ভার থাকে স্থায়ী সরকারী কর্মচারীবৃন্দ বা আমলাদের ওপর। জনগণকেও দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনে অনেক সময় আমলাদের সান্নিধ্যে আসতে হয়। সরকারী কর্মচারী বা আমলারা যদি অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ হন তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সরকারের প্রতি জনগণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এই কারণে গণতন্ত্রে সুদক্ষ, সৎ ও নিরপেক্ষ সরকারী আমলা থাকা প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায় যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে সার্থক করতে হলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে জনগণের মধ্যে কখনও গণতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে উঠতে পারে না। সমাজে অধিকাংশ ব্যক্তি দরিদ্র হলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সর্বদা অর্থের জোরে ভোট কেনা বেচা করবে, জনমতকে প্রভাবিত করবে ও সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। ধনী ব্যক্তিরা যদি কোনও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেই সঙ্গে সরকারকেও প্রভাবিত করে তবে সেখানে কখনও প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। কারণ শাসক শ্রেণী তাদের শাসনকে কায়েম করার জন্য সর্বদা দরিদ্রদের উপর শাসন ও শোষণ চালিয়ে যাবে। আবার ধনী ব্যক্তিদের শাসন-শোষণের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে শ্রমিক শ্রেণীও যে গণতন্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন তাও অনেকে প্রত্যাশা করেন না। এই কারণে অনেকে বলেন যে গণতন্ত্রকে প্রকৃত সফল ও সার্থক করতে পারে একমাত্র শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই শ্রেণী কখনও অন্য শ্রেণীকে শোষণ ও নিপীড়ন করে নি এবং নিজেও কখনও অন্য শ্রেণীর দ্বারা শোষিত ও নিপীড়িত হয় নি। গণতান্ত্রিক আদর্শকে যথাযথভাবে রূপায়িত করার জন্য এই শ্রেণী সর্বদা প্রস্তুত। অতএব গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব একান্ত কাম্য বলে অনেকে মনে করেন।

৭। ভারতে গণতন্ত্র (Democracy in India)

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে অভিহিত করা হয়েছে। জন প্রতি, এক ভোট এই নীতি অনুসারে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার নীতির ওপর ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অর্থনৈতিক প্রভাব নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয় নাগরিককে ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে। সংবিধান অনুসারে যে কোনও ভারতীয় নাগরিক রাষ্ট্রপতির পদ থেকে শুরু করে যে কোনও সরকারী পদে নিযুক্ত হতে পারেন। ভারতে কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানীয় পর্যায়ে যাঁরা শাসন সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করার কাজের সাথে জড়িত তাঁরা সকলেই জনগণের প্রতিনিধি। ভারতকে বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্ররূপে আখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং ভারতে গণতন্ত্রের সাফল্যের প্রয়োজনীয় শর্তগুলির অস্তিত্ব কি পরিমাণে দেখা যায় তা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

অনেকেই বলেন যে ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলন করা হলেও এদেশে গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তগুলির বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারতে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে এই অভিমত যাঁরা

পোষণ করেন তাঁদের যুক্তিগুলিকে এইভাবে দেখানো যেতে পারে :

প্রথমত, দীর্ঘকাল বিদেশী শাসনের অধীনে থাকার ফলে ভারতীয় জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে উঠতে পারে নি। ফলে ভারতীয় নাগরিকগণ তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও কর্তব্যসমূহ সম্পর্কে যথাযথভাবে সচেতন নন।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার দিক দিয়েও ভারত খুব অনগ্রসর। এদেশে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা মাত্র শতকরা ৩০/৩৫ ভাগ। সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের অংশে উল্লেখ করা থাকলেও ভারতে এখনও পর্যন্ত শিশুদের জন্য সর্বজনীন অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নি। শিক্ষার অভাবে ভারতীয় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার অভাব দেখা যায়।

তৃতীয়ত, ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এদেশের স্বল্পসংখ্যক বিত্তশালী ব্যক্তি এবং বিশাল সংখ্যক দরিদ্র ব্যক্তির মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত বেশী। দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও হতাশায় জর্জরিত অধিকাংশ ভারতীয়দের কাছেই গণতন্ত্র একটি অর্থহীন উচ্চ আদর্শ স্বরূপ।

চতুর্থত, ভারতে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন করা হলেও নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব দেখা যায়। এই কারণে ভারতীয় জনগণ অনেক সময় বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ ও সমস্যা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর আঞ্চলিক, ধর্মীয় ও ভাষাগত স্বার্থের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। নির্বাচনের সময়েও এইসব কারণে অনেক ক্ষেত্রে যোগ্যতম ব্যক্তির পরিবর্তে অযোগ্য প্রার্থী জনগণের সমর্থন লাভ করে।

পঞ্চমত, ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করা হলেও এই ধরনের শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য যে শক্তিশালী বিরোধী দল থাকা প্রয়োজন এই দেশে সেরূপ কোনো বিরোধীদলের অস্তিত্ব দেখা যায় না। ভারতে কেন্দ্রে প্রায় সর্বদা একটিমাত্র শক্তিশালী দলই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে বলে দেখা যায়। অন্যদিকে বিভিন্ন রাজ্যে অসংখ্য আঞ্চলিক দল গড়ে উঠেছে। সুতরাং ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অন্তত আরও একটি শক্তিশালী সর্বভারতীয় দল থাকা প্রয়োজন।

তবে উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে একথা বলা যুক্তিযুক্ত নয়। বিংশ শতকে এশিয়া ও আফ্রিকার নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত বহু রাষ্ট্রেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু প্রতিকূল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার জন্য অনেক রাষ্ট্রেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে ১৯৫০ সনে ভারতের সংবিধান প্রবর্তন করার পর প্রায় চার দশক কাল ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। সুতরাং রাজনৈতিক স্থায়িত্বকে ভারতীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের একটি প্রমাণ রূপে গণ্য করা যায়।

ব্যাপক দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও যোগাযোগের অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভারতের বিশাল সংখ্যক নির্বাচকমণ্ডলী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকেন। ভারতে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী জনগণের সংখ্যাও দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্যেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতা দখল করেছে। কেন্দ্রেও দেখা যায় যে ১৯৭৭ সনের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস(ই) দল পরাজিত হয় এবং জনতা দল সরকার গঠন করে। এইসব ঘটনা সুস্পষ্টরূপে ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় প্রদান করে।

১৯৫০ সনে ভারতের সংবিধান প্রবর্তন করার মাধ্যমে ভারতে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের রূপায়ণ আবশ্যক। ভারতের সংবিধানে উল্লেখিত রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মাধ্যমে ভারতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সংবিধান

প্রবর্তনের পর থেকে কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারসমূহ সাংবিধানিক উপায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রসারের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, রাজন্যভাতা ও রাজন্যবর্গের বিশেষ সুবিধাসমূহের বিলোপ সাধন, বিভিন্ন শিল্পসংস্থার জাতীয়করণ, মৌলিক অধিকার রূপে সম্পত্তির অধিকারের বিলোপসাধন, আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন নির্দেশমূলক নীতির রূপায়ণ ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে সামাজিক অসাম্য ও অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ভারতে গণতন্ত্র যাতে ভবিষ্যতে আরও সাফল্য অর্জন করতে পারে তার জন্য অনুকূল সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা এখনও অব্যাহত আছে।

৮। একনায়কতন্ত্র—প্রকৃতি ও সংজ্ঞা (Dictatorship—Nature and Definition)

একনায়ক (Dictator) শব্দটির উৎপত্তি হয় প্রাচীন রোম প্রজাতন্ত্রে। রোম নগরে কোনও সময়ে বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ বিপ্লব দেখা দিলে সেনেট সভা যদি মনে করত যে এই সংকট মোকাবিলা করার জন্য প্রচলিত শাসনপদ্ধতি যথেষ্ট নয় তাহলে তারা একজন একনায়ক নিয়োগ করত। এই একনায়ককে রোম নগরীকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সীমিত সময়ের জন্য তাঁর ইচ্ছানুযায়ী রোমের সম্পদ ব্যবহার করার চরম ক্ষমতা প্রদান করা হত। বিপদ কেটে যাওয়ার পর একনায়কের সমস্ত ক্ষমতা পুনরায় সেনেট ও জনগণের নিকট প্রত্যাবর্তন করানো হত এবং একনায়ক তাঁর পূর্বতন সাধারণ নাগরিকের মর্যাদায় ফিরে যেতেন। তবে রোম নগরীর পতনের পূর্বে দেখা যায় যে অনেকসময় উচ্চকাঙ্ক্ষী রাজনীতিবিদগণ সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা বা সেনেটের কাছ থেকে জোর করে একনায়কের উপাধি ও ক্ষমতা দখল করত। ঐ সময়ের পর থেকে বহু শতাব্দী ধরে একনায়ক শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হত। সাধারণত যে ব্যক্তি অবৈধভাবে চরম ক্ষমতা দখল করে প্রয়োগ করতেন তাঁকে একনায়ক আখ্যা দেওয়া হত। অন্যদিকে যে ব্যক্তি বৈধভাবে ক্ষমতা অর্জন করার পর তা চরমভাবে প্রয়োগ করতেন তাঁকে স্বৈরাচারী শাসক (Autocrat) বলে গণ্য করা হত।

অস্টিন রেনী বলেন যে বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা 'একনায়কতন্ত্র' শব্দটি শাসন ব্যবস্থার একটি বিশেষ রূপ হিসাবে প্রয়োগ করেন তখনই যখন চূড়ান্ত শাসনক্ষমতা একজন ব্যক্তি বা একদল ক্ষুদ্র বাছাই করা ব্যক্তি দখলে রাখে ও প্রয়োগ করে (Political scientist... now use the term 'dictatorship' to denote a form of Government in which the ultimate ruling power is held and exercised by one man or a small elite)। একনায়কতন্ত্র হল গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত শাসনব্যবস্থা। বর্তমান বিশ্বে রাজতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্রের পুনরাবির্ভাবের কোনও সম্ভাবনা নেই বলে একনায়কতন্ত্রকে গণতন্ত্রের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী শাসনব্যবস্থা বলেও আখ্যা দেওয়া হয়।

বলপ্রয়োগকে কেন্দ্র করেই একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে যে পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখল করা হয় তাকে একনায়কতন্ত্রের মূল উপাদানরূপে গণ্য করা যায় না। একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসূচক মূলনীতি সমূহ হল : সার্বভৌমিকতা কোনও ব্যক্তি বা ছোট গোষ্ঠীর নিকট কেন্দ্রীভূত থাকা, রাজনৈতিক অসাম্য, জনগণের সাথে সংযোগ না থাকা এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ শাসন (Sovereignty concentrated in one man or a small group, political inequality, no popular consultation, and minority rule)।

একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব হয়ে থাকে সাধারণত দুটি কারণে—প্রথমত, গণতন্ত্রের ব্যর্থতা এবং

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সংকট ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা।

৯। একনায়কতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Dictatorship)

একনায়কতন্ত্রকে (১) ব্যক্তিগত (Personal), (২) দলগত (Party) ও (৩) শ্রেণীগত (Class) এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্র—রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা যখন একজন ব্যক্তি বা সামরিক নেতার নিকট কেন্দ্রীভূত থাকে তখন তাকে ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্র বলা হয়। তবে একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হলেও তাঁকে পরোক্ষে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল বা সামরিক বাহিনী সমর্থন করে। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বে-আইনীভাবে কোনও সামরিক নেতা সহসা রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করে সামরিক একনায়কতন্ত্রের সৃষ্টি করতে পারে। ফরাসী ভাষায় সামরিক বাহিনীর সমর্থনে সামরিক নেতা কর্তৃক ক্ষমতা দখল করাকে coup d'etat বলা হয়। পাকিস্থানে আয়ুব খাঁ ও মিশরে কর্নেল নাসের সামরিক একনায়কত্বের উদাহরণ।

দলগত একনায়কতন্ত্র—যদি কোনও একটি বিশেষ দল সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে ও প্রয়োগ করে এবং ঐ রাষ্ট্রে সেই দল ব্যতীত অন্য কোনও দলের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় তবে ঐরূপ শাসনব্যবস্থাকে দলগত একনায়কতন্ত্র বলে। ১৯২০ সনে ইটালীতে বেনিতো মুসোলিনীর ফ্যাসিষ্ট দল এবং ১৯৩২ সনে জার্মানীতে হিটলারের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত নাৎসী দল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে যে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল তাকে দলগত একনায়কতন্ত্রের উদাহরণ রূপে গণ্য করা যায়। তবে হিটলার ও মুসোলিনী উভয়েই আইনানুমোদিত পদ্ধতিতে ক্ষমতা করায়ত্ত করে দলগত একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেও তাঁরা বাস্তবে ব্যক্তিগত একনায়করূপেই পরিচিতি লাভ করেন।

শ্রেণীগত একনায়কতন্ত্র—যখন কোনও একটি বিশেষ শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে শাসনকার্য পরিচালনা করে তখন তাকে শ্রেণীগত একনায়কতন্ত্র বলা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র প্রবর্তিত আছে। বর্তমান সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়নের সংবিধানে বলা হয়েছে যে সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্রের লক্ষ্যসমূহ পূরণ হবার পর সোভিয়েত রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে গোটা জনগণের রাষ্ট্র। তবে সর্বহারা একনায়কতন্ত্র বা সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্রের সঙ্গে অন্যান্য একনায়কতন্ত্রের পার্থক্য দেখা যায়। সর্বহারা একনায়কতন্ত্র হল একটি সাময়িক ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে শোষক শ্রেণীকে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত করে। একটি শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই হল এর প্রধান উদ্দেশ্য। অনেকে মনে করেন যে এরূপ সমাজেই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সর্বহারা একনায়কতন্ত্রকে গণতন্ত্রের বিরোধী বলা চলে না।

১০। একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Dictatorship)

ফ্রিড্রিশ ও বরজেজিন্স্কি (Friedrich and Brzezinski) শুধু একনায়কতন্ত্রের পরিবর্তে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী একনায়কতন্ত্র (Totalitarian Dictatorship) শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। তাঁদের মতে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী একনায়কতন্ত্র হল এক অর্থে বিংশ শতাব্দীর শিল্পপ্রধান সমাজে স্বৈরতন্ত্রের অভিযোজন। তাঁরা সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী একনায়কতন্ত্রের ছটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

১। এই শাসনব্যবস্থায় একটি বিস্তারিত সরকারী মতাদর্শ থাকে যা মানতে সমস্ত ব্যক্তি বাধ্য থাকেন।

২। একজন ব্যক্তি অর্থাৎ একনায়কের নেতৃত্বে একটিমাত্র গণ-রাজনৈতিক দল গঠিত হয়।

৩। জনগণ যাতে সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস না পান সেই উদ্দেশ্যে ভীতি প্রদর্শনের

ব্যবস্থা থাকে। এই উদ্দেশ্যে বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগ, গোপন পুলিস ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

৪। বেতার, দূরদর্শন, চলচ্চিত্র প্রভৃতি জনসংযোগের কার্যকরী মাধ্যমগুলির ওপর সরকার বা দলের প্রায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হয়।

৫। সকল প্রকার যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন ও ব্যবহার সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী করা হয়ে থাকে।

৬। সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সরকারের আদেশে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে একনায়কতন্ত্রে আদৌ ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকতে পারে না। এই শাসনব্যবস্থায় সর্বদা ব্যক্তির ওপর রাষ্ট্রকে স্থান দেওয়া হয়। একনায়কতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে চরম ও অসীম। অর্থনৈতিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক—সকল প্রকার স্বার্থ ও মূল্যবোধ রাষ্ট্রকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও কাজে লাগানো হয়ে থাকে।

১১। একনায়কতন্ত্রের সুবিধা (Advantages of Dictatorship)

গণতন্ত্রের তুলনায় একনায়কতন্ত্র নিকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা হলেও এই শাসনব্যবস্থার কতকগুলি সুবিধা দেখা যায়।

১। একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে কেন্দ্রীভূত থাকে বলে এবং শাসন, আইন ও বিচার—সরকারের এই তিনটি বিভাগই শাসকদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে বলে যে কোনও বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় এবং অবিলম্বে ঐ সিদ্ধান্তকে কার্যকর করা যায়। একনায়কতন্ত্রে আইনসভার তর্কবিতর্কের জন্য বৃথা সময়ের অপচয় হয় না। অনেক সময় নেতার আদেশেই অবিলম্বে কোনও জনকল্যাণমূলক আইন প্রণীত হতে পারে। সমাজে প্রচলিত রক্ষণশীল আইনগুলিও যে কোনও সময়ে বাতিল করা যেতে পারে।

২। একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যোগ্যতম, অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিদের সরকারী কাজে নিয়োগ করা হয়। ফলে এই শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

৩। একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা একজন ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত থাকার ফলে যুদ্ধ বা জরুরী অবস্থায় অতি দ্রুত যে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করা সম্ভব।

৪। গণতন্ত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হয় বলে দেখা যায় যে জনমতের রায় অনুসারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে। ক্ষমতাসীন দলের পরিবর্তনের ফলে সরকারের স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হয়। একনায়কতন্ত্রে সরকারের পরিবর্তনের আদৌ কোনও সম্ভাবনা থাকে না। একমাত্র উচ্ছেদ ব্যতীত সরকারের পতন সম্ভব নয়। এই জন্য একনায়কতন্ত্রে সরকার দীর্ঘস্থায়ী নীতি গ্রহণ করতে পারে।

৫। একনায়কতন্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব না থাকার ফলে দলগুলির মধ্যে অন্তর্বিরোধের দরুণ রাষ্ট্রের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রে সুশৃঙ্খল প্রশাসন প্রবর্তন করে রাষ্ট্রের দ্রুত উন্নতি করা সম্ভব।

১২। একনায়কতন্ত্রের অসুবিধা (Disadvantages of Dictatorship)

একনায়কতন্ত্রের সপক্ষে অনেক যুক্তি দেখানো গেলেও এই শাসনব্যবস্থাকে কখনও চিরস্থায়ী আদর্শরূপে অথবা গণতন্ত্রের বিকল্পরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। একনায়কতন্ত্রের ত্রুটিগুলিকে এইভাবে দেখানো যেতে পারে :

১। একনায়কতন্ত্রে জনগণ সর্বদা বিনা প্রতিবাদে নেতার আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী চলতে বাধ্য থাকে। এই আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করা হলে তা কঠোর হস্তে দমন করা হয়। সুতরাং

একনায়কতন্ত্রে জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকে না। ব্যক্তিস্বাধীনতা অস্বীকৃত হওয়ার ফলে জনসাধারণ তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা ও মতামত ব্যক্ত করতে পারে না। এর ফলে কোনও ব্যক্তির মানসিক সত্তার বিকাশ ঘটতে পারে না।

২। একনায়কতন্ত্রে শাসক ও জনগণের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। এই শাসনব্যবস্থায় যে কোনও ব্যক্তি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে না। শাসকরা নিরঙ্কুশভাবে শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলে বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হন। অন্যদিকে জনসাধারণ সর্বদা অধিকার বঞ্চিত অবস্থায় শাসকদের অধীনস্থ থাকেন। এই ভাবে সমাজে স্বাধীনতা ও সাম্যের অস্তিত্ব দেখা যায় না।

৩। একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জাতীয় সমস্যাগুলি নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও মতাদর্শের মধ্যে ভাববিনিময়ের কোনও সুযোগ থাকে না। জনগণ শাসনব্যবস্থায় কোনওভাবে অংশগ্রহণ করতে না পারায় তাদের মধ্যেও দেশের সমস্যাগুলি সম্পর্কে কোনও উৎসাহ দেখা যায় না। এর ফলে নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে না ও জাতীয় চরিত্রও গড়ে ওঠে না।

৪। একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বল প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের ওপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে প্রয়োগ করা হয়। এই শাসনব্যবস্থায় শাসকদের ইচ্ছা ও সম্মতির ওপর আদৌ কোনও গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। জনগণের সরকারের প্রতি আস্থা না থাকলেও তারা আইনসঙ্গত কোনও উপায়ে সরকারের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। একনায়কতন্ত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের পরিবর্তন সম্ভব নয় বলে জনগণ একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটাতে পারে।

৫। একনায়কতন্ত্রে কোনও একজন বিশেষ নেতা সততা ও দক্ষতার সঙ্গে জনকল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রভূত উন্নতি সাধন করতে পারেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু বা পতনের পর যাঁরা ক্ষমতা দখল করেন তাঁরাও যে অনুরূপভাবে সৎ, দক্ষ ও জনকল্যাণকামী হবেন একথা কখনও বলা সম্ভব নয়। অতএব কোনও সংকটময় অবস্থা থেকে কোনও রাষ্ট্রকে বাঁচানোর জন্য সাময়িকভাবে একনায়কতন্ত্রকে সমর্থন করা গেলেও এই শাসনব্যবস্থা স্থায়ীভাবে গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

৬। একনায়কতন্ত্রে শাসক তাঁর নিজের শাসনকে স্থায়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য জনগণের মনকে দেশের নানাবিধ সমস্যা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। এই কারণে অনেক সময় শাসকরা উগ্র জাতীয়তাবাদের নীতি প্রচার করেন। এই ধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদের নীতির পরিণতি হল সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধ। অতএব একনায়কতন্ত্রকে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের পরিপন্থী বলে গণ্য করা যায়।

১৩। গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র (Democracy and Dictatorship)

আধুনিক বিশ্বে গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র এই দুটি পরস্পর বিরোধী শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায়। একনায়কতন্ত্র হল গণতন্ত্রের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী শাসনব্যবস্থা। একনায়কতন্ত্রকে আবার গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত শাসনব্যবস্থারূপেও গণ্য করা যেতে পারে। এই দুটি শাসনব্যবস্থার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল এরূপ :

১। অস্টিন রেনীর মতে গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র হল সরকারী নীতি নির্ধারণের চূড়ান্ত ক্ষমতা বণ্টনের বিভিন্ন পদ্ধতি। গণতন্ত্রে নাগরিকরা এই ক্ষমতার চূড়ান্ত অধিকারী। নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নাগরিকদের পক্ষে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। অন্যদিকে একনায়কতন্ত্রে সরকারী নীতি নির্ধারণের চূড়ান্ত দায়িত্ব কোনও ব্যক্তি, দল বা শ্রেণী প্রয়োগ করে। অতএব গণতন্ত্র জনগণের সার্বভৌমিকতার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। একনায়কতন্ত্রের সার্বভৌমিকতা কোনও ব্যক্তি বা

ছোট গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে।

২। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকারের কর্তৃত্ব জনগণের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। একনায়কতন্ত্র বলপ্রয়োগ ও বেআইনীভাবে সরকারের উচ্ছেদ সাধন করে প্রতিষ্ঠা করা হয় বলে এই শাসনব্যবস্থার প্রতি সাধারণত জনগণের সমর্থন থাকে না।

৩। গণতান্ত্রিক সরকার শাসনসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের জন্য জনসাধারণের কাছে দায়ী থাকে। একনায়কতান্ত্রিক সরকারের হাতে শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্ব থাকলেও এরূপ সরকার কারও কাছে দায়ী থাকে না।

৪। গণতন্ত্রে জনগণ সরকারের সমালোচনা ও বিরোধিতা করতে পারে এবং প্রয়োজন হলে সরকারের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। অতএব গণতন্ত্রে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রকে মহিমান্বিত করা হয় এবং সরকার যা কিছু করে তা গ্রহণ করতে সকলে বাধ্য থাকেন। সুতরাং একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয় না।

৫। গণতন্ত্রের মূল আদর্শ হল নানাধরনের ধারণা এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন দলের অস্তিত্ব স্বীকার। একনায়কতন্ত্র হল সর্বাত্মকবাদী শাসনব্যবস্থা। এই শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্র এক ধারণা সম্বলিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কারণ একনায়কতন্ত্রে একটি মাত্র দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় ও অন্য দলগুলির অস্তিত্ব বরদাস্ত করা হয় না।

৬। গণতন্ত্র হল সংখ্যাগরিষ্ঠদের মত অনুসারে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। অন্যদিকে একনায়কতন্ত্র হল সংখ্যালঘিষ্ঠদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা।

৭। গণতন্ত্রে সরকারের নীতি নির্ধারণ ও সরকারী কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিটি নাগরিককে অংশগ্রহণ করার সমান সুযোগসুবিধা প্রদান করার মাধ্যমে রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জন প্রতি এক ভোট, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সরকারীপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার ইত্যাদির মাধ্যমে নাগরিকরা রাজনৈতিক সাম্য ভোগ করে। একনায়কতন্ত্রে রাজনৈতিক সাম্যের নীতিটিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়।

৮। গণতন্ত্রে শাসকগণ জনগণের অভাব অভিযোগ ও সমস্যা উপলব্ধি করার জন্য জনগণের সাথে সংযোগ রাখেন। একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা বলে এতে জনগণের সঙ্গে শাসকদের কোনও সংযোগ থাকে না। শাসকগণ নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকেন।

গণতন্ত্র ও একনায়তন্ত্রের উল্লিখিত তুলনার পরিপ্রেক্ষিতে একনায়কতন্ত্রকে কখনও গণতন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাসন বলে গণ্য করা যায় না। একনায়কতন্ত্রের সমর্থকরা গণতন্ত্রকে মন্থর গতিসম্পন্ন, ব্যয়বহুল ও অজ্ঞদের শাসন বলে অভিহিত করে থাকেন। অন্যদিকে গণতন্ত্রের সমর্থকরা একনায়কতন্ত্রকে মানবতা বিরোধী ও স্বৈরাচারী শাসন বলে সমালোচনা করেন। গণতন্ত্রের তুলনায় একনায়কতন্ত্র দ্রুতগতি সম্পন্ন ও দক্ষ শাসনব্যবস্থা হতে পারে, কিন্তু একনায়কতন্ত্রে জনসাধারণের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে না বলে এই শাসনব্যবস্থা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সাধারণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সুশাসনকে যেরূপ স্বায়ত্ত শাসনের পরিবর্তরূপে গ্রহণ করা যায় না গণতন্ত্রকেও সেরূপ একনায়কতন্ত্রের পরিবর্তরূপে গণ্য করা যায় না।

অধ্যায় ৪

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার

ক· সরকারের বিভিন্ন বিভাগ—তাদের কার্যাবলী ও পারস্পরিক সম্পর্ক

১। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (Organs of Government)

রাষ্ট্র হল একটি বিমূর্ত ধারণা। সরকার হল রাষ্ট্রের একটি সংস্থা যার মাধ্যমে রাষ্ট্র তার অস্তিত্ব বজায় রাখে, কার্যকলাপ পরিচালনা করে এবং নীতি ও উদ্দেশ্যসমূহকে কার্যকর করে। রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা প্রধানত তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়াগুলি হল—আইন প্রণয়ন করা, আইনকে প্রয়োগ ও কার্যকর করা এবং আইনসমূহ ব্যাখ্যা করা ও আইনভঙ্গকারীদের শাস্তি প্রদান করা। এই তিনটি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরকারের তিনটি প্রধান বিভাগ বা অঙ্গ জড়িত। সরকারের প্রধান তিনটি বিভাগ হল—আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ।

উৎপত্তির দিক দিয়ে বিচার করলে আইন ও বিচার বিভাগের পূর্বে শাসন বিভাগের অস্তিত্ব দেখা যায়। সমাজ গঠিত হওয়ার পর প্রথম পর্যায়ে শাসনবিভাগ চরম ও অসীম ক্ষমতা প্রয়োগ করত। পরবর্তী সময়ে গণতান্ত্রিক ধারণার প্রসারের ফলে শাসক অথবা শাসক গোষ্ঠীর ক্ষমতাকে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সরকারের তিনটি বিভাগ আবার সমান ক্ষমতা বিশিষ্ট নয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই আইন বিভাগ অন্য দুটি বিভাগ অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ভোগ করত। তবে সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলসমূহের উদ্ভব এবং শাসন বিভাগের ক্ষমতার পরিধি ও জটিলতা বৃদ্ধি হওয়ার ফলে বিংশ শতকে আইনসভার গুরুত্ব ও মর্যাদার হ্রাস পরিলক্ষিত হয়।

২। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি (The theory of Separation of Powers)

রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত ধারণা। সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা প্রকাশিত ও কার্যকরী হয়। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা প্রধানত তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়াগুলি হল—আইন প্রণয়ন করা, আইনকে প্রয়োগ ও কার্যকর করা এবং আইনসমূহ ব্যাখ্যা করা ও আইনভঙ্গকারীদের শাস্তি প্রদান করা। এই তিনটি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরকারের তিনটি প্রধান বিভাগ জড়িত। সরকারের প্রধান তিনটি বিভাগ হল—আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই এই অভিমত পোষণ করেন যে শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য সরকারের তিনটি বিভাগ সৃষ্টি করা হলেও প্রকৃত পক্ষে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা ভাগ করা সম্ভব নয়।

আবার অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন যে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতাকে আইন সংক্রান্ত, শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত ও বিচার সংক্রান্ত এই তিন ভাগে ভাগ করে সরকারের পৃথক তিনটি বিভাগের হাতে দেওয়া আবশ্যক। সরকারের ক্ষমতা তিনটি বিভাগের মধ্যে স্বতন্ত্র করে দেওয়ার নীতিটি ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি নামে পরিচিত।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল বক্তব্যগুলি হল এরূপ: প্রথমত, সরকারের তিনটি বিভাগ—আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ—একে অপরের থেকে পৃথক থাকবে। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি বিভাগ তার নিজ এক্তিয়ারে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ মুক্ত বা স্বাধীন হবে। তৃতীয়ত, কোনও বিভাগই অপর বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। চতুর্থত, প্রতিটি বিভাগই পৃথক পৃথক

ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হবে। কোনও ব্যক্তিই একই সময়ে একাধিক বিভাগের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা সরকারের তিনটি প্রধান বিভাগের মধ্যে বিভক্ত করার কতকগুলি সুবিধা দেখা যায়। প্রথমত, ক্ষমতা একই ব্যক্তি বা বিভাগের হাতে কেন্দ্রীভূত না থাকার ফলে ক্ষমতা বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা যাবে। তৃতীয়ত, কেবল মাত্র নিজ নিজ বিভাগের কর্তব্য সম্পাদন করার ফলে প্রত্যেক বিভাগের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। চতুর্থত, অনেকে বলেন যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ করার ফলে কোনও বিভাগের স্বৈরাচারী হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতা সুরক্ষিত হবে।

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের রচনায় সর্বপ্রথম ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উল্লেখ দেখা যায়। অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত (Deliberative), শাসনসংক্রান্ত (Magisterial) এবং বিচার সংক্রান্ত (Judicial) এই তিন ভাগে ভাগ করেন। এর পর রোমান দার্শনিক পলিবিয়াস (Polybius) ও সিসারো (Cicero) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি আলোচনা করেন। ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী লেখক বদাঁও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটি উল্লেখ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে জন লক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগকে পৃথক করার ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার হলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক মন্তেস্কু (Montesquieu)। তাঁর L'espirit de lois (The Spirit of Laws) গ্রন্থে এই মতবাদের বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মন্তেস্কুর জীবদ্দশায় ফরাসী দেশে স্বৈরাচারী রাজা চতুর্দশ লুই একাই শাসন, আইন ও বিচার সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। এর ফলে জনগণ কোনও স্বাধীনতা উপভোগ করত না। এই সময়ে মন্তেস্কু ইংল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করে এই ধারণা লাভ করেন যে ঐ দেশের জনগণ ফরাসী জনগণ অপেক্ষা অধিক ব্যক্তিস্বাধীনতা উপভোগ করে। তাঁর মতে এর কারণ ছিল ইংল্যাণ্ডে শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটির প্রয়োগ। সুতরাং ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা ও সরকারের প্রতিটি বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তিনি ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটিকে পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। মন্তেস্কুর পর ইংরাজ আইনবিদ ব্ল্যাকস্টোন এই নীতিটি আলোচনা করেন। তবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটি বাস্তবে সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচয়িতাগণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। লাতিন অ্যামেরিকার রাষ্ট্রসমূহের সংবিধানেও এই নীতিটি প্রয়োগ করা হয়েছে। ১৭৮৯ সনে ফরাসী জাতীয় পরিষদেও এই নীতিটির গুরুত্ব স্বীকার করা হয়।

৩। সমালোচনা (Criticism)

আধুনিক কালে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটি বিভিন্ন দিক দিয়ে সমালোচনা করেছেন।

প্রথমত, অনেকে বলেন যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ এই নামকরণটিই যথার্থ নয়। কারণ সরকারের ক্ষমতা কখনও ভাগ করা যায় না। প্রতিটি বিভাগের ওপর এক-একটি দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষমতা প্রদান করাকে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ বলা ঠিক নয়। এর যথার্থ নাম হওয়া উচিত কর্ম বিভাজন নীতি (Principle of division of functions)।

দ্বিতীয়ত, সরকারের কাজগুলি কটি ভাগে ভাগ করা উচিত এ সম্পর্কেও বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন অভিমত পোষণ করেন। সরকারের কার্যাবলীকে অনেকে দুটি, অনেকে তিনটি, আবার

অনেকে পাঁচ ভাগে পর্যন্ত বিভক্ত করার পক্ষপাতী। অনেক লেখক বিচার ক্ষমতাকে শাসন ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন। আবার কয়েকজন লেখক শাসনবিভাগকে নীতি নির্ধারণ ও নীতি প্রয়োগ এই দুভাগে ভাগ করেছেন।

তৃতীয়ত, কোনও রাষ্ট্রেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটির পরিপূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব নয়। কারণ বাস্তবে দেখা যায় যে কার্য পরিচালনার জন্য সরকারের প্রত্যেক বিভাগকেই অপর বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হয়। সরকারের প্রতিটি বিভাগ পরস্পরের সাথে এরূপভাবে জড়িত যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটি সূক্ষ্মভাবে প্রয়োগ করে শাসনকার্য পরিচালনা করা অসম্ভব। মন্ত্রিসভা চালিত শাসন ব্যবস্থায় এই নীতি গ্রহণ করা হয় না। এই শাসন ব্যবস্থায় প্রকৃত শাসনকর্তৃপক্ষের সঙ্গে আইন বিভাগের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে এবং প্রকৃত শাসনকর্তৃপক্ষ তার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। মার্কিন শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রয়োগ করা হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে সরকারের এক বিভাগের সঙ্গে অন্য বিভাগের যোগাযোগ দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে শাসন বিভাগের প্রধানরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি যে সব নিয়োগগুলি করেন বা বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে যে সব চুক্তি বা সন্ধি স্বাক্ষর করেন সেগুলির জন্য আইনসভার উচ্চকক্ষ সেনেটের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

চতুর্থত, পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রয়োগ করা সম্ভব হলেও তা কাম্য বলে গণ্য করা যায় না। জীবদেহের বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যেরূপ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল সরকারের বিভিন্ন বিভাগও সেরূপ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং সরকারের কার্যাবলীকে যান্ত্রিকভাবে শাসন, আইন ও বিচার বিভাগের মধ্যে ভাগ করার ফলে দক্ষতার অভাব দেখা দেবে এবং প্রতিটি বিভাগ তার নিজ এক্তিয়ারভুক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলে দুর্বল হয়ে পড়বে। অতএব শক্তিশালী সরকার গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে এই নীতিটির প্রয়োগ কাম্য নয়।

পঞ্চমত, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসারে তত্ত্বগতভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে যে সরকারের তিনটি বিভাগ সমান ক্ষমতাসম্পন্ন। কিন্তু বাস্তবে প্রায় প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই দেখা যায় যে জন-প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত আইন সভার ক্ষমতা সরকারের অন্য দুটি বিভাগের থেকে অধিক।

ষষ্ঠত, মন্তেস্ক্যুর মতে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ আবশ্যক। কিন্তু এর বিপক্ষে বলা যেতে পারে যে ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রযুক্ত আছে এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে মন্তেস্ক্যু বলেছিলেন যে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই নীতিটি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থায় কোনদিনই এই নীতিটি প্রচলিত ছিল না। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতাই ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ব্যক্তিস্বাধীনতা উপভোগ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ওপর নির্ভর করে না। জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা হল ব্যক্তি স্বাধীনতার ভিত্তি।

সপ্তমত, আধুনিক কালে কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণার প্রসারের ফলে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। পূর্বে রাষ্ট্রগুলির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা। কিন্তু বর্তমানে কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা প্রচলিত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের কার্যাবলী বহুগুণে বেড়ে গেছে। আধুনিক রাষ্ট্রে সরকারকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নানাবিধ কাজ করতে হয়। কল্যাণকর রাষ্ট্রের সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা ও ঐক্য না থাকলে জনস্বার্থ ব্যাহত হয়। অতএব বর্তমান যুগে এই ধারণা প্রায় অচল হয়ে পড়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে মার্ক্সীয় চিন্তাধারাতেও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটিকে বর্জন করা হয়েছে। বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী লেখক আরনেস্ট ম্যাণ্ডেল (Ernest Mandel) বলেন যে রাষ্ট্রের কাঠামো

সম্পর্কে প্রামাণ্য মার্ক্সবাদী চিন্তাধারায় যে সকল সাংগঠনিক নীতি প্রকাশ পায় তার মধ্যে একটি হল—"শাসনবিভাগীয় ও আইনবিভাগীয় ক্ষমতার মধ্যে কোনও সুস্পষ্ট ব্যবধান বা বিচ্ছেদ থাকবে না। এমন সব সংস্থা প্রয়োজন যারা আইন প্রণয়ন করবে ও সেগুলি প্রয়োগও করবে।"

৪। আইনসভা (Legislature)

শব্দার্থের বিচারে আইনসভা আইন প্রণয়ন কার্যে যুক্ত থাকে একথা মনে হলেও ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হয় অন্য উদ্দেশ্যে। আইনসভা প্রতিষ্ঠার পূর্বে আইন প্রয়োগ ও আইনের ব্যাখ্যার দায়িত্ব ছিল সম্পূর্ণরূপে রাজার ওপর। যুগ যুগ ধরে প্রচলিত আইন সকলে মান্য করত বলে ঐ সময়ে নতুন আইন প্রণয়নের কোনও প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত না। পরবর্তীকালে রাজা অর্থের প্রয়োজনে বিত্তশালী ব্যক্তিদের সাথে এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে যে সকল ব্যক্তিদের অধীনে সৈন্য থাকত তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রয়োজন মেটাতেন। এই সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়ে সভা (Assembly) গঠিত হয়। কালক্রমে এই সভা রাজ্যের বৃহৎ পরিষদে (Great Council of Kingdom) পরিণত হয়। নতুন কর ধার্যের ক্ষেত্রে এই সংস্থার পরামর্শ গ্রহণ করা হত। এই সংস্থাই ধীরে ধীরে প্রথম আইনসভায় পরিণত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। অধিক অর্থের জন্য রাজা সমাজের সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার ফলেই ইংল্যাণ্ডে পার্লামেন্টের সৃষ্টি হয়। প্রথমে পার্লামেন্ট একটি একক সংস্থারূপে কাজ করত, কিন্তু পরবর্তীকালে লর্ড সভা ও কমন্স সভা এই দুটি সংস্থায় বিভক্ত হয়ে যায়। লর্ড সভা অভিজাত এবং সামন্তদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত। অন্যদিকে শহর ও গ্রামের সাধারণ প্রতিনিধিদের নিয়ে কমন্স সভা গঠন করা হত। ব্রিটেনে পার্লামেন্টের দুটি কক্ষ কোনও পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টি করা হয় নি—আকস্মিক ভাবেই দুটি কক্ষের উদ্ভব হয়। ব্রিটেনে সর্বপ্রথম আইনসভার উৎপত্তি দেখা যায় বলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে আইনসভা সমূহের জননী (Mother of Parliaments) রূপে অভিহিত করা হয়।

৫। আইনসভার গঠন (Composition of the Legislature)

আইনসভা একটি কক্ষ বা দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত হতে পারে। একটি কক্ষ নিয়ে গঠিত আইনসভাকে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা (Unicameral Legislature) বলা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের আইনসভা (জাতীয় গণ কংগ্রেস) এককক্ষ বিশিষ্ট। ভারতে ২২টি রাজ্যের মধ্যে ১৩টি রাজ্যের আইনসভা এককক্ষ বিশিষ্ট। এদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, ওড়িষ্যা, আসাম, গুজরাট, রাজস্থান, পাঞ্জাব ইত্যাদিকে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রের আইনসভাই দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত। এদের দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা (Bi-cameral Legislature) বলে। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার যে কক্ষটি জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় তাকে প্রথম কক্ষ (First Chamber) বা জনপ্রিয় কক্ষ (Popular Chamber) বলা হয়। অন্য কক্ষটিকে দ্বিতীয় কক্ষ (Second Chamber) বা উচ্চকক্ষ (Upper House) বলা হয়। ইংল্যাণ্ডেই প্রথম দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হয়। এক সময়ে লর্ড সভা দারুণ প্রভাবশালী ছিল বলে তাকে উচ্চকক্ষ বলা হত। বর্তমানে এর গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাওয়ায় একে দ্বিতীয় কক্ষ বলে আখ্যা দেওয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত, জাপান, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রেও দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রচলিত আছে। ভারতে রাজ্য আইনসভাসমূহের মধ্যে ৯টিতে

দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা দেখা যায়।

৬। দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা (Bi-cameral Legislature)

বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রের আইনসভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট। পূর্বে দ্বিকক্ষ অথবা তিন কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাগুলি তৎকালীন সমাজের স্তর বিন্যাসকে প্রতিফলিত করত। যেমন, ইংল্যাণ্ডে অভিজাত ও ধর্মযাজক সম্প্রদায়কে নিয়ে লর্ড সভা এবং গ্রাম ও শহরের প্রতিনিধিদের নিয়ে কমন্স সভা গঠিত হত। ফ্রান্স ও অন্যান্য মহাদেশীয় রাষ্ট্রসমূহে ধর্মযাজকদের নিয়ে একটি ব্যবস্থাপক সভা (Estate), অভিজাতদের নিয়ে অন্য একটি ব্যবস্থাপক সভা এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিদের নিয়ে তৃতীয় ব্যবস্থাপক সভা (Third Estate) গঠন করা হত।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর অংশত ঐতিহ্য অনুসরণে এবং অংশত অন্য প্রয়োজনে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার অস্তিত্ব দেখা যায়। যেখানে অনেকগুলি অঞ্চল চুক্তি করে একটি জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি করে সেখানে জাতীয় আইনসভার উচ্চকক্ষে আঞ্চলিক স্বার্থ রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যাণ্ডকে উদাহরণরূপে গণ্য করা যেতে পারে।

দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা সমূহের নিম্নকক্ষের প্রতিনিধিরা জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এই কারণে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই উচ্চকক্ষের প্রতিনিধিদের অন্য পদ্ধতিতে নির্বাচিত করা হয়। অনেক রাষ্ট্রে উচ্চকক্ষের প্রতিনিধিরা উত্তরাধিকার সূত্রে সদস্যপদ লাভ করেন (ইংল্যাণ্ডের লর্ড সভা), অনেক রাষ্ট্রে তাঁরা সারা জীবনের জন্য নিযুক্ত হন (ক্যানাডার সেনেট) এবং অনেক রাষ্ট্রে তাঁরা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন (ভারতের রাজ্যসভা)। অধিকাংশ রাষ্ট্রেই উচ্চকক্ষের প্রতিনিধিদের সাধারণত নিম্নকক্ষের প্রতিনিধিদের থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ হতে হয়।

৭। দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে যুক্তি (Arguments for Bi- cameral Legislature)

আইনসভার দুটি কক্ষ হওয়া উচিত না একটি কক্ষ থাকা উচিত এ সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার সমর্থকেরা নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখান :

(১) একটি কক্ষ থাকলে অনেকসময় সময়ের অভাবে দ্রুত আইন প্রণয়ন অথবা আবেগের বশে আইন প্রণয়নের জন্য আইনে ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে। এছাড়া নিম্নকক্ষ অনেক সময় জনমতের চাপে বা উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে বিচার বিবেচনা না করে কোনও আইন প্রণয়ন করতে পারে। দ্বিতীয় কক্ষ থাকলে সমস্ত আইনই পুনরায় সুচিন্তিতভাবে বিচার বিবেচনা করার ফলে আইনের দোষ ত্রুটিগুলি নির্ণয় করা যেতে পারে। সুতরাং দ্বিতীয় কক্ষ তার সংশোধনমূলক, নিয়ন্ত্রণকারী ও সংযতকারী ক্ষমতা প্রয়োগ করে উন্নত ধরনের আইন প্রণয়নে সহায়তা করতে পারে।

(২) এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাসমূহের স্বৈরাচারী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যার ফলে জনস্বার্থ ব্যাহত হতে পারে। দুটি কক্ষ থাকলে কোনও কক্ষই যথেচ্ছভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। প্রত্যেকটি কক্ষই অপরের অস্তিত্বের জন্য সংযত থাকে ও দায়িত্বের সাথে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য সচেষ্ট থাকে।

(৩) বর্তমানকালে রাষ্ট্রের দায়িত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আইনসভার কাজকর্ম বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি কক্ষের পক্ষে সমস্ত আইন সুষ্ঠুভাবে প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। এই কারণে দুটি কক্ষ থাকলে উভয়ের কাজের চাপ অনেক কম হয়ে থাকে।

(৪) আইনসভায় দুটি কক্ষ থাকলে একটি কক্ষে গৃহীত কোনও প্রস্তাবিত আইনে অপর কক্ষ বাধা প্রদান করতে পারে। আবার একটি কক্ষ প্রস্তাবিত কোনও আইন পুনর্বিবেচনার জন্য উত্থাপনকারী কক্ষের নিকট ফেরৎ পাঠাতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এর ফলে অন্য কক্ষ ঐ প্রস্তাবিত আইন সম্পর্কে পুনরায় চিন্তাভাবনা করার সুযোগ লাভ করে এবং উভয় কক্ষের মধ্যে মতপার্থক্য প্রকাশিত হওয়ার ফলে ঐ আইনটির পক্ষে বা বিপক্ষে জনমত গড়ে উঠতে পারে। উভয় কক্ষের তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে কোনও একটি রাজনৈতিক প্রশ্নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জনগণ অবহিত হওয়ার ফলে তাদের রাজনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

(৫) আইনসভায় দুটি কক্ষ থাকলে তাদের গঠন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সাধারণত একটি কক্ষের সদস্যরা জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন এবং অন্যটির সদস্যরা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত এবং মনোনীত হতে পারেন। দ্বিতীয় কক্ষের সদস্যদের পরোক্ষভাবে নির্বাচন এবং মনোনয়ন করা হলে তার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা যায়। যে সকল জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে এড়িয়ে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে চান তাঁদের উচ্চকক্ষে মনোনীত করা যেতে পারে। ভারতের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতি বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য ও সমাজসেবা বিষয়ে যাঁদের বিশেষ জ্ঞান বা পারদর্শিতা আছে ঐরূপ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ১২ জনকে মনোনীত করেন।

(৬) আইনসভায় দুটি কক্ষ থাকলে প্রথম কক্ষের সদস্যগণ জনগণের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হন বলে অনেকসময় বয়সে নবীন ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও আইনসভার সদস্য হতে পারেন। কিন্তু দ্বিতীয় কক্ষ সাধারণত বয়োজ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়। সেইজন্য দ্বিতীক্ষ কক্ষ কম প্রভাবশালী হলেও তার প্রতিনিধিরা প্রথম কক্ষের ওপর একটি নৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

(৭) অনেকে বলেন যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় জাতীয় ঐক্যের সঙ্গে আঞ্চলিক স্বার্থের সমন্বয় সাধনের জন্য দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা আবশ্যক। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রথম কক্ষটির সদস্যরা সমগ্র রাষ্ট্রের জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় কক্ষের সদস্যগণ বিভিন্ন অঙ্গগুলির অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন।

৮। দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against Bi-cameral Legislature)

দ্বিপরিষদ বিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে যে সব যুক্তি দেওয়া হয় সেগুলি সম্পর্কে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে দ্বিপরিষদ আইনসভা অনাবশ্যক। দ্বিকক্ষ আইনসভার বিরুদ্ধে সাধারণত নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখানো হয়ে থাকে :

(১) অনেক লেখকই দ্বিকক্ষ ব্যবস্থাকে অপ্রয়োজনীয় ও অনাবশ্যক বলে মনে করেছেন। এ সম্পর্কে ফরাসী লেখক আবে সিয়ে (Abbe Sieyes) বলেছেন যে দ্বিতীয় কক্ষ যদি প্রথম কক্ষের সঙ্গে একমত হয় তবে তা অনাবশ্যক, আর যদি একমত না হয় তবে তা অনিষ্টকর। উচ্চকক্ষ সর্বদা নিম্নকক্ষে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমর্থন করলে উচ্চকক্ষের অস্তিত্বের কোনও সার্থকতা থাকে না। আবার উচ্চকক্ষ যদি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্নকক্ষকে বাধাদান করে তাহলে এক অবাঞ্ছনীয় অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

(২) দ্বিকক্ষ ব্যবস্থায় আইনসভার দায়িত্ব দ্বিধা বিভক্ত হয়। এর ফলে কোনও কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত না হলে এক কক্ষ সর্বদা অন্য কক্ষের ওপর দোষারোপ করার চেষ্টা করে। এই কারণে

অনেকে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব সর্বদা একটি কক্ষের ওপর ন্যস্ত থাকা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন।

(৩) দ্বিকক্ষ ব্যবস্থা ব্যয় বহুল। দ্বিতীয় কক্ষের সদস্যদের বেতন, ভাতা ও ঐ কক্ষ পরিচালনার জন্য অন্যান্য খরচ বাবদ সরকারের প্রচুর ব্যয় হয়। দ্বিতীয় কক্ষের প্রকৃত কোনও ক্ষমতা না থাকলে এই ব্যয়কে অপচয় বলে গণ্য করা যেতে পারে। এছাড়া দ্বিতীয় কক্ষ যদি না থাকে তাহলেও আইন প্রণয়ন কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে। এই কারণেও এই অতিরিক্ত ব্যয়ের কোনও সার্থকতা দেখা যায় না।

(৪) দ্বিকক্ষ ব্যবস্থায় আইনসভার যে কোনও কাজ পৃথক পৃথক ভাবে দু কক্ষে সম্পাদন করতে হয় বলে অযথা সময়ের অপচয় ঘটে। সুতরাং দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় কোনও কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে জরুরী অবস্থাতে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা একেবারে অনুপযুক্ত।

(৫) দ্বিকক্ষ ব্যবস্থাকে অগণতান্ত্রিক বলেও গণ্য করা হয়। প্রথম কক্ষের প্রতিনিধিরা সর্বত্রই জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। সুতরাং গঠনের দিক দিয়ে নিম্নপরিষদকে গণতান্ত্রিক বলা যেতে পারে। পরোক্ষ নির্বাচন, মনোনয়ন ইত্যাদির ভিত্তিতে গঠিত উচ্চপরিষদ যদি নিম্নপরিষদের কাজে বাধা প্রদান করে তবে তা অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ বলে বিবেচিত হবে। আবার উচ্চপরিষদের সদস্যদের যদি নিম্নপরিষদের সদস্যদের মত জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত করা হয় সে ক্ষেত্রেও স্বতন্ত্র একটি কক্ষ গঠনের কোনও যৌক্তিকতা থাকে না।

(৬) দ্বিকক্ষ ব্যবস্থায় সর্বত্রই বৃহত্তর জনস্বার্থ রক্ষার দিকে দৃষ্টি দিয়ে নিম্নকক্ষ গঠন করা হয়। অন্যদিকে উচ্চকক্ষ গঠিত হয় প্রধানত আঞ্চলিক বা শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য। এই কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে উচ্চকক্ষ বৃহত্তর জনস্বার্থের দিকে দৃষ্টি দেয় না। ফলে নিম্নকক্ষ প্রস্তাবিত প্রগতিমূলক ও সময়োপযোগী অনেক কাজে উচ্চকক্ষ অনেক সময় বাধা প্রদান করে থাকে।

(৭) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আঞ্চলিক স্বার্থ রক্ষা করার জন্যও উচ্চ পরিষদকে অপরিহার্য বলে গণ্য করা যায় না। দ্বিতীয় কক্ষ ব্যতীত অন্যান্য অনেক উপায়েও যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক স্বার্থ রক্ষা করা যেতে পারে। আঞ্চলিক স্বার্থরক্ষার এই সব পদ্ধতির মধ্যে লিখিত সংবিধান কর্তৃক আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতার উল্লেখ, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৯। আইনসভার কার্যাবলী (Functions of the Legislature)

বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইনসভার গঠনের মধ্যে যেরূপ পার্থক্য দেখা যায় তাদের ক্ষমতা, কার্যাবলী ও ভূমিকার ক্ষেত্রেও সেরূপ পার্থক্য দেখা যায়। কোনও কোনও রাষ্ট্রে আইনসভার ভূমিকা অত্যন্ত সক্রিয় এবং এর ক্ষমতাও আইনত সীমাবদ্ধ নয়। যেমন, ব্রিটেনের পার্লামেণ্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা কংগ্রেসও সংবিধানে উল্লেখিত এক্তিয়ারভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের আইনসভা সুপ্রীম সোভিয়েতকে সংবিধান অনুসারে বহু ক্ষমতা প্রদান করা হলেও এই সংস্থা প্রতি বছর মাত্র সামান্য কয়েকটি দিনের জন্য অধিবেশনে মিলিত হয়। এর একমাত্র কাজ হল রাশিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যত্রে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহকে অনুমোদন করা।

আইনসভা এই নামটি এই সংস্থার আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজকে অতিরঞ্জিত করে দেখানোর একটি ইঙ্গিত বলে গণ্য করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে শাসককে উপদেশ প্রদান করার উদ্দেশ্যে এই সংস্থার উদ্ভব হয়। সুতরাং আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজকে ঐতিহাসিক দিক দিয়ে অগ্রবর্তী অথবা আধুনিক আইনসভাসমূহের কার্যাবলীর মধ্যে রাজনৈতিক দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলা চলে না।

আইনসভার কার্যাবলীকে সুসম্বদ্ধভাবে আলোচনা করতে হলে তাদের কতকগুলি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

(১) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ—প্রতিটি রাষ্ট্রেই আইনসভাসমূহ নতুন আইন প্রণয়ন করে, এবং প্রচলিত যেসব আইন অপ্রয়োজনীয় বা সেকেলে হয়ে যায় সেগুলিকে সংশোধন করে বা বাতিল করে। আইন প্রণয়নের ক্ষমতার মধ্যে শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন করা ও বিচার বিবেচনা করা (Deliberation) এই দুটি কাজ অন্তর্ভুক্ত। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে বহুসংখ্যক ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত কোনও আইনসভা প্রত্যক্ষভাবে আইনপ্রণয়ন কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত। আজকের দিনে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই দেখা যায় যে আইনসভার সদস্যদের নিয়ে গঠিত ছোট ছোট কমিটি অনেক সময় বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে আইনের খসড়া রচনা করে। এই সকল খসড়া আইন সমগ্র আইনসভায় বিবেচনা করার পর আইন প্রণয়ন হয়।

বর্তমানে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইনসভার সদস্যদের ওপর রাজনৈতিক দলের অসীম প্রভাব দেখা যায়। আইনসভার সদস্যরা যে দলভুক্ত হন তাঁদের সেই দলের নির্দেশ অনুসারে দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিভিন্ন ধরনের চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও স্বার্থগোষ্ঠীও তাদের নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে আইনসভার ওপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে। আধুনিককালে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইনসভার অভ্যন্তরে ও বাইরে যে ঘাত-প্রতিঘাত দেখা যায় সেই প্রক্রিয়াকে আইন বিভাগীয় প্রক্রিয়া (Legislative Process) বলা হয়।

(২) অর্থসংক্রান্ত কাজ—আইনসভা হল প্রত্যেক রাষ্ট্রের জাতীয় অর্থের রক্ষক ও নিয়ন্ত্রণকর্তা। আইনসভার অনুমোদন ছাড়া কোনও কর ধার্য করা যায় না। ব্যয় বরাদ্দ ও ঋণ গ্রহণের জন্যও আইনসভার নির্দেশ প্রয়োজন। প্রতিটি রাষ্ট্রেই সরকারের বাৎসরিক আয়-ব্যয় বরাদ্দের আনুমানিক হিসাব (Budget) আইন সভায় পেশ করা হয়।

(৩) শাসন সংক্রান্ত কাজ—মন্ত্রিপরিষদ চালিত শাসনব্যবস্থায় আইনসভা প্রকৃত শাসন কর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই শাসনব্যবস্থায় আইনসভার সদস্যগণ মন্ত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সমালোচনা এবং প্রয়োজন হলে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাশ করে মন্ত্রীদের পদচ্যুত করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও রাষ্ট্রপতি যেসব উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের নিয়োগ করেন এবং বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যেসব চুক্তি বা সন্ধি সাক্ষর করেন সেগুলি আইনসভার উচ্চকক্ষ অর্থাৎ সেনেটের অনুমোদনক্রমে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। সুতরাং রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থাতেও সামান্য হলেও শাসনবিভাগের ওপর আইনসভার নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়।

(৪) সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত কাজ—সকল রাষ্ট্রেই আইনসভা সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। তবে বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই ক্ষমতার তারতম্য দেখা যায়। ব্রিটেনে আইনসভা একাকী সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে সংবিধান সংশোধন করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভা একাকী সংবিধান সংশোধন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। ঐ দেশে সংবিধান সংশোধন করতে হলে কেন্দ্রীয় আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের সমর্থন ছাড়াও রাজ্য আইনসভাসমূহের তিন-চতুর্থাংশের অনুমোদন আবশ্যক। সুতরাং আইনসভা সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে অথবা বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে সংবিধান সংশোধন করতে পারে।

(৫) নির্বাচন সংক্রান্ত—কোনও কোনও রাষ্ট্রে আইনসভা শাসনবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচারকদের নির্বাচন করে। সুইজারল্যাণ্ডের আইনসভা শাসন পরিষদের (যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ) এবং বিচারকদের নির্বাচন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত

হন। গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নে বিচারকগণ আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত হন। ভারতে পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ ও রাজ্য আইনসভাসমূহের নির্বাচিত সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের জন্য গঠিত নির্বাচক মণ্ডলীর অংশরূপে কাজ করেন। ভারতের উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনেও পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া প্রায় সব রাষ্ট্রেই আইনসভা তার সদস্যদের মধ্য থেকে সভার কাজ পরিচালনা করার জন্য সভাপতি ও সহসভাপতি নির্বাচন করে।

(৬) বিচার সংক্রান্ত কাজ—আইনসভা কিছু কিছু বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। ব্রিটেনের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ লর্ডসভা ঐ দেশের আপীল বিচারের সর্বোচ্চ আদালতরূপে কাজ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও পদস্থ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যায় এবং উচ্চকক্ষ সেনেট ঐ সব অভিযোগ বিচার করতে পারে। ভারতের পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগ থাকলে তা বিচার করে তাঁকে অপসারণ করতে পারে।

(৭) অনুসন্ধান মূলক কাজ—বর্তমান যুগে আইনসভাসমূহ জাতীয় সমস্যা সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কমিশন, কমিটি ইত্যাদি নিয়োগ করে থাকে। আবার বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির প্রতিবেদনগুলিও আইনসভা পর্যালোচনা করে।

১০। আইন প্রণয়ন পদ্ধতি (Process of Law-making)

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কোনও প্রস্তাবকে বিল (Bill) বলা হয়। কোনও বিল আইনসভায় যথাযথভাবে গৃহীত হওয়ার পর তা আইনে (Act) পরিণত হয়। যে সমস্ত বিলে সরকারী আয়ব্যয় সংক্রান্ত প্রস্তাব করা হয় সেগুলিকে অর্থ বিল (Money Bill) বলে। সরকারী আয়ব্যয় সংক্রান্ত প্রস্তাব ব্যতীত অন্যান্য প্রস্তাব সম্বলিত বিলগুলিকে সাধারণ বিল (Ordinary Bill) রূপে গণ্য করা হয়।

কোনও বিল আইনসভায় কয়েকটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার পর তা আইনে পরিণত হয়। এই পর্যায়গুলি হল নিম্নরূপ :

(১) প্রথম পাঠ—প্রথম পাঠ পর্যায়ে কোন খসড়া বিল আইনসভায় উত্থাপন করা হয়। প্রথমে ঐ খসড়া বিলটি আইনসভায় পাঠ করা হয় এবং তা আইনসভার সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই পর্যায়ে বিলটি সম্পর্কে কোনও আলোচনা হয় না।

(২) দ্বিতীয় পাঠ—এই পর্যায়ে বিলটিতে উল্লেখিত সাধারণ নীতিসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এই সময়ে প্রয়োজন হলে বিলটির সপক্ষে ও বিপক্ষে ভোট গ্রহণ করা যেতে পারে। দ্বিতীয় পাঠে যদি বিলটি টিকে যায় তবে অনেক সময় তাকে আইনসভার কোনও একটি কমিটিতে পাঠানো হয়ে থাকে।

(৩) কমিটি পর্যায়—কমিটিতে বিলটির প্রতিটি ধারা-উপধারা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। প্রয়োজন হলে কমিটি বিলে প্রয়োজনীয় সংশোধন প্রস্তাব করতে পারে।

(৪) রিপোর্ট পর্যায়—কমিটি বিলে কোনও সংশোধন প্রস্তাব করলে আইনসভা ঐ সংশোধনী প্রস্তাব বিবেচনা করে। কমিটি যদি কোনও সংশোধনী প্রস্তাব পেশ না করে তাহলে এই পর্যায়ে আইনসভায় কোনও আলোচনার প্রয়োজন হয় না।

(৫) তৃতীয় ও চূড়ান্ত পাঠ—এই পর্যায়ে আইনসভা বিলটিকে সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করার

পর বিলটি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই পর্যায়েই স্থির করা হয় বিলটি পাশ করা হবে, না বাতিল করা হবে।

আইনসভা দ্বিপরিষদ বিশিষ্ট হলে একটি কক্ষ কোনও বিল সমর্থন করার পর বিলটিকে অন্য কক্ষে প্রেরণ করা হয়। অন্য কক্ষে বিলটিকে পাশ করানোর উদ্দেশ্যে একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।

আইনসভার দুটি কক্ষের মধ্যে কোনও বিলকে কেন্দ্র করে মতপার্থক্য দেখা দিলে বিভিন্ন রাষ্ট্রে তা বিভিন্ন পদ্ধতিতে সমাধান করার চেষ্টা করা হয়। ভারতের পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের মধ্যে সাধারণ বিল সম্পর্কে কোনও মতবিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে একটি যৌথ অধিবেশন আহ্বান করেন। ঐ যৌথ অধিবেশনে বিষয়টি মীমাংসা করা হয়। ব্রিটেনে লর্ডসভা কোনও প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও ঐ প্রস্তাব যদি কমন্স সভায় পরপর দুটি অধিবেশনে গৃহীত হয় তাহলে এক বছর পরে লর্ডসভার বিনা অনুমোদনেই বিলটি রাজা বা রানীর সম্মতি পেয়ে আইনে পরিণত হয়। তবে লর্ডসভায় উত্থাপিত কোনও আইনের প্রস্তাব কমন্স সভা কর্তৃক প্রত্যাহত হলে ঐ প্রস্তাব আইনে পরিণত হতে পারে না। সুতরাং ব্রিটেনে সাধারণ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে কমন্স সভাই হল প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের দুটি কক্ষের মধ্যে সাধারণ আইন প্রণয়নের বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে প্রথাগত বিধান অনুসারে উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি যৌথ সম্মেলন কমিটি বিষয়টি নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান অনুসারে সুপ্রীম সোভিয়েতের দুটি কক্ষের মধ্যে মত পার্থক্য ঘটলে বিষয়টি মীমাংসার জন্য সমতার ভিত্তিতে উভয় কক্ষ দ্বারা গঠিত একটি সালিস কমিশনের কাছে পেশ করা হবে এবং তারপর উভয় কক্ষের যুক্ত সভায় বিষয়টি দ্বিতীয়বার বিবেচিত হবে। আবার যদি মতৈক্য না ঘটে তাহলে বিষয়টি আইনসভার পরবর্তী অধিবেশনে আলোচনার জন্য স্থগিত থাকবে, অথবা আইনসভা কর্তৃক জাতিব্যাপী ভোট গ্রহণের জন্য পেশ করা হবে।

এইভাবে আইনসভায় কোনও বিল গৃহীত হওয়ার পর বিলটিকে রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়। রাষ্ট্রপ্রধান বিলে সম্মতি প্রদান করলে বিলটি আইনে (Act) পরিণত হয়। রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মতির বিষয়েও বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। অনেক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধানের এই ক্ষমতাটি সম্পূর্ণরূপে একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। অনেক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে আইনসভা প্রণীত বিলকে নাকচ করার ক্ষমতা (Veto) প্রদান করা হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানকে বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য আইনসভার নিকট ফেরত পাঠাবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। কোনও কোনও রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান কোনও বিলে সম্মতি প্রদান না করলে ঐ বিল যদি আইনসভা বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সমর্থন করে তবে বিলটি রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মতি ছাড়াই আইনে পরিণত হয়।

১১। শাসন বিভাগ (The Executive)

সাধারণ অর্থে সরকার বলতে কেবলমাত্র শাসন বিভাগকেই বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতার্থে সরকার বলতে শাসন, আইন ও বিচার এই তিনটি বিভাগকেই বোঝায়। যে সব ব্যক্তি সরকারের নীতি ও কার্যক্রমকে কার্যকর করার সঙ্গে যুক্ত তারাই শাসন বিভাগের অংশ।

সময়ের দিক দিয়ে বিচার করলে আইন ও বিচার বিভাগের পূর্বে শাসন বিভাগের অস্তিত্ব দেখা যায়। রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর প্রথম দিকে শাসন বিভাগ চরম ও অসীম ক্ষমতা প্রয়োগ করত। পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটলে শাসন বিভাগের ক্ষমতাকে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত

করার জন্য আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ইদানীং কালে অবশ্য প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রেই শাসন বিভাগ সরকারের নেতৃত্ব প্রদান করে বলে এর গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত শাসন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদ আইনসভায় নেতৃত্ব দান করে। কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণার উদ্ভব হওয়ার ফলে প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রেই সরকারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সব কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব শাসন বিভাগের ওপর ন্যস্ত। এছাড়া বর্তমানে আইন বিভাগের ওপর খুব কাজের চাপ পড়ার ফলে সময়ের অভাবে এই বিভাগ শাসন বিভাগের ওপর উপ-আইন, নির্দেশ, বিধি ইত্যাদি প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়ে থাকে। শাসন বিভাগ কর্তৃক আইনসভা প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে আইন রচনা করাকে অর্পিত আইন-প্রণয়ন (Delegated Legislation) বলা হয়। পরিশেষে বলা যায় যে শাসন বিভাগের কাজকর্ম অনেকাংশে প্রত্যক্ষভাবে মানুষের জীবন যাত্রার সঙ্গে জড়িত বলে যে কোনও রাষ্ট্রের জনগণ শাসন বিভাগ সম্পর্কে সমধিক উৎসাহী। সুতরাং আধুনিক যুগে বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই শাসন বিভাগের গুরুত্ব বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

১২। শাসন বিভাগের বিভিন্ন রূপ (Types of the Executive)

শাসন বিভাগকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—রাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষ (Political Executive) এবং অরাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষ (Non-political Executive)। অরাজনৈতিক শাসকগণ স্থায়ী সরকারী কর্মচারী (Permanent Civil Service), আমলা (Bureaucracy) বা প্রশাসক (Admistrators) নামে পরিচিত। রাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষ প্রধান শাসক (Chief Executive) ও অন্যান্য শাসকবর্গ নিয়ে গঠিত হয়। সাধারণভাবে রাজা বা রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রিপরিষদ, ক্যাবিনেট এঁরা সবাই রাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষের কাঠামো ভিন্ন ভিন্ন রকম। রাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষ সরকারের নীতি নির্ধারণ করে, নীতিগুলি ঠিকমত প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা তা পরিদর্শন করে এবং প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। রাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষ খুব কম সংখ্যক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত হয়। যে সব রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান রাজা তাঁদের বাদ দিলে রাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুক্ত প্রায় সমস্ত ব্যক্তিই জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একটি নির্দিষ্ট কার্যকালের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

শাসন বিভাগের অপর অংশ স্থায়ী আমলাদের নিয়ে গঠিত হয়। সরকারী কর্মচারীবৃন্দ বা আমলারা সরকারের নীতি ও কার্যক্রমকে বাস্তবে প্রয়োগ করেন। আমলাদের বিশেষ যোগ্যতার ভিত্তিতে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়। নীচ থেকে শুরু করে ওপর পর্যন্ত সমস্ত পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে অরাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়। রাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষ সময়ান্তরে পরিবর্তিত হলেও আমলারা সরকারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া রাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা শাসন কার্য পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হন না। আমলারা, বিশেষত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা, শাসন কার্য পরিচালনা বিষয়ে দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকেন। সুতরাং আমলারা রাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষকে শাসন পরিচালনা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অভিমত প্রদান করে থাকে। রাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষকে আবার নামসর্বস্ব (Nominal or Titular) এবং প্রকৃত (Real) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। নামসর্বস্ব ও প্রকৃত শাসন কর্তৃপক্ষকে আবার শাসন বিভাগের মর্যাদাপূর্ণ বা সম্মানিত (Dignified) ও কার্যকর (Efficient) অংশরূপে গণ্য করা যায়। নামসর্বস্ব শাসক সাধারণত জাতীয় ঐক্যের প্রতীকরূপে

গণ্য হন। ব্রিটেনের রাজা বা রানী এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন নামসর্বস্ব শাসক প্রধান। নামসর্বস্ব শাসক প্রধানের কোনও প্রকৃত ক্ষমতা থাকে না তবে তিনি রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব, ধারাবাহিকতা ও ঐতিহ্য রক্ষা করেন। শাসন পরিচালনা ক্ষেত্রে তিনি কেবল তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। যে সব রাষ্ট্রে একজন নামসর্বস্ব প্রধান থাকেন সেখানে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করে মন্ত্রিপরিষদ বা ক্যাবিনেট। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিপরিষদ হল প্রকৃত বা কার্যকর শাসন কর্তৃপক্ষ। ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্রের প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত শাসক প্রধান ও সরকারের প্রধান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি একাই নামসর্বস্ব শাসক প্রধান এবং প্রকৃত শাসকরূপে কাজ করেন।

শাসন বিভাগের ক্ষমতা একজন ব্যক্তির নিকট কেন্দ্রীভূত থাকে না একাধিক ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় তার ভিত্তিতে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শাসন বিভাগকে একক পরিচালক বিশিষ্ট শাসন কর্তৃপক্ষ (Single Executive) এবং বহু পরিচালক বিশিষ্ট শাসন কর্তৃপক্ষ (Plural Executive) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। মার্কিন সংবিধানের দ্বিতীয় ধারায় বলা হয়েছে যে সমস্ত শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নিকট ন্যস্ত থাকবে। তবে রাষ্ট্রপতি তাঁর শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য কয়েকজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি নিয়ে একটি ক্যাবিনেট গঠন করেন। এই ক্যাবিনেট সম্পর্কে সংবিধানে কোথাও কিছু উল্লেখ নেই। ক্যাবিনেট সদস্যদের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে রাষ্ট্রপতি বাধ্যও থাকেন না। মার্কিন রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্রের প্রধান ও সরকারের প্রধান রূপে কাজ করে থাকেন। অতএব মার্কিন রাষ্ট্রপতি একক পরিচালিত শাসন কর্তৃপক্ষের উদাহরণ।

প্রকৃত শাসন ক্ষমতা একজন ব্যক্তির পরিবর্তে একাধিক ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত থাকলে তাকে বহু পরিচালক বিশিষ্ট বা সমষ্টিগত শাসন কর্তৃপক্ষ বলা হয়। সুইজারল্যাণ্ডের শাসন বিভাগ বহু পরিচালক বিশিষ্ট শাসন বিভাগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাতজন সমান ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ (Federal Council) গঠিত হয়। এই সাতজন সদস্যের মধ্য থেকে প্রতি বছরের জন্য একজন সদস্যকে সভাপতি রূপে নিযুক্ত করা হয়। এইভাবে সাতজন সদস্য সভাপতিরূপে কাজ করার সুযোগ লাভ না করলে কোনও সদস্যকে সভাপতিরূপে পুনর্নিয়োগ করা হয় না। সভাপতি সহ এই শাসনসংস্থার কোনও সদস্য অপর সদস্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সভাপতির পদটি কেবল আনুষ্ঠানিক মর্যাদাযুক্ত, এর সঙ্গে কোনও প্রকৃত ক্ষমতা যুক্ত নয়।

ব্রিটেন, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রের মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থাকে অনেকে বহু পরিচালক বিশিষ্ট শাসন কর্তৃপক্ষের উদাহরণ রূপে গণ্য করেন। তাঁদের মতে এরূপ শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত শাসন ক্ষমতা প্রয়োগকারীরা অর্থাৎ মন্ত্রীরা সকলেই সমপর্যায়ভুক্ত, প্রধানমন্ত্রীকে কেবল সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য (First among equals) বলে গণ্য করা যায়। তবে মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য ও শক্তিশালী নেতৃত্বের জন্য অনেকে আবার এই শাসনব্যবস্থাকে বহু পরিচালক বিশিষ্ট শাসনব্যবস্থা রূপে আখ্যা দিতে চান না।

একজন ব্যক্তির হাতে সমস্ত শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত থাকলে দ্রুততা ও দক্ষতার সাথে সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব। তবে ঐরূপ ব্যক্তির স্বৈরাচারী হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

শাসন ক্ষমতা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভাগাভাগি করে দিলে সরকারী নির্দেশ ও নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত দায়িত্ব নির্ধারণ করা কঠিন। তবে সমষ্টিগত শাসনে স্বৈরাচারের কোনও সম্ভাবনা থাকে না।

১৩। রাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী (Functions of the Political Executive)

বর্তমান যুগে পুলিসী রাষ্ট্রের ধারণা জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণায় পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কার্যাবলী যথেষ্ট পরিমাণে বর্ধিত হয়েছে। সুতরাং যে সরকার সর্বাপেক্ষা কম শাসন করে সেই সরকার সর্বশ্রেষ্ঠ এই ধারণাটি আধুনিক কল্যাণকর রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। রাষ্ট্রের কার্যাবলী বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই শাসনবিভাগের কার্যাবলী বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীকে নিম্নলিখিত ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে :

(১) অভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা— যে কোনও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা শাসন বিভাগের একটি অন্যতম প্রধান কাজ। এই কারণে রাষ্ট্রকে পুলিস বাহিনী রাখতে হয় এবং কোনও ব্যক্তি আইন ভঙ্গ বা অপরাধমূলক কাজ করলে তাকে আদালতের রায় অনুসারে শাস্তি প্রদান করতে হয়। শাসন বিভাগ সরকারের নিম্নতম শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ ও বদলী এবং অন্যান্য শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের জন্য চাকুরীর নিয়মাবলী প্রণয়ন করে। জরুরী অবস্থা দেখা দিলে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শাসনবিভাগ অর্ডিন্যান্স্ অথবা সামরিক আইন প্রয়োগ করে থাকে। শাসন বিভাগের যে দপ্তরকে অভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় তাকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর (Home Department) বলে।

(২) পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজ—রাষ্ট্রসমূহ সার্বভৌম হলেও কোনও রাষ্ট্র কখনও একাকী তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। প্রত্যেক রাষ্ট্রই তার নিজ অস্তিত্বের জন্য অন্য রাষ্ট্রসমূহের ওপর কিছুটা নির্ভরশীল। যে কোনও রাষ্ট্রে পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজগুলির মধ্যে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন বা ছিন্ন করা, অন্যান্য রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত পাঠানো, বিদেশী রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রদূত গ্রহণ করা, আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সন্ধি সম্পাদন করা, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠানো, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাজে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শাসনবিভাগের পররাষ্ট্র দপ্তর (Department of External Affairs) এইসব দায়িত্ব সম্পাদন করে থাকে।

(৩) প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কাজ—রাষ্ট্রকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা ও রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করা শাসনবিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অধিকাংশ রাষ্ট্রেই আইনসভার সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা না গেলেও যুদ্ধ পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রধানত শাসন বিভাগের হাতে ন্যস্ত। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসক প্রধান রূপে রাষ্ট্রপতিরা হলেন রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়ক। প্রতিরক্ষা দপ্তরের (Defence Department) মাধ্যমে শাসনবিভাগ যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কাজগুলি সম্পাদন করে।

(৪) আইনসংক্রান্ত কাজ—যদিও আইন প্রণয়নের প্রধান দায়িত্ব আইনসভার ওপর ন্যস্ত কিন্তু শাসনবিভাগও অনেক ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। আইনসভার অধিবেশন যখন বন্ধ থাকে ঐ সময় শাসনবিভাগ প্রয়োজন হলে অর্ডিন্যান্স্ (Ordinance) জারি করতে পারে। অর্ডিন্যান্স্‌গুলি সাময়িক কালের জন্য আইনসভা প্রণীত আইনের মত বলবৎ করা হয়ে থাকে। অনেকসময় আইনসভা প্রণীত কোনও আইনকে যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য শাসনবিভাগ উপ আইন (Bye-laws) প্রণয়ন করে থাকে। এছাড়া প্রায় সব রাষ্ট্রেই দেখা যায় যে আইনসভা প্রণীত কোনও বিলে রাষ্ট্রের শাসক প্রধান সম্মতি প্রদান না করলে ঐ বিল আনুষ্ঠানিকভাবে আইনে পরিণত হয় না।

(৫) অর্থ সংক্রান্ত কাজ—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে আইনসভার মারফত জনগণের প্রতিনিধিদের অনুমতি গ্রহণ না করে কোনও কর ধার্য বা অর্থব্যয় করা যায় না। কিন্তু করলব্ধ অর্থ আদায় ও অর্থব্যয়ের দায়িত্ব থাকে শাসন বিভাগের ওপর। শাসন বিভাগ অর্থ বা রাজস্ব দপ্তরের (Finance

Department) মাধ্যমে অর্থসংক্রান্ত দায়িত্বগুলি পালন করে। শাসনবিভাগের দপ্তরগুলির মধ্যে অর্থদপ্তর খুব প্রভাবশালী কারণ এই দপ্তর অন্যান্য দপ্তরের মধ্যে অর্থ বণ্টনের ব্যবস্থা করে এবং অন্যান্য দপ্তরগুলির অর্থব্যয়ের নীতির হিসাব পরীক্ষা করে।

(৬) বিচার সংক্রান্ত কাজ—আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শাসন বিভাগের প্রধান ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন। কোনও সরকারী কর্মচারী অন্যায়ভাবে পদচ্যুত হয়েছেন বলে মনে করলে তিনি শাসন বিভাগের কাছে প্রতিকারের জন্য আবেদন করতে পারেন। শাসন বিভাগ ঐরূপ আবেদন বিচার করতে পারে। কোনওব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর অতিরিক্ত অথবা অযথা কর ধার্য করা হলে তার বিরুদ্ধেও শাসন বিভাগের নিকট প্রতিকারের জন্য আবেদন করা যেতে পারে। শাসন বিভাগ এরূপ ক্ষেত্রে ঐ করের যথার্থতা বিচার করে দেখে।

(৭) বিবিধ কাজ—আধুনিক কালে কল্যাণকর রাষ্ট্রসমূহে রাষ্ট্রের কাজ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাসন বিভাগের ওপর নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য দেওয়া হয়ে থাকে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, জনস্বাস্থ্য, অরণ্য, বন্যপ্রাণী ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয় সমূহ পরিচালনার দায়িত্ব শাসন বিভাগের ওপর দেওয়া হয়। যে সকল শিল্পকে জাতীয়করণ করা হয় তাদের পরিচালন দায়িত্বও শাসন বিভাগকে গ্রহণ করতে হয়। কোনও রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা করা হলে ঐ সকল উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব শাসন বিভাগের। এইভাবে দেখা যায় যে রাষ্ট্রের কার্যকলাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাসনবিভাগের কার্যাবলীও ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৪। বিচার বিভাগ (Judiciary)

আধুনিককালে বিচার কার্য পরিচালনা করা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। বিচার বিভাগের মাধ্যমে সরকার এই দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু প্রাচীনকালে রাষ্ট্রের কোনও বিচারবিভাগ ছিল না এবং বিচার কার্য পরিচালনা করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব রূপে গণ্য করা হত না কোনওব্যক্তি অন্যায় আচরণ করলে বা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কোনও বিরোধ দেখা দিলে গোষ্ঠী বা সমাজে তার মীমাংসা করা হত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিরা অন্যায় আচরণ করার পর সমাজ প্রদত্ত শাস্তি মানত না বলে এ বিষয়ে রাজার সহায়তা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এছাড়া শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা রাজার একটি দায়িত্ব এই ধারণার উদ্ভব হওয়ার ফলেও যে কোনও অপরাধমূলক কাজের ফলে অরাজকতা বা বিশৃঙ্খলতা দেখা দিলে রাজা হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেন। সুতরাং কোনও অন্যায় আচরণকে ব্যক্তিগত ব্যাপার রূপে গণ্য না করে রাষ্ট্রের প্রতি অপরাধ বলে গণ্য করার ফলে অন্যায়কারী ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের কাজ রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। প্রথম দিকে অবশ্য গোষ্ঠী, সামন্তপ্রভু ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রত্যেকেই বিচার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করে। কিন্তু রাজকীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি ও জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভবের ফলে কালক্রমে বিচার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে না। এইভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের কাজে পরিণত হয়।

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার একটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করা। ব্যক্তিদের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করা বিচার বিভাগের মাধ্যমেই সম্ভব। সুতরাং ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা করা, অন্যায়কারীকে শাস্তি প্রদান করা এবং নির্দোষীকে রক্ষা করার জন্য বিচার বিভাগ আবশ্যক। বস্তুত ন্যায় বিচারের আদালতের কোনও সন্তোষজনক পরিবর্ত কল্পনা করা অসম্ভব। লর্ড ব্রাইসের মতে বিচার বিভাগ কেবল প্রয়োজনীয় তাই নয়, কোনও শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ নির্ধারণের জন্য

বিচার বিভাগের দক্ষতা ব্যতীত আর অন্য কোনও ভাল মানদণ্ড নেই। যথাযথ ও দ্রুত ন্যায় বিচার সম্পাদনের ওপর সাধারণ নাগরিকরা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে কারণ এরূপ বিচার ব্যতীত অন্য কিছু তাঁদের কল্যাণ ও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে পারে না।

১৫। বিচার বিভাগের কার্যাবলী (Functions of the Judiciary)

আধুনিক যুগে প্রতিটি রাষ্ট্রেই বিচার বিভাগ নানাধরনের কাজ করে থাকে। বিচার বিভাগের কাজগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যেতে পারে :

(১) ন্যায় বিচার—বিচার বিভাগের প্রাচীনতম কাজ হল ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি ও ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসা করা। ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে দেওয়ানী ও ফৌজদারী যে কোনও মামলায় আদালত তথ্য এবং প্রচলিত আইন ও সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করে। সুতরাং বিচার বিভাগ সর্বদা আইনসঙ্গতভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করে।

(২) আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ—কোনও আইনকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হল বিচার বিভাগের একটি অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। অনেকসময় সাংবিধানিক ব্যবস্থা বা আইনসভা প্রণীত কোনও আইনকে কোনও বিশেষ মামলায় প্রয়োগ করে ঐ মামলার মীমাংসা করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারপতিগণ তাঁদের নিজেদের বিচার বুদ্ধি ও ন্যায়বোধের ভিত্তিতে বিচার কার্য সম্পাদন করে থাকেন। বিচারকদের সিদ্ধান্তের ফলে সৃষ্ট এরূপ আইনকে বিচারক প্রণীত আইন (Judge-made laws) বলা হয়। বিচারক প্রণীত আইন পরবর্তীকালে একই ধরনের মামলায় বিচারের নজির রূপে প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং আইনের ব্যাখ্যা ও আইন প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বিচারকগণ অনেক সময় নতুন আইন সৃষ্টি করে থাকেন।

(৩) নাগরিকদের অধিকার রক্ষা—বিচার বিভাগ ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ রূপে কাজ করে। কোন ব্যক্তির অধিকারের ওপর অন্য কোনও ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকার হস্তক্ষেপ করলে ঐরূপ কার্যকলাপ যথাযথ কিনা তা আদালত বিচার করতে পারে। যে সকল রাষ্ট্রের সংবিধানে নাগরিকদের অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ থাকে সেখানে ঐগুলি ক্ষুণ্ণ হলে আদালত লেখ (Writ), নির্দেশ বা আদেশ জারী করে অধিকারসমূহ রক্ষা করার চেষ্টা করে। ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত এবং নাগরিকদের অধিকারসমূহ সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত না হলেও নাগরিকদের প্রচলিত অধিকারসমূহ ক্ষুণ্ণ হলে আদালত রাজার নামে লেখ (Prerogative writs) জারী করে ঐগুলি রক্ষা করে থাকে।

(৪) সরকারকে পরামর্শদান—অনেক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ বা আইন বিভাগকে আইনগত কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারে। ভারত, ব্রিটেন ও ক্যানাডায় এইভাবে শাসন বিভাগ বিচার বিভাগের কাছ থেকে আইনের দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কোনও বিষয় সম্পর্কে অভিমত গ্রহণ করে থাকে।

(৫) সংবিধানের ব্যাখাকর্তা ও বিচারবিভাগীয় পুনর্বিচার—যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সংবিধানের চরম ব্যাখ্যাকর্তা রূপে কাজ করে। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকার সমূহের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে বিচার বিভাগ সংবিধান অনুযায়ী ঐ বিরোধ মীমাংসা করে। কোনও যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকার তাদের নিজ নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে কাজ করছে কিনা তাও প্রয়োজন হলে আদালত বিচার করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার প্রণীত কোনও আইন বা শাসন বিভাগীয় কোনও নির্দেশ সংবিধান বিরোধী হলে আদালত ঐরূপ আইন বা নির্দেশকে অবৈধ বলে বাতিল করে দিতে পারে। বিচার বিভাগের এই

ক্ষমতাকে বিচার বিভাগীয় পুনর্বিচারের ক্ষমতা (power of Judicial Review) বলা হয়।

(৬) বিবিধ কাজ—বিচার বিভাগ আরও কিছু কর্তব্য সম্পাদন করে থাকে যেগুলিকে প্রকৃতপক্ষে বিচার সংক্রান্ত কাজের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ, লাইসেন্স্ প্রদান, কোনও প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির সংরক্ষণ ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্তমান কালে নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ স্থির করাও আদালতের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

১৬। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (Independence of the Judiciary)

চরম রাজতন্ত্রে শাসন কার্য ও বিচার কার্যের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হত না। রাজা একাই শাসন কার্য পরিচালনা করতেন ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার করতেন। কিন্তু একই কর্তৃপক্ষের নিকট শাসন কার্য ও বিচার কার্য উভয়ের পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হলে জনগণের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। এই কারণে দেখা যায় যে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকারের শাসন, আইন ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ পূর্ণভাবে সমর্থন না করলেও বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করার পক্ষপাতী।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বোঝায় যে এই বিভাগ আইন বিভাগ বা শাসন বিভাগের দ্বারা কোনমতে নিয়ন্ত্রিত হবে না। বিচারকগণ যাতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন সেইজন্য বিচার বিভাগকে যথাসম্ভব রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা আবশ্যক বলে অনেকে মনে করেন। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে।

(১) বিচারকদের নিয়োগ—বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতির ওপর তাঁদের স্বাধীনতা যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে। সাধারণত দুভাবে বিচারপতিদের নিয়োগ করা যেতে পারে—নির্বাচন ও মনোনয়ন। সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি ক্যান্টনে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি রাজ্যে বিচারকগণ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন। অনেকে বলেন যে জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বিচারকগণকে নির্বাচিত করা হলে বিচারকদের যোগ্যতা যথাযথভাবে বিচার করা হয় না এবং প্রধানত দলীয় রাজনীতির ভিত্তিতে বিচারকগণ নির্বাচিত হন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে বিচারকগণ আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত হন। আইনসভার দ্বারা বিচারকদের নির্বাচন করা হলেও দলীয় রাজনীতির প্রভাবে অনেকসময় সুযোগ্য ব্যক্তিরা বিচারকরূপে নিযুক্ত হতে পারেন না। ব্রিটেন, ক্যানাডা ও ভারতে বিচারকগণ শাসন বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত হন। সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে প্রথম ক্ষেত্রে ভারতের প্রধান বিচারপতি এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভারতের প্রধান বিচারপতি ও সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি আইনসভার উচ্চকক্ষ সেনেটের অনুমোদন ক্রমে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। মোট কথা বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সমর্থনকারীরা বলেন যে বিচারপতিদের এরূপ পদ্ধতিতে নিয়োগ করা উচিত যাতে তাঁরা কোনও মামলায় রায় দানের সময় নিরপেক্ষতার পরিবর্তে সরকারের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়াসী না হন।

(২) বিচারকদের কার্যকাল—বিচারকদের কার্যকাল যদি শাসনবিভাগ বা আইন বিভাগের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হয় তবে তাঁরা নিশ্চয়তার সঙ্গে ও স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারেন না। সুতরাং বিচারকদের চাকুরীর স্থায়িত্ব ও নিশ্চয়তা থাকা একান্ত আবশ্যক। বিচারকদের কার্যকাল দীর্ঘদিন হলে তাঁরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের

বিচারপতিগণ যতকাল সক্ষম থাকেন ততকাল কাজে বহাল থাকতে পারেন। ভারতের সংবিধানে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়স যথাক্রমে ৬৫ ও ৬২ বৎসর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) বিচারকদের পদচ্যুতি—শাসন বিভাগ বা আইন বিভাগ যাতে বিচারপতিদের যথেচ্ছভাবে পদচ্যুত করতে না পারে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য তার ব্যবস্থাও থাকা প্রয়োজন। বিচারপতিরা যাতে স্বাধীনভাবে ও নির্ভয়ে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন এজন্য তাঁদের চাকুরীর নিরাপত্তা থাকা আবশ্যক। বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা শাসন বিভাগের ওপর ন্যস্ত না করে আইনসভাকে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। বিচারপতিরা একমাত্র অসদাচরণ বা অযোগ্যতার অভিযোগে আইনসভা কর্তৃক তদন্তে অভিযুক্ত বলে প্রমাণিত হলে তাঁদের অপসারণ করা উচিত।

(৪) বিচারকদের বেতন ও ভাতা—বিচারকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতা প্রদান করা না হলে উচ্চযোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা এই কাজে আকৃষ্ট হবেন না। এছাড়া বিচারকগণ যাতে অর্থাভাবে উৎকোচ গ্রহণ ও অন্যান্য দুর্নীতিমূলক কাজে জড়িত না হন তার জন্যও তাঁদের যথেষ্ট পরিমাণে বেতন ও ভাতা দেওয়া উচিত। কার্যকালের মধ্যে বিচারকদের বেতন ও ভাতা হ্রাস করাও উচিত নয়।

(৫) বিচারকদের যোগ্যতা—বিচারকগণ যে সব কর্তব্য সম্পাদন করে থাকেন তার জন্য তাঁদের প্রায়োগিক যোগ্যতা থাকা একান্ত আবশ্যক। বিচারকদের আইন ও সংবিধান সম্পর্কে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং আইনসংক্রান্ত পেশায় যাঁরা বিশেষ পারদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্য থেকেই বিচারপতিদের নিয়োগ করা উচিত।

(৬) বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য—অনেকে বলেন যে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখা হলে বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারে। ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যও বিচার বিভাগকে অন্তত শাসন বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র করা আবশ্যক বলে অনেকে মনে করেন।

১৭। বাস্তবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কতদূর থাকা সম্ভব ? (How far is it possible to maintain the independence of the judiciary in practice?)

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে নিরপেক্ষ ও উদারচেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিদের বিচারপতি পদে নিয়োগ করার চেষ্টা করা হলেও বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়াকে কোনমতেই মানবিক প্রভাব থেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। বিচারপতি যতই বিশিষ্ট হন না কেন, তিনি তাঁর প্রচলিত ভাবধারণা দ্বারাই আবদ্ধ থাকেন। সুতরাং কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিচারপতিগণ সচেতনভাবে নিরপেক্ষ হওয়ার চেষ্টা করলেও তাঁদের অগোচরে এই সিদ্ধান্ত তাঁদের শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা, মতাদর্শ এবং প্রচলিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে যুক্তিভিত্তিক, যন্ত্রবৎ এবং আইনগত নয়। আইনের শব্দতালিকাতে উল্লেখিত ধারণাগুলিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করা যেতে পারে। বিচারপতিগণকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আইনসমূহকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়। বিচারকগণ সর্বদা প্রচলিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করে থাকেন। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার অনুকূলেই গড়ে তোলা হয়। বিচারকগণ সমাজবদ্ধ জীব। সুতরাং বিচার বিভাগকে আইনের দিক দিয়ে বাহ্যত স্বাধীন করার চেষ্টা

করা হলেও বিচারকগণ কখনও নিজেদের মতাদর্শ ও মূল্যবোধের উর্ধ্বে উঠে বিচার কার্য সম্পাদন করতে পারেন না। এই কারণে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ওপর আদৌ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না।

আধুনিক কালে সব ধরনের শাসন ব্যবস্থাতেই স্থায়িত্ব ও পরিবর্তনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সরকারের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য বিচার বিভাগের সঙ্গে সরকারের অন্য দুটি বিভাগের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। এই কারণে বর্তমানে বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই বিচারবিভাগকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার একটি অংশরূপে গণ্য করেন।

খ· ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন ও আইন বিভাগ

১। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার (Union Government in India)—বর্তমানে একটি কেন্দ্রীয় সরকার, ২২টি রাজ্য সরকার ও ৯টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় কাজ শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রিপরিষদ এবং সরকারী আমলারা শাসন বিভাগের অংশ। রাষ্ট্রপতি ও একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা নিয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠিত। আইনসভার উচ্চ ও নিম্ন কক্ষের নাম হল যথাক্রমে রাজ্যসভা ও লোকসভা। কেন্দ্রীয় আইনসভা পার্লামেন্ট বা সংসদ নামে পরিচিত। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট হল কেন্দ্রীয় বিচার বিভাগ।

২। ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ (Union Executive in India)—ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশ হল এই যে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নিকট ন্যস্ত থাকবে এবং তিনি স্বয়ং অথবা তাঁর অধীন আধিকারিকগণের মাধ্যমে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। অর্থাৎ সংবিধান অনুযায়ী ভারত সরকারের সমস্ত শাসন সংক্রান্ত কার্যকলাপ রাষ্ট্রপতির নামে কৃত বলে অভিব্যক্ত করা হয়। অবশ্য রাষ্ট্রপতি হলেন নামসর্বস্ব শাসক প্রধান। রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করবার ও মন্ত্রণা দেওয়ার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকে, যার শীর্ষে থাকেন প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি ঐরূপ মন্ত্রণা অনুযায়ী তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিপরিষদ হল প্রকৃত শাসন কর্তৃপক্ষ। আবার প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের নেতৃত্ব দেন বলে তাঁকে সরকারের প্রধান রূপে আখ্যা দেওয়া চলে। রাষ্ট্রপতির পদ তাঁর মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের জন্য শূন্য হলে যতদিন পর্যন্ত নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হন ততদিন পর্যন্ত অথবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্ব সম্পাদনে সাময়িক কালের জন্য অসমর্থ হলে সেই সময়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য একজন উপরাষ্ট্রপতি থাকেন। তবে সাধারণ সময়ে উপরাষ্ট্রপতির কোনও শাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব থাকে না ; তিনি অবশ্য পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা হলেন রাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষের (Political Executive) অংশ। কারণ এঁরা প্রত্যেকেই জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাঁদের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। রাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ও নির্ধারিত কার্যকলাপ ও নীতিসমূহকে বাস্তবে প্রয়োগ করেন সরকারী কর্মচারী বা আমলারা। এঁদের স্থায়ী অরাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষ (Permanent non-political Executive) বলা হয়। সরকারী আমলাদের বিশেষ যোগ্যতার ভিত্তিতে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়। রাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষের অংশ ভুক্ত ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেও জনমতের চাপে যে কোনও সময়ে অপসারণ করা যেতে পারে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতা লাভ করে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করতে পারে। কিন্তু সরকারী আমলারা শাসন বিভাগের স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন।

৩। ভারতের রাষ্ট্রপতি (The President of India)

ভারতের সংবিধানের পঞ্চমভাগে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম ভাগের প্রথম অধ্যায়ে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ এই শিরোনামে প্রথমে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং সাধারণভাবে সংবিধানের পঞ্চম ভাগের প্রথম অধ্যায়

লক্ষ করলে মনে হবে যে ভারতের রাষ্ট্রপতি কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের প্রধান। কিন্তু সমগ্রভাবে ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তিনি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের প্রধান নন। তিনি কেন্দ্র, ২২টি রাজ্য ও ৯টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সম্বলিত ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রধান (Head of the Indian Union), ভারতীয় জাতির প্রধান (Head of the Indian Nation), ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু (Focus of Indian Fedration) এবং ভারত রাষ্ট্রের প্রতীক (Symbol of India's statehood)। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করলেই তাঁর এই পদমর্যাদা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৪। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন (Election of the President)

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি ও প্রণালীকে কেন্দ্র করে সংবিধান পরিষদে বহু আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এই বিষয়ে নানাধরনের প্রস্তাবও উত্থাপন করা হয়। প্রথমত, অনেকে রাষ্ট্রপতিকে জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত করার প্রস্তাব পেশ করেন। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ফলে প্রচুর সময়, অর্থ ও শক্তির অপচয় হবে বলে মনে করে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। দ্বিতীয়ত, সংবিধান পরিষদের সাংবিধানিক উপদেষ্টা স্যার বি· এন· রাও প্রস্তাব করেন যে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যেরা একটি যৌথ বৈঠকে মিলিত হয়ে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করবেন। এই রূপে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হলে পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠদলের মনোনীত প্রার্থীর সর্বদা রাষ্ট্রপতি রূপে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকবে বলে এই প্রস্তাবও বাতিল করা হয়। অবশেষে সংবিধান পরিষদ নেহেরু-আম্বেদকর প্রস্তাবিত সূত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

সংবিধানের ৫৪ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি (ক) পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণকে এবং (খ) রাজ্যগুলির বিধানসভাসমূহের নির্বাচিত সদস্যগণকে নিয়ে গঠিত একটি নির্বাচক সংস্থার (Electoral College) সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

প্রধানত তিনটি কারণে রাষ্ট্রপতিকে পরোক্ষভাবে নির্বাচন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে—(১) বিশাল সংখ্যক নির্বাচক মণ্ডলী, (২) প্রশাসনিক যন্ত্রের ওপর চাপ ও (৩) ভারতের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির নামসর্বস্ব ভূমিকা।

রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচনের জন্য নির্বাচক সংস্থাকে এরূপভাবে গঠন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে রাষ্ট্রপতিকে এক দিকে সমগ্র জাতির প্রতিনিধি ও অন্যদিকে বিভিন্ন রাজ্যের জনগণের প্রতিনিধি রূপে গণ্য করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কারণ কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের উভয়ের দ্বারা মনোনীত প্রতিনিধি রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। পৃথিবীর অন্য কোনও রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন না। এই কারণে একজন শাসনতন্ত্রবিদ মন্তব্য করেছেন যে ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির ক্ষেত্রে একটি মৌলিক অবদান ("An original contribution to constitutional practice"—K.R. Bombwall)

সংবিধানে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের প্রণালী ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, যতদূর কার্যত সম্ভব রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিত্বের মানের মধ্যে সমতা রক্ষা করা হবে। রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিত্বের মধ্যে ঐরূপ সমতা এবং সামগ্রিকভাবে রাজ্যসমূহের ও কেন্দ্রের মধ্যে সমতা সুনিশ্চিত করার জন্য পার্লামেন্টের ও প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্য ঐ নির্বাচনে যে সংখ্যক ভোট প্রদান করতে পারেন তা একটি প্রণালীতে নির্ধারণ করা হয়। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে জনপ্রতি এক ভোট (One man, One vote) এই নীতি অনুসরণ করা হয় না। প্রতিটি

ভোটদাতার ভোটের একটি সংখ্যা বা মূল্য স্থির করে দেওয়া হয়। কোনও রাজ্যের জনসংখ্যাকে (সর্বশেষ জনগণনা অনুসারে) ঐ রাজ্যের বিধানসভায় নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে যে ভাগফল পাওয়া যায় তাতে এক হাজারের যতগুলি গুণিতক আছে, ঐ রাজ্যের বিধানসভায় প্রতিটি নির্বাচিত সদস্যের ততগুলি ভোট থাকবে। রাজ্য বিধানসভাগুলির সদস্যগণকে প্রদত্ত ভোটের মোট সংখ্যাকে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে, পার্লামেন্টের প্রতিটি কক্ষের প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের তত সংখ্যক ভোট থাকবে।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে একক হস্তান্তরযোগ্য গোপন ব্যালটে ভোট গ্রহণ করা হয়।

নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণ পদ্ধতি (Method of determining results of the election)—রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে যে কজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ভোটদাতারা তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী প্রত্যেককে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা দিয়ে ভোট প্রদান করেন। নির্বাচন শেষ হওয়ার পর প্রত্যেক প্রার্থী যে সংখ্যক বৈধ প্রথম পছন্দের ভোট পেয়ে থাকেন সেগুলিকে যোগ করে মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা স্থির করা হয়। মোট বৈধ ভোটের সংখ্যাকে দুই দিয়ে ভাগ করে তার সাথে এক যোগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে কোটা (Quota) বলে। কোনও প্রার্থীকে জয়ী হতে হলে অন্তত পক্ষে কোটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট পেতে হয়। প্রার্থীদের প্রথম পছন্দের ভোটের বিচারে যদি কেউ কোটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট না পান তবে যে প্রার্থী সর্বাপেক্ষা কম সংখ্যক প্রথম পছন্দের ভোট পেয়েছেন তাঁকে বাদ দেওয়া হয়। এরপর তাঁর নামে প্রদত্ত ভোটকাগজে অন্যান্য যে যে প্রার্থীর অনুকূলে যতগুলি করে দ্বিতীয় পছন্দের ভোট দেওয়া হয়েছে সেইসব প্রার্থীর পাওয়া প্রথম পছন্দের ভোটের সঙ্গে ততগুলি করে দ্বিতীয় পছন্দের ভোট যোগ করা হয়। এইবার যিনি কোটা পান তিনি জয়ী বলে ঘোষিত হন। কিন্তু এবারেও যদি কেউ কোটা না পান তাহলে একই পদ্ধতি আবার প্রয়োগ করা হয় এবং এইভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনও প্রার্থী কোটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট পান ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রার্থীবাদ ও ভোট হস্তান্তর পদ্ধতি চলতে থাকে।

নির্বাচনী বিরোধ (Election Disputes)—রাষ্ট্রপতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যদি কোনও সন্দেহ ও বিরোধ দেখা যায় তবে ঐ বিষয়ে তদন্ত করা ও চূড়ান্তরূপে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দায়িত্ব ভারতের সুপ্রীম কোর্টের ওপর দেওয়া হয়েছে।

৫। রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা (Qualification for election as President)

কোনও ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে তাঁকে—(ক) ভারতীয় নাগরিক হতে হবে, (খ) ৩৫ বছর বয়স পূর্ণ করতে হবে এবং (গ) লোকসভার সদস্যরূপে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। এছাড়া তিনি কোনও লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

৬। রাষ্ট্রপতি পদের কার্যকাল (Term of office of the President)

রাষ্ট্রপতি তাঁর পদের কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বছর কাল পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। যিনি রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন বা ছিলেন তিনি ঐ পদে পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি তার পাঁচ বছরের কার্যকালের মধ্যে যে কোনও সময়ে, উপরাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে নিজ স্বাক্ষরিত লিখন দ্বারা, পদত্যাগ করতে পারেন।

৭। রাষ্ট্রপতির অপসারণ (Removal of the President)

ভারতের রাষ্ট্রপতির পাঁচ বছরের নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে এই পদটি তিনটি কারণে শূন্য হতে পারে—(১) মৃত্যু, (২) পদত্যাগ ও (৩) অপসারণ। রাষ্ট্রপতির অপসারণ পদ্ধতিকে মহা অভিযোগ (Impeachment) বলা হয়। ভারতের সংবিধান অনুসারে একমাত্র রাষ্ট্রপতিকেই মহা অভিযোগে অভিযুক্ত করে অপসারণ করা যায়। রাষ্ট্রপতিকে একমাত্র সংবিধান ভঙ্গের (Violation of the Constitution) জন্য অপসারণ করা যেতে পারে। তাঁকে অপসারণের জন্য পার্লামেন্টের যে কোনওকক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগ আনা যায়। অন্য কক্ষ অভিযোগ অনুসন্ধান করে তার সত্যতা প্রমাণিত করতে পারলে তাঁকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করা যায়। পার্লামেন্টের যে কোনও কক্ষের এক-চতুর্থাংশ সদস্য লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগের বিষয়টির প্রতি কক্ষের সকল সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। এই লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি কক্ষে আলোচনা করার পর যদি ঐ কক্ষের সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ বিষয়টি সমর্থন করে তাহলে বিষয়টি অপর কক্ষে অনুসন্ধানের জন্য পাঠানো হয়। অপর কক্ষ প্রথমে অভিযোগটি সম্পর্কে নিজে অনুসন্ধান করে অথবা অভিযোগটি অনুসন্ধান করার ব্যবস্থা করে। এইরূপ অনুসন্ধানের পর যদি ঐ কক্ষের সমগ্রসংখ্যক সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ বিষয়টি সমর্থন করে তাহলে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির অপসারণ পদ্ধতিটি একটি জটিল ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এই পদ্ধতিটিকে বিভিন্নভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। প্রথমত, সংবিধান ভঙ্গ এই বিষয়টি সুস্পষ্ট নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে সংবিধানে কোথাও একথা বলা নেই যে সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকেই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী রূপে নিয়োগ করবেন। প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগের বিষয়টি সংসদীয় শাসনব্যবস্থার প্রচলিত রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং রাষ্ট্রপতি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার পরিবর্তে অন্য কোনও ব্যক্তিকেপ্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন তাহলে তার জন্য তাঁকে সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাবে কিনা এই বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতির অপসারণের ক্ষেত্রে তাঁদের আদৌ কোন ভূমিকা নেই।

৮। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী (Powers and functions of the President)

ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাসমূহকে সাধারণ সময়ে প্রযোজ্য ও জরুরী অবস্থায় প্রযোজ্য এই দুভাগে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

(ক) রাষ্ট্রপতি সাধারণ সময়ে যে সব ক্ষমতা প্রয়োগ করেন (Powers exercisable in normal times) সে গুলিকে শাসনসংক্রান্ত (Executive) ও আইনসংক্রান্ত (Legislative) এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ভারতের সংবিধানের ৫৩ ধারা অনুসারে কেন্দ্রের শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নিকট ন্যস্ত থাকবে এবং সংবিধান অনুসারে তিনি এই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের পক্ষ থেকে শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতার সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে সংবিধান বা অন্য কোনও আইন অনুসারে আইনসংক্রান্ত ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা প্রদান করার পরে সরকার পরিচালনা সংক্রান্ত যেসব ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে সাধারণ অর্থে সেগুলিই হল শাসনসংক্রান্ত। ভারত সরকারের সমস্ত শাসনসংক্রান্ত কাজ রাষ্ট্রপতির নামে কৃত বলে অভিব্যক্ত হয়। তবে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিপরিষদের সাহায্য ও পরামর্শ অনুসারে এই সব ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

রাষ্ট্রপতির শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতাসমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে।

(১) নিয়োগ ও অপসারণ করার ক্ষমতা—রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ করেন—প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য মন্ত্রী, ভারতের এটর্নি জেনারেল, ভারতের কম্প্‌ট্রোলার ও অডিটর জেনারেল, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি সমূহ, রাজ্যপাল সমূহ, কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্‌ভিস কমিশনের সদস্যবৃন্দ, মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য সদস্য, অর্থকমিশনের সদস্যবৃন্দ ইত্যাদি। রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের, এটর্নি জেনারেলকে এবং রাজ্যপালদের আনুষ্ঠানিকভাবে অপসারণ করে থাকেন। এছাড়া পার্লামেন্টের সুপারিশ ক্রমে তিনি সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের, ভারতের কম্প্‌ট্রোলার ও অডিটর জেনারেলকে এবং নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের এবং সুপ্রীম কোর্টের তদন্তের প্রতিবেদন অনুসারে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য পাবলিক সার্‌ভিস কমিশনের সদস্যদের আনুষ্ঠানিক ভাবে অপসারণ করতে পারেন।

(২) কূটনৈতিক ক্ষমতা—রাষ্ট্রের প্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। সমস্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সন্ধি রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হয় যদিও পার্লামেন্টের অনুমোদন ব্যতীত এগুলি কার্যকর করা যায় না। রাষ্ট্রপতি বিদেশী রাষ্ট্রসমূহে ভারতের রাষ্ট্রদূত ও কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের নিয়োগ করেন এবং বিদেশী রাষ্ট্রদূত ও কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের পরিচয় পত্র গ্রহণ করেন।

(৩) সামরিক ক্ষমতা—রাষ্ট্রপতি হলেন ভারতের সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তবে পার্লামেন্টের সম্মতি ছাড়া তিনি যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপন করতে পারেন না বা সামরিক বাহিনী প্রয়োগ করার নির্দেশ দিতে পারেন না।

(৪) ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা—অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় ভারতেও রাষ্ট্রপ্রধান রূপে রাষ্ট্রপতিকে অপরাধী ব্যক্তিদের ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় আইন ভঙ্গকারী কোনও ব্যক্তি বা সামরিক আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত কোনও ব্যক্তি বা মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত কোনও ব্যক্তিকে তিনি ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন। এইভাবে তিনি দণ্ড মকুব, দণ্ড স্থগিত বা দণ্ড হ্রাসের ব্যবস্থা করতে পারেন।

(৫) বিবিধ ক্ষমতা—শাসন বিভাগের প্রধানরূপে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে বহু ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা হল—(ক) কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সমূহের শাসনভার তাঁর হাতে ন্যস্ত থাকে। তিনি এইসব অঞ্চলের জন্য প্রশাসক নিযুক্ত করে তাঁদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। (খ) কোনও গুরুত্বপূর্ণ আইনগত বা তথ্যগত প্রশ্ন সম্পর্কে তিনি সুপ্রীম কোর্টের কাছে অভিমত চাইতে পারেন। (গ) পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশন, সুপ্রীম কোর্টের আধিকারিকদের নিয়োগ, কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্‌ভিস কমিশনের সদস্য সংখ্যা, সুপ্রীম কোর্টের অস্থায়ী বিচারপতি নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে রাষ্ট্রপতি বিধি নিয়ম প্রণয়ন করেন। (ঘ) রাষ্ট্রপতি কোনও রাজ্য সরকারের সম্মতি সাপেক্ষে ঐ রাজ্যের সরকার বা তার আধিকারিকগণের ওপর কেন্দ্রের শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতার যে কোনও বিষয়, শর্তসহ বা বিনা শর্তে, ন্যস্ত করতে পারেন। (ঙ) রাজ্যগুলির মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রপতি আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠন করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি একদিকে যেমন শাসনবিভাগের অন্যদিকে আবার পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাষ্ট্রপতির আইনসংক্রান্ত ক্ষমতাসমূহকে রাষ্ট্রপ্রধান রূপে তাঁকে যে আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে তারই অনুপূরক অংশরূপে গণ্য করা যেতে পারে। তাঁর আইন সংক্রান্ত ক্ষমতাগুলি হল

এরূপ :

(১) রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন ও স্থগিত রাখেন এবং প্রয়োজন হলে লোকসভা ভেঙ্গে দিতে পারেন। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ দূর করার জন্য উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন।

(২) লোকসভার প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশন এবং প্রত্যেক বছরের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের একত্রে সমবেত বৈঠকে উদ্বোধনী অভিভাষণ দেন। এছাড়া রাষ্ট্রপতি যে কোনও সময়ে পার্লামেন্টের যে কোনও কক্ষে বা একত্রে সমবেত উভয় কক্ষে অভিভাষণ দিতে পারেন।

(৩) তিনি পার্লামেন্টের যে কোনও কক্ষে বিবেচনাধীন বিষয়ে বা অন্য কোনও বিষয়ে বাণী প্রেরণ করতে পারেন।

(৪) পার্লামেন্ট প্রণীত যে কোনও বিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি প্রদান করলে তবেই ঐ বিল আইনে পরিণত হয়। অর্থ সংক্রান্ত ও সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিলে সম্মতি দিতে তিনি বাধ্য থাকেন। কোনও সাধারণ বিলে তিনি সম্মতি না দিতে পারেন অথবা এই বিলটিকে পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেন্টের কাছে ফেরত পাঠাতে পারেন। তবে পুনর্বিবেচনার পর পার্লামেন্ট যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাতে তিনি সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন।

(৫) সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা ও সমাজসেবায় যাঁদের বিশেষ জ্ঞান বা বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে এরূপ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি ১২জনকে রাজ্যসভায় সদস্য হিসাবে মনোনয়ন করেন। তিনি যদি মনে করেন যে লোকসভায় ইঙ্গ ভারতীয়দের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব নেই তাহলে ঐ কক্ষে তিনি ২জন ইঙ্গ ভারতীয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে মনোনয়ন করতে পারেন।

(৬) অনেক বিল রাষ্ট্রপতির বিনা অনুমতিতে পার্লামেন্টে উত্থাপন করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ অর্থবিল ও রাজ্যগুলির নাম, সীমানা ও আয়তন হ্রাস বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিলের উল্লেখ করা যায়।

(৭) পার্লামেন্টের অধিবেশন যখন স্থগিত থাকে তখন প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ (Ordinance) জারি করে আইন প্রণয়নের কাজ চালাতে পারেন। এই অধ্যাদেশগুলির পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের ন্যায় একই কার্যকারিতা থাকে। তবে পার্লামেন্ট পুনরায় অধিবেশনে মিলিত হওয়ার ৬ সপ্তাহের মধ্যে এই অধ্যাদেশগুলিকে পার্লামেন্ট অনুমোদন না করলে ঐগুলি বাতিল হয়ে যায়।

(৮) বার্ষিক আয় ব্যয় বরাদ্দের হিসাব (Budget) এবং অর্থ কমিশন, কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন, কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল, তপসিলী জাতি ও তপসিলী উপজাতি কমিশনার প্রভৃতির প্রতিবেদন সমূহ রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে উপস্থাপিত করেন।

(৯) কোনও বিল রাজ্য আইনসভায় গৃহীত হওয়ার পর তা রাজ্যপালের নিকট স্বাক্ষরের জন্য প্রেরণ করা হলে রাজ্যপাল ঐ বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য আটক রাখতে পারেন। রাষ্ট্রপতি ঐ বিলে সম্মতি প্রদান না করলে ঐ বিল আইনে পরিণত হতে পারে না। বাধ্যতামূলকভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণ, হাইকোর্টের ক্ষমতার খর্বতা সাধন অথবা পার্লামেন্ট কর্তৃক 'অত্যাবশ্যক' ঘোষিত কোনও পণ্যের ওপর কর ধার্য সংক্রান্ত কোনও বিল রাজ্য আইনসভায় গৃহীত হলে ঐরূপ বিল অবশ্যই রাষ্ট্রপতির অনুমতির জন্য রাজ্যপালকে আটক রাখতে হয়।

(খ) জরুরীক্ষমতা সমূহ (Emergency Powers)

রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা (extraordinary powers) সংবিধানের ১৮ ভাগে 'জরুরী ব্যবস্থাদি' এই শিরোনামায় উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানে তিন ধরনের জরুরী অবস্থার বিষয় বলা

আছে—১। জরুরী অবস্থার ঘোষণা (Proclamation of Emergency), ২। রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার দরুণ জরুরী অবস্থা (Emergency in case of failure of constitutional machinery in States) ও ৩। অর্থসংক্রান্ত জরুরী অবস্থা (Financial Emergency)।

১। **জরুরী অবস্থার ঘোষণা**—যদি কোনও সময়ে রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে এরূপ গুরুতর জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে সমগ্র ভারতের বা ভারতের কোনও অংশের নিরাপত্তা যুদ্ধ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা বিপন্ন হয়েছে বা বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে তা হলে তিনি সমগ্র ভারতে বা তার কোনও অংশে জরুরী অবস্থার ঘোষণা জারী করতে পারেন। তবে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট (অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেট পর্যায়ের অন্য মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত পরিষদ) এরূপ ঘোষণা জারী করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে লিখিতভাবে তাঁদের সিদ্ধান্ত না জানালে তিনি এরূপ ঘোষণা জারী করতে পারেন না। রাষ্ট্রপতি একই সময়ে যুদ্ধ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা সশস্ত্র বিদ্রোহের কারণে পৃথক পৃথক ভাবে একাধিক জরুরী অবস্থার ঘোষণা জারী করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেটের পরামর্শক্রমে জরুরী অবস্থার ঘোষণা জারী করলেও পার্লামেন্টের অনুমোদন ব্যতীত এই ঘোষণা স্থায়ী হতে পারে না। জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ার পর একমাসের মধ্যে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটের দ্বারা এই ঘোষণা অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। পার্লামেন্ট অনুমোদন না করলে ঘোষণা বাতিল হয়ে যায়। এইভাবে প্রতি ৬ মাস অন্তর পার্লামেন্টের উভয়কক্ষে জরুরী অবস্থার ঘোষণা অনুমোদন করাতে হয়। কোনও সময়ে অনুমোদনের জন্য লোকসভাকে পাওয়া না গেলেও অর্থাৎ লোকসভা যদি ভেঙে দেওয়া হয় বা তার ৫ বছরের কার্যকাল যদি শেষ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কেবল রাজ্যসভার অনুমোদনে জরুরী অবস্থা প্রচলিত থাকে। তবে লোকসভা পুনর্গঠিত হওয়ার পর ৩০ দিনের মধ্যে ঐ সভা দ্বারা ঐ ঘোষণা অনুমোদন করাতে হয়। জরুরী অবস্থার ঘোষণার কোনও সর্বাধিক কার্যকাল সংবিধানে স্থির করে দেওয়া হয় নি।

জরুরী অবস্থার ঘোষণা চলাকালে (১) পার্লামেন্ট সংবিধানের কেন্দ্রীয় তালিকায় লিপিবদ্ধ নয় এমন যে কোনও বিষয়ের ওপর অর্থাৎ রাজ্যতালিকাভুক্ত কোনও বিষয়ের ওপর আইন প্রণয়ন করতে পারে। (২) কেন্দ্রীয় সরকার শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে (৩) রাষ্ট্রপতি নির্দেশ প্রদান করে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টন সংক্রান্ত সাংবিধানিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে পারে। (৪) যতদিন জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকে ততদিন ১৯ ধারায় বর্ণিত ছটি স্বাধীনতার অধিকার খর্ব করে রাষ্ট্র আইন প্রবর্তন করতে পারে অথবা প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি নিতে পারে। (৫) রাষ্ট্রপতি বিশেষ নির্দেশ প্রদান করে সংবিধানের তৃতীয়ভাগের ২০ ও ২১ ধারা ছাড়া বাকি অন্যান্য ধারায় প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের সাংবিধানিক প্রতিকারের ব্যবস্থা বন্ধ রাখতে পারেন। (৬) লোকসভা ও রাজ্যবিধানসভাগুলির ৫ বছরের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে তাদের মেয়াদ এককালীন এক এক বছর করে বাড়িয়ে দিতে পারে।

রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার জন্য জরুরী অবস্থা—যদি কোনও সময়ে কোনও রাজ্যের রাজ্যপালের নিকট থেকে প্রতিবেদন পাওয়ার পর বা অন্যভাবে রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে কোনও রাজ্যে এরূপ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে যাতে ঐ রাজ্যের শাসন সংবিধান অনুসারে পরিচালনা করা সম্ভব নয় তা হলে তিনি ঐ রাজ্যে সাংবিধানিক অচলাবস্থার জন্য জরুরী অবস্থা জারী করতে

পারেন। এরূপ জরুরী অবস্থাকে সাধারণভাবে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন (President's Rule in a State) বলা হয়ে থাকে।

এরূপ ঘোষণা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বলবৎ হওয়ার পর দুমাসের মধ্যে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের দ্বারা অনুমোদন করাতে হয়। প্রতি ৬ মাস অন্তর এইভাবে পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত করা হলে সর্বাধিক ৩ বছর কোনও রাজ্যে এই ধরনের জরুরী অবস্থা প্রচলিত থাকতে পারে। তবে এরূপ ঘোষণা প্রথমে ১ বছর বলবৎ থাকবে। এক বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে যদি নির্বাচন কমিশন এই অভিমত প্রকাশ করে যে ঐ রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার মত অবস্থা না থাকার দরুণ এই জরুরী অবস্থা-বিধি চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন তাহলে ঐ ঘোষণা ১ বছরের অধিককাল স্থায়ী হতে পারে।

এরূপ ঘোষণার দ্বারা রাষ্ট্রপতি (১) কোনও রাজ্য সরকারের সমস্ত বা যে কোনও কাজ এবং রাজ্যপালের যে কোনও বা সমস্ত কাজ নিজ হাতে গ্রহণ করতে পারেন; (২) রাজ্যের আইনসভার ক্ষমতা পার্লামেন্ট কর্তৃক বা পার্লামেন্টের কতৃত্বাধীনে প্রয়োগ করা হবে বলে ঘোষণা করতে পারেন; (৩) এরূপ ঘোষণার উদ্দেশ্যকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় বা বাঞ্ছনীয় আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারেন। তবে সংবিধান প্রদত্ত রাজ্য হাইকোর্টের কোনও ক্ষমতা তিনি অধিগ্রহণ করতে পারেন না।

অর্থসংক্রান্ত জরুরী অবস্থা—যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যার ফলে ভারতের বা তার কোনও অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম বিপন্ন হয়েছে তা হলে তিনি ঐ মর্মে একটি ঘোষণা করতে পারেন।

এরূপ ঘোষণা বলবৎ করার পর দুমাসের মধ্যে তাকে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ দ্বারা অনুমোদন করাতে হবে। অর্থসংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণার কোনও সর্বাধিক সময় সীমা সংবিধানে উল্লেখ করা হয় নি।

অর্থসংক্রান্ত জরুরী অবস্থা বলবৎ কালে কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষ রাজ্যগুলিকে অর্থব্যবস্থায় যথাযথ নীতি পালনের জন্য নির্দেশ দিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে যে সব নির্দেশ দান করা রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন ও উপযুক্ত বলে গণ্য করেন তা তিনি দিতে পারেন। এরূপ নির্দেশের মধ্যে (১) রাজ্য সরকারের সকল শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা হ্রাস এবং (২) রাজ্য আইনসভায় গৃহীত সমস্ত অর্থবিল রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষণের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। এরূপ ঘোষণা প্রচলিত থাকাকালে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দান করে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিসহ সরকারের অধীনস্থ চাকুরিরত সকল শ্রেণীর ব্যক্তিদের বেতন ও ভাতা হ্রাস করার নির্দেশ দিতে পারেন।

৯। ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা (The position of the President of India)

ভারতের সংবিধান বিশ্বের সর্ববৃহৎ লিখিত সংবিধান হলেও ১৯৫০ সনে যখন এই সংবিধান প্রবর্তন করা হয় তখন এতে রাষ্ট্রপতির সাথে মন্ত্রিপরিষদের সম্পর্ক কি ধরনের হবে অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি সর্বদা মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী শাসন কাজ পরিচালনা করবেন না প্রয়োজন হলে নিজ ইচ্ছানুসারে শাসনকাজ পরিচালনা করবেন—এই বিষয়টি সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ছিল না। সংবিধানের ৭৪(১) ধারায় কেবলমাত্র বলা ছিল যে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করবার ও মন্ত্রণা দেবার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকবে, যার শীর্ষে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। অতএব রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদাকে কেন্দ্র করে সংবিধান বিশারদ ও আইনজ্ঞদের মধ্যে মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়।

অনেক সমালোচকের মতে যেহেতু সংবিধানের কোনও স্থানে একথা বলা ছিল না যে রাষ্ট্রপতি সর্বদা মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য অতএব তিনি তাঁদের পরামর্শ ব্যতীতও শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারেন। সুতরাং এই সকল সমালোচকগণ ভারতের রাষ্ট্রপতিকে নামসর্বস্ব শাসক প্রধানরূপে গণ্য করতে অস্বীকার করতেন। তাঁদের মতে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন হলে প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।

তবে অধিকাংশ আইনজ্ঞ ও সংবিধান বিশারদদের অভিমত ছিল এই যে রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধান। তিনি সর্বদা মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে চলতে বাধ্য। এই মতের সমর্থনকারীদের বক্তব্যও বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমত, সংবিধান পরিষদে বিতর্কের সময় রাষ্ট্রপতির সাথে মন্ত্রিপরিষদের সম্পর্কের বিষয়টি উত্থাপন করা হলে ডঃ আম্বেদকর সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে রাষ্ট্রপতির মর্যাদা হবে বৃটিশ রাজা বা রানীর মত। তিনি সর্বদা মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য থাকবেন। তাঁদের পরামর্শ উপেক্ষা করে বা তাঁদের পরামর্শ ব্যতীত তিনি কোনও কিছু করতে পারবেন না। দ্বিতীয়ত, ভারতের সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যের শাসকপ্রধান রাজ্যপাল কিছু স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ভোগ করেন যেগুলি তিনি মন্ত্রি পরিষদের পরামর্শ ছাড়াই প্রয়োগ করতে পারেন। রাষ্ট্রপতিকে এরূপ কোনও স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। অতএব এর থেকেও বলা যায় যে তিনি সর্বদা মন্ত্রীদের সাথে পরামর্শ করতে বাধ্য। তৃতীয়ত, ভারতের সুপ্রীম কোর্ট ও বিভিন্ন মামলায় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মন্ত্রীপরিষদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে যে অভিমত প্রকাশ করেন তার দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে রাষ্ট্রপতি সর্বক্ষেত্রে মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য। ১৯৫৫ সনে রাম-জবাইয়া কাপুর বনাম পাঞ্জাব মামলায় বলা হয়েছিল যে রাষ্ট্রপতিকে আনুষ্ঠানিক বা সাংবিধানিক শাসক প্রধান করা হয়েছে এবং প্রকৃত শাসন ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের ওপর ন্যস্ত। ১৯৭৪ সনে শ্যামসের সিং বনাম পাঞ্জাব মামলাতেও বলা হয় যে রাষ্ট্রপতি হলেন কেন্দ্রের সাংবিধানিক বা আনুষ্ঠানিক প্রধান এবং সংবিধান প্রদত্ত সমস্ত ক্ষমতা তিনি মন্ত্রিপরিষদের সাহায্য ও পরামর্শ অনুসারে প্রয়োগ করবেন।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদের সম্পর্কের বিষয়টি রাজনৈতিক বিতর্কের উর্ধ্বে রাখার জন্য সম্প্রতি ভারত সরকার সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছেন। সংবিধান (৪২তম সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ দ্বারা সংবিধানের ৭৪ (১) ধারা সংশোধনের ফলে বর্তমানে তা হল এরূপ : "রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করবার ও মন্ত্রণা দেবার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকবে, যার শীর্ষে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী, এবং রাষ্ট্রপতি, তাঁর দায়িত্বের প্রয়োগের ক্ষেত্রে, ঐরূপ পরামর্শ অনুসারে কাজ করবেন।" "ঐরূপ পরামর্শ অনুসারে কাজ করবেন"—এই অংশটি সংযোজন করার ফলে সমস্ত বিতর্কের অবসান ঘটেছে। অতএব সংবিধানের বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতে বাধ্য।

সংবিধান (৪৪ তম সংশোধন) আইন, ১৯৭৮ মাধ্যমে ৭৪ ধারায় একটি নতুন অংশ যোগ করে তাতে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদ প্রদত্ত কোনও পরামর্শকে, সাধারণভাবে বা অন্যথা, পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করতে পারেন। তবে এইরূপ পুনর্বিবেচনার পর প্রদত্ত পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কাজ করতে বাধ্য থাকবেন।

১০। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি (Vice President of India)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অনুকরণে ভারতের সংবিধানেও একটি উপরাষ্ট্রপতি পদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে শাসনব্যবস্থায় উপরাষ্ট্রপতির ভূমিকা খুব তাৎপর্যপূর্ণ নয়। রাষ্ট্রপতির পদ কোনও কারণে শূন্য হলে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতিরূপে কাজ করে থাকেন। সাধরণ সময়ে অর্থাৎ যখন

রাষ্ট্রপতি তাঁর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন তখন উপরাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের উচ্চকক্ষ অর্থাৎ রাজ্যসভায় পদাধিকার বলে (Ex-officio) সভাপতিত্ব করেন।

উপরাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি নির্বাচক সংস্থার (Electoral College) দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে গোপন ব্যালট দ্বারা ভোট দেওয়া হয়।

উপরাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে প্রার্থীকে (ক) ভারতীয় নাগরিক হতে হবে, (খ) ৩৫ বৎসর বয়স পূর্ণ হতে হবে এবং (গ) রাজ্যসভায় সদস্যরূপে নির্বাচিত হবার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। এইরূপ ব্যক্তি কেন্দ্র, রাজ্য বা স্থানীয় সরকারসমূহের অধীনে কোনও লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন না।

উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন সম্পর্কিত সকল সন্দেহ ও বিবাদ সম্পর্কে একমাত্র সুপ্রীম কোর্ট অনুসন্ধান ও মীমাংসা করতে পারে এবং ঐ কোর্টের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়।

উপরাষ্ট্রপতি তাঁর পদের কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ থেকে পাঁচবছর কাল পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন। তাঁকে পুনর্নির্বাচিত করার ক্ষেত্রেও কোন বাধা নেই। উপরাষ্ট্রপতি তাঁর কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে যে কোনও সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট তাঁর পদত্যাগ পেশ করতে পারেন। রাজ্যসভার তৎকালীন সদস্যদের অধিকাংশরা উপরাষ্ট্রপতিকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন। এই প্রস্তাব যদি লোকসভা কর্তৃক সমর্থিত হয় তবে উপরাষ্ট্রপতিকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করা যেতে পারে।

উপরাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রপতির পরবর্তী সর্বোচ্চ সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরূপে গণ্য করা হয়। ভারত সরকারের পদমর্যাদার তালিকা (Warrant of Precedence) অনুসারে উপরাষ্ট্রপতির স্থান দ্বিতীয়—অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির পরে এবং প্রধানমন্ত্রীর আগে।

উপরাষ্টপতির ভূমিকাকে তিন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, উপরাষ্ট্রপতির প্রধান কাজ তিনি পদাধিকারবলে রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন। রাজ্যসভার সভাপতিরূপে উপরাষ্ট্রপতি সাধারণত আইনসভার সভাপতিরা যে সব ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন তিনি সেই সব ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং কোনও সময়ে কোনও বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে তিনি একটি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করে বিষয়টির মীমাংসা করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতির পদটি পাঁচ বছরের কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের কারণে স্থায়ীভাবে শূন্য হলে নতুন রাষ্ট্রপতি তাঁর পদের কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতিরূপে কাজ করেন। এইভাবে তিনি সর্বাধিক ছ মাস পর্যন্ত রাষ্ট্রপতিরূপে কাজ করতে পারেন।

তৃতীয়ত, অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনও কারণে রাষ্ট্রপতি তাঁর কার্য সম্পাদন করতে অসমর্থ হলে উপরাষ্ট্রপতি যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি তাঁর নিজ কার্যভার পুনরায় গ্রহণ না করেন ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির কার্যসমূহ সম্পাদন করেন।

রাজ্যসভার সভাপতিরূপে উপরাষ্ট্রপতিকে বেতন প্রদান করা হয়। তবে তিনি যখন রাষ্ট্রপতিরূপে কাজ করেন তখন তাঁর বেতন ও ভাতা পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে স্থির করে দেয় এবং তখন তাঁকে রাজ্যসভায় সভাপতিরূপে কাজ করতে হয় না।

রাষ্ট্রপতি (দায়িত্ব পালন) আইন, ১৯৬৯ [The President (Discharge of functions Act, 1969)]

কখনও যদি এক সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি উভয়ের পদই শূন্য থাকে সে ক্ষেত্রে কে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন সে বিষয়ে সংবিধানে কিছু উল্লেখ করা নেই। এইজন্য ১৯৬৯ সনে পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতি (দায়িত্ব পালন) আইন [The President (Discharge of functions Act, 1969] পাশ করে। এই আইন অনুযায়ী যদি কোনও সময়ে যুগপৎ রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি উভয়ের পদই শূন্য থাকে সেক্ষেত্রে ভারতের প্রধান বিচারপতি বা তাঁর অনুপস্থিতিতে সুপ্রীমকোর্টের সর্বপুরাতন (Senior most) বিচারপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

১১। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ (Union Council Of Ministers)

ভারতে মন্ত্রিপরিষদ চালিত বা সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এরূপ শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ হল প্রকৃত শাসনকর্তৃপক্ষ এবং মন্ত্রিপরিষদ আইন সভার একটি অংশরূপে কাজ করে এবং তার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। ব্রিটেনে মন্ত্রীপরিষদ চালিত শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। ভারতের সংবিধানে মন্ত্রিপরিষদের গঠন ও দায়িত্ব সম্পর্কে কিছু বিধিনির্দেশ লিপিবদ্ধ থাকলেও অনেক বিষয়ে সংবিধানে সুস্পষ্টরূপে কোনও উল্লেখ নেই। সুতরাং মন্ত্রিপরিষদ সংক্রান্ত সংবিধানের ব্যবস্থাগুলি সংসদীয় সরকারের, বিশেষত এরূপ সরকারের জন্মভূমি বৃটেনে, যে সব রীতিনীতি প্রচলিত আছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে হয়।

ভারতের সংবিধানে বলা আছে যে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করার ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকবে যার শীর্ষে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, ঐরূপ পরামর্শে অনুসারে কাজ করবেন।

প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং অন্যান্য মন্ত্রিরা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এর অর্থ এই নয় যে রাষ্ট্রপতি তাঁর বিচারবুদ্ধি বা ইচ্ছা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করবেন। বাস্তবে দেখা যায় যে লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদল বা গোষ্ঠীর নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীরূপে নিয়োগ করেন। মন্ত্রিপরিষদের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার জন্য অন্যান্য মন্ত্রিদের নিয়োগের ব্যাপারেও প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য দেখা যায়। সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুসারে পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। যদি কোনও মন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে অসহযোগিতা করেন বা মন্ত্রিপরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি ঐ মন্ত্রিকে অপসারণ করতে পারেন। অতএব রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধানরূপে একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীদের আনুষ্ঠানিকভাবে অপসারণ করতে পারেন। সংবিধানে আরও বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি ভারত সরকারের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মন্ত্রীদের মধ্যে ঐ কাজ বিতরণ করবেন। সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলেও রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে মন্ত্রীদের মধ্যে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ভাগ করে দেন।

মন্ত্রিপরিষদের সাথে পার্লামেণ্টের একটি যোগসূত্র বজায় রাখতে হয় এবং মন্ত্রিপরিষদকে সর্বদা লোকসভার সমর্থন লাভ করতে হয়। এই কারণে সংবিধানে বলা হয়েছে যে কোনও ব্যক্তি মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হওয়ার পর ছমাসের মধ্যে যদি পার্লামেণ্টের কোনও কক্ষের সদস্য না হতে পারেন তবে ঐ সময়ের পর তিনি আর মন্ত্রী থাকতে পারবেন না। মন্ত্রিপরিষদ সমষ্টিগতভাবে লোকসভার কাছে দায়ী থাকে। এর অর্থ হল যদি কোনও সময় লোকসভায় মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা-সূচক প্রস্তাব পাশ করা হয় সেক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদকে পদত্যাগ করতে হবে।

সাধারণ অর্থে মন্ত্রিপরিষদ ও ক্যাবিনেট এই দুটি শব্দ এক অর্থে ব্যবহার করা হলেও এই

দুটি হল পৃথক সংস্থা। সংবিধানে একমাত্র জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত অংশ (১৮ ভাগ) ব্যতীত আর কোনও স্থানে ক্যাবিনেট এই শব্দটি প্রয়োগ করা হয় নি।

সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রীদের মধ্যে কোন বিভেদ করা না হলেও সমস্ত মন্ত্রীরা সমপর্যায়ভুক্ত নন। মন্ত্রিপরিষদে তিন ধরনের মন্ত্রী থাকেন—ক্যাবিনেট মন্ত্রী (Cabinet Ministers), রাষ্ট্র মন্ত্রী (Ministers of State) এবং সহমন্ত্রী (Deputy Ministers)। সরকারের কোনও গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের প্রধান দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রীকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী বলা হয়। এঁরা হলেন পূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন মন্ত্রী। রাষ্ট্রমন্ত্রীকে কোনও একটি দপ্তরের বা তার একটি অংশের দৈনন্দিন কাজকর্ম দেখাশুনা করার ভার দেওয়া হয়। উপমন্ত্রীদের কাজ হল মন্ত্রীদের কাজে সহায়তা করা। বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদে অবশ্য কোনও উপমন্ত্রী নেই।

ক্যাবিনেট মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী সকলকে নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে সরকারী নীতি নির্ধারণের জন্য কেবলমাত্র ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের নিয়ে ক্যাবিনেট গঠন করা হয়। অনেক সময় রাষ্ট্র মন্ত্রীদের ক্যাবিনেটের আলোচনায় যোগদান করার জন্য বিশেষভাবে আহবান জানানো হয়। তবে উপমন্ত্রীদের কখনও ক্যাবিনেটের বৈঠকে ডাকা হয় না। ক্যাবিনেটকে একটি ক্ষুদ্র অথচ প্রকৃত কার্যকর সংস্থারূপে গণ্য করা যেতে পারে।

মন্ত্রীপরিষদের মূল কাজ হল সরকারী নীতি নির্ধারণ ও ঐ নীতিগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য আইনের খসড়া প্রণয়ন, উচ্চপদ সমূহে নিয়োগ, প্রশাসনিক কর্মচারী বা আমলাদের প্রশাসন বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করা, আন্তঃদপ্তর বিরোধ নিষ্পত্তি ও সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

১২। প্রধানমন্ত্রী—পদমর্যাদা ও ক্ষমতা (**Prime Minister—Position and powers**)

ভারতের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হলেন নামসর্বস্ব বা নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধান। প্রকৃত শাসন ক্ষমতা প্রয়োগকারী সংস্থা হল মন্ত্রিপরিষদ। সংবিধানে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করবার ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকবে, যার শীর্ষে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী, এবং রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে ঐরূপ পরামর্শ অনুসারে কাজ করবেন। প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত। মন্ত্রিপরিষদের শীর্ষে তাঁর অবস্থান অর্থাৎ তিনিই প্রকৃত মুখ্য নির্বাহিক (Real chief executive)

ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের নেতৃত্ব প্রদান করেন, তিনি লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, তিনি রাষ্ট্রপতির প্রধান উপদেষ্টা এবং তিনি হলেন জাতির অবিসংবাদী নেতা।

সংবিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা দলগোষ্ঠীর নেতাকে রাষ্ট্রপতি সর্বদা প্রধানমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীকে দ্বৈত নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁর পদ লাভ করতে হয়। প্রথমত, তাঁকে ভারতের যে কোনও নির্বাচনী এলাকা থেকে লোকসভার সদস্যরূপে নির্বাচিত হতে হয়। দ্বিতীয়ত, তাঁকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা গোষ্ঠীর নেতা হিসাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হতে হয়। অতঃপর রাষ্ট্রপতি তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী রূপে নিয়োগ করেন।

ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকাকে কয়েকটি দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

১। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সম্পর্ক—প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির প্রধান উপদেষ্টারূপে কাজ করেন। প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করতে

হয়। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ীই কোনও মন্ত্রীকে অপসারণ করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমেই রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন মন্ত্রীদের মধ্যে সরকারী দপ্তরগুলি বিতরণ করেন। এছাড়া সংবিধানের ৭৮ ধারায় রাষ্ট্রপতির নিকট প্রধানমন্ত্রীর তিনটি কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য হল : প্রথমত, কেন্দ্রের কার্যাবলী পরিচালনা সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদের সকল সিদ্ধান্ত ও আইন প্রণয়নের প্রস্তাবসমূহ রাষ্ট্রপতিকে জানানো। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রের কার্যাবলী পরিচালনা সংক্রান্ত ও আইন প্রণয়নের প্রস্তাবসমূহ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি যে তথ্য জানতে চান সেগুলি সরবরাহ করা। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনীয় বলে মনে করলে, যে বিষয়ে কোনও মন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, অথচ যা মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক বিবেচিত হয় নি, তা ঐ পরিষদের বিবেচনার জন্য পেশ করা। এইভাবে দেখা যায় যে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে প্রধান যোগসূত্ররূপে কাজ করেন।

২। মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক—মন্ত্রিপরিষদের নেতৃত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিপরিষদের গঠন থেকে শুরু করে এর সমাপ্তির কাল পর্যন্ত এর সাফল্য নির্ভর করে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের ওপর। মন্ত্রীদের নিয়োগ, অপসারণ, তাঁদের মধ্যে দপ্তর বন্টন ও প্রয়োজন হলে দপ্তরগুলি পুনর্বিন্যাস করা—এই সব কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতি সম্পাদন করলেও এই সব ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে চলতে বাধ্য থাকেন। মন্ত্রিপরিষদের ঐক্য ও সংহতি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে রক্ষা করা সম্ভব।

মন্ত্রিপরিষদের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন ও মন্ত্রীদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটলে প্রধানমন্ত্রীই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মতানৈক্য দূর করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর নিজের দপ্তর পরিচালনা করা ব্যতীত সমগ্র শাসনব্যবস্থার তদারক করেন। তিনিই সরকারের সমস্ত দপ্তরগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রীকে অনেক সময় সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম বলে গণ্য করা হয়। তবে মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য সদস্যগণ তাঁর সমপদস্থ সহকর্মী হলেও প্রধানমন্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। তাঁকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হয় এবং তিনি পদত্যাগ করলে বা তাঁর মৃত্যু ঘটলে সামগ্রিকভাবে মন্ত্রিপরিষদের পতন ঘটে।

৩। পার্লামেন্টের সঙ্গে সম্পর্ক—প্রধানমন্ত্রী হলেন লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। তাঁর নির্দেশ অনুসারেই প্রধানত লোকসভার সমস্ত কার্যধারা পরিচালিত হয়। লোকসভার কর্মসূচীও তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন। সংবিধানে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা না থাকলেও ভারতে সাধারণভাবে একটা প্রথাগত বিধান গড়ে উঠেছে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতারূপে প্রধানমন্ত্রী লোকসভার সদস্য হবেন। তিনি লোকসভার সদস্য হলেও রাজ্যসভার অধিবেশনেও যোগদান ও অংশগ্রহণ করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী সমগ্রভাবে মন্ত্রিপরিষদে কার্যক্রমের অধিকর্তা হিসাবে পার্লামেন্টে দলীয় নীতি সমর্থন করেন। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি দলীয় নীতি পার্লামেন্টে ব্যাখ্যা করেন। পার্লামেন্টের বিভিন্ন কমিটির সদস্য-নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। সরকার অনুসৃত কোনও নীতি লোকসভায় সমর্থন লাভ না করলে প্রধানমন্ত্রীকে সমগ্র মন্ত্রিপরিষদসহ পদত্যাগ করতে হয়। মন্ত্রিপরিষদ যদি লোকসভায় তার সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত না হয় তবে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে লোকসভা ভেঙে দিয়ে পুনর্নির্বাচনের আদেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারেন। বিরোধী দলের নেতাদের সাথে যোগসূত্র রক্ষা করাও প্রধানমন্ত্রীর

একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিরোধীদলগুলির সহযোগিতা পাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে তাঁদের সঙ্গে হৃদ্যতামূলক সম্পর্ক রাখার জন্য সচেষ্ট থাকতে হয়।

দলীয় নেতারূপে প্রধানমন্ত্রী— প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে যে বিশাল ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী তার মূল উৎস হল তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতৃত্ব। প্রধানমন্ত্রীর নিজ দল সম্পর্কেও কতকগুলি কর্তব্য থাকে। নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য তাঁকে দলের নীতি ও কার্যক্রমকে এরূপভাবে পরিচালিত করতে হয় যাতে দলীয় নীতি জনপ্রিয় হয়ে জনসমর্থন লাভ করতে পারে। নির্বাচনের পরেও দলীয় নীতি ও কার্যক্রম দ্বারা জনমতকে অনুকূলে রাখা প্রধানমন্ত্রীর একটি কর্তব্য। এই কারণে তাঁকে দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতি এবং বেতার ও দূরদর্শনে বক্তৃতার মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযোগ রাখার চেষ্টা করতে হয়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি বিশ্লেষণ করে সহজেই অনুমান করা যায় যে প্রধানমন্ত্রীর পদাধিকারী ব্যক্তির অসীম যোগ্যতা ও কর্মকুশলতা থাকা একান্ত আবশ্যক। প্রধানমন্ত্রীর বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা, সহনশীলতা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতার ওপর সরকারের সাফল্য যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকার ফলে রাজ্যগুলির দিকেও—বিশেষত যে সব রাষ্ট্রে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল সরকার গঠন করতে পারে নি—প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি রাখতে হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর যোগ্যতার ওপর যে শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ শাসনকার্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে তা নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রীকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়।

ভারতে প্রকৃত শাসনক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের ওপর ন্যস্ত থাকলেও ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন যে অনেকে ভারতের শাসনব্যবস্থাকে মন্ত্রিপরিষদ চালিত শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী চালিত শাসনব্যবস্থা (Prime Ministerial Government) বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। আবার অনেকে মনে করেন যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর পদটি ক্রমশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পদের ন্যায় হয়ে যাচ্ছে। তাঁদের মতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় আইনসভার মাধ্যমে জনগণের নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের সমর্থনের পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ন্যায় তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টার সহায়তায় নিজ দায়িত্বে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকেন। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে এই প্রবণতা অধিক প্রকট হয়ে উঠে। এই প্রবণতাকে 'প্রধানমন্ত্রী পদের রাষ্ট্রপতিকরণ' (Presidentialisation of Prime Minister's Office) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রধানত তিন দিক দিয়ে এই প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় : প্রথমত, বর্তমানে ভারতে লোকসভার সাধারণ নির্বাচন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ন্যায় মূলত প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী বা প্রার্থীদের কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ন্যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী অনেক ক্ষেত্রেই মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে পরামর্শ না করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তৃতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী অনেক সময় আমলাদের সহায়তায় তাঁর সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করে থাকেন।

তবে এরূপ বিশাল ও বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হলেও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে স্বৈরাচারী হওয়া বিপজ্জনক। কারণ তিনি হলেন জনসাধারণের প্রতিনিধি। অতএব লোকসভার সমর্থন অপেক্ষা জনসাধারণের সমর্থনের ওপর মন্ত্রিপরিষদসহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যকালের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। তাঁর নির্ধারিত কার্যকাল হল পাঁচবছর। এই সময়ের পর তাঁকে এবং তাঁর দলকে পুনরায় জনসাধারণের সমর্থন লাভের জন্য চেষ্টা করতে হয়। প্রধানমন্ত্রী যদি যথেচ্ছভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তবে পরবর্তী নির্বাচনে জনসমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়ে দলসহ তাঁর প্রাধান্যের অবসান ঘটবে।

১৩। ভারতে কেন্দ্রীয় আইনসভা (Union Legislature in India)

ভারতে কেন্দ্রীয় আইনসভা পার্লামেণ্ট (Parliament) বা সংসদ নামে পরিচিত। রাষ্ট্রপতি ও দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট একটি আইনসভা নিয়ে পার্লামেণ্ট গঠিত। আইনসভার উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ যথাক্রমে রাজ্যসভা (Council of States) এবং লোকসভা (House of the People) নামে পরিচিত। কক্ষদুটির নামকরণ থেকেই তাদের গঠন প্রতিফলিত হয়। রাজ্যসভা প্রধানত রাজ্য বিধানসভাসমূহ দ্বারা নির্বাচিত রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। লোকসভা আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাগুলি থেকে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। যদিও রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের কোনও কক্ষের সদস্য নন কিন্তু যেহেতু তিনি পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান ও মুলতুবী রাখতে পারেন, লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন, পার্লামেণ্টে অভিভাষণ দান ও বার্তা প্রেরণ করতে পারেন এবং যেহেতু তাঁর স্বাক্ষরের পর পার্লামেণ্ট গৃহীত যে কোনও বিল সিদ্ধ হয় সেই কারণে তাঁকে পার্লামেণ্টের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে গণ্য করা হয়।

১৪। রাজ্যসভার গঠন (Composition of the Rajya Sabha)

রাজ্যসভা হল পার্লামেণ্টের দ্বিতীয় কক্ষ। এই কক্ষের নাম থেকেই ধারণা করা যায় যে রাজ্যগুলিকে রাজ্যরূপে প্রতিনিধিত্ব প্রদান করাই হল এর উদ্দেশ্য, যদিও এই কক্ষ রাজ্যগুলিকে সমভাবে প্রতিনিধিত্ব প্রদান করে না। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির অনধিক ২৩৮ জন প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত ১২ জন সদস্য নিয়ে রাজ্যসভা গঠিত হয়। রাজ্যসভায় প্রত্যেক রাজ্যের প্রতিনিধিগণ ঐ রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। রাজ্যের জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রত্যেক রাজ্যকে রাজ্যসভায় একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন দেওয়া হয়। এই কারণে রাজ্যসভায় রাজ্যগুলির আসনের সংখ্যা সর্বনিম্ন ১ (যেমন, নাগাল্যাণ্ড) থেকে সর্বোচ্চ ৩৪ (উত্তর প্রদেশ) পর্যন্ত হয়ে থাকে। অনেক সমালোচক বলেন যে জনসংখ্যা ও আয়তন নির্বিশেষে প্রত্যেক রাজ্য থেকে রাজ্যসভায় সমসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। রাজ্যসভায় নির্বাচিত হতে হলে কোনও প্রার্থীকে (১) ভারতীয় নাগরিক হতে হবে ; (২) অন্যূন ৩০ বৎসর বয়স্ক হবে ও (৩) যে রাজ্য থেকে তিনি নির্বাচিত হবেন সেই রাজ্যের কোনও সংসদীয় নির্বাচন এলাকায় তিনি নির্বাচক হবেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা এবং সমাজসেবা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান বা বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে এরূপ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ১২ জনকে রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভায় মনোনয়ন করেন।

রাজ্যসভা একটি স্থায়ী কক্ষ। লোকসভার মত একে ভেঙে দেওয়া যায় না। প্রতি ২ বছর অন্তর এর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁদের পরিবর্তে নতুন সদস্য নির্বাচিত হন। রাজ্যসভার নির্বাচিত ও মনোনীত সকল সদস্যদের কার্যকাল হল ৬ বৎসর।

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন। তবে উপরাষ্ট্রপতি যখন রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন তখন তিনি রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করতে পারেন না। উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সদস্য না হলেও তিনি রাজ্যসভার কাজ পরিচালনার জন্য লোকসভার সভাপতির মত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। রাজ্যসভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে উপসভাপতিরূপে নির্বাচিত করেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপসভাপতি রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন।

১৫। লোকসভার গঠন (Composition of the House of the People)

ভারতের পার্লামেণ্টের নিম্ন বা জনপ্রিয় কক্ষ হল লোকসভা। সংবিধান অনুযায়ী লোকসভা

এইভাবে গঠিত হয় : প্রথমত, বিভিন্ন রাজ্যের স্থানীয় নির্বাচন এলাকসমূহ থেকে ২১ বছর বয়সের কম নয় এরূপ ব্যক্তিদের দ্বারা সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনধিক ৫২৫ জনকে নির্বাচিত করা হয়। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকেও সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ২০ জনকে নির্বাচিত করা হয়। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে লোকসভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব পর্যাপ্ত নয়, তা হলে তিনি ঐ সম্প্রদায়ের দুজন সদস্যকে লোকসভায় মনোনীত করতে পারেন। লোকসভায় তপসিলী জাতি ও তপসিলী উপজাতিদের জন্যও আসন সংরক্ষণ রাখা হয়। তবে সংবিধানে বলা আছে যে লোকসভার তপসিলী জাতি ও তপসিলী উপজাতিদের সংরক্ষণ ও ইঙ্গভারতীয় সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে ব্যবস্থাসমূহ সংবিধান প্রচলিত হওয়ার ৪০ বছর পরে আর থাকবে না। লোকসভায় প্রার্থী হতে হলে কোনও ব্যক্তিকে (ক) ভারতীয় নাগরিক হতে হবে, (খ) অন্যূন ২৫ বছর বয়স্ক হতে হবে। পার্লামেন্ট প্রণীত নির্বাচনী আইন অনুসারে এরূপ কোনও ব্যক্তি ভারতের যে কোনও রাজ্যের যে কোনও লোকসভার নির্বাচন এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।

লোকসভার সাধারণ মেয়াদ বা কার্যকাল হল ৫ বৎসর। প্রথম অধিবেশনের তারিখ থেকে এই ৫ বছর সময় গণনা করা হয়। তবে নির্দিষ্ট কার্যকালের মধ্যে রাষ্ট্রপতি যে কোনও সময় লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন। তবে জরুরী অবস্থার ঘোষণা বলবৎ থাকা কালে লোকসভার ৫ বছরের কার্যকাল শেষ হয়ে গেলে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে একবারে এক বছরের অনধিক সময় সীমার জন্য মেয়াদ বাড়াতে পারেন। তবে জরুরী অবস্থা শেষ হওয়ার পর ৬ মাসের মধ্যেই নির্বাচন করে নতুন লোকসভা গঠন করতে হয়। নবনির্বাচিত লোকসভা সদস্যেরা, যথাসম্ভব শীঘ্র, দুজন সদস্যকে যথাক্রমে অধ্যক্ষ (Speaker) ও উপাধ্যক্ষ (Deputy Speaker) পদে নির্বাচন করেন।

১৬ । পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী (Powers and functions of Parliament)

ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত পার্লামেন্টের ক্ষমতাসমূহকে ভাগ করে নিম্নলিখিত শীর্ষকে আলোচনা করা যেতে পারে :

(১) আইন প্রণয়ন (Legislation)— সমস্ত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের সম্মতি আবশ্যক। ভারতের সংবিধান অনুসারে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা পার্লামেন্ট ও রাজ্য আইনসভাসমূহের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির ওপর পার্লামেন্ট একাকী আইন প্রণয়ন করতে পারে। সংবিধানে অনুল্লেখিত বিষয়গুলির ওপর পার্লামেন্টই একমাত্র আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অধিকারী। যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির ওপরও পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করতে পারে। এছাড়া সাধারণ অবস্থায় দুই বা ততোধিক রাজ্যের অনুরোধে, কোনও আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সন্ধিকে কার্যকর করার জন্য অথবা জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজ্যসভায় গৃহীত কোনও প্রস্তাব অনুযায়ী পার্লামেন্ট রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ের ওপর আইন প্রণয়ন করতে পারে। জরুরী অবস্থার ঘোষণার সময়েও পার্লামেন্ট রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে থাকে। কোনও রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার দরুন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হলে ঐ রাজ্যের আইনসভাকে ভেঙে দেওয়া হয়। ফলে পার্লামেন্ট ঐ রাজ্যের আইনসভার পরিবর্তে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির ওপর আইন প্রণয়ন করে।

রাষ্ট্রপতির আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্থাৎ পার্লামেন্ট যখন অধিবেশনে না থাকে ঐ সময়ে অর্ডিন্যান্স (Ordinance) জারী করার ক্ষমতাকে পার্লামেন্ট পুনর্বিবেচনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। পার্লামেন্টের পুনঃ সমাবেশের পর ৬ সপ্তাহের মধ্যে যদি ঐগুলিকে পার্লামেন্ট অনুমোদন না করে

তবে ঐগুলি বাতিল হয়ে যায়।

(২) অর্থসংক্রান্ত (Financial)—পার্লামেন্ট প্রণীত কোনও আইনের অনুমোদন ভিন্ন কোনও কর ধার্য বা সংগ্রহ করা যায় না। অনুরূপভাবে আইনের অনুমোদন ব্যতীত কোনও ব্যয় করা যায় না। সমস্ত অর্থবিষয়ক প্রস্তাবসমূহ রাষ্ট্রপতির অনুমতিক্রমে লোকসভায় উত্থাপন করা হয়। সমস্ত অনুদান, ব্যয়বরাদ্দ ও প্রস্তাবিত কর সংক্রান্ত বিল লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়। অর্থসংক্রান্ত কোন প্রস্তাব রাজ্যসভায় উত্থাপন করা যায় না।

(৩) শাসন বিভাগের মনোনয়ন ও নিয়ন্ত্রণ (The Choice and Control of the Executive)—পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যরা রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের জন্য গঠিত নির্বাচন সংস্থার অংশ গণ্য হন। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনের নির্বাচন সংস্থা গঠন করা হয়।

সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগে পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতিকে মহাভিযোগ পদ্ধতিতে অপসারণ করতে পারে। উপরাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে রাজ্যসভায় গৃহীত কোনও প্রস্তাব যদি লোকসভা কর্তৃক সমর্থিত হয় তবে তাঁকে অপসারণ করা যেতে পারে।

মন্ত্রিপরিষদ সমষ্টিগতভাবে লোকসভার নিকট দায়ী থাকে। মন্ত্রিপরিষদ আনীত কোনও আইনের প্রস্তাব বা বাজেট পাশ না করে অথবা মন্ত্রিপরিষদ গৃহীত কোনও নীতি অগ্রাহ্য করে বা মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাশ করে পার্লামেন্ট মন্ত্রিপরিষদকে পদত্যাগ করাতে বাধ্য করতে পারে। মন্ত্রিপরিষদকে সমষ্টিগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করার মুখ্য দায়িত্বও কেবলমাত্র লোকসভাকে প্রদান করা হয়েছে—এ বিষয়ে রাজ্যসভার কোনও ভূমিকা নেই।

(৪) জাতীয় সমস্যাদি সম্পর্কে বিতর্ক (Debating of public questions)— যে কোনও জাতীয় সমস্যা বা প্রশ্ন নিয়ে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে আলোচনা হতে পারে। এই কারণে সংবিধানে এবং পার্লামেন্ট প্রণীত নিয়মাবলীতে উল্লেখিত নিয়ন্ত্রণবিধির অনুগত থেকেও পার্লামেন্টের সদস্যরা পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে অবাধ বাক্ স্বাধীনতা ভোগ করেন। রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে যে উদ্বোধনী ও বাৎসরিক অভিভাষণ প্রদান করেন তার পরিপ্রেক্ষিতে পার্লামেন্টে সরকারী নীতি সম্পর্কে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। কোনও আনুমানিক অর্থব্যয় বরাদ্দের হিসাব,, ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর, অর্থবিল বা অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব প্রসঙ্গে পার্লামেন্ট সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করতে পারে।

(৫) জরুরী অবস্থায় প্রযোজ্য ক্ষমতা (Powers in Emergencies)—জরুরী অবস্থার ঘোষণা, রাজ্যে অচলাবস্থার দরুন জরুরী অবস্থা বা অর্থ সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা প্রভৃতি যে কোনও ধরনের জরুরী অবস্থার ঘোষণা করেন রাষ্ট্রপতি। কিন্তু পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুমোদন না করলে জরুরী অবস্থার ঘোষণাদেশ বাতিল হয়ে যায়। জরুরী অবস্থার ঘোষণা জারী করার পর ১ মাসের মধ্যে এবং অন্য দুইপ্রকার জরুরী অবস্থা জারী করার পর ২ মাসের মধ্যে তাদের পার্লামেন্টের দুটি কক্ষ দ্বারা অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হয়। জরুরী অবস্থা চলাকালে পার্লামেন্ট রাজ্য তালিকাভুক্ত যে কোনও বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার জন্য জরুরী অবস্থা জারী থাকাকালীনও পার্লামেন্ট ঐ রাজ্যের জন্য রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। জরুরী অবস্থার ঘোষণা চলাকালে লোকসভার এক-দশমাংশ সদস্য জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করার বিষয় বিবেচনার জন্য রাষ্ট্রপতি বা স্পীকারকে লিখিতভাবে তাঁদের অভিপ্রায় জানাতে পারেন। এরূপ অভিপ্রায় লোকসভার বিশেষ বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়।

(৬) সংবিধান সংশোধন (Amendment of the Constitution)— সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব একমাত্র পার্লামেণ্টে উত্থাপন করা যায়। পার্লামেণ্ট তার সংবিধান সংশোধন ক্ষমতা প্রয়োগ করে সংবিধানের যে কোনও অংশ পরিবর্তন, সংযোজন বা বাতিল করতে পারে। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষকে সমান ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

(৭) বিবিধ ক্ষমতা (Miscellaneous powers)— পার্লামেণ্টের অন্যান্য ক্ষমতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল এইরূপ :

(ক) সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্টের কোনও বিচারপতির বিরুদ্ধে প্রমাণিত অসদাচরণ বা অযোগ্যতার কোনও অভিযোগ থাকলে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থনের ভিত্তিতে তাঁদের অপসারণের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা যায়।

(খ) বিচারপতিদের অপসারণের মত একই পদ্ধতি অবলম্বন করে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার ও ভারতের কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলকে অপসারণের জন্য পার্লামেণ্টে প্রস্তাব গ্রহণ করা যায়।

(গ) কেন্দ্রীয় সরকারী চাকরী কৃত্যক, কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল, তপসিলী জাতি ও তপসিলী উপজাতি কমিশনারের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং অর্থকমিশনের প্রতিবেদন আলোচনা ও বিবেচনা করার জন্য রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে পেশ করেন।

(ঘ) পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করে কোনও নতুন রাজ্য স্থাপন করতে পারে ও কোনও রাজ্যের আয়তন বা সীমানা হ্রাসবৃদ্ধি, নাম পরিবর্তন ইত্যাদি করতে পারে।

(ঙ) রাজ্যসভা উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থনের ভিত্তিতে কোনও প্রস্তাব পাশ করে জাতীয় স্বার্থে সাময়িক কালের জন্য পার্লামেণ্টকে রাজ্য তালিকাভুক্ত কোনও বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে।

(চ) রাজ্যসভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থনের ভিত্তিতে কোনও প্রস্তাব পাশ করে নতুন সর্বভারতীয় সরকারী কৃত্যক সৃষ্টির বিষয় বলা হলে পার্লামেণ্ট নতুন সর্বভারতীয় কৃত্যক প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

(ছ) রাজ্য বিধানসভাগুলির প্রস্তাব অনুসারে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করে রাজ্য আইন সভায় দ্বিতীয় কক্ষ সৃষ্টি বা বিলোপসাধন করতে পারে।

১৭। পার্লামেণ্টের দুটি কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between the two Houses of Parliament)

ভারতের পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতি ও একটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা নিয়ে গঠিত। যেহেতু ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় সেইহেতু সংবিধান রচয়িতারা জনগণের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিত্ব ও অঞ্চলগুলির প্রতিনিধিত্বের মধ্যে সমতারক্ষার উদ্দেশ্যে দুটি কক্ষ স্থাপন সম্পর্কে প্রায় একমত ছিলেন। লোকসভার সদস্যগণ সাধারণভাবে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। অন্যদিকে রাজ্যসভা প্রধানত রাজ্য আইনসভাগুলির দ্বারা নির্বাচিত রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়।

পার্লামেণ্টের দুটি কক্ষের মধ্যে সহযোগিতা ও সুষ্ঠু সম্পর্ক ছাড়া পার্লামেণ্টের কার্যকলাপ পরিচালনা করা অসম্ভব। সংবিধান অনুযায়ী পার্লামেণ্টের যে কোনও দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে দুটি কক্ষকে বিচার বিবেচনা করতে হয়। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে সংবিধানে রাজ্যসভাকে কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যেগুলি রাজ্যসভা একাকী এবং লোকসভাকে বাদ দিয়ে প্রয়োগ করতে

পারে। অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে উভয় কক্ষকে সমান ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

সংবিধান অনুসারে কতকগুলি ক্ষেত্রে রাজ্যসভা অপেক্ষা লোকসভা অধিক ক্ষমতা ভোগ করে প্রথমত, সাধারণ বিল পার্লামেণ্টের যে কোনও কক্ষে উত্থাপন করা যেতে পারে। ঐরূপ বিল এ কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর অন্য কক্ষে প্রেরণ করলে (ক) অন্য কক্ষ তা বাতিল করতে পারে (খ) অন্য কক্ষ ঐ বিলে সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করতে পারে এবং এই সংশোধনী প্রস্তাব যে কক্ষে বিলটি প্রথম গৃহীত হয়েছিল সেই কক্ষ গ্রহণ নাও করতে পারে, (গ) অন্য কক্ষ ৬ মাসের মধ্যে কোনও অভিমত নাও জানাতে পারে। এইভাবে কোনও সাধারণ বিলকে কেন্দ্র করে যদি পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের মধ্যে কোনও মতবিরোধ দেখা দেয় তবে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের একটি যৌথ অধিবেশন আহ্বান করেন। যৌথ অধিবেশনে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যেহেতু লোকসভার সদস্যসংখ্যা রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ সুতরাং যৌথ অধিবেশনে লোকসভার জয় সাধারণভাবে অনিবার্য। অতএব সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের দটি কক্ষকে সমান ক্ষমতা প্রদান করা হলেও তাদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দিলে চূড়ান্ত পর্যায়ে লোকসভার প্রাধান্য সুনিশ্চিত। দ্বিতীয়ত, অর্থবিল কেবলমাত্র লোকসভায় উত্থাপন করা যায়। লোকসভায় গৃহীত কোনও অর্থবিল সম্পর্কে ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভাকে অভিমত জানাতে হয়। রাজ্যসভা অর্থবিল অগ্রাহ্য করতে পারে বা তার ওপর সংশোধনী প্রস্তাব করতে পারে। কিন্তু লোকসভা ঐরূপসংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে না এবং ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভার কাছ থেকে কোনও অভিমত না পেলেও, ঐ বিল তার দ্বারা যে আকারে গৃহীত হয়েছিল সেই আকারে উভয় কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে পরিগণিত হয়। অর্থবিলের ক্ষেত্রে রাজ্যসভা প্রদত্ত সংশোধনী প্রস্তাব লোকসভা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে না। সুতরাং বলা যায় যে অর্থবিলের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা দেওয়া হয়েছে লোকসভাকে এবং এ বিষয়ে রাজ্যসভা উপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করে মাত্র।

তৃতীয়ত, মন্ত্রিপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রধান দায়িত্বও লোকসভার ওপর ন্যস্ত। সংবিধান অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ সমষ্টিগতভাবে লোকসভার কাছে দায়ী থাকে। লোকসভায় মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাশ করে মন্ত্রিপরিষদকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা যায়। রাজ্যসভায় প্রশ্ন, সমালোচনা, মুলতুবী প্রস্তাব ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও মন্ত্রিপরিষদ বা প্রকৃত শাসনকর্তৃপক্ষ তার কাজের জন্য কেবলমাত্র লোকসভার কাছেই দায়ী থাকে।

লোকসভার সদস্যগণ জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। এই কারণে অর্থবিল ও মন্ত্রিপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে এই কক্ষকে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার ব্যাপারটি অবশ্যই সমর্থনযোগ্য।

নিম্নলিখিত কয়েকটি ক্ষেত্রে লোকসভা অপেক্ষা রাজ্যসভাকে অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে :

প্রথমত, রাজ্যসভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থনে একটি প্রস্তাব পাশ করে ঘোষণা করা যেতে পারে যে জাতীয় স্বার্থে পার্লামেণ্টের রাজ্য তালিকাভুক্ত কোনও বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এরূপ ঘোষণার দ্বারা রাজ্যের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার ওপর হস্তক্ষেপ করা হয় বলে এই বিষয়টি রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত রাজ্যসভায় উত্থাপন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, রাজ্যসভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থনে প্রস্তাব পাশ করা হলে নতুন সর্বভারতীয় সরকারী কৃত্যক সৃষ্টি সম্পর্কে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করতে পারে। সর্বভারতীয় সরকারী কৃত্যক সৃষ্টির ফলেও রাজ্যগুলির ক্ষমতা প্রভাবিত হয় বলে এই বিষয়টি সম্পর্কেও প্রথমে

রাজ্যসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

তৃতীয়ত, উপরাষ্ট্রপতিকে অপসারণের জন্য প্রস্তাব প্রথমে রাজ্যসভায় উত্থাপন ও গ্রহণ করা হয়। উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভায় সভাপতিরূপে কাজ করেন। এই জন্য তাঁর অপসারণের প্রস্তাব এই কক্ষে প্রথম উত্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চতুর্থত, সংবিধান সংশোধন, রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন, রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ, হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ, বিভিন্ন কমিশনের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা, যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আলোচনা করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ সমান ক্ষমতা ভোগ করে।

পরিশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের আপেক্ষিক পদমর্যাদা সম্পর্কে একসময় রাজ্যসভায় আলোচনা প্রসঙ্গে রাজ্যসভার সভাপতি যে উক্তি করেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে "সংবিধান অনুসারে কোনও কক্ষেরই অন্য কক্ষের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্ন ওঠে না। বিষয়টি তর্কাতীত" (Under the Constitution there was no question of any superiority of one House over the other. It was incontrovertible)।

১৮। পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন পদ্ধতি (Process of Legislation in Parliament)

যে সব বিলগুলি সংবিধানে প্রদত্ত অর্থবিলের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না সেগুলিকে সাধারণ বিল রূপে গণ্য করা যেতে পারে। সাধারণ বিল পার্লামেন্টের যে কোনও কক্ষে উত্থাপন করা যেতে পারে। কোনও সাধারণ বিল বিনা সংশোধনে অথবা উভয় কক্ষ যা স্বীকার করে নিয়েছে কেবল সেরূপ সংশোধন সহ উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের দ্বারা অনুমোদিত হলে তা পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

পার্লামেন্টে বিবেচনাধীন কোনও বিল উভয় কক্ষের অধিবেশন স্থগিত থাকার জন্য তামাদি হয়ে যায় না। রাজ্যসভার বিবেচনাধীন কোনও বিল যা লোকসভায় গৃহীত হয় নি তা লোকসভা ভেঙে গেলে তামাদি হবে না। তবে যে বিল লোকসভার বিবেচনাধীন অথবা লোকসভা কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর রাজ্যসভার বিবেচনাধীন, তা লোকসভা ভেঙে গেলে তামাদি হয়ে যাবে।

পার্লামেন্টে উভয় কক্ষেই আইন প্রণয়ন পদ্ধতি একই ধরনের। যে কোনও সাধারণ বিলকে আইনে পরিণত হতে হলে উভয় কক্ষেই কতকগুলি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। (১) বিলটি উত্থাপন ও সরকারী গেজেটে প্রকাশ করাকে প্রথম পাঠ (FirstReading) বলা হয়। (২) বিলটির সাধারণ নীতি আলোচনাকে দ্বিতীয় পাঠ (Second Reading) বলা হয়। (৩) বিলটিকে কোনও কমিটিতে বিবেচনার জন্য পাঠানো যেতে পারে। এই পর্যায়কে কমিটি পর্যায় বলে। (৪) কমিটি পর্যায়ের পর রিপোর্ট পর্যায়ে বিলটি বিচার বিবেচনার জন্য সভায় গ্রহণ করা হোক, বিলটি কোনও কমিটিতে প্রেরণ করা হোক বা জনমত গ্রহণের জন্য বিলটি প্রচার করা হোক—এই তিনটির যে কোনও একটি প্রস্তাব নেওয়া যেতে পারে। (৫) এরপর বিবেচনা পর্যায়ে বিলটির প্রতিটি ধারা ও উপধারা আলোচনা করা হয় ও বিলটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়। (৬) এরপর তৃতীয় পাঠে (Third Reading) বিলটিকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করা হবে না বর্জন করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পার্লামেন্টের একটি কক্ষে বিলটি গৃহীত হওয়ার পর সেটিকে অন্য কক্ষে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। অন্য কক্ষেও বিলটিকে প্রারম্ভিক কক্ষের মত কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। অন্য কক্ষ ঐ বিলটি সম্পর্কে তিন ধরনের বিকল্প ব্যবস্থার যে কোনও একটি অবলম্বন করতে

পারে : ১। বিলটিকে প্রত্যাখান করতে পারে, ২। বিলটির ওপর সংশোধনী প্রস্তাব করতে পারে। এইরূপ সংশোধনী প্রস্তাব প্রারম্ভিক কক্ষ মেনে নিলে কোনও অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। কিন্তু প্রারম্ভিক কক্ষ ঐরূপ সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ না করলে উভয় কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ৩। অন্য কক্ষ বিলটি সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে তা আটকে রাখতে পারে। তবে সংবিধানে বলা আছে যে এক কক্ষ প্রেরিত কোনও বিল অন্য কক্ষ ৬ মাসের অধিককাল আটক রাখতে পারবে না।

কোনও সাধারণ বিল এক কক্ষের দ্বারা গৃহীত ও অন্য কক্ষে প্রেরিত হওয়ার পর যদি—(১) অন্য কক্ষ ঐ বিল অগ্রাহ্য করে, (২) ঐ বিলে যে সংশোধন প্রস্তাবিত হয় সে বিষয়ে দুটি কক্ষের মধ্যে চূড়ান্তভাবে মতানৈক্য ঘটে অথবা (৩) অন্য কক্ষ বিলটি পাওয়ার তারিখ থেকে ৬ মাসের অধিককালের মধ্যে ঐ বিলটি সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে তবে ঐ বিলটি সম্পর্কে পর্যালোচনার মাধ্যমে উভয় কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ দূর করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের যৌথ বৈঠক (Joint sitting of both the Houses of Parliament) আহ্বান করেন। যৌথ বৈঠকে লোকসভার সভাপতি সভাপতিত্ব করেন। যদি যৌথ বৈঠকে কোনও সংশোধন ব্যতীত বিলটি উভয় কক্ষের যে সব সদস্য উপস্থিত থাকেন ও ভোট দেন তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা গৃহীত হয়, তা হলে ঐ বিল পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে। সুতরাং এই পদ্ধতি অনুসারে সাধারণ বিল পাশের ক্ষেত্রে লোকসভাকে শেষ পর্যায়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে রাজ্যসভা বড়জোর বিলটিকে পাশ করার ক্ষেত্রে ৬ মাস দেরী করিয়ে দিতে পারবে।

যখন পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক কোনও বিল গৃহীত হয় তখন তা রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থিত করা হবে এবং রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করবেন যে তিনি ঐ বিলে সম্মতি দান করলেন অথবা তিনি তাতে সম্মতি দান বন্ধ রাখলেন। তবে রাষ্ট্রপতির নিকট সম্মতির জন্য কোনও বিল প্রেরিত হলে তিনি যথাসম্ভব শীঘ্র তা উভয় কক্ষে ফেরৎ পাঠিয়ে তার সঙ্গে একটি বার্তায় এরূপ অনুরোধ করতে পারেন যে তাঁরা বিলটিকে বা তার কোনও নির্দিষ্ট অংশ পুনর্বিবেচনা করুন। কোনও বিল ঐরূপে ফেরৎ পাঠানো হলে উভয় কক্ষ বিলটিকে পুনর্বিবেচনা করবে এবং ঐ বিল যদি পুনরায় উভয় কক্ষ কর্তৃক সংশোধন সহ বা বিনা সংশোধনে গৃহীত হয় এবং রাষ্ট্রপতির নিকট তাঁর সম্মতির জন্য উপস্থিত করা হয়, তবে রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি প্রদান করতে বাধ্য থাকেন।

১৯। পার্লামেণ্টে অর্থবিল পাশের পদ্ধতি (Process of passing Money Bills in Parliament)

রাষ্ট্রপতির অনুমতিক্রমে কেবলমাত্র মন্ত্রীরাই লোকসভায় অর্থবিল উত্থাপন করতে পারেন। সংবিধানে বল হয়েছে যে কোনও অর্থ বিল রাজ্যসভায় উত্থাপন করা যাবে না। অর্থ বিলের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে সংবিধানে বলা হয়েছে যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যে-কোনও একটি বা একাধিক বিষয় যে বিলে থাকে তাকে অর্থ বিল বলে গণ্য করা হবে : (১) যে কোনও কর ধার্য, বিলোপ, পরিহার, পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ ; (২) ভারত সরকারের ঋণগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয় ; (৩) ভারতের সঞ্চিত তহবিল বা আকস্মিক তহবিলের তত্ত্বাবধান এবং এই তহবিলগুলি থেকে অর্থ গ্রহণ বা এগুলি থেকে অর্থ প্রদান ; (৪) সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থ ব্যয় ;(৫) কোনও ব্যয়কে সঞ্চিত তহবিলের অন্তর্ভুক্ত করা বা সঞ্চিত তহবিলের কোনও ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ানো ; (৬) সঞ্চিত তহবিল অথবা সরকারী তহবিল খাতে অর্থগ্রহণ ও এই অর্থের তত্ত্ববধান এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের হিসাব পরীক্ষা ও (৭) উপরে উল্লেখিত

বিষয়গুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোনও বিষয়।

লোকসভায় পাস হয়ে যাওয়ার পর যে কোনও অর্থবিলকে রাজ্যসভার অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। রাজ্যসভা অর্থবিল আলোচনা করার পর বিলের কোনও অংশ সংশোধনের জন্য সুপারিশ করতে পারে। তবে রাজ্যসভা প্রদত্ত সুপারিশ গ্রহণ করতে লোকসভা বাধ্য থাকে না। রাজ্যসভায় প্রেরিত কোনও অর্থ বিল ১৪ দিনের মধ্যে লোকসভার নিকট ফেরত না এলে সেটি উভয় কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

কোনও বিল অর্থবিল কিনা এরূপ কোন প্রশ্ন উঠলে সেই সম্পর্কে লোকসভার অধ্যক্ষের মীমাংসা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। প্রত্যেক অর্থবিল যখন রাজ্যসভায় প্রেরিত হয় এবং যখন রাষ্ট্রপতির কাছে সম্মতির জন্য উপস্থিত করা হয় তখন লোকসভার অধ্যক্ষের একটি প্রমাণ পত্র থাকবে যে এটি একটি অর্থবিল।

অর্থবিলে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর প্রদান ও সম্মতিদানকে একটি নিছক আনুষ্ঠানিক ব্যাপার রূপে গণ্য করা যায়। কারণ তিনি কোনও অর্থবিলকে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাতে পারেন না। রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর কোনও অর্থবিল আইনে পরিণত হয়।

সুতরাং অর্থবিলের ব্যাপারে প্রকৃত ও কার্যকর ক্ষমতা লোকসভাকে প্রদান করা হয়েছে। এই বিষয়ে রাজ্যসভা একটি উপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করে মাত্র।

২০। লোকসভার অধ্যক্ষ বা স্পীকার (The Speaker of the House of the People)

লোকসভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ বা স্পীকার। লোকসভার সভাপতির পদের সাথে যথেষ্ট সম্মান, মর্যাদা ও কর্তৃত্ব জড়িত থাকে। ভারত সরকার প্রকাশিত পদমর্যাদার তালিকায় (Warrant of Precedence) লোকসভার অধ্যক্ষকে ভারতের প্রধান বিচারপতির সমমর্যাদা প্রদান করে সপ্তম স্থান দেওয়া হয়েছে। অধ্যক্ষের পদটি ব্রিটেনের কমন্সসভার অধ্যক্ষের পদের অনুরূপ বলে বিবেচিত হয়।

নির্বাচন ও কার্যকাল : লোকসভা তার সদস্যদের মধ্য থেকেএকজনকেঅধ্যক্ষরূপে নির্বাচিত করে। অধ্যক্ষের পদ তিনভাবে শূন্য হতে পারে :

১। অধ্যক্ষ যদি আর লোকসভার সদস্য না থাকেন, ২। তিনি উপাধ্যক্ষকে উদ্দেশ্য করে নিজ স্বাক্ষরিত লেখন দ্বারা পদত্যাগ করতে পারেন, ৩। লোকসভায় তৎকালীন সদস্যদের অধিকাংশের দ্বারা গৃহীত একটি প্রস্তাব দ্বারা তাঁকে অপসারণ করা যেতে পারে।

লোকসভার কার্যকালের মেয়াদ যতদিন থাকে অধ্যক্ষও ততদিন তাঁর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তবে লোকসভা ভেঙে দেওয়া হলেও নতুন লোকসভার প্রথম অধিবেশনে নতুন স্পীকার নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অধ্যক্ষ তাঁর পদে বহাল থাকেন।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী : লোকসভার অধ্যক্ষের ক্ষমতা সমূহকে নিয়ন্ত্রণমূলক, পরিদর্শনকারী, প্রশাসনিক ও বিশেষ এই চার ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে।

নিয়ন্ত্রণমূলক কাজের মধ্যে সভার কাজ শৃঙ্খলা ও শালীনতার সঙ্গে পরিচালনা করা, বিতর্ক ও আলোচনার জন্য সদস্যদের সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া, সংবিধান ও সংসদের পদ্ধতির নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করা ও কোনও ক্ষেত্রে দু পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে নির্ণায়ক ভোট (Casting vote) প্রদান করা, কোনও সদস্যকে মাতৃভাষায় বক্তৃতা দানের সুযোগ দেওয়া এবং তাঁর বক্তব্যকে ইংরাজী ও হিন্দীতে অনুবাদের ব্যবস্থা করা, কোরামের অভাবে অধিবেশন স্থগিত রাখা ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে।

পরিদর্শনকারী কাজের মধ্যে কতকগুলি কমিটির প্রধানরূপে কাজ করা, বিভিন্ন কমিটির সভাপতি নিয়োগ করা, লোকসভা ব্য তার কোনও কমিটির জন্য সরকারের কাছে কোনও তথ্য জানতে চাওয়া, কোনও সদস্য অসদাচরণ করলে তাঁর শাস্তির ব্যবস্থা করা, গুরুতর বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে সভার কাজ বন্ধ রাখা—ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অধ্যক্ষের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক দায়িত্ব হল—পার্লামেন্টের সচিবালয়কে নিয়ন্ত্রণ করা, লোকসভা ও তার কমিটিসমূহের অধিবেশনের জন্য ব্যবস্থা করা, সদস্যদের আইনানুগ নানাবিধ সুযোগসুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করা, সদস্য ও কর্মচারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, কোনও সদস্যের পদত্যাগ গ্রহণ করা এবং ঐরূপ পদত্যাগ স্বেচ্ছাকৃত কিনা প্রয়োজন হলে তা অনুসন্ধান করা।

অধ্যক্ষের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ কাজের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য : প্রথমত, কোনও বিল কক্ষে গৃহীত হওয়ার পর প্রমাণপত্র দেওয়া। দ্বিতীয়ত, কোনও বিল অর্থবিল কিনা তা চূড়ান্তভাবে স্থির করা। তৃতীয়ত, পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করা। চতুর্থত, রাষ্ট্রপতি ও লোকসভার মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করা। পঞ্চমত, দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণকারী পার্লামেন্টের প্রতিনিধিদের মনোনয়ন করা। ষষ্ঠত, লোকসভার কার্যকাল শেষ হলে সমাপ্তিভাষণ প্রদান করা।

সংবিধান অনুসারে লোকসভার অধ্যক্ষের পদকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রাখার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথমত, অধ্যক্ষের বেতন ও ভাতা ভারতের সঞ্চিত তহবিলের ওপর ধার্য করা হয় অর্থাৎ এ বিষয়টি প্রতি বছর পার্লামেন্টে ভোটের দ্বারা স্থির করতে হয় না। দ্বিতীয়ত, তাঁকে কক্ষে কোনও ভোট প্রদান করার ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। একমাত্র কোনও বিষয়ে দুদিকে সমানসংখ্যক ভোট পড়লে তিনি একটি নির্ধারক ভোট দিতে পারেন। তৃতীয়ত, লোকসভার সদস্যদের অধিকাংশদের দ্বারা গৃহীত প্রস্তাব ছাড়া তাঁকে অপসারণ করা যায় না।

ভারতে লোকসভার অধ্যক্ষের পদটি ব্রিটেনের কমন্সসভার অধ্যক্ষের পদের মত নিরপেক্ষ ও দলীয় স্বার্থের ওপরে রাখার চেষ্টা করা হলেও ভারতে এইরূপ ঐতিহ্য এখনও গড়ে ওঠেনি। অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করে দলীয় প্রার্থীরূপে সঞ্জিব রেড্ডি রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন। অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর রাজ্যপালরূপে নিয়োগ ও কূটনৈতিক কার্যভার দেওয়ার দৃষ্টান্তও ভারতে আছে। লোকসভার অধ্যক্ষ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ না হলে তাঁর পক্ষে কখনও যথার্থভাবে কক্ষের ক্ষমতা, মর্যাদা ও অধিকারসমূহের অভিভাবকরূপে কাজ করা সম্ভব নয়।

গ ভারতে রাজ্য সমূহের শাসন ও আইন বিভাগ

১। ভারতে আঞ্চলিক সরকার সমূহ (Regional Governments in India)

বর্তমানে ২২টি রাজ্য ও ৯টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে বলে কেন্দ্র ও অঞ্চলগুলিতে (রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল) পৃথক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে। ভারতে রাজ্যগুলির কোনও পৃথক সংবিধান নেই বলে ভারতের সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের শাসন সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। একমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত ভারতের অন্যান্য রাজ্যে একই ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। রাজ্যগুলি সমপর্যায়ভুক্ত ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সম্পর্কেও প্রতিটি রাজ্য সমান অধিকার ও দায়িত্ব লাভ করে।

রাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থা অনেকটা কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অনুরূপ। প্রতিটি রাজ্যেই দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। রাজ্যের শাসনব্যবস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হলেন রাজ্যপাল। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন এবং তাঁর কাছে দায়ী থাকেন। রাজ্যপালকে সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ হল রাজ্যের প্রকৃত শাসন কর্তৃপক্ষ। মন্ত্রিপরিষদ তার কাজের জন্য রাজ্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। রাজ্যপাল এবং এককক্ষ বা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট একটি আইনসভা নিয়ে রাজ্য বিধানমণ্ডল গঠিত। সংবিধান অনুসারে প্রতিটি রাজ্যে একটি করে উচ্চ আদালত গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের সংবিধান কর্তৃক ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ঘোষিত হলেও এই রাজ্যের গণপরিষদ রচিত এই রাজ্যের একটি পৃথক সংবিধান আছে। এই সংবিধান একমাত্র এই রাজ্যের গণপরিষদ সংশোধন করতে পারে। সংবিধানে অনুল্লেখিত ক্ষমতাগুলি জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তে রাজ্য সরকার প্রয়োগ করে। এই রাজ্যে রাজ্য সরকারের সম্মতি নিয়ে একমাত্র জরুরী অবস্থার ঘোষণা জারী করা যায়। রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার জন্য জরুরী অবস্থা বা অর্থসংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা যায় না। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য আইনসভার সম্মতি ব্যতীত রাজ্যের নাম, আয়তন, সীমানা ইত্যাদি পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে এরূপ সম্মতি গ্রহণের কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই অঞ্চলগুলি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসক দ্বারা শাসিত হয় এবং এই অঞ্চলগুলির জন্য একমাত্র পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করতে পারে। রাষ্ট্রপতি একজন চীফ কমিশনার অথবা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করে অথবা পার্শ্ববর্তী কোনও রাজ্যের রাজ্যপালের মাধ্যমে এই অঞ্চলগুলির শাসনকার্য পরিচালনা করেন। পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে আইনসভা বা মন্ত্রিপরিষদ বা উভয়ই প্রতিষ্ঠা করতে পারে। পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে উচ্চ আদালত গঠন করতে পারে অথবা এরূপ অঞ্চলে অবস্থিত যে কোনও আদালতকে উচ্চ আদালত বলে ঘোষণা করতে পারে। পার্শ্ববর্তী কোনও রাজ্যের উচ্চ আদালতও অনেকসময় কোনও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের উচ্চ আদালতরূপে কাজ করে।

২। রাজ্যপাল (Governor)

ভারতের সংবিধান অনুসারে রাজ্যপালগণ রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান এবং কেন্দ্র ও

রাজ্যের মধ্যে সংযোগসাধনকারী—এই দুটি পদাধিকার বলে দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করেন।

সংবিধানে বলা আছে যে প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একজন রাজ্যপাল থাকবেন। তবে একই ব্যক্তিকে দুই বা ততোধিক রাজ্যের রাজ্যপালরূপে নিয়োগ করার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। রাজ্যের শাসন ক্ষমতা রাজ্যপালের ওপর ন্যস্ত থাকে এবং রাজ্য সরকারের সমস্ত কার্যকলাপ রাজ্যপালের নামে পরিচালিত হয়। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন এবং রাষ্ট্রপতির নিকট তাঁর পদত্যাগ পেশ করতে পারেন। কোনও ব্যক্তিকে রাজ্যপালপদে নিযুক্ত হতে হলে তাঁকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং অন্ততপক্ষে ৩৫ বছর বয়স্ক হতে হবে। তিনি কোনও লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

রাজ্যপালের নিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে সংবিধান পরিষদে কয়েকটি বিকল্প প্রস্তাব আলোচনা করার পর শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই ব্যবস্থার সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করা যেতে পারে :

১। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় রাজ্যপালকে জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন করা হলে জনগণের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিরূপে তিনি রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধানের পরিবর্তে প্রকৃত শাসকরূপে ক্ষমতা প্রয়োগ করার চেষ্টা করতে পারতেন। এর ফলে রাজ্যপালের সঙ্গে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত মন্ত্রিপরিষদের বিরোধ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকত।

২। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ভারতে একটি কেন্দ্রপ্রবণ যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এরূপ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সাধারণ সময়ে অনেক ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে জরুরী অবস্থাসমূহে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত রাজ্যপালের মাধ্যমে রাজ্যের শাসন ব্যাপারে কেন্দ্রের নির্দেশকে কার্যকর করা সম্ভব।

৩। রাজ্যপালকে রাজ্য আইনসভার দ্বারা নির্বাচন করা হলে রাজ্য আইন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রার্থী রাজ্যপালরূপে নিযুক্ত হতেন। এর ফলে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ক্রীড়নকে পরিণত হতেন।

তবে কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাজ্যের শাসকপ্রধান রাজ্যপালগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন বলে ভারতে রাজ্য সরকারগুলিকে প্রজাতান্ত্রিকরূপেও আখ্যা দেওয়া যায় না।

৩। রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কার্যাবলী (Powers and functions of the Governor)

রাজ্যপালের ক্ষমতাসমূহকে শাসন সংক্রান্ত, আইন সংক্রান্ত এবং স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ও বিশেষ দায়িত্ব—এই তিনভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। শাসন সংক্রান্ত ও আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যপালগণ মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য থাকেন। কিন্তু স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ও বিশেষ দায়িত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁদের মন্ত্রিপরিষদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করতে হয় না। এই ক্ষমতাগুলি তাঁরা ব্যক্তিগত ইচ্ছানুসারে বা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে প্রয়োগ করে থাকেন।

শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা—রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের, অ্যাডভোকেট জেনারেল ও রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ করেন। মন্ত্রীদের ও অ্যাডভোকেট জেনারেলকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে অপসারণ করতে পারেন। হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে থাকেন। রাজ্যপাল হাইকোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজ্যের জেলা জজদের নিয়োগ, পদে স্থাপন ও পদোন্নতি করেন। রাজ্যপাল রাজ্য সরকারী কৃত্যক কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করে ও তাঁর দ্বারা প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে জেলা জজ ভিন্ন রাজ্যের বিচার বিভাগীয় কৃত্যকে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করেন। রাজ্যের আইন

ভঙ্গকারী ব্যক্তিদের তিনি ক্ষমা প্রদর্শন, দণ্ড মকুব, দণ্ড স্থগিত বা দণ্ড হ্রাসের ব্যবস্থা করতে পারেন।

আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা—রাজ্য আইনসভার সদস্য না হলেও রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তিনি কতকগুলি উল্লেখযোগ্য আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন। ১। রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করেন ও স্থগিত রাখেন এবং প্রয়োজন হলে বিধানসভা ভেঙে দিতে পারেন। ২। বিধানসভার নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনে এবং প্রতি বছরের প্রথম অধিবেশনে তিনি আইনসভায় উদ্বোধনী অভিভাষণ দেন। এছাড়া যে কোনও সময়ে তিনি আইনসভায় অভিভাষণ দিতে পারেন। ৩। তিনি আইনসভার বিবেচনাধীন বা অন্য যে কোনও বিষয়ে বাণী প্রেরণ করতে পারেন। ৪। রাজ্য আইনসভা প্রণীত যে কোনও বিলে রাজ্যপাল সম্মতি প্রদান করলে তবেই ঐ বিল আইনে পরিণত হয়। অর্থসংক্রান্ত বিলে তিনি সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন। সাধারণ বিলে তিনি স্বাক্ষর না দিতে পারেন এবং বিলটিকে পুনর্বিবেচনার জন্য আইনসভার নিকট ফেরত পাঠাতে পারেন। তবে পুনর্বিবেচনার পর আইনসভা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাতে তিনি সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন। রাজ্য আইনসভা প্রণীত কোনও বিলে রাজ্যপাল স্বাক্ষর প্রদান না করে ঐ বিল তিনি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য আটকও রাখতে পারেন। ৫। রাজ্যে বিধান পরিষদ থাকলে সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা, সমবায় আন্দোলন ও সমাজসেবা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও পারদর্শিতা আছে এরূপ ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে রাজ্যপাল ঐ কক্ষে কয়েকজন সদস্যকে মনোনীত করেন। রাজ্যপাল বিধানসভায় একজন ইঙ্গ ভারতীয় সদস্য মনোনয়ন করতে পারেন। ৬। রাজ্য আইনসভার অধিবেশন বন্ধ থাকা কালে প্রয়োজন হলে রাজ্যপাল অধ্যাদেশ (Ordinance) জারি করে আইন প্রণয়নের কাজ চালাতে পারেন। ৭। রাজ্যপালের সুপারিশ ছাড়া বিধানসভায় অর্থবিল উত্থাপন করা যায় না। ৮। রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভার নিকট রাজ্যের বাজেট পেশ করার ব্যবস্থা করেন।

স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা— সংবিধান অনুযায়ী কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্যপালগণ স্ববিবেচনায় অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদের সাহায্য ও পরামর্শ ছাড়া ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। যদি কোনও প্রশ্ন ওঠে যে, কোনও বিষয় এরূপ বিষয় কিনা যার সম্পর্কে এই সংবিধান দ্বারা রাজ্যপালের স্ববিবেচনায় কাজ করা আবশ্যক, তাহলে, রাজ্যপালের স্ববিবেচনা অনুযায়ী মীমাংসা চূড়ান্ত হবে, এবং রাজ্যপাল কর্তৃক সম্পাদিত কোনও কাজের সিদ্ধতা সম্পর্কে, তাঁর স্ববিবেচনায় কাজ করা উচিত ছিল বা উচিত ছিল না, এই কারণে কোনও আপত্তি করা যাবে না।

রাজ্যপালদের যে সব কাজগুলিকে সংবিধান অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে স্বেচ্ছাধীনতায় প্রয়োগ করার বিষয় বলা হয়েছে সেগুলি হল :

১। আসাম সরকার কর্তৃক কোনও জেলা পরিষদকে প্রদেয় খনিজসমূহের লাইসেন্সের রয়ালটি সম্পর্কে কোনও বিবাদ উঠলে তা আসামের রাজ্যপাল স্ববিবেচনায় মীমাংসা করবেন।

২। যদি কোনও রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোনও সন্নিহিত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসকরূপে নিযুক্ত হন, তাহলে সেক্ষেত্রে তিনি তাঁর মন্ত্রিপরিষদ থেকে স্বতন্ত্রভাবে (independently of his Council of Ministers) ঐরূপ প্রশাসকরূপে নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করবেন।

৩। রাষ্ট্রপতি মহারাষ্ট্র বা গুজরাটের রাজ্যপালকে ঐ রাজ্যের কতকগুলি অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য কোনও বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করতে পারেন।

৪। নাগাল্যাণ্ডে আইন ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে রাজ্যপালের বিশেষ দায়িত্ব আছে এবং এ বিষয়ে তাঁর

দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল, মন্ত্রিপরিষদের সাথে পরামর্শের পর, অবলম্বনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারেন।

৫। রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা মণিপুর রাজ্যের পার্বত্যক্ষেত্রসমূহ থেকে নির্বাচিত বিধানসভার সদস্যদের নিয়ে ঐ সভায় একটি কমিটি গঠন ও ঐ কমিটি যাতে যথাযথভাবে কাজ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্যপালকে বিশেষ দায়িত্ব দিতে পারেন।

৬। সিকিমে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রাজ্যের জনগণের বিভিন্ন অংশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি সুনিশ্চিত করার জন্য সিকিমের রাজ্যপালের বিশেষ দায়িত্ব আছে এবং রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী, স্ববিবেচনায় এই সব দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলেও আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজ্যপালগণ স্ববিবেচনায় অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ ব্যতীত ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন। এর মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল :

১। কোনও রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সংবিধান অনুসারে পরিচালনা করা হচ্ছে না এই মর্মে যখন রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করেন সে ক্ষেত্রে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত বিবেচনা প্রয়োগ করবেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

২। রাজ্য আইনসভায় কোনও বিল গৃহীত হওয়ার পর রাজ্যপালের নিকট প্রেরণ করা হলে তিনি ঐ বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য আটক রাখতে পারেন। এ ক্ষেত্রেও রাজ্যপাল ব্যক্তিগত বিবেচনা প্রয়োগ করেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

৪। রাজ্যপালের সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদের সম্পর্ক (Relation between the Governor and the Council of Ministers)

সাধারণভাবে বলা হয় যে রাজ্যপালের সঙ্গে তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সম্পর্ক রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সম্পর্কের অনুরূপ। তবে এ ক্ষেত্রে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল এই যে সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কোনও স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন না, কিন্তু সংবিধানে রাজ্যপালকে কিছু ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যেগুলি তিনি স্ববিবেচনায় প্রয়োগ করতে পারেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের পদমর্যাদার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

সংবিধানে বলা হয়েছে যে রাজ্যপালকে, যতদূর পর্যন্ত তাঁর কার্যাবলী স্ববিবেচনায় প্রয়োগ করা এই সংবিধান অনুযায়ী আবশ্যক ততদূর ভিন্ন, তাঁর কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সাহায্য করবার ও পরামর্শ দেবার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকবে, যার শীর্ষে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী। যদি কোনও প্রশ্ন ওঠে যে, কোনও বিষয় এরূপ বিষয় কিনা যার সম্পর্কে এই সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালের স্ববিবেচনায় কাজ করা আবশ্যক, তা হলে, রাজ্যপালের স্ববিবেচনা অনুযায়ী মীমাংসা চূড়ান্ত হবে। রাজ্যপালের কোনও কাজের সিদ্ধতা সম্পর্কে, তাঁর স্ববিবেচনায় কাজ করা উচিত ছিল বা ছিল না, এ কারণে কোনও প্রশ্ন তোলা যায় না।

রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। রাজ্যপাল আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্রীদের অপসারণ করতে পারেন। তিনিই মন্ত্রীদের মধ্যে সরকারের দপ্তরসমূহ বন্টন করে দেন। কোনও রাজ্য সরকারের শাসনসংক্রান্ত সমস্ত কাজ রাজ্যপালের নামে কৃত বলে গণ্য হয়। প্রত্যেক মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব হচ্ছে রাজ্যের শাসন পরিচালনা সম্বন্ধে মন্ত্রিপরিষদের সকল সিদ্ধান্ত ও আইন প্রণয়নের প্রস্তাবসমূহ রাজ্যপালকে জানানো।

রাজ্যপাল রাজ্যের শাসন পরিচালনা ও আইন প্রণয়ন বিষয়ে যে কোনও তথ্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইতে পারেন।

সংবিধান অনুসারে রাজ্যপালকে রাজ্যের শাসন-সংক্রান্ত ও আইন সংক্রান্ত বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সংবিধান পরিষদে রাজ্যপালের সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা ও বিতর্ক প্রসঙ্গে সংবিধান রচয়িতাদের মধ্যে প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ বারবার একথা ঘোষণা করেন যে রাজ্যপাল হবেন রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধান। রাজ্যের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের নিকটেই ন্যস্ত থাকবে।

তবে রাজ্যপালকে প্রকৃত অর্থে রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধানরূপে গণ্য করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরূপে কাজ করতে হয়। সংবিধান অনুসারে আসাম, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর ও সিকিমের রাজ্যপালদের যে সব বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেগুলি তাঁরা মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ ছাড়া স্ববিবেচনায় প্রয়োগ করে থাকেন। কোনও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসকরূপেও রাজ্যপালগণ মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ ব্যতীত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। এছাড়া রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার দরুন জরুরী অবস্থার প্রবর্তন করা, রাজ্য আইনসভায় গৃহীত কোনও বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য আটক রাখা, মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগ, বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া, মন্ত্রিপরিষদ বাতিল করা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও রাজ্যপাল অনেক সময় কেন্দ্রের নির্দেশে বা স্বেচ্ছায় ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন।

৫ । রাজ্যপালের ভূমিকা (Role of the Governor)

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে রাজ্যপালের পদটিতে তাঁর উপদেষ্টারূপে ভূমিকার ওপর গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, রাজ্যপাল রাজ্য মন্ত্রিপরিষদের দলনিরপেক্ষ উপদেষ্টারূপে কাজ করতে পারেন। রাজ্যের শাসক প্রধান হিসাবে তিনি মন্ত্রিপরিষদকে পরামর্শ দেওয়ার, উৎসাহ প্রদানের এবং সতর্ক করার অধিকার ভোগ করেন। সর্বোচ্চ কর্তৃত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে একজন নিরপেক্ষ দর্শকরূপে রাজ্যে কি ঘটছে তা তিনি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে তাঁর পক্ষে রাজ্য সরকারের মর্যাদা, স্থায়িত্ব ও সমষ্টিগত দায়িত্ব রক্ষা করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, রাজ্যপাল রাজ্যের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির প্রধান উপদেষ্টা ও রাজ্যে কেন্দ্রের প্রতিনিধিরূপে ভূমিকা পালন করেন। তাঁর মাধ্যমেই কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে যোগসূত্র সুদৃঢ় করা সম্ভব। এইভাবে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক কাঠামোর একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গরূপে রাজ্যপাল প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সফল করেন ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

৬ । রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদ (The Council of Ministers of the State)

রাজ্যপাল হলেন রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধান। যে কোনও রাজ্যের প্রকৃত শাসন কর্তৃপক্ষ হল মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিপরিষদ। যদিও সংবিধানে বলা হয়েছে যে মন্ত্রিপরিষদ রাজ্যপালকে সাহায্য করবে ও মন্ত্রণা দেবে; কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে রাজ্যপালকে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে চলতে হয়। কেন্দ্রের ন্যায় ভারতে রাজ্যগুলিতেও ব্রিটেনের অনুকরণে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে এবং এরূপ শাসনব্যবস্থার বহু প্রথাগত বিধান রাজ্যে শাসন পরিচালনার জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থারূপে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সুষ্ঠুভাবে শাসন পরিচালনার জন্য কিছু প্রথাগত বিধান গড়েও উঠেছে।

সংবিধানের ১৬৩(১) ধারা অনুযায়ী রাজ্যপালকে, যতদূর পর্যন্ত তাঁর কার্যাবলী বা যে কোনও কাজ তাঁর স্ববিবেচনায় করা এই সংবিধান অনুসারে আবশ্যক ততদূর পর্যন্ত ভিন্ন তাঁর কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সাহায্য করার ও মন্ত্রণা দেওয়ার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকবে, যার শীর্ষে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে রাজ্যের শাসকপ্রধানরূপে রাজ্যপাল মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে চলবেন। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধিরূপে তিনি স্ববিবেচনায় অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারেন। সংবিধানে বলা হয়েছে যে যদি কোনও প্রশ্ন ওঠে যে, কোনও বিষয় এরূপ বিষয় কিনা যার সম্পর্কে এই সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালের স্ববিবেচনায় কাজ করা আবশ্যক, তাহলে রাজ্যপালের স্ববিবেচনা অনুযায়ী মীমাংসা চূড়ান্ত হবে, এবং রাজ্যপাল সম্পাদিত কোনও কাজের সিদ্ধতা সম্পর্কে, তাঁর স্ববিবেচনায় কাজ করা উচিত ছিল বা উচিত ছিল না, এই কারণে কোনও আপত্তি করা যাবে না। আবার মন্ত্রীরা রাজ্যপালকে কোনও পরামর্শ দিয়েছেন কিনা এবং দিয়ে থাকলে কি পরামর্শ দিয়েছেন, এ সম্পর্কে আদালতে কোনও অনুসন্ধান করা যাবে না।

রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীগণকে নিয়োগ করে থাকেন। মন্ত্রীগণ রাজ্যপালের অভিরুচি অনুযায়ী স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। মন্ত্রীদের রাজ্য আইনসভার সদস্য হতে হয়। যদি কোনও মন্ত্রী আইনসভার সদস্য না থাকেন, তবে, তাঁর নিয়োগকাল থেকে ছমাসের মধ্যে তাঁকে আইনসভার সদস্য হতে হবে, নতুবা ঐ সময়ের পর তিনি আর মন্ত্রী থাকতে পারবেন না। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে মন্ত্রীদের মধ্যে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরগুলি বণ্টন করে দেন। মন্ত্রিপরিষদ সমষ্টিগতভাবে রাজ্যের বিধানসভার নিকট দায়ী থাকে। সুতরাং বিধানসভায় মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাশ করা হলে মন্ত্রিপরিষদকে পদত্যাগ করতে হয়।

৭। মুখ্যমন্ত্রী (Chief Minister)

ক্ষমতা ও পদমর্যাদার দিক দিয়ে বিচার করা হলে মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্য সরকারের প্রকৃত কার্যকারী প্রধান (the real working head of the State Government) রূপে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন এবং এ ক্ষেত্রে সংবিধানে স্পষ্ট করে কিছু উল্লেখ করা না হলেও আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করে থাকেন।

মুখ্যমন্ত্রী হলেন রাজ্যপালের প্রধান উপদেষ্টা এবং রাজ্যপাল ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে যোগসূত্র। রাজ্যপাল ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে অবিরত যোগাযোগ রাখার জন্য সংবিধানে রাজ্যপালকে তথ্য সরবরাহ ইত্যাদি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর তিনটি কর্তব্যের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদের সকল সিদ্ধান্ত এবং আইন প্রণয়নের প্রস্তাবসমূহ রাজ্যপালকে জানানো মুখ্যমন্ত্রীর একটি দায়িত্ব। দ্বিতীয়ত, রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা ও আইন প্রণয়নের প্রস্তাবসমূহ সম্পর্কে রাজ্যপাল যদি কোনও তথ্য চান তাহলে মুখ্যমন্ত্রীকে তা সরবরাহ করতে হবে। তৃতীয়ত, রাজ্যপাল যদি অনুজ্ঞা করেন, তাহলে যে বিষয়ে কোনও মন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, অথচ যা মন্ত্রিপরিষদে বিবেচনা করা হয় নি, এরূপ কোনও বিষয় ঐ পরিষদে বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করতে বাধ্য থাকেন মুখ্যমন্ত্রী।

মন্ত্রিপরিষদ হল একটি একক সংস্থা এবং এই সংস্থার অবিসংবাদী নেতারূপে কাজ করেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যান্য মন্ত্রীগণ মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন। মন্ত্রিপরিষদের

প্রধানরূপে তিনি মন্ত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন দপ্তরগুলি বণ্টন করেন ও সমস্ত মন্ত্রীদের কাজের তদারক ও সমন্বয় সাধন করেন। কোনও মন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদ গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলে তিনি তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করতে পারেন। মন্ত্রিপরিষদের গঠন থেকে শুরু করে তার পরিসমাপ্তি পর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা সম্পূর্ণরূপে মুখ্যমন্ত্রীর ওপর নির্ভর করে। মুখ্যমন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনও মন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা মারা গেলে মন্ত্রিপরিষদ ভেঙে যায় না, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা তাঁর মৃত্যু ঘটলে মন্ত্রিপরিষদ ভেঙে যায় এবং নতুন করে মন্ত্রিপরিষদ গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

রাজ্য আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা হলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আইনসভায় সরকারের নীতি ও কার্যকলাপ সমর্থন করতে হয় ও বিরোধীদলের প্রশ্ন ও সমালোচনার যথাযথ উত্তর দিতে হয়।

রাজ্যের প্রকৃত শাসক প্রধান ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা রূপে জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাও মুখ্যমন্ত্রীর একটি দায়িত্ব। অনেকসময় রাজ্যের সমস্যাসমূহ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে হয়।

বাস্তবে দেখা যায় যে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দল যদি রাজ্যেও সরকার গঠন করে সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীদের শাসনকার্য পরিচালনা করতে অসুবিধা হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রধানমন্ত্রী বা ক্ষমতাসীন দলের উচ্চপর্যায়ের নেতাদের ইচ্ছা অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু কেন্দ্রে যে দল ক্ষমতাসীন সেই দল ব্যতীত অন্য দল রাজ্যে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করলে, বিশেষ করে বিভিন্ন দলের সদস্যদের নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হলে, মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যের প্রকৃত শাসকপ্রধানরূপে অনেক সময় নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বহু সময় রাজ্যপাল ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর মতপার্থক্য দেখা যায়।

সুতরাং মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যের শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু বলে গণ্য করা যেতে পারে। কারণ তাঁর যোগ্যতা, নেতৃত্ব ও জনপ্রিয়তার ওপর রাজ্যের সু-শাসন যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে।

৮। রাজ্য আইনসভা (The State Legislature)

ভারতের সংবিধান অনুসারে প্রতিটি রাজ্যের জন্য একটি আইনসভা বা বিধানমণ্ডল থাকবে যা রাজ্যপাল এবং অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার,তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ ও জম্মু ও কাশ্মীর এই ৭টি রাজ্যে দুইটি কক্ষ ও অন্যান্য রাজ্যে একটি কক্ষ নিয়ে গঠিত। রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কোনও রাজ্যের আইনসভায় একটি কক্ষ থাকলে তা বিধানসভা নামে পরিচিত। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার উচ্চকক্ষ বিধান পরিষদ ও নিম্নকক্ষ বিধানসভা নামে পরিচিত। তবে উচ্চকক্ষ বা বিধান পরিষদের অস্তিত্ব বিধানসভার ইচ্ছা ও সেই সঙ্গে পার্লামেন্টর সম্মতির ওপর নির্ভর করে। পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে যে রাজ্যে বিধান পরিষদ আছে সেই রাজ্যের ঐরূপ পরিষদ বিলোপনের জন্য, অথবা যে রাজ্যের ঐরূপ পরিষদ নেই সেই রাজ্যে ঐরূপ পরিষদ সৃষ্টির জন্য ব্যবস্থা করতে পারে, যদি ঐ রাজ্যের বিধানসভা ঐ সভার মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশের দ্বারা এবং ঐ সভায় উপস্থিত সদস্যদের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনের ভিত্তিতে এই মর্মে কোনও প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এরূপ আইন পার্লামেন্ট সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে পাশ করে থাকে কারণ এরূপ পরিবর্তন সংবিধানের সংশোধন বলে গণ্য হয় না।

৯ । পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা—গঠন (The West Bengal Legislature—Composition)

পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা প্রথমে রাজ্যপাল এবং একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট বিধানমণ্ডল—উচ্চকক্ষ বিধান পরিষদ ও নিম্নকক্ষ বিধানসভা—নিয়ে গঠিত হত। কিন্তু ১৯৬৯ সনে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার বিধান পরিষদ বিলুপ্তি সম্পর্কে বিধানসভায় একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাব অনুসারে পার্লামেণ্ট পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ (বিলোপসাধন) আইন, ১৯৬৯ পাশ করে। এই আইন অনুযায়ী ১৯৬৯ সনের ১লা অগস্ট তারিখ থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিধান পরিষদ বিলুপ্ত হয়।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা রাজ্যপাল ও বিধানসভা নিয়ে গঠিত। সংবিধান অনুসারে বিধানসভার সদস্যসংখ্যা সর্বাধিক ৫০০ এবং সর্বনিম্ন ৬০ হতে হয়। বিধানসভার সদস্যগণ সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। নির্বাচনের জন্য সর্বশেষ জনগণনার ভিত্তিতে রাজ্যকে কতকগুলি আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক নির্বাচন এলাকায় ভাগ করা হয়। নির্বাচন এলাকাগুলিকে এরূপভাবে বিভক্ত করা হয় যাতে জনসংখ্যা অনুযায়ী সদস্যসংখ্যার হার সমস্ত এলকায় যথাসম্ভব এক হয়। প্রত্যেকটি নির্বাচন এলাকা থেকে বিধানসভায় একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বর্তমান মোট আসন সংখ্যা হল ২৯৫। এর মধ্যে ২৯৪জন প্রত্যক্ষভাবে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত এবং ১ জন ইঙ্গভারতীয় সদস্য রাজ্যপালের দ্বারা মনোনীত। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে তপসিলী জাতি ও তপসিলী উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

বিধানসভার সদস্য হতে হলে কোনও ব্যক্তিকে (ক) ভারতীয় নাগরিক হতে হয় ; (খ) অন্যূন ২৫ বছর বয়স্ক হতে হয়। এছাড়া পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করে অন্যান্য যোগ্যতা স্থির করতে পারে। বিধানসভার কোনও সদস্য কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের অধীনে কোনও লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন না। এছাড়া কোনও ব্যক্তি একই সময়ে পার্লামেণ্ট ও বিধানসভার সদস্য বা একাধিক বিধানসভার সদস্য হতে পারেন না।

বিধানসভার যে কোনও সদস্য স্পীকারের নিকট লিখিতভাবে পদত্যাগ পত্র পেশ করতে পারেন। তবে ঐ সদস্য স্বেচ্ছামূলকভাবে পদত্যাগ করছেন কিনা তা স্পীকার অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন। পদত্যাগ স্বেচ্ছামূলক না হলে স্পীকার তা গ্রহণ না করতে পারেন।

বিধানসভার কার্যকাল হল ৫ বৎসর। তবে এই কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে রাজ্যপাল বিধানসভা ভেঙে দিতে পারেন। জরুরী অবস্থার ঘোষণা বলবৎ থাকা কালে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করে বিধানসভার কার্যকাল এককালীন এক বছর বাড়িয়ে দিতে পারে। অবশ্য জরুরী অবস্থার ঘোষণার অবসানের পর ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন বিধানসভা গঠন করতে হয়।

বিধানসভার সদস্যগণ বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে স্পীকার বা অধ্যক্ষ ও অন্য একজনকে ডেপুটি স্পীকার বা উপাধ্যক্ষরূপে নির্বাচিত করেন। স্পীকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার সভার কাজ পরিচালনা করেন। স্পীকারের প্রধান কাজ হল—(১) বিধানসভায় সভাপতিত্ব করা, (২) সভায় শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও আলোচনা ও বিতর্ক নিয়ন্ত্রণ করা, (৩) বিধানসভায় কোনও অর্থবিল গৃহীত হওয়ার পর যখন তা রাজ্যপালের নিকট সম্মতির জন্য পাঠানো হয় তখন স্পীকার এই মর্মে একটি প্রমাণ পত্র দেন যে ঐ বিলটি একটি অর্থবিল। (৪) বিধানসভা ও রাজ্যপালের মধ্যে যোগসূত্র বজায় রাখেন স্পীকার।

স্পীকার যাতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেই জন্য সংবিধানে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা দেখা যায়। প্রথমত, বিধানসভার সদস্য হলেও স্পীকার প্রথমে কোনও বিষয়ে কোনও ভোট দেন না। বিষয়টির পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে বিষয়টি

মীমাংসার জন্য তিনি একটি নির্ধারক ভোট প্রদান করে থাকেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর বেতন ও ভাতা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সঞ্চিত তহবিলের ওপর ধার্য করা হয়—অর্থাৎ প্রতি বছর বিধানসভায় ভোটে পাশ করতে হয় না। তৃতীয়ত, স্পীকারকে অপসারণ করতে হলে বিধানসভার সদস্যদের অধিকাংশের দ্বারা ঐ মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করতে হয়।

১০। ক্ষমতা ও কার্যাবলী (Powers and Functions)

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা অন্যান্য রাজ্যের বিধানসভার মত নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ও কার্যাবলী প্রয়োগ করে :

১। আইন প্রণয়ন— বিধানসভা সংবিধানের রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত যে কোনও বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। এছাড়া যুগ্মতালিকায় উল্লেখিত কোনও বিষয়েও আইন প্রণয়ন করতে পারে। রাজ্যপাল প্রণীত অধ্যাদেশগুলি বিধানসভার অনুমতি সাপেক্ষ এবং এই সভা ঐগুলি যে কোনও সময় বাতিল বলে গণ্য করতে পারে।

২। অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা— বিধানসভা রাজ্যের অর্থব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাজ্য সরকারের যাবতীয় ব্যয়, কর ধার্য ও ঋণ গ্রহণের জন্য বিধান সভার আইনগত অনুমোদন আবশ্যক। সরকারের বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দের হিসাব বা বাজেট বিধানসভায় পেশ করতে হয়। তবে রাজ্যপালের সম্মতি ব্যতীত কোনও অর্থবিল বিধানসভায় পেশ করা যায় না।

৩। শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ— বিধানসভায় সদস্যগণ মন্ত্রীদের প্রশ্ন করতে পারেন, মন্ত্রিপরিষদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন এবং মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করে সরকারকে পদচ্যুত করতে পারেন। সংবিধান অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ সমষ্টিগতভাবে বিধানসভার নিকট দায়ী থাকে।

৪। সর্বসাধারণের স্বার্থজড়িত যে কোনও বিষয়ে বিতর্ক (Debating public questions)— বিধানসভার সদস্যগণ সংবিধান ও সভার কার্যাবলী পরিচালনা সংক্রান্ত বিধিনিষেধগুলি মান্য করে সর্বসাধারণের স্বার্থ জড়িত যে কোনও প্রশ্ন আলোচনা করার জন্য পূর্ণ বাক্ স্বাধীনতা ভোগ করেন। রাজ্যপালের উদ্বোধনী অভিভাষণ ও বাৎসরিক অভিভাষণের পর বিধানসভায় সরকারী নীতিসমূহ সম্পর্কে আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। বিধানসভায় বাজেট পেশ হওয়ার পর সভায় ঐ সম্পর্কে আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।

৫। সংবিধান সংশোধন বিলসমূহের অনুমোদন— রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি, কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা, সুপ্রীম কোর্ট, রাজ্যের হাইকোর্ট ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের হাইকোর্ট, কেন্দ্র-রাজ্য আইন প্রণয়ন সম্পর্ক, আইন প্রণয়ন তালিকাসমূহ ও সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি সংশোধন করতে হলে পার্লামেন্টের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থন ব্যতীত রাজ্য আইনসভাগুলির অর্ধেকের সম্মতি আবশ্যক। এরূপ কোনও বিল বিধানসভায় প্রেরিত হলে বিধানসভাকে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রস্তাব করে ঐ বিলকে সমর্থন অথবা অগ্রাহ্য করতে হয়।

৬। অন্যান্য ক্ষমতা— বিধানসভার অন্যান্য ক্ষমতাগুলির মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(ক) বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের জন্য গঠিত নির্বাচক সংস্থার অংশরূপে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

(খ) বিধানসভা তার সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে অধ্যক্ষ ও অন্য একজনকে উপাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করে।

(গ) বিধানসভা সংবিধানের ব্যবস্থা অনুসারে তার কাজ পরিচালনা সংক্রান্ত পদ্ধতি প্রণয়ন করে।

(ঘ) রাজ্য সরকারী কৃত্যক কমিশন, কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল ও অন্যান্য সংস্থার প্রতিবেদনগুলি বিধানসভা পর্যালোচনা করে।

(ঙ) পার্লামেন্টে রাজ্যের আয়তন, সীমানা, নাম ইত্যাদি পরিবর্তন সংক্রান্ত বিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত উত্থাপন করা যায় না। রাষ্ট্রপতি আবার ঐ ধরনের প্রস্তাবিত বিল সম্পর্কে রাজ্য আইনসভার মতামত গ্রহণ করেন। সুতরাং এই ধরনের প্রস্তাবিত বিলে অভিমত প্রদান করাও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার একটি কাজ।

ঘ· ভারতে বিচার ব্যবস্থা

১। ভারতে অখণ্ড বিচার ব্যবস্থা (Integrated Judiciary in India)

সমগ্র ভারতে দুটি শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে—কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজ্যসমূহের শাসনব্যবস্থা। সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষ ও পার্লামেণ্ট হল কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে রাজ্যের শাসন কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য আইনসভা নিয়ে রাজ্যের শাসনব্যবস্থা গঠিত। যদিও সংবিধানে স্বতন্ত্রভাবে কেন্দ্রীয় বিচার বিভাগ ও রাজ্যের বিচার বিভাগের উল্লেখ দেখা যায় কিন্তু সমগ্র ভারতে একটি মাত্রই বিচারব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ভারত যুক্তরাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও ভারতে অখণ্ড বা একক বিচারব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায় কারণ সমগ্রদেশে একই মৌলিক আইন ও বিচারব্যবস্থা প্রচলিত। ভারতে কেন্দ্রীয় আইন সংক্রান্ত মামলাগুলি বিচার করার জন্য কোনও পৃথক আদালত নেই, আবার রাজ্যের বিচারালয়গুলি কেবলমাত্র রাজ্যের আইন সংক্রান্ত মামলাগুলির বিচার করে না। ভারতের সমস্ত আদালতগুলি একটি ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের (Hierarchy) অন্তর্ভুক্ত যার শীর্ষে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট অবস্থিত। সুপ্রীমকোর্টের নীচে রয়েছে রাজ্যের হাইকোর্ট সমূহ। সুতরাং ভারতের বিচারব্যবস্থাকে সর্ব-ভারতীয় বিচারব্যবস্থা বলে গণ্য করা যেতে পারে।

রাজ্যের হাইকোর্টসমূহকে কেবলমাত্র সৌজন্যের খাতিরে রাজ্য সরকারের তৃতীয় অঙ্গরূপে গণ্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে হাইকোর্টগুলি হল কেন্দ্রীয় সরকারের তৃতীয় অঙ্গের একটি উপ-অঙ্গ। হাইকোর্টের গঠন ও এক্তিয়ার সম্পর্কে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অধিকারী। হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং তিনি তাঁদের এক হাইকোর্ট থেকে অন্য হাইকোর্টে বদলি করতে পারেন। পার্লামেণ্টে কোনও হাইকোর্টের বিচারপতির বিরুদ্ধে অসদাচরণের প্রস্তাব পাশ করা হলে রাষ্ট্রপতি তাঁকে অপসারণ করতে পারেন। পার্লামেণ্ট হাইকোর্টসমূহের এক্তিয়ার বৃদ্ধি করতে পারে। পার্লামেণ্ট বিচারপতিদের অবসরগ্রহণের বয়স বৃদ্ধি করতে পারে।

সুপ্রীম কোর্ট হল সমগ্র ভারতের সর্বোচ্চ আপীল আদালত। সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ার হল সমগ্র ভারতব্যাপী এবং তার যে কোনও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। সুপ্রীমকোর্টের নির্দেশ (rulings) যে নজির সৃষ্টি করে তা সমস্ত হাইকোর্টসমূহ ও অন্যান্য নিম্ন আদালতসমূহ অনুসরণ করে থাকে। যদিও জেলা পর্যায়ের নিম্নআদালতগুলি রাজ্যসরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কিন্তু তাদের পক্ষে কেন্দ্রীয় আইন সংক্রান্ত অথবা সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত মামলার বিচারের ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। অন্যদিকে ভারতের সুপ্রীমকোর্ট, স্ববিবেচনায়, একমাত্র সামরিক আদালত ব্যতীত ভারতের যে কোনও আদালত বা ট্রাইবুন্যাল কর্তৃক প্রদত্ত কোনও রায়, ডিক্রি, নির্ধারণ, দণ্ডাদেশ বা আদেশ থেকে আপীল করার বিশেষ অনুমতি প্রদান করতে পারে। এই একক ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত বিচারব্যবস্থা কেবলমাত্র এক্তিয়ারগত ঐক্য সৃষ্টি করেনি, এর মাধ্যমে সমগ্রদেশে এক ধরনের একক বিচার বিভাগীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব হয়েছে। যদিও ব্যবহারজীবীদের মধ্য থেকে প্রত্যক্ষভাবে সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি নিয়োগ করা যায় কিন্তু সাধারণত হাইকোর্টের বিচারপতিদের মধ্যে থেকেই সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগগুলি হয়ে থাকে। নিম্ন আদালতগুলির, বিশেষত জেলা ও সেসন্স্ বিচারপতিদের মধ্য থেকে হাইকোর্টের বহুবিচারপতিকে নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া হাইকোর্টের বিচারপতিদেরও বিভিন্ন রাজ্যে বদলি করার ব্যবস্থা আছে। অতএব এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে যদিও ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে কিন্তু তবুও সংবিধান অনুসারে ভারতে অখণ্ড বিচারব্যবস্থা এবং সমগ্র দেশে একই প্রকারের মৌলিক আইন প্রচলিত আছে।

২। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট(The Supreme Court of India)

ভারতের সুপ্রীম কোর্ট হল দেশের সর্বোচ্চ বিচার সংস্থা। এই আদালত ভারতের অখণ্ড বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়রূপে, মৌলিক অধিকারের সংরক্ষক রূপে, সংবিধানের অভিভাবকরূপে ও দেশের সর্বোচ্চ আপীল আদালতরূপে ভারতের সুপ্রীমকোর্ট ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ১৯৫০ সনের ২৮শে জানুয়ারী এই আদালতের উদ্বোধনী অধিবেশনে এই আশা প্রকাশ করা হয় যে "এই আদালত একটি মহৎ ও অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং নিজেকে ভারতীয় জনগণের চেতনায় প্রতিষ্ঠা করবে" (..."this Court will play a great and singular role and establish itelf in the consciousness of the Indian people")।

৩। গঠন (Composition)

ভারতের সুপ্রীম কোর্ট বর্তমানে একজন প্রধান বিচারপতি ও ১৭ জন অন্যান্য বিচারপতি নিয়ে গঠিত। পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে বিচারপতির সংখ্যা বাড়াতে পারে। রাষ্ট্রপতি, সুপ্রীমকোর্টের ও রাজ্যসমূহের হাইকোর্টের যে সব বিচারপতিদের সাথে এই উদ্দেশ্যে পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করেন তাঁদের সাথে পরামর্শের পর, সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিদের নিযুক্ত করেন। তবে প্রধান বিচারপতি ভিন্ন অন্য কোনও বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে সর্বদা ভারতের প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করতে হয়। তবে বাস্তবে দেখা যায় যে রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের সুপারিশ অপেক্ষা প্রধানমন্ত্রীর অভিমতের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

কোনও ব্যক্তিকে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরূপে নিযুক্ত হতে হলে তাঁকে নিম্নলিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে—(১) ভারতীয় নাগরিক হতে হবে, (২) এক বা একাধিক হাইকোর্টে অন্তত ৫ বছর বিচারপতিরূপে থাকতে হবে; অথবা এক বা একাধিক হাইকোর্টের উকিলরূপে অন্তত ১০ বছর কর্মরত থাকতে হবে; অথবা রাষ্ট্রপতির অভিমতে একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হতে হবে।

সংবিধান অনুসারে বিচারপতিরা ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। কোনও বিচারপতি, রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে লিখিত স্বাক্ষরিত পত্রদ্বারা, পদত্যাগ করতে পারেন। কোনও বিচারপতির বিরুদ্ধে 'প্রমাণিত অসদাচরণ' বা 'অযোগ্যতা'র অভিযোগ প্রমাণিত হলে রাষ্ট্রপতি তাঁকে পদচ্যুত করতে পারেন। এরূপ অভিযোগ সম্বলিত প্রস্তাব পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ও উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের অন্ততঃ দুই তৃতীয়াংশের দ্বারা সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন। তবে সুপ্রীম কোর্টের কোনও বিচারপতির অপসারণ সংক্রান্ত প্রস্তাব ব্যতীত তিনি তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে যে আচরণ করেছেন সেই সম্পর্কে পার্লামেণ্টের কোনও কক্ষে কোনও আলোচনা করা যায় না।

বিচারপতিদের বিশেষ অধিকার, বেতন, ভাতা, ছুটি, পেন্সন প্রভৃতি পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করে স্থির করে। বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে প্রদান করা হয়। সুতরাং এই বাবদ ব্যয়ের জন্য প্রতি বছর পার্লামেণ্টের অনুমতি গ্রহণ করতে হয় না। তবে কোনও বিচারপতির বিশেষাধিকার বা ভাতা বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সম্পর্কিত অধিকার তাঁর নিয়োগের পর তাঁর পক্ষে অসুবিধাজনকভাবে পরিবর্তন করা যায় না।

৪। সুপ্রীম কোর্টের কার্যাবলী (Functions of the Supreme Court)

সুপ্রীম কোর্টের কার্যাবলীকে প্রধানত মূল, আপীল ও পরামর্শদাতা এই তিনটি এক্তিয়ারে ভাগ

করে আলোচনা করা যেতে পারে।

১। মূল এলাকা (Original jurisdiction) —ভারত সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্যের মধ্যে অথবা একপক্ষে ভারত সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্য এবং অন্যপক্ষে অন্য এক বা একাধিক রাজ্য, এদের মধ্যে অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে কোনও বিবাদের সাথে যদি এরূপ কোনও প্রশ্ন জড়িত থাকে যার ওপর কোনও বৈধ অধিকারের অস্তিত্ব বা প্রসার নির্ভর করে, তা হলে ঐ বিবাদ একমাত্র সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকায় বিচার করা যাবে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট ভারতখণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতরূপে কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে সালিসরূপে কাজ করে।

২। আপীল এলাকা (Appellate jurisdiction)—সুপ্রীমকোর্ট আপীল এলাকায় তিন ধরনের মামলায় বিচার করতে পারে :

(ক) দেওয়ানী (civil)—ভারতের যে কোনও হাইকোর্টের দেওয়ানী মামলায় প্রদত্ত কোনও রায়, ডিক্রী বা চূড়ান্ত আদেশ থেকে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যাবে যদি হাইকোর্ট প্রমাণপত্র প্রদান করে তাতে উল্লেখ করে যে—(ক) মামলাটিতে সাধারণ গুরুত্বের কোনও তাৎপর্যপূর্ণ আইনগত প্রশ্ন জড়িত আছে এবং (খ) ঐ হাইকোর্টের অভিমত, উক্ত প্রশ্নটি সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক মীমাংসিত হওয়া প্রয়োজন। (খ) ফৌজদারী (Criminal)—ভারতের যে কোনও হাইকোর্টের পক্ষ থেকে ফৌজদারী মামলায়, প্রদত্ত কোনও রায়, চূড়ান্ত আদেশ বা দণ্ডাদেশ থেকে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা চলবে, যদি ঐ হাইকোর্ট (ক) কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির আদেশ আপীলে উল্টে দিয়ে থাকে এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়ে থাকে ; অথবা (খ) কোনও মামলা অন্য কোনও নিম্ন আদালত থেকে প্রত্যাহার করে নিজে বিচার করে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঐরূপ বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে মৃত্যদণ্ডাদেশ দিয়ে থাকে ; অথবা (গ) প্রমাণপত্র প্রদান করে তাতে উল্লেখ করে যে মামলাটি সুপ্রীম কোর্টে আপীল করার পক্ষে উপযুক্ত।

(গ) সাংবিধানিক (constitutional)—ভারতের যে কোনও হাইকোর্টের কোনও দেওয়ানী, ফৌজদারী বা অন্য কোনও মামলার রায়, ডিক্রী বা আদেশ থেকে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যাবে যদি ঐ হাইকোর্ট প্রমাণ পত্র প্রদান করে তাতে বলে যে মামলাটিতে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কোনও তাৎপর্যপূর্ণ আইনগত প্রশ্ন জড়িত আছে।

(ঘ) আপীল করার জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিশেষ অনুমতি (Special leave to appeal by the Supreme Court)—সুপ্রীম কোর্ট, স্ববিবেচনায়, একমাত্র সামরিক আদালত ভিন্ন ভারতের যে কোনও আদালত বা ট্রাইবুন্যাল প্রদত্ত কোনও রায়, ডিক্রি, নির্ধারণ, দণ্ডাদেশ বা আদেশ থেকে আপীল করবার বিশেষ অনুমতি দিতে পারে।

৩। উপদেশমূলক এলাকা (Advisory jurisdiction)—যদি কোনও সময়ে রাষ্ট্রপতি নিকট এরূপ প্রতীয়মান হয় যে কোনও আইনগত বা তথ্যগত প্রশ্ন উঠেছে বা ওঠার সম্ভাবনা আছে যার প্রকৃত ও সর্বজনীন গুরুত্ব এরূপ যে ঐ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের অভিমত নেওয়া সঙ্গত, তা হলে, তিনি ঐ প্রশ্ন ঐ কোর্টের বিবেচনার জন্য পাঠাতে পারেন। সুপ্রীম কোর্ট, যেরূপ উপযুক্ত মনে করে সেরূপ শুনানীর পরে, ঐ সম্পর্কে নিজ অভিমত রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিবেদন করতে পারে।

৪। লেখ এলাকা (Writ jurisdiction)—সংবিধানে বর্ণিত যে কোনও মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে তা বলবৎ করার জন্য সুপ্রীম কোর্ট হেবিয়াস করপাস, ম্যানডেমাস, প্রহিবিশন, কুওওয়ারেন্টো ও সার্সিওরারাই প্রকৃতির লেখ জারী করতে পারে। মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য সরাসরি সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করা হলে ঐরূপ মামলা কোর্ট তার আদি এলাকায় বিচার করে। আবার মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত কোনও মামলায় হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা হলে তা

সুপ্রীম কোর্ট আপীল এলাকায় বিচার করবে। অতএব লেখ জারী করার এলাকা আদি ও আপীল দু ধরনের হতে পারে। পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে মৌলিক অধিকার সুরক্ষা ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যেও সুপ্রীম কোর্টকে লেখ জারী করার ক্ষমতা প্রদান করতে পারে।

৫। অন্যান্য কাজ (other functions)—সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য কাজের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল এরূপ :

(ক) রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন থেকে উদ্ভূত বা ঐ সম্পর্কিত সকল সন্দেহ ও বিবাদ সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্ট অনুসন্ধান ও মীমাংসা করবে এবং ঐ কোর্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়।

(খ) কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারী কৃত্যক কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের বিরুদ্ধে অসদাচরণের কোনও অভিযোগ উঠলে রাষ্ট্রপতি ঐ বিষয় সুপ্রীম কোর্টের নিকট অনুসন্ধানের জন্য পাঠান।

(গ) পার্লামেন্ট প্রণীত আইন অনুসারে, সুপ্রীম কোর্ট সময় সময়, রাষ্ট্রপতির অনুমতি নিয়ে, ঐ কোর্টের কার্য পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সাধারণভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে পারে।

৫। সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা (Role of the Supreme Court)

ভারতের শাসন ব্যবস্থায় সুপ্রীম কোর্ট একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। সুপ্রীম কোর্টের প্রথম এবং প্রধান কাজ হল আইনগুলি যাতে ন্যায্যভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং দেশের কোনও আদালত বা ট্রাইবুন্যাল যাতে কোনও বিচার প্রার্থীকে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত থেকে সুপ্রীম কোর্ট যাতে এই উদ্দেশ্যেসমূহ কার্যকর করতে পারে সেজন্য তাকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এই কারণে সংবিধানে বলা হয়েছে যে সুপ্রীম কোর্ট, স্ববিবেচনায়, সামরিক আদালত ছাড়া ভারতের যে কোনও আদালত বা ট্রাইবুন্যাল কর্তৃক প্রদত্ত কোনও রায়, ডিক্রি,নির্ধারণ, দণ্ডাদেশ বা আদেশ থেকে আপীল করার বিশেষ অনুমতি প্রদান করতে পারে। দ্বিতীয়ত, সুপ্রীম কোর্ট একটি ঐক্যবদ্ধকারী শক্তিরূপে কাজ করবে বলেও প্রত্যাশা করা হয়। অখণ্ড বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত এই আদালত ঘোষিত আইন ভারতীয় ভূখণ্ডে অবস্থিত সমস্ত আদালতের পক্ষে বাধ্যতামূলক হবে। এইভাবে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনসমূহের সমরূপতা দেশের ঐক্যের একটি সহায়ক শক্তিরূপে কাজ করবে। তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত রূপে সুপ্রীম কোর্ট কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে সাংবিধানিক ক্ষমতা বণ্টনের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব পালন করে। চতুর্থত, এই আদালত মৌলিক অধিকার সমূহের সংরক্ষক ও সংবিধানের অভিভাবকরূপে কাজ করে। পরিশেষে বলা যায় যে সুপ্রীম কোর্ট সরকারের উপদেষ্টারূপে বহু আইনগত ও সাংবিধানিক জটিল সমস্যা সহজে সমাধান করতে পারে।

৬। হাইকোর্টসমূহ (High Courts)

সংবিধান অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একটি হাইকোর্ট থাকবে। তবে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য, অথবা, দুই বা ততোধিক রাজ্য ও একটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের জন্য, একটি অভিন্ন হাইকোর্ট স্থাপন করতে পারে। আবার পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে কোনও হাইকোর্টের এক্তিয়ার কোনও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে প্রসারিত করতে পারে অথবা কোনও হাইকোর্টের এক্তিয়ার কোনও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে বাদ দিতে পারে।

৭। গঠন (Composition)

প্রত্যেক হাইকোর্ট একজন প্রধান বিচারপতি এবং রাষ্ট্রপতি সময় সময় যে অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ করা প্রয়োজন বলে গণ্য করেন, তাঁদের নিয়ে গঠিত হবে। যদি কোনও

হাইকোর্টের কাজের সাময়িক বৃদ্ধি বা বকেয়া কাজের কারণে রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে ঐ কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত, তাহলে তিনি দুবছরের অনধিক কালের জন্য যথোচিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ঐ কোর্টে অতিরিক্ত বিচারপতি নিযুক্ত করতে পারেন। কোনও হাইকোর্টের কোনও বিচারপতি অনুপস্থিতির জন্য বা অন্য কারণে তাঁর দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে তিনি তাঁর কার্যভার পুনরায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত ঐ কোর্টে অস্থায়ী বিচারপতিরূপে কাজ করার জন্য রাষ্ট্রপতি যথোচিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি, ভারতের প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করার পর, কোনও বিচারপতিকে এক হাইকোর্ট থেকে অন্য যে কোনও হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করতে পারেন।

হাইকোর্টের বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রধান বিচারপতি, রাজ্যের রাজ্যপাল এবং প্রধান বিচারপতি ভিন্ন অন্য কোনও বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করেন। কোনও ব্যক্তিকে হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে নিযুক্ত হতে হলে তাঁর নিম্নলিখিত যোগ্যতাগুলি থাকা আবশ্যক—(১) তাঁকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে, (২) অন্তত ১০ বছর ভারতের কোনও স্থানে বিচারবিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকতে হবে অথবা অন্ততঃ ১০ বছর কোনও হাইকোর্টের বা পর পর দুই বা ততোধিক ঐরূপ কোর্টে উকিলরূপে যুক্ত থাকতে হবে।

সংবিধান অনুসারে হাইকোর্টের বিচারপতিরা ৬২ বছর বয়স পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। কোনও বিচারপতি রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে নিজ স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা পদত্যাগ করতে পারেন। কোনও বিচারপতির বিরুদ্ধে 'প্রমাণিত অসদাচরণ' বা 'অযোগ্যতা'র অভিযোগ প্রমাণিত হলে রাষ্ট্রপতি তাঁকে পদচ্যুত করতে পারেন। তবে এরূপ অভিযোগ সম্বলিত প্রস্তাব পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের মোট সদস্যসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ ও উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা সমর্থিত হওয়া আবশ্যক। হাইকোর্টের কোনও বিচারপতির অপসারণ সংক্রান্ত কোনও প্রস্তাব ব্যতীত তিনি তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে যে আচরণ করেছেন সেই সম্পর্কে পার্লামেন্টের কোনও কক্ষে কোনও আলোচনা করা যায় না।

বিচারপতিদের বিশেষ অধিকার, বেতন, ভাতা, পেনসন প্রভৃতি বিষয় পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে স্থির করে। তাঁদের বেতন ও ভাতা রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল থেকে প্রদান করা হয়। সুতরাং এই বাবদ ব্যয়ের জন্য প্রতি বছর রাজ্য আইনসভার অনুমোদন নিতে হয় না। তবে কোনও বিচারপতির বিশেষ অধিকার ভাতা বা অন্যান্য সুযোগসুবিধা সম্পর্কিত কোনও অধিকার তাঁর নিয়োগের পর তাঁর পক্ষে অসুবিধাজনকভাবে পরিবর্তন করা যায় না।

৮। ক্ষমতা ও কার্যাবলী (Powers and functions)

ভারতের সংবিধানে হাইকোর্টের ক্ষমতা সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে কিছু বলা হয়নি। এই বিষয়ে বলা আছে যে সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার আগে হাইকোর্ট সমূহ যে সব ক্ষমতা ভোগ করত এই সংবিধান অনুসারেও তারা অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। এছাড়া রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়েও সংবিধান অনুসারে হাইকোর্টসমূহকে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

হাইকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে মূল এলাকাভুক্ত, আপীল এলাকাভুক্ত এবং প্রশাসনিক এই তিন ভাগে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

১। মূল এলাকা (Original jurisdiction)

(ক) দেওয়ানী (civil)—কলকাতা ও বোম্বাই-এর হাইকোর্টসমূহ এক লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের দেওয়ানী মামলাগুলি মূল এলাকায় বিচার করে থাকে।

(খ) রাজস্ব (Revenue—রাজস্ব সংক্রান্ত যে কোনও মামলা হাইকোর্ট সমূহ তাদের মূল এলাকায় বিচার করে থাকে।

(গ) লেখ জারী (Issuing Writs)—হাইকোর্ট সমূহ তাদের নিজ নিজ ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ করা এবং অন্য উদ্দেশ্যে সরকার সমেত যে কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর হেবিয়াস কর্পাস, ম্যানডেমাস, প্রহিবিশন, কুও ওয়ারেণ্টো ও সার্সিওরারাই প্রকৃতির লেখ, আদেশ বা নির্দেশ জারী করতে পারে।

(ঘ) পার্লামেণ্ট ও রাজ্য আইনসভার সদস্যদের নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ (Disputes relating to the election of the M. P. s and the M. L. A. s)—১৯৫১ সনে প্রণীত জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (Representation of People Act, 1951) ১৯৭৮ সনে সংশোধন করার ফলে বর্তমানে হাইকোর্ট সমূহ পার্লামেণ্ট ও রাজ্য আইনসভা সমূহের সদস্যদের নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে।

(ঙ) ফৌজদারী মামলা (Criminal cases)—১৯৭৩ সনে প্রণীত ফৌজদারী দণ্ড বিধি(The Criminal Procedure Act, 1973) অনুসারে বর্তমানে হাইকোর্টের মূল ফৌজদারী এলাকার বিলোপসাধন করা হয়েছে।

২। আপীল এলাকা (Appellate jurisdiction)—(ক) দেওয়ানী মামলা (Civil Cases)—(১) কোনও জেলা জজ বা সহকারী জেলা জজের প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে তথ্য ও আইন সংক্রান্ত প্রশ্নকে কেন্দ্র করে হাইকোর্টে সরাসরি আপীল করা যায়। (২) কোনও জেলা জজ বা সহকারী জজ কর্তৃক কোনও অধস্তন আদালতের রায় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর আইন ও পদ্ধতিগত প্রশ্ন সম্পর্কে হাইকোর্টের কাছে দ্বিতীয় আপীল করা যায়। (৩) হাইকোর্টের কোনও বিচারপতির আদিম অথবা আপীল এলাকায় একক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও হাইকোর্টে আপীল করা চলে। এরূপ আপীল গৃহীত হলে মামলাটি একাধিক বিচারপতি নিয়ে গঠিত বিচার সভা (bench) বিচার করে।

(খ) ফৌজদারী মামলা (Criminal cases)—কোনও দায়রা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজ কোনও ব্যক্তিকে ৭ বছরের অধিক কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলে ঐ রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা চলে।

৩। প্রশাসনিক ক্ষমতা (Administrative powers) -(ক) অধস্তন আদালতসমূহকে তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতা (Power of Superintendence over subordinate Courts)—প্রত্যেক হাইকোর্ট তার নিজস্ব এলাকার সর্বত্র সামরিক আদালত ব্যতীত অন্যান্য আদালত ও ট্রাইবুন্যালসমূহের তত্ত্বাবধান করে। এই ক্ষমতাবলে হাইকোর্ট অধস্তন আদালত সমূহের কাছ থেকে কাজকর্মের প্রতিবেদন চাইতে পারে, তাদের কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, আদালতসমূহের হিসাবপত্র, দলিলসমূহ ইত্যাদি কিভাবে সংরক্ষিত হবে সে বিষয়ে নির্দেশ দিতে পারে এবং এই সব আদালতের শেরিফ, অন্যান্য প্রাধিকারিক ও করণিকদের বেতন এবং অ্যাটর্নি, অ্যাডভোকেট ও উকিলদের পারিশ্রমিকের পরিমাণ স্থির করে দিতে পারে।

(খ) কোনও কোনও মামলার হাইকোর্টে স্থানান্তর (Transfer of certain cases to High Courts)—যদি কোনও হাইকোর্ট মনে করে যে অধস্তন আদালতে বিচারাধীন কোনও মামলার সাথে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে তবে হাইকোর্ট ঐ মামলা তুলে নিয়ে নিজে বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে অথবা সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত প্রশ্নটি নির্ধারণ করার পর মামলাটি অধস্তন আদালতের কাছে ফেরত পাঠাতে পারে।

(গ) অধস্তন আদালতসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা (Powers of control over subordinate courts)—হাইকোর্ট নিম্নলিখিত উপায়ে অধস্তন আদালতগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে :

১। কোনও জেলা জজের নিয়োগ, পদে-স্থাপন ও পদোন্নতি সম্পর্কে রাজ্যপাল হাইকোর্টের সাথে পরামর্শ করবেন।

২। কোনও রাজ্যে বিচারবিভাগীয় কৃত্যকে জেলা ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল রাজ্য সরকারি কৃত্যক কমিশন ও হাইকোর্ট উভয়ের সঙ্গে পরামর্শ করেন।

৩। কোনও রাজ্যের বিচার বিভাগীয় কৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত এবং জেলা জজের পদ অপেক্ষা অধস্তন কোনও পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের পদে-স্থাপন, পদোন্নয়ন, আদালতসমূহের ওপর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব হাইকোর্টের ওপর ন্যস্ত থাকবে।

৯। হাইকোর্টের পদমর্যাদা (Position of High Courts)

হাইকোর্টের গঠন ও ক্ষমতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই আদালত প্রকৃত অর্থে রাজ্য সরকারের অংশ নয়। এই আদালত সর্ব-ভারতীয় বিচার-ব্যবস্থা যা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন —তারই একটি উপ-অঙ্গ। এর কারণ হল রাষ্ট্রপতি হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন, তাঁদের এক হাইকোর্ট থেকে অন্য হাইকোর্টে বদলী করেন এবং পার্লামেন্টে প্রস্তাব পাশ করা হলে তাঁদের অপসারণ করেন। এছাড়া পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা করতে পারে, ঐরূপ আদালতের এক্তিয়ার বাড়াতে পারে ও বিচারপতিদের অপসারণের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে। হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা রাজ্যের সঞ্চিত তহবিলের ওপর ধার্য করা হলেও কেন্দ্রীয় সরকার তা বৃদ্ধি করতে পারে এবং আর্থিক জরুরী অবস্থা চলাকালে তা হ্রাস করতে পারে। হাইকোর্টের কোনও সিদ্ধান্তকে সুপ্রীম কোর্টে বিচার করা যেতে পারে যা সুপ্রীম কোর্ট বাতিল করে দিতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট প্রদত্ত নির্দেশ, বিধি ও প্রবিধান হাইকোর্টগুলিকে অনুসরণ করতে হয়। অতএব বলা যেতে পারে যে হাইকোর্ট প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারেরই অংশ।

১০। অধস্তন বা নিম্ন আদালতসমূহ (Subordinate Courts)

প্রতিটি হাইকোর্টের নীচে অধস্তন আদালতসমূহ দেখা যায়। এই আদালতসমূহকে দেওয়ানী (civil) এবং ফৌজদারী (criminal) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত মামলাগুলি দেওয়ানী আদালতে বিচার করা হয় এবং চুরি, ডাকাতি, হত্যা ইত্যাদি সংক্রান্ত মামলা গুলি ফৌজদারী আদালতে বিচার করা হয়।

দেওয়ানী আদালতসমূহ—কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ ব্যতীত সমগ্র ভারতের প্রতিটি জেলায় একটি করে দেওয়ানী আদালত থাকে। জেলায় দেওয়ানী এলাকায় সর্বোচ্চ আদালত হল জেলা জজের আদালত (Court of District Judge)। এই আদালত জেলার অন্যান্য আদালতগুলিকে অধীক্ষণ করে। জেলা জজ অতিরিক্ত জেলা জজ, সহকারী জেলা জজ ও যৌথ জেলা জজের সাহায্যে বিচার কার্য সম্পাদন করেন।

জেলা জজের নীচে রয়েছে অধস্তন জজের আদালত (Subordinate Judge's Court) ও তার নীচে আছে মুন্সেফের আদালত (Munsiff's Court)। মুন্সেফের আদালতে দুহাজার টাকার অধিক মূল্যের কোনও মামলার বিচার করা হয় না। মামলার বিষয়বস্তুর মূল্য তার বেশি হলে ঐ মামলা অধস্তন জজের আদালতে বিচার করা হয়। অধস্তন জজের আদালতে মুন্সেফের আদালত থেকে আপীল শোনা হয়ে থাকে। আবার অধস্তন জজের আদালত থেকে আনীত কোনও মামলা জেলা জজের আদালতে বিচার করা হয়।

সর্বনিম্ন দেওয়ানী আদালত হল ন্যায় পঞ্চায়েত (Nyaya Panchayet)। এগুলি গ্রামাঞ্চলের ছোটখাট মামলা চূড়ান্তভাবে বিচার করে। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজে নগর দেওয়ানী আদালত

(City civil Court) দেওয়ানী মামলাগুলি বিচার করে। তাছাড়া প্রেসিডেন্সি শহরগুলিতে এবং মহানগরগুলিতে প্রেসিডেন্সি ছোট আদালত (Presidency Small Causes Court) থাকে।

ফৌজদারী আদালতসমূহ—জেলাসমূহে ফৌজদারী এলাকার সর্বোচ্চ আদালত হল দায়রা জজের (Sessions Judge) আদালত। সাধারণত একই ব্যক্তি জেলা ও দায়রা জজের (District and Sessions Judge)পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। দায়রা জজকে সাহায্য করার জন্য অতিরিক্ত দায়রা জজ ও সহকারী দায়রা জজ থাকেন। দায়রা জজের আদালতের নীচে রয়েছে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত (Magistrate's Courts)। প্রত্যেক শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের এক্তিয়ার নির্দিষ্ট ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট একমাস পর্যন্ত কারাবাসের আদেশ ও একশো টাকা পর্যন্ত জরিমানা ধার্য করতে পারেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ছমাস পর্যন্ত কারাদণ্ড ও ছশো টাকা পর্যন্ত জরিমানা ধার্য করতে পারেন। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কোনও ব্যক্তিকে দুবছর কারাদণ্ড এবং দুহাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা ধার্য করতে পারেন। সর্বনিম্ন ফৌজদারী আদালত হল পঞ্চায়েত আদালত (Panchayat Adalat) বা ন্যায় পঞ্চায়েত (Nyaya Panchayat). এরা ছোটখাট ফৌজদারী মামলার বিচার করে থাকে।

গুরুতর ফৌজদারী মামলাগুলি উচ্চতর ফৌজদারী আদালত সমূহে বিচার করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত থেকে সহকারী দায়রা জজের আদালতে আপীল করা যায়। সহকারী দায়রা জজ দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দিতে পারেন। সহকারী দায়রা জজের আদালত থেকে দায়রা জজের আদালতে আপীল করা যায়। দায়রা জজের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা থাকে। তবে মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

কলকাতা প্রভৃতি মহানগরীসমূহে ফৌজদারী বিচারের জন্য রয়েছে মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত (Metropolitan Magistrate's Court)। প্রধান মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী প্রধান মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ে এই আদালত গঠিত হয়।

জেলা জজকে জেলা ও দায়রা জজ (District and Sessions Judge) রূপে অভিহিত করা হয় কারণ তিনি জেলা জজ ও দায়রা জজ উভয়রূপেই কাজ করে থাকেন। রাজ্যপাল রাজ্যের হাইকোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে জেলা ও দায়রা জজকে নিয়োগ করেন।

হাইকোর্টসমূহ নিম্নলিখিতভাবে নিম্ন আদালতসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে—

১। জেলা জজের নিয়োগ, পদে-স্থাপন ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে রাজ্যপালকে হাইকোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়।

২। জেলা জজ ব্যতীত রাজ্যের বিচার বিভাগীয় কৃত্যকের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যপালকে রাজ্যের সরকারী কৃত্যক কমিশন এবং সেইসঙ্গে হাইকোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়।

৩। কোনও রাজ্যের বিচার বিভাগীয় কৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত জেলা জজের পদ অপেক্ষা অধস্তন কোনও পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের পদে স্থাপন, পদোন্নয়ন ও তাঁদের অবকাশ মঞ্জুরীকরণ সমেত, জেলা আদালতসমূহ ও তার অধীনস্থ আদালত সমূহের ওপর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব হাইকোর্টের ওপর ন্যস্ত।

প্রতিটি হাইকোর্ট তার নিজ এলাকার সর্বত্র সামরিক আদালত ব্যতীত অন্যান্য আদালত ও

ট্রাইবুন্যালগুলিকে তত্ত্বাবধান করে। এই ক্ষমতা বলে হাইকোর্ট নিম্ন আদালতসমূহের কাছ থেকে কাজকর্মের প্রতিবেদন চেয়ে পাঠাতে পারে, তাদের কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং আদালতগুলির হিসাবপত্র, দলিলসমূহ ইত্যাদি কিভাবে সংরক্ষিত হবে সে বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করতে পারে এবং এইসব আদালতের শেরিফ, অন্যান্য প্রাধিকারিক ও করনিকদের বেতন ও অ্যাটর্নি, অ্যাডভোকেট ও উকিলদের পারিশ্রমিকের পরিমাণ স্থির করে দিতে পারে।

তাছাড়া যদি কোনও হাইকোর্ট মনে করে যে নিম্ন কোনও আদালতে বিচারাধীন কোনও মামলার সাথে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে তবে হাইকোর্ট ঐ মামলা তুলে নিয়ে নিজে বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে অথবা সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত প্রশ্নটি নির্ধারিণ করার পর মামলাটি নিম্ন আদালতের কাছে ফেরত পাঠাতে পারে।

জনমত ও রাজনৈতিক দল

ক· জনমত

১। জনমতের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of Public Opinion)

আধুনিককালের প্রায় সমস্ত শাসনব্যবস্থায় জনমত একটি প্রবল শক্তিরূপে স্বীকৃত। জনমতের সংজ্ঞা প্রদান করা অসুবিধাজনক। এর প্রকৃতি উপলব্ধি করা আরও কঠিন। জনমত কাকে বলে তা বর্ণনা করা অপেক্ষা জনমত বলতে কি বোঝায় না তা ব্যাখ্যা করা সহজ। সাধারণভাবে যে মত জনগণ গ্রহণ করে বা যার প্রতি তাদের আস্থা বা সম্মতি থাকে তাকে জনমত বলা হয়। জনমত বলতে সকলের মত বা ঐকমত্য বোঝায় না। জনমত বলতে আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘুদের মতামতকে বোঝান হয় না। আবার কোনও বিষয় বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনগণের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মতামত গড়ে উঠতে পারে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে কোনটিকেই জনমত বলা চলে না।

অনেকে বলেন প্রকৃত অর্থে জনমত আখ্যা পেতে হলে কোনও মতকে জনগণের বা সর্বসাধারণের হতে হবে এবং মতও হতে হবে (Public opinion to be public opinion must be public and opinion)। আবার অনেক সময় বলা হয় যে জনমত জনসাধারণের সঙ্গে যুক্তও নয় এবং প্রকৃত অর্থে মতও নয় (Public opinion is neither public nor opinion)।

জনমত সম্পর্কে যথার্থ ধারণা লাভ করতে হলে 'জনসাধারণ' (Public) এবং 'মতামত' (Opinion) এই দুটি শব্দকে পৃথক করে বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

জনসাধারণ বা সর্বসাধারণ বলতে কখনও একত্র মিশ্রিত অবিচ্ছেদ্য দলবদ্ধ জনসমষ্টিকে বোঝায় না। জনসাধারণ বলতে প্রধানত সমাজের একটি অংশ বিশেষকে বোঝায়। ফলে সমাজে বিভিন্ন ধরনের জনসাধারণ থাকতে পারে। কোনও নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা যথা, নগর, গ্রাম, রাষ্ট্র ইত্যাদিতে বসবাসকারী ব্যক্তিদের জনসাধারণ বলা যেতে পারে। সাধারণ স্বার্থের সঙ্গে জড়িত জনসমষ্টিকে জনসাধারণ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বাণিজ্যসংস্থা ও শ্রমিক সংঘকে উল্লেখ করা যায়। সাধারণভাবে স্থায়ী সংগঠন ও সদস্যসমূহ নিয়ে জনসাধারণ গঠিত হতে পারে। যেমন, রাজনৈতিক দল। আবার অস্থায়ীভাবে সংযোগসাধনের মাধ্যমে জনসাধারণ গড়ে উঠতে পারে। যেমন বেতারের শ্রোতা ও দূরদর্শনের দর্শকদের জনসাধারণ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এইভাবে বিচার করলে একই বিষয়ে আকৃষ্ট বা আগ্রহী ব্যক্তিদের নিয়ে জনসাধারণ গড়ে ওঠে। যে কোনও সমাজে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এরূপ বহু জনসাধারণের অস্তিত্ব দেখা যেতে পারে এবং তারা অনেক সময় সরকারকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

জনমতের ধারণাটির অন্যদিকটি হল মতামতের (Opinion) প্রকৃতি। মতামতের প্রকৃতির চারটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—গতি বা লক্ষ্য (Direction), তীব্রতা (Intensity), স্থায়িত্ব (Stability) ও প্রাধান্য (Salience)। গতি বলতে কোনও একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন্ দিকে মতামত যাচ্ছে তা বোঝায়। তীব্রতা বলতে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কিভাবে তাঁর বা তাঁদের মতকে পক্ষে বা বিপক্ষে যে দিকেই হক চালনা করছেন তাকে বোঝায়। কোনও মত কতখানি জোরের সঙ্গে কার্যকর করার চেষ্টা করা হচ্ছে তার থেকে ঐ মতের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। কোনও মতামতের গতি ও তীব্রতা তার স্থায়িত্বের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। কোনও একটি বিষয়ে সাধারণভাবে একটি স্থায়ী মতামত থাকলে ঐ মতকে সরকার উপেক্ষা করতে পারে না। পরিশেষে মতামতের ক্ষেত্রে প্রাধান্য বলতে বোঝায় যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও প্রশ্নের মধ্যে জনসাধারণ কোন্‌টিকে অগ্রাধিকার দিতে চায়।

কোনও একটি বিশেষ রাজনৈতিক প্রশ্ন বা বিষয়কে কেন্দ্র করেই জনমত গড়ে ওঠে। যথাযথভাবে প্রকাশিত ও সমর্থিত না হলে কোনও মতকেই জনমত রূপে গণ্য করা যায় না। কোনও বিষয়ে যথার্থভাবে জনমত প্রকাশিত হলে সরকার ঐ মত অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে। ভি· ও· কি (V.O.Key) এইভাবে জনমতের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন : 'সাধারণ ব্যক্তিরা পোষণ করেন এই ধরনের মতামত নিয়ে জনমত গঠিত হয় যে গুলির প্রতি মনোযোগ প্রদান করাকে সরকারসমূহ বিচক্ষণ বলে গণ্য করে' (Public opinion consists of those opinions held by private persons which governments find it prudent to heed)।

অস্টিন রেণীর (Austin Ranney) মতে 'জনমত হল সমস্ত ব্যক্তিগত মতামতের সমষ্টি যেগুলি সম্পর্কে সরকারী আধিকারিকগণ (সরকারের কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা) কিছু পরিমাণে সচেতন থাকেন এবং যেগুলি তাঁরা তাঁদের সরকারী কার্যকলাপ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বিবেচনা করেন' (Public opinion is the sum of all private opinions of which Government officials in some measure are aware and that they take into account in determining their official actions)।

২। জনমত গঠন (Formation of public opinion)

জনমত গঠনের ক্ষেত্রে নানাবিধ শক্তির প্রভাব দেখা যায়। এগুলির মধ্যে কয়েকটি যুক্তিসঙ্গত আর কয়েকটি অযৌক্তিক, কয়েকটি ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন আবার কয়েকটি তার নিয়ন্ত্রণের বহির্ভূত।

প্রথমত, জনমত গঠনের ক্ষেত্রে মতাদর্শের (ideology) প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ ব্যক্তির জীবনধারা এবং সমাজ সম্পর্কে একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। অনেকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থাকেন। অনেকে রাজনৈতিক দল বিশেষের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এছাড়া প্রত্যেকে বংশগত ও জাতিগত ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে থাকেন। এইসব প্রভাবের ফলে ব্যক্তির রাজনৈতিক বিষয় ও সমস্যাসমূহের প্রতি একটি বিশেষ মনোভাব গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক বা বস্তুগত বিবেচনার (Economic and material considerations) দ্বারাও জনমত প্রভাবিত হয়। যে কোনও সমাজে বিত্তবান শ্রেণী ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল শ্রেণী বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের অভিমত পোষণ করে থাকেন।

কোনও সমাজে জনমত কতখানি দৃঢ় তা নির্ভর করে কিভাবে তা গঠিত হয় তার ওপর। এরূপ সংগঠন আবার অর্থনৈতিক ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। সমাজে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অসমতা থাকলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সবল শ্রেণী সর্বদা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল শ্রেণী অপেক্ষা সংগঠিত আকারে মতামত প্রকাশ করতে অধিকতর সক্ষম হবে। ল্যাস্কির (Laski) ভাষায়, এককথায় বলতে গেলে অসম সমাজে নৈতিক প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে জনমত তার দাবি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না (Public opinion in an unequal society, in a word, cannot make its claim in terms of its moral character)।

তৃতীয়ত, মনস্তাত্ত্বিক উপাদান (Psychological factor) জনমতকে প্রভাবিত করে। তবে আদর্শগত ও অর্থনৈতিক উপাদানের তুলনায় এই উপাদানটি যথেষ্ট স্পষ্টভাবে কার্যকর হয় না। বিভিন্ন ব্যক্তি ও ব্যক্তিগোষ্ঠী সামাজিক সমস্যাগুলিকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে। প্রচলিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি যাদের কোনও আস্থা থাকে না অনেক সময় দলীয় নেতা ও স্বার্থগোষ্ঠীসমূহ তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করে।

চতুর্থত, প্রযুক্তিগত উপাদানও (Technological factor) জনমতের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে উন্নত রাষ্ট্রসমূহে সংবাদপত্র, পত্র পত্রিকা প্রভৃতি জনগণের মধ্যে বিপুলভাবে প্রচার চালাতে পারে এবং বেতার ও দূরদর্শনের মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য জানতে পারে। এর ফলে ঐসব রাষ্ট্রে যথেষ্ট সচেতন জনমত গড়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশী।

৩। জনমত গঠনের বিভিন্ন মাধ্যম (Various agencies for the formation of Public Opinion)

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মাধ্যমে রাজনীতি ও রাজনৈতিক সমস্যাদি সম্পর্কে জনসাধারণ তাদের মনোভাব প্রকাশ করে। সাধারণ ব্যক্তিরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কদাচিৎ রাজনৈতিক ব্যাপারে উৎসাহ দেখায়। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে নিম্নলিখিত মাধ্যমগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

(১) মুদ্রাযন্ত্র (The Press)—সংবাদপত্র (Newspaper), সাময়িকপত্র-পত্রিকা (Magazines) এবং পুস্তক-পুস্তিকার মাধ্যমে জনসাধারণের মতামত প্রভাবিত হয়ে থাকে। তবে সংবাদপত্র জনমত গঠন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। যেসব রাষ্ট্রে শিক্ষিতের হার বেশী সেখানে সংবাদপত্রের প্রচারও বেশী এবং ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদপত্রের মাধ্যমে যে কোনও ব্যক্তি তার নিজ দেশ ও বিদেশের নানা ঘটনা ও তথ্য জানতে পারে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন চিন্তাশীল প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় মন্তব্য, জনসাধারণের বক্তব্য ও অভাব-অভিযোগের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি হয়। সংবাদপত্রগুলি যদি সঠিক, নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতশূন্য সংবাদ পরিবেশন করে তাহলে জনগণও তাদের নিজস্ব মতামত গঠন করতে পারে এবং সরকারও সমালোচনার ভয়ে স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে না।

সংবাদপত্রগুলি যাতে নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে সংবাদ বিশ্লেষণ ও পরিবেশন করতে পারে সেইজন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা একান্ত আবশ্যক। এইজন্য সংবাদপত্রগুলিকে সম্পূর্ণরূপে সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা প্রয়োজন। অনেক সময় সংবাদপত্রগুলি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র রূপে কাজ করে। ফলে তারা বিশেষ কোনও রাজনৈতিক দলের মতবাদকে সমর্থন করার চেষ্টা করে। বহুল প্রচারিত কোনও সংবাদপত্র পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এই কারণে সংবাদপত্রের মালিকানা অনেক ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী ও পুঁজিপতিদের হাতে চলে যায়। তাঁরা স্বভাবতই সংবাদপত্রের মাধ্যমে সর্বদা তাঁদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেন। এইভাবে অনেকসময় সংবাদপত্রগুলি সংবাদকে বিকৃতভাবে প্রকাশ করে জনমতকে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে।

অনেক সময় কোনও পুস্তক জনসাধারণের মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে জনমত গঠনে সহায়তা করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ফ্রান্সে রুশোর Contract Social গ্রন্থটি জনসাধারণকে বিপ্লবের পথে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করেছিল। জন গলস্‌ওয়ার্দির Justice নাটকটিও ব্রিটিশ সরকারকে কারাগার সংস্কার সাধনে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

(২) বেতার, চলচ্চিত্র ও দূরদর্শন (Radio, Cinema and Television)

সংবাদপত্র কেবলমাত্র অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যেই প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কিন্তু বেতারের মাধ্যমে শিক্ষিত ও নিরক্ষর সমস্ত ব্যক্তিরাই প্রভাবিত হয়ে থাকেন। এছাড়া বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে কোনও সংবাদ, তথ্য অথবা রাজনৈতিক নেতা বা বিশিষ্ট ব্যক্তির ভাষণ মুহূর্তের মধ্যে দেশবিদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিতে

দূরদর্শনও জনমত গঠনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

তবে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই রেডিও ও দূরদর্শন সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর ফলে ক্ষমতাসীন সরকার রেডিও ও দূরদর্শনকে তাদের নিজেদের দলীয় নীতি ও কার্যক্রম প্রচার করার কাজে ব্যবহার করতে পারে। ভারতে আকাশবাণী ও দূরদর্শন সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। ব্রিটেনে রেডিওর ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করার জন্য রেডিও পরিচালনার ভার একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থার হাতে দেওয়া হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেতার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত হয়।

সাম্প্রতিক কালে ভারতে লোকসভা ও রাজ্যবিধানসভাগুলির নির্বাচনের পূর্বে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির মুখপাত্রদের রেডিও ও দূরদর্শনের মাধ্যমে তাদের নীতি ও কার্যকলাপ জনসাধারণের সামনে পরিবেশন করার সুযোগ দেওয়ার প্রথা চালু হয়েছে। এরূপ ব্যবস্থা জনমত গঠনের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক।

জনমত গঠনের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী মাধ্যমরূপে কাজ করে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় ধরনের ব্যক্তিদের ওপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব। চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে আনন্দদান ব্যতীত শিক্ষাদান করাও সম্ভব। তবে সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই চলচ্চিত্র ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হয়। সুতরাং চলচ্চিত্র শিল্পের মূল লক্ষ্য থাকে মুনাফা লাভ। রেডিও ও দূরদর্শনের অনুষ্ঠানগুলির মাধ্যমে অনেকসময় যেরূপ একটি বিশেষ রাজনৈতিক বক্তব্যকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা যায় ব্যক্তিগত মালিকানায় মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সেরূপ প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক প্রচার সম্ভব নয়। প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই কোনও চলচ্চিত্র জনসাধারণকে প্রদর্শন করার পূর্বে সরকারের নির্দিষ্ট বিভাগের দ্বারা তার অনুমোদন (censor) আবশ্যিক। এইভাবে সরকার চলচ্চিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সরকার অনেক সময় সমাজ কল্যাণ, জনশিক্ষা, জনস্বার্থ, জননিরাপত্তা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা ইত্যাদি উদ্দেশ্য সম্বলিত তথ্যচিত্র (Documentary Films) পরিবেশনের মাধ্যমে জনমত গঠনে সহায়তা করতে পারে। তবে তথ্যচিত্র কখনও এরূপভাবে নির্মাণ করা উচিত নয় যাতে তা ক্ষমতাসীন দলের প্রচার যন্ত্রে পরিণত হয়।

(৩) সভাসমিতি (Platform)—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের বাক্ ও মতামত প্রকাশ এবং সভাসমিতি করার স্বাধীনতা স্বীকৃত। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভাসমিতিতে ভাষণ প্রদান ও আলোচনার মাধ্যমে জনমতকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করতে পারেন। যে সব রাষ্ট্রে অধিকাংশ ব্যক্তিই অশিক্ষিত সেখানে সভাসমিতির মাধ্যমে কোনও একটি বিষয়ে বক্তব্য শোনার পর কোনও ব্যক্তি তাঁর নিজস্ব মতামত স্থির করতে পারেন।

(৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Educational Institutions)—সাধারণত কৈশোর ও যৌবনে জনসাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরূপে জড়িত থাকে। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পাঠ্যপুস্তকসমূহ ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের ভাবধারা ও চরিত্র গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করে। সরকারও বিভিন্ন পঠন-পাঠনের পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে ভবিষৎ নাগরিকদের দেশাত্মবোধ, আইনের প্রতি আনুগত্য, দেশের শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করার চেষ্টা করেন। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যক্তিদের রাজনৈতিক সত্তা গঠনে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। সুতরাং অনেকেই মনে করেন যে শিক্ষার মাধ্যমে সুনাগরিক গড়ে তোলা যায় এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই রাজনৈতিক বিষয়ে অধিক আগ্রহী ও ওয়াকিবহাল হয়ে থাকেন। তবে নিরপেক্ষ ও সচেতন জনমত গঠনের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে দলীয় রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা একান্ত আবশ্যক।

(৫) **রাজনৈতিক দলসমূহ (Political Parties)**—রাজনৈতিক দলসমূহ সরকার ও জনমতের মধ্যে যোগসূত্র রূপে কাজ করে। রাজনৈতিক দলগুলি জনসাধারণকে, বিশেষভাবে নির্বাচকমণ্ডলীকে, শিক্ষিত, সক্রিয় ও সুসংগঠিত করে তোলে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল গণসংযোগ ও স্থানীয় সংগঠনের মাধ্যমে জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। সরকারী দল ও বিরোধী দলসমূহ সভাসমিতি, পোস্টার, ফেস্টুন, প্রচার পুস্তিকা, দলীয় ইস্তাহার, নির্বাচনের সময় বাড়ি-বাড়ি প্রচার ইত্যাদির মাধ্যমে দলীয় নীতি ও কার্যক্রমের সমর্থনে অথবা যে কোনও সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালায়। এইভাবে রাজনৈতিক দলগুলি জনমতকে প্রভাবিত করে থাকে।

(৬) **আইনসভা (Legislature)**—আইনসভায় ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধীপক্ষের আলোচনা-সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্ক সম্পর্কে সংবাদপত্র, রেডিও, দূরদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণ অবহিত হন। আইনসভার বিভিন্ন সদস্যদের বক্তব্য ও তার বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনের প্রতিবেদন থেকেও জনসাধারণ তাদের নিজস্ব বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী মতামত স্থির করতে পারে। অতএব আইনসভায় একদিকে জনপ্রতিনিধিরা জনসাধারণের অভাব অভিযোগ উপস্থিত করার মাধ্যমে জনমতকে প্রতিফলিত করে আবার অন্যদিকে আইনসভার আলোচনা ও তর্কবিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতেও জনমত সৃষ্টি হয়ে থাকে।

(৭) **পরিবার ও সমকক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত গোষ্ঠী (Family and Peer Group)**— শৈশবাবস্থা থেকে কোনও ব্যক্তির রাজনৈতিক মনোভাব, পছন্দ-অপছন্দ এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপে আগ্রহের সৃষ্টি হয় পরিবার থেকে। পিতা-মাতা, ভাই-বোন বা আত্মীয়-স্বজন রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকলে তার প্রভাব শিশুর ওপর অবশ্যই দেখা যায়। পরিবারের অন্যান্যদের রাজনৈতিক মতামত ও চিন্তাভাবনা বাল্যকালে যে কোনও ব্যক্তির অবচেতন মনকে প্রভাবিত করে এবং এর প্রভাব পরবর্তী জীবনেও দেখা যায়।

বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, কর্মস্থলে সহকর্মীবৃন্দ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ইত্যাদির দ্বারাও ব্যক্তির রাজনৈতিক মতামত কিছুটা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

মার্ক্সবাদীদের মতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একটি নির্দিষ্ট পদমর্যাদার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে শ্রেণীর উদ্ভব হয়। আধুনিক সমাজে এরূপ দুটি শ্রেণী দেখা যায়—বুর্জোয়া, যাঁরা উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিকানা উপভোগ করেন ও এই মালিকানা বজায় রাখার জন্য জনসাধারণকে শোষণ করেন এবং প্রোলেতারিয়েত, যাঁদের শ্রমের ভিত্তিতেই উৎপাদন সম্ভব হয় এবং যাঁদের নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রয় ছাড়া জীবিকা অর্জনের অন্য কোনও উপায় থাকে না বলে যাঁরা বুর্জোয়াদের দ্বারা শোষিত হন। মার্ক্সীয় ধারণা অনুযায়ী এই দুই শ্রেণীর বিরুদ্ধ স্বার্থের সংঘাত অনিবার্য এবং ফলত রাজনীতি মূলত অধিষ্ঠিত হয় শ্রেণীসংগ্রামকে কেন্দ্র করে। এই বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণীচেতনাকে ব্যক্তির রাজনৈতিক মতামতের মূল নিয়ন্ত্রকরূপে গণ্য করা হয়।

৪। জনমত ও গণতন্ত্র (Public opinion and Democracy)

পাশ্চাত্য জগতে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের উদ্ভব হয় গ্রীসদেশে। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় ৫০০ বছর আগে পেরিক্লিস গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন অ্যাথেন্সে। তাঁর ধারণা অনুযায়ী গণতন্ত্র হল এরূপ একটি শাসন যেখানে কয়েকজনের পরিবর্তে বহু ব্যক্তি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। প্রকৃত গণতন্ত্রের আদর্শ অনুযায়ী গ্রীক নাগরিকরা কোনও স্থানে মিলিত হয়ে সরাসরি আলোচনা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচার সংক্রান্ত কার্য পরিচালনা করতেন। এরূপ ব্যবস্থা প্রায় দুশো বছর প্রচলিত ছিল। এরপর জনগণের প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করার ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটে।

প্লেটো তাঁর The Republic গ্রন্থে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ক্ষমতা সাধারণ নাগরিকদের হাতে অর্পণ করার তত্ত্বটি প্রত্যাখ্যান করেন এবং অ্যারিস্টটল এই নীতিটিকে বিভিন্ন বিকল্প শাসনব্যবস্থার মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠরূপে সমর্থন করেন। যাই হোক, একথা অস্বীকার করা যায় না যে প্রাচীনকালের এই প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই প্রাথমিকভাবে অনুপ্রাণিত করেছে আধুনিককালের ধারণাটিকে যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনমতই হল জনগণের কণ্ঠস্বর (Voice of the people)।

গ্রীক আমলের পর প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের অবসান ঘটে। পরবর্তীকালে জন লক, টমাস জেফারসন ও রুশোর লেখনীতে লোকায়ত সার্বভৌমিকতার তত্ত্বের মধ্য দিয়ে জনগণের ইচ্ছা (will of the people) ধারণাটির পুনরুত্থান ঘটে। প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার উদ্ভব ও ভোটাধিকারের প্রসারের ফলে শাসন পরিচালনা ক্ষেত্রে জনগণের প্রভাবের ধারণাটি পুনঃপ্রচলনের ফলে গণতন্ত্রে জনমতের ভূমিকা সম্পর্কে একটি সমালোচনামুক্ত মতবাদের পথ প্রশস্ত হয়। আধুনিককালে গণতন্ত্রের ভিত্তি সর্বার্থেই জনমতের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ভি· ও· কি-র মতে সরকারী নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনসাধারণের অভিমতকে কিছুটা স্থান না দিলে গণতন্ত্র সম্পর্কে সমস্ত আলোচনাই অর্থহীন হয়ে পড়ে (Unless mass views have some place in shaping public policy all talk about democracy is nonsense)। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত সরকারের নীতি ও কার্যকলাপের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

প্রথমত, যে কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন পরিচালনা করার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল নাগরিকরা কি চান তা ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে ঘোষণা করার সুযোগ দেওয়া। সুতরাং গণতন্ত্রে জনগণের রায় অনুসারে সরকার গঠিত হয়। এই কারণে গণতান্ত্রিক সরকার কখনও জনমতকে উপেক্ষা করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক সরকার জনমতের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যেহেতু গণতন্ত্রে শাসনকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন সেইজন্য তাঁরা সর্বদা জনমত অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য সচেষ্ট থাকেন। কোনও আইন যদি জনমতের বিরোধী হয় তবে সেই আইনের প্রতি জনসাধারণের রাজনৈতিক আনুগত্য দেখা যায় না। এই কারণে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতার ভিত্তির পরিবর্তে জনসম্মতির ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। কোনও গণতান্ত্রিক সরকার যদি জনমত অনুসারে না চলে তবে পরবর্তী নির্বাচনে তার পক্ষে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসা অসম্ভব।

গণতন্ত্রে জনসাধারণ যদি শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের কার্যকলাপের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে তবে সরকারের স্বৈরাচারী হওয়ার আদৌ সম্ভাবনা থাকে না। এইজন্য অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেছেন যে সদাজাগ্রত ও বুদ্ধিদীপ্ত জনমত হল গণতন্ত্রের প্রথম প্রয়োজনীয় শর্ত (An alert and intelligent public opinion is the first essential of democracy)।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরুদ্ধ জনমত সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে বহু অসুবিধার সৃষ্টি করে। এই কারণে গণতান্ত্রিক সরকার যে সব সংস্থার মাধ্যমে জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হয় সেগুলিকে প্রভাবিত করার ও অনুকূলে রাখার চেষ্টা করে। এছাড়া গণতান্ত্রিক সরকারসমূহ অনেকসময় মতামত গ্রহণ (Polls) ও বাছাই পরীক্ষা (Preference Tests) এই ধরনের পদ্ধতির মাধ্যমেও জনমতকে পরিমাপ করার চেষ্টা করে।

খ· রাজনৈতিক দল

১। রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and nature of Political Parties)

বর্তমানে রাজনীতি বলতে প্রধানত সরকারের নীতিসমূহের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য জনগণ

ও গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বোঝায়। বিভিন্ন ধরনের সংগঠিত ও অসংগঠিত গোষ্ঠী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। রাজনৈতিক দল হল এক ধরনের স্বেচ্ছাকৃত রাজনৈতিক গোষ্ঠী।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কারণে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়—প্রথমত, নিরঙ্কুশ রাজার কর্তৃত্ব সীমিতকরণ এবং দ্বিতীয়ত, সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ভোটাধিকারের বিস্তার। যতদিন পর্যন্ত রাজারা একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং জনসাধারণের ভোট প্রদানের অধিকার ছিল না ততদিন দলীয় কার্যকলাপকে নিষ্ফল ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল বলে গণ্য করা হত।

আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছাড়া কল্পনা করা যায় না। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাজনৈতিক দল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ব্যবস্থাতেও রাজনৈতিক দলের ওপর যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করা হয়। সুতরাং বর্তমানে রাজনৈতিক দল সর্বত্রই বিরাজমান (Political parties today are omnipresent)।

কোনও রাজনৈতিক দলকে গঠনের উদ্দেশ্য, সদস্যদের প্রকৃতি, কাঠামো, কার্যাবলী এই ধরনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। জোসেফ সুম্‌পিটার (Joseph Schumpeter)-এর মতে "প্রতি রাজনৈতিক দলের প্রথম এবং প্রধানতম লক্ষ্য হল ক্ষমতায় আসার জন্য অথবা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য অন্য দলগুলির ওপর আধিপত্য বিস্তার করা" (The first and foremost aim of each political party is to prevail over the others in order to get into power or to stay in it)। এই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলগুলিকে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অবস্থিত অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে পৃথক করা হয়। জোসেফ লাপালোম্‌বারা (Joseph Lapalombara) বলেন যে "কোনও রাজনৈতিক দল হল একটি আনুষ্ঠানিক সংগঠন যার আত্মসচেতন প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল সেইসব ব্যক্তিদের সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ও বজায় রাখা যাঁরা একাকী অথবা মিলিতভাবে শাসনযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করবেন"। (A political party is a formal organisation whose self-conscious, primary purpose is to place and maintain in public office persons who will control, alone or in coalition, the machinery of Government)।

অস্টিন রেণীর (Austin Ranney) মতে গণতান্ত্রিক বা একনায়কতান্ত্রিক যে কোনও ব্যবস্থাতেই রাজনৈতিক দলের অন্তত নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়:

১। দল হল জনগণের সমষ্টি যাঁদের ক্ষেত্রে তাঁরা স্বয়ং ও অন্যেরা উভয়েই সাধারণভাবে একটি প্রতীক (label) প্রয়োগ করে থাকেন। (যেমন, ভারতে কংগ্রেস(ই), সি· পি· আই (এম) ইত্যাদি)।

২। এই ধরনের জনগণের কিছু অংশ সংঘবদ্ধ হন। তাঁরা সচেতনভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে তাঁদের দলের উদ্দেশ্যগুলিকে সফল করতে চেষ্টা করেন।

৩। বৃহত্তর সমাজ তাঁদের সংঘবদ্ধ হওয়ার ও তাঁদের দলের উদ্দেশ্য সাধনের দাবিকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেয়।

৪। দলের উদ্দেশ্য সহায়ক বহু কার্যকলাপ প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য দিয়ে কার্যকরী করা হয়।

৫। কোনও দলের মূল কার্যকলাপ হল সরকারী পদের জন্য প্রার্থীদের বাছাই ও মনোনয়ন করা।

এই সব বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও কুচক্রীদলের

পার্থক্য নির্দেশ করা হলে রাজনৈতিক দলের স্বরূপ বোঝা যাবে আরও ভালভাবে।

একদল ব্যক্তি কোনও অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, পেশাগত ইত্যাদি বিশেষ ও নির্দিষ্ট স্বার্থ নিয়ে সরকারকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করলে তাদের চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure Group) বলা হয়। বণিক সভা, শ্রমিক সংঘ, শিক্ষক সংস্থা ইত্যাদি হল চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদাহরণ। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ও সদস্যপদ সীমাবদ্ধ। এরা সর্বদা সরকারের বাইরে থেকে সরকারের ওপর চাপ দিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করার চেষ্টা করে। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল এদের উদ্দেশ্য নয়। অন্যদিকে রাজনৈতিক দল শাসনক্ষমতা দখল করে বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার কাজে প্রয়াসী হয়।

কুচক্রী দলের (Faction, coterie or clique) প্রধান উদ্দেশ্য হল নীতিজ্ঞানশূন্য হয়ে দলীয় নেতাদের ব্যক্তিগত বা সংকীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধি করা। অনেক সময় অনেক রাজনৈতিক দল বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে আদর্শ বিবর্জিত উপায়ে দলীয় স্বার্থ সিদ্ধি করার চেষ্টা করলে কুচক্রী দলে পরিণত হয়।

২। দলব্যবস্থার প্রকারভেদ (Types of Party system)

দলব্যবস্থা আলোচনার ক্ষেত্রে 'ব্যবস্থা' শব্দটির দ্বারা দলসমূহের সংখ্যা ও তাদের মধ্যে সম্পর্ককে বোঝায়। অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে তিন ধরনের দল ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায়। কোনও রাষ্ট্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকলে তাকে একদলীয় ব্যবস্থা (One party system) বলে। কোনও রাষ্ট্রে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখা গেলে তাকে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা (Two-party system) বলে। কোনও রাষ্ট্রে তিন বা ততোধিক রাজনৈতিক দলের অবস্থিতি দেখা গেলে তাকে বহুদলীয় ব্যবস্থা (Multi-party system) বলা হয়। তবে অনেকে বলেন যে সংজ্ঞা অনুসারে দল হল কোনও একটি সমগ্রের অংশ বিশেষ। অতএব দল বলতে অন্যান্য অংশের, এক্ষেত্রে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বকে বোঝায়। সুতরাং একদলীয় ব্যবস্থা এই বাক্যাংশটি প্রকৃতপক্ষে স্ববিরোধিতারই উদাহরণ, কারণ দল ব্যবস্থা বলতে সর্বদা একের অধিক দলের অবস্থিতিকে বোঝায়। অবশ্য দ্বি-দলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থা থেকে পৃথক করার জন্য একদলীয় ব্যবস্থাকে 'ব্যবস্থা' এই অ্যাখ্যা দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে একদলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্বকে অনেকে দলপ্রথার মূল চরিত্রের পরিপন্থী বলে মনে করেন। এর উত্তরে একদলীয় ব্যবস্থার সমর্থনকারীরা, বিশেষত সাম্যবাদীরা, বলেন যে, যেসব রাষ্ট্রে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন স্বার্থ ও বিভিন্ন শ্রেণী থাকে সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখা যায়। সাম্যবাদী সমাজে কোনও পরস্পর বিরোধী শ্রেণী দেখা যায় না বলে বিভিন্ন স্বার্থ রক্ষাকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পরিবর্তে সেখানে একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বই স্বাভাবিক।

তবে দলব্যবস্থাকে একদলীয়, দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় এই তিন ভাগে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে দলগুলির আপেক্ষিক শক্তি বা প্রভাব, তাদের সংগঠন, আদর্শগত পার্থক্য ইত্যাদি উপাদানগুলিকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র দলের সংখ্যার ওপরেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই দুটি দেশেই দ্বিদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও উভয় দেশের দলব্যবস্থার প্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ভারত ও নরওয়ে এই দুই দেশেই বহুদলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা গেলেও উভয় দেশের দলব্যবস্থার প্রকৃতি একরূপ নয়।

দলব্যবস্থাকে একদলীয়, দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করার চিরাচরিত পদ্ধতির পরিবর্তন ও সংশোধন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আধুনিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী। বস্তুত, বর্তমানে একদলীয়, দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থার নানা প্রকারভেদ করা হয় এইভাবে :

কোনও রাষ্ট্রে একদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল হিসাবে সরকারী দলের অস্তিত্ব থাকার ফলে দলীয় বিষয়ে জনসাধারণের পছন্দ থাকতে পারে না। দ্বি-দলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলি যেসব প্রধান কার্যকলাপের সাথে যুক্ত থাকে সেগুলি থেকে একদলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ স্বতন্ত্র। একদলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের সমর্থন লাভের জন্য সচেষ্ট থাকে, জনগণকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল করার চেষ্টা করে; নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারী কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নিয়োগ করে ও সরকারী নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সংবিধান অনুসারে ঐ দুটি রাষ্ট্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। ঐ দুটি রাষ্ট্রে সাম্যবাদী দল সমস্ত প্রকার সরকারী ও বেসরকারী কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই ধরনের একদলীয় ব্যবস্থাকে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী একদলীয় ব্যবস্থা (Totalitarian one party system) বলা হয়। এরূপ ব্যবস্থায় দলীয় আদর্শের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং দলের মাধ্যমেই শাসক গোষ্ঠীকে নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অসাম্যবাদী রাষ্ট্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকলেও ঐ দল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের সমস্ত দিক নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে না। এছাড়া ঐ একই দলের বিভিন্ন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। কেনিয়া ও ট্যানজেনিয়ায় এরূপ অসাম্যবাদী একদলীয় ব্যবস্থা (Non-Communist one party system) প্রচলিত আছে।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় অন্যান্য দলের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও মাত্র দুটি দল নির্বাচক মণ্ডলীর বিশাল অংশের সমর্থন লাভ করে এবং সরকার গঠনের প্রত্যাশা করে। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হল দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার উদাহরণ। তবে এই দুই দেশের ব্যবস্থার প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থাকে সুস্পষ্ট দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা (Distinct Two party system) আখ্যা দেওয়া হয়। এই দেশের শ্রমিক দল ও রক্ষণশীল দল আদর্শের দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। সর্বদাই দেখা যায় যে একটি দল সরকার গঠন করে ও অপর দল বিরোধী দল রূপে কাজ করে। সংগঠনের দিক দিয়েও দল দুটি কেন্দ্রীভূত ও সুশৃঙ্খল। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থাকে অস্পষ্ট দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা (Indistinct Two-party system) বলা হয়। এখানে ডেমোক্রাটিক ও রিপাবলিকান এই দুটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখা যায়। দলদুটি বিকেন্দ্রীভূত ও সংগঠনের দিক দিয়েও স্তরবিন্যস্ত নয়। মূলত নির্বাচনে সাফল্য লাভ করার লক্ষ্যের মধ্যে দল দুটি তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখে। আদর্শের দিক দিয়ে এই দুটি দলের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য দেখা যায় না।

ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেমন দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখা যায় ঠিক এর বিপরীতভাবে ফ্রান্স, জাপান, ইটালী নরওয়ে, সুইডেন, ভারত প্রভৃতি দেশে বহু প্রধান রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখা যায়। সুতরাং বহু দলীয় ব্যবস্থায় দুই এর অধিক রাজনৈতিকদল ক্ষমতা দখলের জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে।

নানা কারণে বহুদলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব হতে পারে। কোনও সমাজে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের মধ্যে বিরোধের জন্য বহু দলের সৃষ্টি হতে পারে। বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক গোষ্ঠীও পৃথক পৃথক রাজনৈতিক দল গঠনের মাধ্যমে তাদের স্বার্থ রক্ষার প্রচেষ্টা করতে পারে। এইভাবে কৃষক, শ্রমিক, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও অন্যান্য গোষ্ঠী পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারে। অনেক সময় সমাজে ক্ষমতাশালী শ্রেণীরা বহুদলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে ভাগ করে শাসন করার নীতিটি (Policy of divide and rule) বজায় রাখতে পারে। একবার কোনও রাষ্ট্রে বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত হলে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, দলীয় যন্ত্র এবং নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ইত্যাদি যান্ত্রিক ও

আইনগত উপায়ে তা রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়।

অনেকে বলেন যে কোনও রাষ্ট্রে বহু সংখ্যক রাজনৈতিক দল থাকা গণতন্ত্রের মৌলিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কারণ এরূপ ব্যবস্থায় সরকারী নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে বহু বিকল্প থেকে বাছাই করার ব্যাপক সুযোগ দেওয়া হয়। অন্যদিকে অনেক সময় বহু সংখ্যক দল থাকার ফলে সরকার দুর্বল হয়ে থাকে। ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানীতে বহুদলব্যবস্থা রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি বহুদলীয় রাষ্ট্র হলেও ঐসব দেশে অযথা রাজনৈতিক অস্থিরতা বা দলাদলির আধিক্যের পরিবর্তে স্থায়ী রাজনৈতিক অভিকর্ষ (Stable political gravity) পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং বহুদলীয় ব্যবস্থা বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে।

৩। বহুদলীয় ব্যবস্থার প্রকারভেদ (Types of Multi-party system)

একসময় ডেনমার্কের জনৈক প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন যে জনগণ অনেক সময় দ্বি-দলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যকে অতিরঞ্জিত করে থাকে। তিনি বলেন যে রাজনীতির উদ্দেশ্যই হল আপস মীমাংসার মাধ্যমে মতৈক্যে উপনীত হওয়া। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় দুটি দলের মধ্যে এরূপ আপস মীমাংসা করা হয়। বহুদলীয় ব্যবস্থাতেও বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে আপস মীমাংসা করা হয়ে থাকে। সুতরাং উভয় ব্যবস্থাতেই ফলাফল প্রায় একই ধরনের।

তবে বহু দলীয় ব্যবস্থা শব্দটি সবসময়ে সমার্থক নয়। কারণ যেসব রাষ্ট্রে দুই এর অধিক প্রধান রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখা যায় সেই সব রাষ্ট্রগুলি একই ধরনের নয়।

ডগলাস ডবলু রে (Douglas W. Rae) একটি সমীক্ষায় ২০টি পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলগুলি জনসাধারণের ভোটের কত অংশ অর্জন করেছে এবং আইনসভায় কটা আসন লাভ করেছে তার ভিত্তিতে দল ব্যবস্থাকে স্বল্প ভগ্নাঙ্ককৃত ব্যবস্থা (Less fractionalised system), মধ্যবর্তী ধরনের ভগ্নাঙ্ককৃত ব্যবস্থা (moderate fractionalised system) এবং অধিক ভগ্নাঙ্ককৃত ব্যবস্থা (more fractionalised system) বলে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে যে সব রাষ্ট্রে দলব্যবস্থা অধিক ভগ্নাঙ্ককৃত সেখানে তিন থেকে শুরু করে অনেক সময় পাঁচ বা ছটি রাজনৈতিক দল নিয়মিত যথেষ্ট পরিমাণে ভোট ও আইনসভায় আসন পেয়ে "প্রধান" (major) দল রূপে গণ্য হয়। অধিক ভগ্নাঙ্ককৃত ব্যবস্থাকে বহুদলীয় ব্যবস্থার একটি রূপ বলে ধরা যেতে পারে। আবার অনেক সময় কোনও রাষ্ট্রে বহু রাজনৈতিক দল ক্ষমতা লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও একটি দল নিয়মিত আইনসভায় যথেষ্ট পরিমাণে আসন লাভ করে প্রধান দল বলে পরিগণিত হয়।

সরকারের স্থায়িত্বের দিক দিয়ে বিচার করে বহুদলীয় ব্যবস্থাকে কার্যকর বহুদলীয় ব্যবস্থা (Working multi-party system) ও অস্থায়ী বহুদলীয় ব্যবস্থা (Unstable multi-party system) এই দুভাগে ভাগ করা যায়। এছাড়া দলের প্রাধান্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে প্রাধান্যকারী দল ব্যবস্থা (Dominant party system) এই শিরোনামায় বহুদলীয় ব্যবস্থার একটি তৃতীয় শ্রেণী চিহ্নিত করা যায়।

(ক) কার্যকর বহুদলীয় ব্যবস্থা—এই ব্যবস্থায় দুই এর অধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখা যায় ও দলব্যবস্থা সরকারের স্থায়িত্ব রক্ষা করে। সাধারণভাবে সবকটি দল রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এরূপ ব্যবস্থায় কখনও একটি দল আবার কখনও কয়েকটি দল মিলিত হয়ে সরকার (coalition government) গঠন করে। দলীয় অস্থিরতার জন্য সরকার যখন তখন পরিবর্তিত হয় না। কার্যকর বহুদলীয় ব্যবস্থায় দুই এর অধিক রাজনৈতিক দল

থাকলেও এই ব্যবস্থা, বিশেষত সরকারের স্থায়িত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে, সুস্পষ্ট দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার মত কাজ করে। কার্যকর বহুদলীয় ব্যবস্থার উদাহরণ হল নরওয়ে ও সুইডেন। বেলজিয়াম ও ইস্রায়েলেও বহু দল থাকা সত্ত্বেও সরকারের ঘনঘন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না।

(খ) অস্থায়ী বহুদলীয় ব্যবস্থা—অস্থায়ী বহুদলীয় ব্যবস্থায় বহু রাজনৈতিক দল থাকার ফলে সরকারের স্থায়িত্ব দেখা যায় না। এরূপ ব্যবস্থায় সাধারণত বহু দলের সমন্বয়ে সরকার গঠন করা হয়। ফলে দলগুলির মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলেই সরকার পরিবর্তিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনও রাজনৈতিক দল একাকী যথেষ্ট শক্তিশালী না হওয়ার জন্য রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা যায়। ফরাসী দেশে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের সময়ে বহু রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে সরকার গঠিত হত বলে প্রায়ই সরকারের উত্থান ও পতন ঘটত। ইদানীংকালে ইটালীকে অস্থায়ী বহুদলীয় ব্যবস্থার উদাহরণ বলে গণ্য করা যায়। ইটালীর পার্লামেন্টে কমপক্ষে আটটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব দেখা যায় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কোনও সময়েই কোনও দল ইটালীর পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হয় নি।

(গ) প্রাধান্যকারী দল ব্যবস্থা—প্রাধান্যকারী দল ব্যবস্থায় বহু রাজনৈতিক দল থাকলেও এবং দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে স্বীকার করা হলেও অন্যান্য সমস্ত দলকে ম্লান করে দিয়ে একটি মাত্র দল প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। ভারত হল এই ধরনের দলব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। সংবিধান অনুসারে শাসনকার্য শুরু হওয়ার পর থেকে স্বল্পসময় বাদে (যখন জনতা দল সরকার গঠন করে) অবিভক্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দল ও বর্তমানে কংগ্রেস (ই) দল ভারতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রাধান্যপূর্ণ ভূমিকায় অবস্থিত আছে। অন্যান্য দলগুলি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও এবং পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করলেও কেন্দ্রে শাসকদল রূপে অধিকাংশ সময়েই একটি দল কাজ করে। ভারতের পার্লামেন্টে শক্তিশালী বিরোধী দলেরও অভাব পরিলক্ষিত হয়। জাপানকেও প্রাধান্যকারী দলব্যবস্থা রূপে গণ্য করা যেতে পারে। ১৯৬০ সনের পর থেকে ঐ দেশে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দল (Liberal Democratic party) একমাত্র শাসকদল রূপে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে এবং আইনসভায় (Diet) কোনও কার্যকর বিরোধীদলেরও অস্তিত্ব দেখা যায় না।

৪। রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী (Functions of Political Parties)

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা ও বজায় রাখার কাজ হল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলির মুখ্য লক্ষ্য। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলি অন্যান্য যে সব কাজ করে যাকে সেগুলিকে উল্লেখযোগ্য উপজাত (significant by-products) বলে গণ্য করা যেতে পারে।

১। রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ হল রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে যে সংগ্রাম চলে তাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করা। যে কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরস্পর বিরোধী আদর্শ ও স্বার্থসম্বলিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। জনসাধারণের সমর্থন লাভ করে যে দল নির্বাচনে জয়ী হয় তারা সরকার পরিচালনায় দায়িত্ব গ্রহণ করে। শাসন কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দল সর্বদা নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রদত্ত নীতি ও কার্যক্রমকে রূপায়িত করার জন্য সচেষ্ট থাকে। যে সব দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না তারা বিরোধী দল রূপে কাজ করে। সরকারী দল ও বিপক্ষ দল উভয়েই সর্বদা জনমত অনুসারে তাদের কার্যকলাপ পরিচালনা করার চেষ্টা করে। শাসকদল ও বিরোধীদল উভয়কেই সর্বদা বাস্তব পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

২। রাজনৈতিক দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে ঐক্যবদ্ধ, সহজতর এবং স্থিতিশীল করা। আধুনিক রাষ্ট্রগুলি আয়তনে বৃহৎ, এদের নির্বাচকমণ্ডলীও বিশাল। অনেক রাষ্ট্রের

বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগণ বসবাস করে। রাজনৈতিক দলসমূহ যে কোনও রাষ্ট্রে ভৌগোলিক দূরত্ব ও আঞ্চলিক বা সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে অতিক্রম করে বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা আনয়নের চেষ্টা করে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। যে সব রাষ্ট্রে বহুধাবিভক্ত সরকারী কাঠামো প্রচলিত থাকে সেখানে দলগুলি বিভিন্ন অংশকে একত্রিত করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সমগ্র দেশব্যাপী বৃহৎ রাজনৈতিক দল সমূহের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্বার্থের উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করা হয় এবং এই ধরনের দল কেন্দ্র ও আঞ্চলিক সরকার সমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষা করে। রাষ্ট্রপতি চালিত শাসন ব্যবস্থায় শাসন-বিভাগ ও আইনবিভাগের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোনও যোগাযোগ না থাকলেও দলের মাধ্যমে উভয় বিভাগের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির ফলে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালিত হয়। মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যদের মধ্য থেকে প্রকৃত শাসন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। এই ধরনের সরকারের সাফল্য সম্পূর্ণরূপে দলব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে। সুতরাং রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের অবদান অপরিসীম।

৩। রাজনৈতিক দলগুলি জনসাধারণকে নির্বাচকরূপে ও সচেতন নাগরিকরূপে শিক্ষিত ও সক্রিয় করে তোলে। গণসংযোগ ব্যবস্থা ও স্থানীয় সংগঠন সমূহের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক দিক্‌ দিয়ে অপেক্ষাকৃত উদাসীন ব্যক্তিদের সক্রিয় করার চেষ্টা করে। গণসমাবেশ, পোস্টার, প্রচার-পত্র, বিক্ষোভ প্রদর্শন, সভাসমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে নির্বাচনের পূর্বে ও নির্বাচনের পরে রাজনৈতিক দলগুলি জনগণের সাথে সংযোগ রক্ষা করে। জনসাধারণের সমর্থন লাভের জন্য এবং তাদের বিশেষ স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজনৈতিক দলসমূহ অনেক অরাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালিত করে থাকে। এইভাবে রাজনৈতিক দলগুলি শ্রমিক সংঘ, বণিক সভা, কৃষি সংস্থা, ছাত্র সংস্থা ইত্যাদি পরিচালনা করে।

৪। রাজনৈতিক দলসমূহ ভাব বা আদর্শের প্রচারক (broker of ideas) রূপেও কাজ করে। জনসমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে দলগুলি সর্বদা দলীয় নীতি ও কার্যক্রমকে সভাসমিতি, পত্র পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার করে। প্রতিটি দলের এক একটি আদর্শ থাকে এবং ঐ আদর্শের ভিত্তিতে ঐ দলকে অন্য দলের থেকে পৃথক করা যায়। এই কারণে প্রতিটি দল প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে তাদের আদর্শ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য সচেষ্ট থাকে। আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে দলগুলি জনসাধারণের নিকট সমস্যাদি উপস্থাপিত করে এবং সেগুলির সমাধানের পথ স্থির করে।

৫। রাজনৈতিক দলসমূহ জনমত গঠনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। নির্বাচনের পূর্বে ও সাধারণ সময়ে রাজনৈতিক দলসমূহ জনসাধারণকে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করার মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক দিক দিয়ে সক্রিয় করে তোলে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল সরকারের কার্যকলাপ জনপ্রিয় করে তোলার জন্য জনগণের মধ্যে নিরন্তর প্রচার চালায়। বিরোধী দলগুলি সরকারের দোষত্রুটিগুলি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করে। এইভাবে প্রচারের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলসমূহ জনমত গঠন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা করে।

৬। রাজনৈতিক দলসমূহ রাজনৈতিক নেতাদের বাছাই করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদন করে। আজকের দিনে নেতৃত্ব প্রদান করা একটি উল্লেখযোগ্য কাজ এবং অধিকাংশ রাষ্ট্রেই রাজনৈতিক দলই হল রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রধান উৎস। সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ব্যবস্থায় একমাত্র দলের মাধ্যমেই শাসক গোষ্ঠী তৈরী হয়ে থাকে। সুদক্ষ স্থায়ী দলীয় সহায়ক বাহিনী (cadre) গড়ে তোলার জন্য অনেক সময় রাজনৈতিক দলগুলি সদস্যদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেখানে একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে সেখানে রাজনৈতিক দল যেসব দায়িত্ব পালন করে তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হল : সরকারের মূল নীতি ও কার্যকলাপ

নির্ধারণ করা, সরকারী আমলাদের কার্যকলাপের ওপর লক্ষ্য রাখা, জনসাধারণকে দলীয় মতবাদে উদ্বুদ্ধ করা, সদস্যদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে দলীয় নেতৃত্বের জন্য উপযুক্ত করে তোলা রাজনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিয়োগ করা বা ঐ সব নিয়োগের অনুমোদন করা।

৫। গণতন্ত্রে দলব্যবস্থার গুরুত্ব (Importance of the Party system in Democracy)

গণতান্ত্রিক দলগুলি ব্যতীত আধুনিক গণতন্ত্রের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। বাস্তবে দেখা যায় যে দল-ব্যবস্থার প্রকৃতি হল কোনও বিশেষ রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বরূপ উপলব্ধি করার শ্রেষ্ঠ উপায়। সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলি আধুনিক সরকারের কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক অনুষঙ্গ নয়; তারা আধুনিক সরকারের কেন্দ্র এবং শাসনব্যবস্থায় তারা একটি সিদ্ধান্তকারী ও সৃজনী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় গণ অংশগ্রহণের সুযোগ সুবিধা প্রদান করার ফলে দুটি প্রয়োজন অনুভূত হয়। প্রথমত, রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপকে যথাযথ পথে পরিচালিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। সরকার পরিচালনার নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে কোনও সাধারণ আলোকপাত ব্যতীত শুধুমাত্র লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিগত ভোট গণনা করার ফলে অরাজকতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শাসিতদের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সরকার কেবলমাত্র এইভাবে গণনার ভিত্তিতে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভোট প্রদানকারী জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করাও আবশ্যক। এইরূপ প্রতিষ্ঠান হল আইনসভা এবং আইনসভার মাধ্যমে প্রতিনিধিরা বিতর্ক ও আলোচনা করতে পারে।

দল ব্যবস্থা এই দুটি প্রয়োজনই মেটায়। দল ব্যবস্থার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ নাগরিকদের ভোট সংঘবদ্ধ করা হয়ে থাকে। আইনসভার কার্যকলাপকেও দল ব্যবস্থার মাধ্যমে সক্রিয় ও সঠিকভাবে পরিচালিত করা সম্ভব হয়। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলি এইভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সংযোগ সাধন করে থাকে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলগুলি হল যন্ত্রবিশেষ যাদের মাধ্যমে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হতে পারে এবং এই প্রয়াসে যাঁরা সফল হন তাঁরা ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন। আবার রাজনৈতিক দলগুলির মাধ্যমেই জনসাধারণ সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সুতরাং গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলি থাকার নানাধরণের সুবিধা দেখা যায়।

৬। দলব্যবস্থার সুবিধা (Advantages of the Party system)

গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে দলব্যবস্থার কতকগুলি অনস্বীকার্য সুবিধা হল নিম্নরূপ :

প্রথমত, দলব্যবস্থা জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়ে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক দলগুলি ব্যতীত বহু ব্যক্তিই রাজনৈতিক বিষয়ে উদাসীন থাকত। সুতরাং সাধারণ ব্যক্তির রাজনৈতিক অভিমত গঠনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, কোনও রাষ্ট্রে দলব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে সর্বদা আলোচনা ও তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে কোনও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। ক্ষমতাসীন দল কোনও অযৌক্তিক কাজ করলে বিরোধী দলগুলি সর্বদা তাতে বাধা প্রদান করার চেষ্টা করে ও ঐ বিষয়ে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। এর ফলে সুষ্ঠুভাবে আইন প্রণয়ন ও শাসনকার্য পরিচালিত হয়।

তৃতীয়ত, মন্ত্রিপরিষদ চালিত শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দলের মাধ্যমেই শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হয়ে সরকারের কার্যসম্পাদন করে। রাষ্ট্রপতি চালিত শাসন-ব্যবস্থাতেও দলব্যবস্থার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসনবিভাগের সঙ্গে আইনবিভাগের যোগসূত্র রক্ষা করা হয়ে থাকে।

চতুর্থত, গণতান্ত্রিক মানদণ্ডের বিচারে দলব্যবস্থার আর একটি প্রধান সুবিধা এই যে এটি সর্বদা সম্ভাব্য বিকল্প সরকার গঠনের ব্যবস্থা করে এবং নির্বাচকমণ্ডলী বিকল্পের মধ্য থেকে তাদের পছন্দমত শাসক বাছাই করার সুযোগ পেয়ে থাকে।

পঞ্চমত, দলব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেকোনওদলীয় নেতা বা ক্ষমতাসীন দল স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে না। কোনও দলীয় নেতা যথেচ্ছাচারী হয়ে উঠলে তাকে তার পদ থেকে ও দল থেকে অপসারণ করা যায়। ক্ষমতাসীন দল আবার বিরোধীদল এবং জনমতের ভয়ে স্বৈরাচারী হওয়ার সাহস পায় না। সুতরাং দলপ্রথা প্রবর্তিত থাকার ফলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বা সাংবিধানিক পদ্ধতিতে জনমত অনুসারে সরকার পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। ম্যাক আইভার (Mac Iver) বলেন যে দলব্যবস্থা ব্যতীত সরকার পরিবর্তনের একমাত্র উপায় হল জোর করে দখল, বৈপ্লবিক পরিবর্তন অথবা বিপ্লব।

ষষ্ঠত, রাজনৈতিক দলগুলি দরিদ্রতম ব্যক্তিদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দান করে। বর্তমান কালে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এক ব্যয়বহুল ব্যাপার। কোনও সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে এই ব্যয়ভার একাকী বহন করা সম্ভব নয়। দলগুলি তাদের তহবিল থেকে নির্বাচনী ব্যয় সঙ্কুলানের ব্যবস্থা করে থাকে।

৭। দলব্যবস্থার অসুবিধা (Disadvantages of the Party system)

দলব্যবস্থা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পক্ষে অপরিহার্য হলেও এর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটিও অস্বীকার করা যায় না।

প্রথমত, অনেক সময় অতিরিক্ত দলীয় নিয়ন্ত্রণ, কঠোর দলীয় শৃঙ্খলা ও দলীয় সংহতি বজায় রাখার চেষ্টা করার ফলে ব্যক্তিগত উদ্যম বিনষ্ট হয়। এইভাবে ব্যক্তিগত মতামত ও কার্যকলাপ দমন করার ফলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার একটি আবশ্যক শর্ত বিনষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ত, দলগুলি অনেকসময় যে কোনও প্রকারে জনসমর্থন লাভের জন্য চেষ্টা করে থাকে। সরকারী দল সর্বদা তাদের ত্রুটিগুলি যথাসম্ভব লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে সাফল্যের দিকের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং বিরোধীদলগুলি সরকারের ব্যর্থতাকে ফলাও করে সমালোচনা করে। এইভাবে রাজনৈতিক দলগুলি বহুক্ষেত্রে মিথ্যা অপপ্রচারের দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্তও করে থাকে।

তৃতীয়ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনও রাজনৈতিক দলকে প্রকৃতপক্ষে পরিচালনা করে এক দলীয় নেতৃগোষ্ঠী। সুতরাং বহু ব্যক্তি শাসনকার্যের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও ঐ সব নেতারা প্রকৃতপক্ষে সরকারের কাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন। এই জন্য অনেকে বলেন যে দলব্যবস্থার মাধ্যমে গণতন্ত্র বাস্তবে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির শাসনে (oligarchy) পরিণত হয়।

চতুর্থত, দলব্যবস্থার মাধ্যমে অনেক সময় জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে ক্ষুদ্র দলীয় ও আঞ্চলিক স্বার্থকে বড় করে দেখা হয়। এইজন্য দলব্যবস্থার অবস্থিতির ফলে অনেকসময় আইনসভা এমন-কি সমগ্র রাষ্ট্র পর্যন্ত কয়েকটি পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে। এর ফলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়, সঙ্কীর্ণ দলীয় মনোভাব থেকে অনেকসময় রাজনৈতিক হত্যা, সংঘর্ষ ইত্যাদিও দেখা যায়।

পঞ্চমত, অনেকসময় জ্ঞানীগুণী ও বিদ্বান ব্যক্তিরা দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে চান না বলে তাঁরা শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

ষষ্ঠত, ক্ষমতাসীন দলের নেতারা অনেকসময় সরকারীপদ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলি তাঁদের আত্মীয়স্বজন ও ঘোর সমর্থকদের মধ্যে বিতরণ করে থাকেন। এইভাবে দলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে

অনেক সময় স্বজনপোষণ, উৎকোচ প্রদান ইত্যাদি ধরনের দুর্নীতি ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। পরিশেষে বলা যায় যে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে অনেক সময় রাজনৈতিক দলসমূহ পুঁজিপতিদের অর্থে পরিপুষ্ট হয়ে তাঁদের স্বার্থে পরিচালিত হয়। এর ফলে সমাজের সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

অধ্যায় ৬

সর্বজনীন ভোটাধিকার

১। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার—প্রকৃতি (Universal Adult Franchise—Nature)

গণতন্ত্রকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে বা এর বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করা যেতে পারে কিন্তু প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্র বলতে সর্বদা এমন একটি ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে জনসাধারণকে ক্ষমতার চূড়ান্ত ধারক বলে গণ্য করা হয় এবং সরকার তাদেরই প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। জনসাধারণের ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠানগত অর্থে বাস্তবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতিকে গণতন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলে অভিহিত করা যেতে পারে। নিঃসন্দেহে এর সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল ভোটাধিকারের প্রসারণ।

অবশ্য গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনীতিতে সর্বসাধারণের অংশগ্রহণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি বর্তমানকালের সাফল্য। যেসব রাষ্ট্র আজকের দিনে গণতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ সেগুলি ঊনবিংশ শতকের প্রথমদিকে স্বল্প কয়েকজনের দ্বারা শাসিত হত। যদিও ঐ শতকের শেষে অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরা ভোটাধিকার অর্জন করে, কিন্তু বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের আগে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই এই অধিকার যথোপযুক্তভাবে প্রসারিত হয়নি।

আধুনিক কালে শাসনব্যবস্থার একটি রূপ হিসাবে গণতন্ত্রের অর্থ হল প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের বিশাল আকৃতি ও জটিলতার জন্য জনসাধারণের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। সমস্ত নাগরিকদের সরকারী কাজে অংশগ্রহণ করার সময়ও থাকে না এবং আধুনিক সরকারের কার্যকলাপ উপলব্ধি করার মত যোগ্যতা ও উৎসাহও থাকে না। এই কারণে ধীরে ধীরে প্রতিনিধিত্বের ধারণাটির উদ্ভব হয়।

নাগরিকদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক বাছাইকরা ব্যক্তি যাঁরা সমস্ত নাগরিকদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ও তাঁদের হয়ে কাজ করেন তাঁদের প্রতিনিধি বলা হয়। কালক্রমে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা এইভাবে গড়ে উঠেছে যাতে নির্বাচনের মাধ্যমে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের বাছাই করা যায়।

সুতরাং প্রতিনিধিত্বের ধারণার সঙ্গে ভোটাধিকারের ধারণাটি জড়িত। যে সমস্ত ব্যক্তি ভোটাধিকার ভোগ করেন তাঁদের সমষ্টিগতভাবে নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়। জন প্রতি, এক ভোট (One man, one vote) এবং প্রতি ভোট সমমূল্য (Each vote, equal value) হল গণতন্ত্রের নীতিবাক্য। সর্বজনীন ভোটাধিকার বলতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, সম্পদ, প্রভাব নির্বিশেষে রাষ্ট্রে বসবাসকারী সমস্ত মানসিক সুস্থতাবিশিষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকারকে বোঝায়।

প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকরা ভোটাধিকার অর্জন করার আগে পর্যন্ত জনগণের দ্বারা সরকার এই ধারণাটি প্রকৃতপক্ষে বাস্তবায়িত হয় নি। কিন্তু এই অধিকারটি প্রতিষ্ঠা করতে প্রায় এক শতাব্দী সময় অতিবাহিত হয়। কয়েকটি পাশ্চাত্য রাষ্ট্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রবর্তিত হয়; অন্যান্য রাষ্ট্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই অধিকারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বেশ কয়েকটি বিপ্লব ও হাজার হাজার জীবনের বিনিময়ে অবশেষে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার মানুষকে নাগরিকরূপে ভূষিত করেছে।

উনবিংশ শতকে ধর্মনিরপেক্ষ ধারণার সাধারণভাবে বিস্তারের ফলে ধর্মক্ষেত্রে পরমত-অসহিষ্ণুতা (Religious intolerance) ক্রমশ দূরীভূত হয়ে যায়। কালক্রমে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয় যে পৌর আনুগত্যের সঙ্গে ধর্মীয় বশ্যতার কোনও যোগসূত্র নেই এবং বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা সুনাগরিক ও সুপ্রতিবেশীরূপে পাশাপাশি বাস করতে পারে।

অধিকাংশ রাষ্ট্রেই নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক বাধা সমূহকে (Economic barriers) দূর করা হতে থাকে। প্রথমে মধ্যবিত্ত ও পরে নিম্নবিত্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ভোটাধিকার প্রসার করা হয়। অবশেষে ভোটাধিকারকে আয় ও সম্পত্তি নির্বিশেষে একটি নাগরিকতার অধিকাররূপে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

পূর্বে স্ত্রী-পুরুষ বিচারেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত নারীদের পুরুষদের তুলনায় রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট বলে গণ্য করা হত। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সামরিক বাহিনীকে নারীদের সহায়তা ও বেসামরিক কাজে নারীরা যে ভূমিকা গ্রহণ করেন তার ফলে বহু রাষ্ট্রেই নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। আজকের দিনে বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রেই নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত।

বর্ণবিদ্বেষের (Racial Prejudice) কারণেও পূর্বে কয়েকটি রাষ্ট্রে, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, একটি বিশাল সংখ্যক জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত। শিক্ষাগত যোগ্যতা বা সাক্ষরতা পরীক্ষাকে (literacy test) অনেক সময় ভোটাধিকারের একটি যোগ্যতারূপে গণ্য করা হত। নীতিগতভাবে এই যোগ্যতাকে অস্বীকার করা না গেলেও প্রতিটি নাগরিককে শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ প্রদান করা না হলে এই যোগ্যতা নির্ণায়ক শর্তকে সমর্থন করা যায় না।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে পরমত-অসহিষ্ণুতা, অর্থনৈতিক বাধাসমূহ, স্ত্রী-পুরুষ বিচারে বৈষম্য, বর্ণবিদ্বেষ, শিক্ষাগত অসাম্য এই সকল প্রতিবন্ধকতা সমাজের মধ্যে থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজে গণতান্ত্রিক ধারণার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এইসব প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায়। বহু শতাব্দী ধরে অধিকাংশ সমাজেই কুসংস্কার, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, কঠোর সামাজিক ও শ্রেণী বৈষম্য ইত্যাদি সামাজিক কারণে ব্যক্তিদের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পৃথকীকরণ করা হত। এই সব বিচ্ছিন্নকারী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র একটি ঐক্যসাধনকারী শক্তিরূপে কাজ করে। সামাজিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠান সমূহের দ্বারা বিভক্ত ব্যক্তিদের গণতন্ত্রের মাধ্যমে একত্রিত করা হয়।

আধুনিক গণতন্ত্রের একটি মৌলিক শর্ত হল সমস্ত নাগরিকদের নির্দিষ্ট সময়ান্তরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার প্রদান করা যাতে তাঁরা বিভিন্ন প্রার্থী ও কার্যসূচীর মধ্যে প্রকৃত বাছাই এর কাজটি করতে পারেন। সুতরাং ভোটাধিকারকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক বিপ্লব রূপে গণ্য করা যায়

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে সর্বজনীন ভোটাধিকার বর্তমানে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। কিন্তু বাস্তবে বিশ্বের প্রগতিশীল রাষ্ট্রসমূহে ও কয়েক শ্রেণীর ব্যক্তিদের—শিশু, বিদেশী এবং দণ্ডপ্রাপ্ত ও মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের—ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য প্রায় অধিকাংশ রাষ্ট্রেই স্বীকৃত প্রধান যোগ্যতা বা শর্তগুলি হল : নাগরিকতা, নির্দিষ্ট বয়স ও বসবাস। ভোটাধিকার হল সর্বাপেক্ষা প্রধান রাজনৈতিক অধিকার। এই অধিকারটি রাজনৈতিক আনুগত্যের সঙ্গে যুক্ত। এইজন্য নাগরিকতাকে সাধারণত ভোটাধিকারের একটি শর্তরূপে গণ্য করা হয়। কোনও রাষ্ট্রে সাময়িকভাবে বসবাসকারী বিদেশীরা নিজ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দেখান। এইজন্য কোনও রাষ্ট্রেই তাঁদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয় না।

ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য ব্যক্তিদের বিচার-জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। এইজন্য ভোটাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিটি রাষ্ট্রেই একটি ন্যূনতম বয়স স্থির করা হয়। বর্তমানে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রভৃতি রাষ্ট্রে ১৮ বছর পূর্ণ হলে ব্যক্তিদের প্রাপ্তবয়স্ক রূপে গণ্য করে ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। ভারতে ২১ বছর বয়স পূর্ণ না হলে কোনও ব্যক্তিকে ভোটাধিকার প্রদান করা হয় না।

কোনও একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় একটি ন্যূনতম সময় পর্যন্ত বসবাস করাকে সাধারণত ঐ নির্বাচন এলাকা থেকে কোনও ব্যক্তির ভোটদানের একটি শর্ত রূপে গণ্য করা হয়। এই শর্তের কারণ হল এই যে, যে নির্দিষ্ট এলাকা থেকে কোনও ব্যক্তি ভোটদান করছেন সেই অঞ্চলের অবস্থা ও সমস্যাসমূহ সম্পর্কে তিনি সচেতন থাকবেন বলে প্রত্যাশা করা হয়।

এইসব যোগ্যতার শর্ত সাধারণত সকল রাষ্ট্রেই প্রচলিত আছে। এইসব শর্ত সাপেক্ষে নাগরিকদের ভোটদান ক্ষমতাকে স্বীকার করে নেওয়া হলে তাকে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার বলা হয়।

২। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের পক্ষে যুক্তি (Arguments for Universal Adult Franchise)

প্রথমত, সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার হল একটি গণতান্ত্রিক নীতি যার মাধ্যমে যে সব ব্যক্তি সরকার গঠন করেন তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে নাগরিকরা সুযোগ পান। বাস্তবে যে রাষ্ট্রে যত অধিক পরিমাণে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটাধিকার স্বীকার করা হয় সেই রাষ্ট্র ততখানি গণতান্ত্রিক আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে গণ্য হয়।

দ্বিতীয়ত, সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার হল একমাত্র পদ্ধতি যার মাধ্যমে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ সাম্য প্রদান করা সম্ভব।

তৃতীয়ত, আইনসভা যাতে সামগ্রিকভাবে জনসাধারণকে প্রতিনিধিত্ব করে তা নিশ্চিত করার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় হল সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রবর্তন করা।

চতুর্থত, কোনও রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনসাধারণের বিভিন্ন অংশকে যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্ব প্রদান করার জটিল সমস্যা সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রদানের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব।

পঞ্চমত, সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শিক্ষা, সম্পদ ও প্রভাব নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে ভোটদান ক্ষমতা প্রদান করা হয় বলে বিশেষ নির্বাচনব্যবস্থা উদ্ভাবন করার প্রয়োজনীয়তাকে এড়ানো যায়। রাজনৈতিক আদর্শ ও উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তিশীল দলসমূহ উদ্ভবের ক্ষেত্রেও সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার সহায়তা করে।

ষষ্ঠত, সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার ফলে প্রতিটি নাগরিক তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বিকাশ করতে পারেন। ভোটাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিরা রাজনৈতিক বিষয়সমূহ সম্পর্কেও সচেতন থাকেন।

৩। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against Universal Adult Franchise)

দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে অবশেষে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই আন্দোলন চলাকালে বহু বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই অধিকারকে সুবিবেচনাহীন ও বিপজ্জনক বলে গণ্য করে এর বিরোধিতাও করেন। সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেওয়া যেতে পারে :

প্রথমত, লেকী (Lecky), মিল (Mill), স্যার হেনরি মেইন (Sir Henry Maine) প্রমুখ কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে যেসব ব্যক্তি যথাযথভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার উপযুক্ত নন তাঁদের ভোটাধিকার প্রদান করা যুক্তিযুক্ত নয়। লেকী গণতন্ত্রকে অজ্ঞ জনতার দ্বারা পরিচালিত সরকার বলে গণ্য করেন। তাঁর মতে দরিদ্রতম, সর্বাপেক্ষা অজ্ঞ ও অযোগ্য অথচ সংখ্যার দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক —এমন ধরনের ব্যক্তিদের চরম ক্ষমতা প্রদান করার তত্ত্বটি মানবতার পূর্ব অভিজ্ঞতার বিরোধী। তিনি বলেন যে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল কখনও প্রকৃত জনমতকে প্রতিফলিত করে না। কারণ এরূপ নির্বাচনে বহু সংখ্যক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি বা সংস্থার নির্দেশে বা এলোমেলোভাবে না বুঝে ভোট প্রদান করেন। এই কারণে তিনি শিক্ষা ও সম্পত্তির ওপর ভিত্তি করে ভোটদানের অধিকার প্রদান করাকে সমর্থন করেন। তাঁর মতে যেহেতু আইনসভা প্রধানত একটি করধার্যকরী সংস্থা সেই জন্য যেসব ব্যক্তি কর প্রদান করে প্রধানত তাঁদের নিয়ে গঠিত নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা আইনসভার সদস্যদের নির্বাচন করা উচিত।

জন স্টুয়ার্ট মিল ভোটদানের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে নির্বাচকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর মতে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন করার আগে সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত (Universal education should precede universal enfranchisement)। তাঁর মতে, সামান্য লিখতে পড়তে না জানলে এবং পাটিগণিতের সাধারণ জ্ঞান না থাকলে কোনও ব্যক্তিকে ভোটদানের অযোগ্য বলে বিবেচনা করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, অনেকে নারীদের রাজনৈতিক কাজের অনুপযুক্ত বলে মনে করে তাদের ভোটদানের বিরোধিতা করতেন। বাস্তবেও দেখা যায় যে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার আন্দোলনের ফলে পৃথিবীতে বহু দেশে প্রথমে কেবলমাত্র পুরুষদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছিল।

তৃতীয়ত, অনেক লেখক মনে করেন যে সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রবর্তন করা মূল্যহীন। তাঁদের মতে যে কোনও সমাজে অর্ধভুক্ত ও অর্ধনগ্ন ব্যক্তিদের কাছে ভোটাধিকার থাকা অথবা না থাকা সমান।

চতুর্থত, বহু লেখকের মতে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে নাগরিকদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করা হয় এই যুক্তি সঠিক নয়। তাঁরা বলেন যে ভোটাধিকারের দ্বারা নাগরিকরা কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রতিনিধিদের নির্বাচন করার সুযোগ পান। কিন্তু নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার পর প্রতিনিধিরা তাঁদের দলীয় বা স্বীয় স্বার্থ অনুসারে কাজ করে থাকেন। এক্ষেত্রে রুশোর একটি বিখ্যাত উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন যে ইংরাজরা নিজেদের স্বাধীন বলে মনে করে ; কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল ; যেই সদস্যরা নির্বাচিত হয়ে যান জনগণ আবার ক্রীতদাসে পরিণত হন (The English people believes itself to be free; it is gravely mistaken; it is free only during the election of Members of Parliament; as soon as the Members are elected, the people is enslaved)।

পঞ্চমত, নির্বাচক মণ্ডলীকে যদি বিভিন্ন প্রার্থী, দল ও কর্মসূচীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বাছাই বা পছন্দ করার সুযোগ দেওয়া না হয় সেক্ষেত্রে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার অর্থহীন হয়ে পড়ে। কোনও রাষ্ট্রে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রচলিত থাকলেও যদি নির্বাচকমণ্ডলী অসামরিক বন্দী শিবির বা অন্য ধরনের রাজনৈতিক প্রতিশোধের ভয়ে প্রচলিত প্রশাসন ও তার নীতিসমূহ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁদের ইচ্ছাকে প্রকাশ করতে না পারেন সে ক্ষেত্রে প্রকৃত গণতন্ত্রের অস্তিত্ব দেখা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে সরকার পরিবর্তনের জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটদানের ক্ষমতা হল গণতন্ত্রের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। কিন্তু যে সব রাষ্ট্রে এই ক্ষমতা স্বাধীন ও

নির্ভীক ভাবে প্রয়োগ করার মত পরিবেশ না থাকে সেখানে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার সম্পূর্ণ মূল্যহীন।

৪। নারীদের ভোটাধিকার (Women Franchise)

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাকে পুরুষদের একচেটিয়া অধিকাররূপে গণ্য করা হত। এইজন্য ঐ সময়ে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহেও নারীদের স্বেচ্ছাকৃতভাবেই ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত। তৎকালীন বিশ্বে কেবলমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রে ভোটাধিকার সীমাবদ্ধকরণকে গণতান্ত্রিক নীতি অথবা শাসিতদের সম্মতির মতবাদের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে বিবেচিত হত/না। তবে গণতান্ত্রিক ধারণার প্রসার ও পুরুষদের ক্ষেত্রে ভোটাধিকারের বিস্তৃতিকরণের পাশাপাশি নারীদের ভোটাধিকারের আন্দোলনও সমানে চলে। ১৮৯৩ সনে নিউজিল্যাণ্ডে নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করার পর থেকে বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্রেই ধীরে ধীরে নারীদের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। ১৯১৮ সনে ব্রিটেনে প্রথম সীমাবদ্ধ আকারে নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। এরপর ১৯২৮ সনে তাঁদের পুরুষদের সঙ্গে সমান ভোটাধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯১৭ সনে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০ সনে সর্বপ্রথম নারীদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। ১৯৭০ সনে গ্যালাপ পোল (Gallup Poll - একধরণের সমীক্ষা ভোট) অনুসারে সুইজারল্যাণ্ডকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাসিত দেশ বলে গণ্য করা হলেও ১৯৭১ সন পর্যন্ত ঐ দেশে নারীরা জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন। যাই হোক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতা থেকে নারীমুক্তির আন্দোলনের (Women's Lib) ফলে আজকে বিশ্বের স্বল্প দু'একটি রাষ্ট্র ব্যতীত সর্বত্রই নারীদের ভোটাধিকারকে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্যরূপে গণ্য করা যেতে পারে।

৫। নারীদের ভোটাধিকারের বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against Women Suffrage)

নারীদের ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে প্রদত্ত যুক্তিসমূহ খুব জোরালো নয়। অধিকাংশ যুক্তিই অত্যন্ত তুচ্ছ এবং নিছক তর্কের খাতিরে এগুলি প্রদান করা হয় বলে মনে হয়। আজকের দিনে এই সব যুক্তির অধিকাংশই মূল্যহীন।

১। নারীদের ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি ছিল এই যে তাদের সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ প্রদান করা হলে তাদের নারীসুলভ গুণাবলী বিনষ্ট হবে।

২। অতীতে একটি ধারণা প্রচলিত ছিল যে নারীদের প্রকৃতিই হল গার্হস্থ্য জীবন পরিচালনা করার পক্ষে উপযুক্ত এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপের অনুপযুক্ত। নারীরা রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করলে তাঁরা গৃহস্থালী কাজকর্ম দেখাশুনা করতে পারবেন না যার ফলে পারিবারিক কল্যাণ ব্যাহত হবে। ব্লুণ্টস্লির মতে নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হলে পারিবারিক সংহতি ও বন্ধন বিনষ্ট হবে। তিনি এ বিষয়ে অ্যারিস্টটলের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন যে কেবলমাত্র পুরুষরাই রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার উপযুক্ত।

৩। অনেকের মতে নারীদের বুদ্ধিবৃত্তি সহজাতভাবে পুরুষদের তুলনায় নিম্নমানের। সুতরাং তাদের ভোটাধিকারের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করা উচিত নয়।

৪। অনেক সমালোচক বলতেন যে নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করেকোনওসুফল পাওয়া সম্ভব নয়। প্রথমত নারীরা যদি তাদের নিজেদের মত অনুসারে ভোট প্রদান করে সেক্ষেত্রে ঐ মতামত যদি তাদের স্বামী বা অভিভাবকের মতের সাথে একরূপ না হয় তবে পারিবারিক অশান্তি দেখা যাবে। দ্বিতীয়ত তারা যদি স্বামী বা অভিভাবকের নির্দেশ অনুযায়ী ভোট প্রদান করে তাহলে তা বাহুল্য বলে বিবেচিত হবে। ব্লুণ্টস্লি বলেন যে এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে স্বতন্ত্রভাবে ভোট প্রদান করার

পরিবর্তে স্বামীকে দুটি ভোট প্রদান করার অধিকার দেওয়া যুক্তিযুক্ত।

৫। অনেকে বলেন যে যেহেতু নারীরা পুরুষদের মত নাগরিকতা সংক্রান্ত সকল ধরনের কাজে যোগদান করার ক্ষেত্রে দৈহিক দিক দিয়ে অসক্ষম এজন্য তারা ভোটাধিকার দাবি করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে নারীদের পক্ষে সামরিক বাহিনীর অনেক বিভাগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়।

৬। নারীদের ভোটাধিকারের পক্ষে যুক্তি (Arguments for Women Suffrage)

বর্তমান যুগে নারীদের ভোটাধিকারকে কেন্দ্র করে সমস্ত বির্তকের প্রায় সম্পূর্ণরূপে অবসান ঘটেছে। অতীতে যাঁরা কেবল রাষ্ট্রের পক্ষে অস্ত্রধারণ করতে পারতেন তাঁদের নিয়ে নির্বাচক মণ্ডলী গঠন করার ধারণা প্রচলিত ছিল। এই কারণে নারীদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত। নারীদের সাধারণ অর্থনৈতিক ও আইনগত নির্ভরশীলতার জন্যও দীর্ঘদিন তাদের এই অধিকারটি প্রদান করা হয় নি। কিন্তু কলকারখানা, অফিস, দোকান ইত্যাদিতে নারীদের ক্রমবর্ধমান নিয়োগ, বিভিন্ন পেশায় নারীদের প্রবেশ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের সমান সুযোগসুবিধা প্রদান করার ফলে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের ক্ষেত্রে বাধাগুলি দূর হয়ে যায়। এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে দুটি বিশ্বযুদ্ধে নারীদের অগ্রণী ভূমিকা নারীদের ভোটাধিকারের আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলে। নারীদের ভোটাধিকারের পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখানো যেতে পারে :

১। স্ত্রীপুরুষের পার্থক্যকে ভোটাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্য করার একটি উপযুক্ত কারণ বলে বিবেচনা করা যায় না। ভোটাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে দৈহিক সামর্থ্য অপেক্ষা নৈতিক ও বুদ্ধিমত্তামূলক গুণাবলী অধিক বিবেচ্য বিষয়। এই কারণে নারীদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যুক্তিযুক্ত নয়।

২। কেবলমাত্র পুরুষদের ভোটাধিকার প্রদান করা হলে তাঁরা নারীদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দেবেন না। এর ফলে অনেক বিষয়েই নারীরা অবহেলিত ও বঞ্চিত হতে পারেন। সুতরাং নারীদের স্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাঁদের ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত। নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হলে সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

৩। আধুনিক কালে মনস্তাত্ত্বিকদের গবেষণার ফলে পুরুষদের তুলনায় নারীদের 'সহজাত নিকৃষ্টতা'র (innate inferiority) ধারণাটিও পরিত্যক্ত হয়েছে। অতএব নারীরা পুরুষদের সমকক্ষ নয় একথা এখন বলা চলে না। এ দিক দিয়েও নারীদের ভোটাধিকারের নীতি সমর্থন করা যায়।

৪। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকে সমান অধিকার ও সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করাই হল গণতন্ত্রের আদর্শ। অতএব নারীদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার অর্থ হল গণতান্ত্রিক আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা।

৫। প্রতিটি রাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ নারীদের নিয়ে গঠিত। সুতরাং প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া না হলে সেই শাসনব্যবস্থাকে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বলে গণ্য করা যায় না।

প্রশ্নাবলী

প্রথম পত্র

অধ্যায় ১

ক· রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :

১ । রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।
(উত্তর সঙ্কেত—৩)

২ । রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি সংজ্ঞা দাও। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কি একটি বিজ্ঞান বলিয়া গণ্য করা যায় ? তোমার উত্তরের সমর্থনে কারণ দেখাও। (উ: মা ১৯৮৫)
(উত্তর সঙ্কেত— ২ ও ৪)

৩ । রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কি ? অর্থবিদ্যার সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা কর। (উ : মা ১৯৮৪)
(উত্তর সঙ্কেত— ৩ ও ৫ (গ)

৪ । রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কি বিজ্ঞান বলা চলে ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ইতিহাসের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পার্থক্য কোথায় ? (উ : মা ১৯৭৯)
(উত্তর সঙ্কেত— ৪ ও ৫ (খ))

৫ । রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। সমাজবিদ্যার সহিত ইহার কি সম্পর্ক ? (উ : মা ১৯৮০)
(উত্তর সঙ্কেত— ২ ও ৫ (ঘ))

৬ । রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু আলোচনা কর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান পদবাচ্য ? (উ : মা ১৯৮১)
(উত্তর সঙ্কেত— ৩ ও ৪)

৭ । রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত ইতিহাস ও অর্থবিদ্যার সম্পর্ক আলোচনা কর। (উ : মা ১৯৮২)
(উত্তর সঙ্কেত— ৫ (খ) ও ৫ (গ))

৮ । রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত মনোবিদ্যা ও নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক আলোচনা কর। (উ : মা ১৯৮৩)
(উত্তর সঙ্কেত— ৫ (ঙ) ও ৫ (চ))

খ· সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১ । রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত ইতিহাসের সম্পর্ক আলোচনা কর। উত্তর সঙ্কেত—৫ঘ)

২ । রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও।
(উত্তর সঙ্কেত—৪)

অধ্যায় ২

ক· রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :—

১। রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি ? উদাহরণ সহ আলোচনা কর। (উ : মা ১৯৭৮)
(উত্তর সঙ্কেত— ৩)

২। রাষ্ট্র কাহাকে বলে ? রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য নিরূপণ কর। (উ : মা· ১৯৭৯)
(উত্তর সঙ্কেত— ২ ও ৮)

৩। রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। (উ : মা ১৯৮০)
(উত্তর সঙ্কেত— ৩)

৪। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দাও। রাষ্ট্রের উপাদান হিসাবে সার্বভৌমিকতার গুরুত্ব আলোচনা কর। (উ : মা ১৯৮১)
(উত্তর সঙ্কেত—২ ও ৩ এর অংশ)

৫। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ কর। (উ : মা ১৯৮৩)
(উত্তর সঙ্কেত— ২ ও ৩)

৬। রাষ্ট্র কাহাকে বলে ? রাষ্ট্রের সহিত সরকারের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।
(উত্তর সঙ্কেত— ২ ও ৭)

৭। রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর। পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র নয় কেন ?
(উত্তর সঙ্কেত— ৩ ও ৪)

খ· সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১। পশ্চিমবঙ্গ কি একটি রাষ্ট্র ? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কি একটি রাষ্ট্র ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। (উ : মা ১৯৭৯)
(উত্তর সঙ্কেত— ৪ ও ৫)

২। রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য আলোচনা কর। (উ : মা ১৯৮১)
(উত্তর সঙ্কেত— ৮)

৩। রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য সংঘের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। (উ : মা ১৯৮৪)
(উত্তর সঙ্কেত— ৮)

৪। রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য বিবৃত কর। (উ : মা· ১৯৮৫)
(উত্তর সঙ্কেত— ৭)

৫। রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।
(উত্তর সঙ্কেত— ৬)

অধ্যায় ৩

ক· রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :

১। সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য কি কি ? (উ : মা ১৯৮২, ১৯৮৪)

(উত্তর সঙ্কেত— ২ ও ৩)

২। সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা দাও এবং আইনগত সার্বভৌমিকতা ও রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

(উত্তর সঙ্কেত— ২ ও ৪ ঘ)

খ· সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১। সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য কি কি ? (উ : মা· ১৯৭৮, ১৯৮০)

(উত্তর সঙ্কেত—৩)

২। আইনসম্মত ও রাজনীতিক সার্বভৌমত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। (উ : মা· ১৮৮৫)

(উত্তর সঙ্কেত— ৪ ঘ)

অধ্যায় ৪

ক· রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :

১। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদটি ব্যাখ্যা ও সমালোচনা কর। (উ : মা ১৯৭৮)
(উত্তর সঙ্কেত— ৪)

২। রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে বিবর্তনবাদ আলোচনা কর এবং এই মতবাদ সম্পর্কে তোমার মতামত বিবৃত কর। (উ : মা ১৯৭৯)
(উত্তর সঙ্কেত— ৬)

৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে বলপ্রয়োগ মতবাদ বিবৃত কর। মতবাদটির মধ্যে কোন সত্য নিহিত আছে কি ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। (উ : মা ১৯৮০)
(উত্তর সঙ্কেত—৩)

৪। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিবর্তনমূলক মতবাদ আলোচনা কর। তোমার কাছে এই মতবাদ কি গ্রহণযোগ্য ? (উ : মা ১৯৮১)
(উত্তর সঙ্কেত—৬)

৫। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বলপ্রয়োগ মতবাদটি আলোচনা কর। (উ : মা ১৯৮২, ১৯৮৪)
(উত্তর সঙ্কেত— ৩)

৬। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবর্তনমূলক মতবাদ ব্যাখ্যা কর। মতবাদটির কোন মূল্য আছে কি ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। (উ : মা ১৯৮৩)
(উত্তর সঙ্কেত—৬)

৭। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিবর্তনমূলক মতবাদটি আলোচনা কর এবং এই মতবাদের মূল্যায়ন কর। (উ : মা ১৯৮৫)
(উত্তর সঙ্কেত—৬)

খ· সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ত্রুটিগুলো আলোচনা কর। (উ : মা ১৯৮১, ১৯৮৩)
(উত্তর সঙ্কেত—৪ (খ))

২। "রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি"— এই ধারণা তোমার কতদূর গ্রহণযোগ্য মনে হয় ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। (উ : মা ১৯৮৪)
(উত্তর সঙ্কেত—২)

৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদটি যে সকল কারণে সমালোচিত হইয়াছে সেই কারণগুলি বিবৃত কর।
(উত্তর সঙ্কেত— ৪ (খ))

অধ্যায় ৫

ক· রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

১। 'জাতীয়তাবাদ' কথাটির অর্থ কি ? ইহা কি আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী ? যুক্তি দাও। (উ : মা ১৯৭৮, ১৯৮৪)

(উত্তর সঙ্কেত— ৯ ও ১১)

২। জাতীয় জনসমাজ ও জাতির সংজ্ঞা নিরূপণ কর। এদের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে ? তোমার বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দাও। জাতীয় জনসমাজের প্রধান উপাদানগুলো উল্লেখ কর। (উ : মা· ১৯৭৯)

(উত্তর সঙ্কেত— ৩, ৪ ও ৬)

৩। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে কি বোঝায় ? আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির বিরুদ্ধে কি কি যুক্তি প্রদর্শন করা যায় ? (উ : মা ১৯৮০, ১৯৮২)

(উত্তর সঙ্কেত— ৮)

৪। জাতীয় জনসমাজের গঠনের উপাদানগুলি কি কি ?

ভারতকে কি একটি জাতি বলা যায় ? (উ : মা ১৯৮১)

(উত্তর সঙ্কেত— ৬ ও ৭)

৫। রাষ্ট্রের সীমারেখা কি জাতীয় জনসমাজের সমানুপাতিক হওয়া উচিত ? তোমার বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দাও। (উ : মা· ১৯৮৩)

(উত্তর সঙ্কেত— ৮)

৬। জাতীয় জনসমাজ বলতে কি বোঝায় ? জাতীয় জনসমাজ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য উপাদানগুলি আলোচনা কর। (উ : মা ১৯৮৫)

(উত্তর সঙ্কেত—৩ ও ৬)

খ· সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী :—

১। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে কি বোঝ ? (উ : মা ১৯৭৮)

(উত্তর সঙ্কেত— ৮)

২। জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার সম্পর্ক আলোচনা কর। (উ : মা ১৯৮১)

(উত্তর সঙ্কেত—১১)

৩। জাতীয়তাবাদ কি আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী ? উত্তরের অনুকূলে যুক্তি দেখাও। (উ : মা ১৯৮২)

(উত্তর সঙ্কেত— ১১)

৪। রাষ্ট্র ও জাতির মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

(উত্তর সঙ্কেত— ৫)

৫। রাষ্ট্র ও জাতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। জাতীয় জনসমাজের মূল উপাদানগুলি কি ?

(উত্তর সঙ্কেত— ৫ ও ৬)

অধ্যায় ৬

ক· রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

১। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান অঙ্গগুলি কি কি ? উহাদের যে কোন একটির গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর। (উ : মা ১৯৭৮)

(উত্তর সঙ্কেত—৫ও ৬-১১(যে কোন একটি)

২। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। সাধারণ সভার ভূমিকার মূল্যায়ন কর। (উ : মা ১৯৮০, ১৯৮৩)

(উত্তর সঙ্কেত—৬)

৩। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতি আলোচনা কর। ইহার উদ্দেশ্য কি ব্যর্থ হয়েছে ? (উ : মা ১৯৮১)

(উত্তর সঙ্কেত—৪, ১২ ও ১৩)

৪। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। সংক্ষেপে নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকার মূল্যায়ন কর। (উ : মা ১৯৮২)

(উত্তর সঙ্কেত— ৭)

৫। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা কর। (উ : মা ১৯৮৪)

(উত্তর সঙ্কেত—১২ ও ১৩)

৬। জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতিগুলি আলোচনা কর। ইহার প্রধান অঙ্গগুলি কি কি ? (উ : মা ১৯৮৫)

(উত্তর সঙ্কেত— ৪ ও ৫

খ· সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :—

১। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতিগুলি আলোচনা কর। (উ : মা ১৯৭৯)

(উত্তর সঙ্কেত— ৪)

২। অছি পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর। (উ : মা ১৯৮০)

(উত্তর সঙ্কেত— ৯)

৩। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর।

(উত্তর সঙ্কেত—৮)

৪। কখন এবং কি কি উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ?

(উত্তর সঙ্কেত—২ ও ৪)

অধ্যায় ৭

রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :

১। নাগরিকতা বলতে কি বোঝায় ? নাগরিকতা অর্জন ও বিলোপসাধনের পদ্ধতিগুলি আলোচনা কর।
(উত্তর সঙ্কেত—১, ৪ ও ৫)

২। অধিকার বলিতে কি বোঝায় ? আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রধান পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি বর্ণনা কর। (উ· মা· ১৯৮৫)
(উত্তর সঙ্কেত—৬ ও ৮)

৩। সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি ? ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। (উ : মা ১৯৭৯, ১৯৮৪)
(উত্তর সঙ্কেত—১৩, ১৪ ও ২১)

৪। ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত যে কোন তিনটি মৌলিক অধিকার সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। (উ : মা· ১৯৮২)
(উত্তর সঙ্কেত—১৫ থেকে ২০ এর মধ্যে যে কোন ৩টি)

৫। ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা কর। এই নীতিগুলির তাৎপর্য কি (উ : মা· ১৯৭৮)
(উত্তর সঙ্কেত—২৫, ২৬ ও ২৮)

৬। ভারতীয় সংবিধানে সন্নিবিষ্ট রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি সমূহের বর্ণনা দাও। মৌলিক অধিকারসমূহের সহিত নির্দেশমূলক নীতি সমূহের পার্থক্য দেখাও। (উ : মা : ১৯৮০)
(উত্তর সঙ্কেত—২৬ ও ২৯)

৭। নাগরিকত্ব বলতে কি বোঝায় ? যে সকল উপায়ে নাগরিকত্ব অর্জন করা যায় সেগুলি বর্ণনা কর।
(উত্তর সঙ্কেত ১ ও ৪) (উ : মা ১৯৮৫)

খ· সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১। নাগরিকতা অর্জন ও বিলোপের পদ্ধতিগুলি কি কি (উ : মা ১৯৭৮)
(উত্তর সঙ্কেত—৪ ও ৫)

২। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কর্তব্যসমূহ আলোচনা কর। (উ : মা ১৯৭৯-১৯৮২, ১৯৮৪)
(উত্তর সঙ্কেত— ১০)

৩। নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর। (উ : মা ১৯৮০-১৯৮৩)
(উত্তর সঙ্কেত—৪)

৪। অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা কর। (উ : মা ১৯৮০, ১৯৮৩)
(উত্তর সঙ্কেত—১২)

৫। কি কি কারণে নাগরিকতা বিলুপ্ত হয় ? (উ : মা· ১৯৮১)
(উত্তর সঙ্কেত—৫)

৬। একজন নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। (উ : মা ১৯৮২)
(উত্তর সঙ্কেত—৩)

৭। ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের কি কি মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে ? (উ : মা· ১৯৭৮)
(উত্তর সঙ্কেত— ১৩)

৮। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার বলতে কি বোঝায় ? কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের উল্লেখ কর। (উ : মা : ১৯৮৩)
(উত্তর সঙ্কেত— ৯)

৯। ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখিত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। (উ : মা ১৯৮২, ১৯৮৪)

(উত্তর সঙ্কেত—২৮)

১০ । ভারতীয় নাগরিকদের অন্তত চারটি মৌলিক অধিকার উল্লেখ কর । ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি কিভাবে সংরক্ষিত হয় ? (উ : মা ১৯৮৫)

(উত্তর সঙ্কেত—১৫ থেকে ২০ এর মধ্যে যে কোন ৪টি ও ২০)

১১ । "অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত"—এই উক্তিটি ব্যাখ্যা কর । (উ : মা ১৯৮৫)

(উত্তর সঙ্কেত— ১২)

১২ । ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যগুলি আলোচনা কর ।

(উত্তর সঙ্কেত— ২৪)

১৩ । জন্মসূত্রে নাগরিকতা নির্ণয়ের দুইটি মূলনীতি উল্লেখ করিয়া উহাদের পার্থক্য নির্ণয় কর ।

(উত্তর সঙ্কেত— ৪)

১৪ । কর্তব্যগুলি নেতিবাচক অথবা ইতিবাচক হইতে পারে । উক্তিটি ব্যাখ্যা কর ।

(উত্তর সঙ্কেত—১০)

অধ্যায় ৮

ক· রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :—

১। মার্কসবাদের মূল বক্তব্যগুলি আলোচনা কর। (উত্তর সঙ্কেত—৩ (খ))

২। উদারনীতিবাদ কাহাকে বলে ? উদারনীতিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। (উত্তর সঙ্কেত—২ ক ও খ)

৩। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। (উত্তর সঙ্কেত—(৪ ক ও খ)

৪। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের অর্থ ব্যাখ্যা কর। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি ? (উত্তর সঙ্কেত—৪ ক ও খ

খ· সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী :—

১। রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসের বক্তব্য আলোচনা কর। (উত্তর সঙ্কেত—৩ খ))

২। উদারনীতিবাদের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। (উত্তর সঙ্কেত—২)

প্রশ্নাবলী

দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ১

ক· রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :—

১। সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবধানের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর এবং উভয়ের দোষ ও গুণাবলীর আলোচনা কর। (উ : মা : ১৯৭৮)

(উত্তরের ইঙ্গিত— ৮ থেকে ১২)

২। সংবিধানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। কি ভাবে তুমি সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ করবে ? (উ : মা : ১৯৮০)

(উত্তরের ইঙ্গিত—১ ও ২)

৩। ভারতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা বা আলোচনা কর। (উ : মা : ১৯৭৮, ১৯৮১, ১৯৮৩, ১৯৮৫)

(উত্তরের ইঙ্গিত — ১৪)

৪। সংবিধান বলিতে কি বোঝায় ? লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের পার্থক্য যথোপযুক্ত উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর। (উ : মা : ১৯৮২)

(উত্তরের ইঙ্গিত— ১ ও ৩)

৫। দুষ্পরিবর্তনীয় ও সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের পার্থক্য নির্ধারণ কর এবং দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের দোষ ও গুণাবলীর আলোচনা কর।

(উত্তরের ইঙ্গিত— ৮, ১১ ও ১২)

৬। ভারতীয় সংবিধানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

(উত্তরের ইঙ্গিত—১৩)

খ· সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :—

১ সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়—এই দুই ধরনের সংবিধানের মধ্যে তুমি কোনটি পছন্দ কর ? তোমার উত্তরের সমর্থনে কারণ দেখাও।

(উত্তরের ইঙ্গিত—৮)

২। লিখিত সংবিধানের দোষ ও গুণাবলী আলোচনা কর। (উত্তরের ইঙ্গিত—৪ ও ৫)

অধ্যায় ২

ক· রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :—

১। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। ইহার সুবিধা ও অসুবিধা কি কি ? (উ : মা : ১৯৭৮, ১৯৮৩) (উত্তরের ইঙ্গিত—১০ থেকে ১৩)

২। রাষ্ট্রপতি শাসিত ও পার্লামেণ্ট শাসিত শাসনব্যবস্থার পার্থক্য নির্দেশ কর এবং প্রথমটির দোষ ও গুণগুলো আলোচনা কর। (উ : মা : ১৯৭৯) (উত্তরের ইঙ্গিত—২২, ২০ ও ২১)

৩। তুমি কি মনে কর যে ভারতের সংবিধান কেবলমাত্র গঠনের দিক হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কিন্তু কার্যত ইহা এককেন্দ্রিক ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তিগুলো আলোচনা কর।(উ :মা :১৯৭৯)(উত্তরের ইঙ্গিত—১৫)

৪। যুক্তরাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা কর এবং ইহার গুণাগুণ আলোচনা কর। (উ : মা : ১৯৮০) (উত্তরের ইঙ্গিত—১০-১৩)

৫। সংসদ-শাসিত (পার্লামেণ্টীয়) ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। সংসদ-শাসিত সরকারের সুবিধা ও অসুবিধা কি কি ? (উ : মা : ১৯৮১, ১৯৮৩) (উত্তরের ইঙ্গিত—২২, ১৭ ও ১৮)

৬। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি আলোচনা কর। (উ : মা : ১৯৮২) (উত্তরের ইঙ্গিত—১৫)

৭। "ভারতীয় সংবিধান আংশিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও আংশিকভাবে এককেন্দ্রিক"—এই মতবাদ পর্যালোচনা কর। (উ : মা : ১৯৮৪) (উত্তরের ইঙ্গিত—১৫)

৮। সংসদীয় সরকার ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের সুবিধা ও অসুবিধা কি কি ? (উ : মা : ১৯৮৫)(উত্তরের ইঙ্গিত—২২, ২০ ও ২১)

৯। এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখাও এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি উল্লেখ কর। (উত্তরের ইঙ্গিত—১৪, ১২ ও ১৩)

খ· সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী :—

১। 'প্রজাতন্ত্র' কাহাকে বলে ? নিম্নলিখিত দেশগুলির মধ্যে কোন কোনটি প্রজাতন্ত্র তাহা কারণ সহ আলোচনা কর :— (উ : মা : ১৯৭৮)

(ক) বৃটেন (খ) ইউ· এস· এ। (উত্তরের ইঙ্গিত—২৫)

২। ভারতকে কি সাধারণতন্ত্র (রিপাবলিক) বলে অভিহিত করা যায় ? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দাও। (উ : মা : ১৯৮১, ১৯৮৫) (উত্তরের ইঙ্গিত—২৬)

অধ্যায় ৩

ক· রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :—

১ । গণতান্ত্রিক সরকার বলিতে কি বুঝ ? প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ কি ?

(উত্তরের ইঙ্গিত— ১ ও২)

২ । গণতন্ত্র বলিতে কি বোঝায় ? গণতন্ত্রের গুণাগুণ আলোচনা কর ।

(উত্তরের ইঙ্গিত— ১, ৩ ও ৪)

৩ । গণতন্ত্র কাহাকে বলে ? কি কি যুক্তির সাহায্যে তুমি ইহা সমর্থন করিবে ?

(উত্তরের ইঙ্গিত— ১ ও ৩)

৪ । একনায়কতন্ত্র বলিতে কি বোঝায় ? একনায়কতন্ত্রের গুণাগুণ আলোচনা কর । (উ : মা : ১৯৮৪)

(উত্তরের ইঙ্গিত— ৮, ১১ ও ১২)

৫ । গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তগুলো বিশদভাবে আলোচনা কর । এই শর্তগুলো বর্তমান ভারতে আছে কি ? (উ : মা : ১৯৭৯, ১৯৮৫)

(উত্তরের ইঙ্গিত— ৬ ও ৭)

৬ । একনায়কতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং ইহার গুণাগুণ বিশ্লেষণ কর । (উ : মা : ১৯৮০)

(উত্তরের ইঙ্গিত— ৮, ১১ ও ১২)

৭ । গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর । এই দুইটির মধ্যে তুমি কোনটি পছন্দ কর এবং কেন কর ?

(উত্তরের ইঙ্গিত— ১৩, ৩ বা ১১)

৮ । সরকারের অন্যতম রূপ হিসাবে গণতন্ত্রের সাফল্যের মূলে কি কি কারণ আছে ? গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তুমি কি ধারণা পোষণ কর ।

(উত্তরের ইঙ্গিত— ৩ ও ৫)

৯ । গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিপক্ষে কি কি যুক্তি দেখানো হয় ? গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলী কি কি ? (উ : মা : ১৯৮২)

(উত্তরের ইঙ্গিত ৪ ও ৬)

খ· সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১ । প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলতে কি বোঝায় ? প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের গুণাগুণ বিশ্লেষণ কর । (উ : মা ১৯৮০, ১৯৮৩)
(উত্তরের ইঙ্গিত—২)

২ । গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি টীকা রচনা কর । (উত্তরের ইঙ্গিত—৫)

অধ্যায় ৪ (ক)

ক· রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :

১। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ তত্ত্বটি আলোচনা ও বিচার কর। (উ : মা : ১৯৭৮)
(উত্তরের ইঙ্গিত-- ২ ও ৩)

২। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ব্যাখ্যা কর। 'কঠোর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভবপর নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়।' উদাহরণ সহকারে উক্তিটি আলোচনা কর। (উ : মা : ১৯৮০)
(উত্তরের ইঙ্গিত— ২ ও ৩)

৩। দ্বিপরিষদ সম্পন্ন আইনসভার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি পর্যালোচনা কর। (উ : মা : ১৯৮৪)
(উত্তরের ইঙ্গিত— ৬, ৭ ও ৮)

৪। আধুনিক রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের কার্যাবলী আলোচনা কর। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কিভাবে রক্ষা করা যায়? (উ : মা : ১৯৭৯)
(উত্তরের ইঙ্গিত—১৫, ১৬ ও ১৭)

৫। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভার কার্যাবলী কি?
(উত্তরের ইঙ্গিত— ৯)

৬। আধুনিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী ব্যাখ্যা কর।
(উত্তরের ইঙ্গিত— ১৩)

খ· সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১। দ্বিকক্ষসম্পন্ন আইনসভার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি সমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ কর। (উ : মা : ১৯৭৯, ১৯৮১)
(উত্তরের সঙ্কেত— ৭ ও ৮)

২। আধুনিক রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কি ভাবে রক্ষা করা যায়? (উ : মা : ১৯৮৫)
(উত্তরের ইঙ্গিত ১৬ ও ১৭)

ক· রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

১। স্বাভাবিক অবস্থায় ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতাবলী আলোচনা কর। (উ : মা : ১৯৭৮)
(উত্তরের ইঙ্গিত— ৮ (ক)

২। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর। (উ : মা ১৯৮০, ১৯৮৫)
(উত্তরের ইঙ্গিত— ১২)

৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর। (উ : মা ১৯৮১, ১৯৮৩)
(উত্তরের ইঙ্গিত— ৮ ও ৯)

৪। ভারতের পার্লামেন্টের গঠন ও কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা কর। (উ : মা ১৯৮৩)
(উত্তরের ইঙ্গিত —১৩ ও ১৬)

৫। ভারতের পার্লামেন্টের কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা কর। (উ : মা ১৯৮৩)
(উত্তরের সঙ্কেত— ১৬)

খ· সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১। ভারতের পার্লামেন্টের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর। (উ : মা ১৯৭৮)
(উত্তরের ইঙ্গিত—১৩ ও ১৬)

২। ভারতে লোকসভার অধ্যক্ষের পদমর্যাদা ও ক্ষমতা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর। (উ : মা ১৯৭৯)
(উত্তরের ইঙ্গিত—২০)

৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতার সংক্ষেপে আলোচনা কর। (উ : মা ১৯৮০, ১৯৮৫)
(উত্তরের ইঙ্গিত— ৮ (খ))

৪। লোকসভা ও রাজ্যসভার পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে যাহা জান লিখ। (উ : মা ১৯৮০)
(উত্তরের ইঙ্গিত— ১৭)

৫। ভারতে পার্লামেন্টে আইনপাশের পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। (উ : মা ১৯৮২)
(উত্তরের ইঙ্গিত— ১৮)

৬। ভারতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। (উ : মা : ১৯৮২, ১৯৮৪)
(উত্তরের ইঙ্গিত— ৪)

৭। রাজ্যসভা ও লোকসভার গঠন আলোচনা কর। (উ : মা : ১৯৮৪)
(উত্তরের ইঙ্গিত—১৩, ১৪ ও ১৫)

(গ)

ক· রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :

১। বর্তমান ভারতে রাজ্যপালের পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও ভূমিকা আলোচনা কর। (উ : মা ১৯৭৯, ১৯৮৫)
(উত্তরের ইঙ্গিত—২ থেকে ৫)

২। পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার গঠন ও কার্যাবলীর বিবরণ দাও। (উ : মা ১৯৮২)
(উত্তরের ইঙ্গিত— ৯ ও ১০)

খ· সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১। ভারতের সংবিধানে বর্ণিত কোন রাজ্যের রাজ্যপালের ভূমিকা আলোচনা কর। (উ : মা ১৯৮১, ১৯৮৩)
(উত্তর সঙ্কেত— ৩ ও ৫)

২। 'মুখ্যমন্ত্রী অঙ্গরাজ্যের প্রকৃত শাসক', উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
(উত্তর সঙ্কেত— ৭)

(ঘ)

ক· রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :

১। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। (উ : মা ১৯৮৪)
(উত্তরের ইঙ্গিত— ২ ও ৪)

২। ভারতের বিচার ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
(উত্তরের ইঙ্গিত— ১, ২, ৬ ও ১০)

খ· সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ কিভাবে নিযুক্ত হন এবং কি ভাবে তাঁহাদের অপসারণ করা হয় ? (উ : মা : ১৯৭৯, ১৯৮৩)
(উত্তরের ইঙ্গিত—৩)

২। ভারতের কোন রাজ্যের মহাধর্মাধিকরণের ক্ষমতা বর্ণনা কর। (উ : মা ১৯৮১, ১৯৮৫)
(উত্তরের ইঙ্গিত—৮)

অধ্যায় ৫

ক· রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :

১ । জনমত বলতে কি বুঝ ? গণতন্ত্রে ইহার গুরুত্ব কি ? কিভাবে জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হয় ? (উ : মা ১৯৭৮)

(উত্তরের ইঙ্গিত—১, ৪, ২ ও ৩)

২ । জনমত বলিতে কি বোঝায় ? গণতন্ত্রে ইহার গুরুত্ব নির্ধারণ কর । উ : মা : ১৯৮০)

(উত্তরের ইঙ্গিত—১ ও ৪)

৩ । আধুনিক গণতন্ত্রে জনমত গঠনের বিভিন্ন মাধ্যমের বিবরণ দাও । (উ : মা : ১৯৮২)

(উত্তরের ইঙ্গিত— ৩)

৪ । রাজনৈতিক দল বলতে তুমি কি বোঝ ? গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর । (উ : মা : ১৯৮১, ১৯৮৩)

(উত্তরের ইঙ্গিত—৫, ৮, ও ৯)

৫ । রাজনৈতিক দল কাহাকে বলে ? গণতন্ত্রের পক্ষে কি রাজনৈতিক দল অপরিহার্য ?

(উত্তরের ইঙ্গিত— ৫ , ৮ ও ৯)

৬ । রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ কর । আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকার মূল্যায়ন কর ।

(উত্তরের ইঙ্গিত— ৫ ও ৭)

৭ । রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দাও । দলীয় ব্যবস্থার গুণাগুণ আলোচনা কর ।

(উত্তরের ইঙ্গিত— ৫, ৯ ও ১০)

৮ । 'জনমত' এর স্বরূপ ব্যাখ্যা কর । জনগণ শাসিত সরকারে ইহার গুরুত্ব কি ?

(উত্তরের ইঙ্গিত— ১ ও ৪)

খ· সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১ । গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার গুরুত্ব আলোচনা কর । (উ : মা : ১৯৭৮, ১৯৮৫)

(উত্তরের ইঙ্গিত— ৮)

২ । জনমত গঠনে রাজনৈতিক দল, মুদ্রাযন্ত্র ও সভাসমিতির ভূমিকা আলোচনা কর ।

(উত্তরের ইঙ্গিত— ৩)

৩ । বহুদলীয় ব্যবস্থার অর্থ ব্যাখ্যা কর ও উহার প্রকারভেদ আলোচনা কর ।

(উত্তরের ইঙ্গিত— ৬ শেষ ও ৭)

অধ্যায় ৬

ক· রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :

১। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার কি ? কি কি যুক্তির সাহায্যে তুমি ইহার সমর্থন করিবে ?
(উত্তরের ইঙ্গিত—১ ও ২)

২। গণতন্ত্রে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ব্যবস্থার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলির আলোচনা কর। (উ : মা : ১৯৭৮)
(উত্তরের ইঙ্গিত— ২ ও ৩)

৩। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দাও। (উ : মা : ১৯৮১, ১৯৮৫)
(উত্তরের ইঙ্গিত— ২ ও ৩)

খ· সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১। নারীজাতির ভোটাধিকারের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলো আলোচনা কর। (উ : মা : ১৯৭৯)
(উত্তরের ইঙ্গিত— ৬ ও ৫)

২। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার বলতে কি বোঝায় ব্যাখ্যা কর। এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করা হয় কেন ? (উ : মা : ১৯৮৩)
(উত্তরের ইঙ্গিত— ১ ও ২)

৩। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
(উত্তরের ইঙ্গিত— ১)

৪। ভোটাধিকারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। আধুনিক গণতন্ত্রে ভোটদাতাদের যোগ্যতাবলী কি কি ?
(উত্তরের ইঙ্গিত—১)

বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী

প্রথম পত্র

বন্ধনীর ভিতরে প্রদত্ত বিকল্পগুলো থেকে সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া, সেই উত্তর-সহ নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পুনরায় লিখ :—

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞান (সামাজিক/প্রাকৃতিক/নৈতিক) বিজ্ঞানের একটি শাখা। (উ : মা ১৯৭৮, ১৯৮২)

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞান (স্থিতিশীল/গতিশীল) বিজ্ঞান।

৩। (পশ্চিমবঙ্গ/বাংলাদেশ) একটি রাষ্ট্র। (উ : মা : ১৯৮২)

৪। একজন ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক (রাষ্ট্রের/সামাজিক প্রতিষ্ঠানের)সদস্য হতে পারে। (উ : মা : ১৯৮০, ১৯৮৩)

৫। রাষ্ট্র শ্রেণীশোষণের যন্ত্র। কে বলেছিলেন ? (অ্যারিস্টটল/রুশো/ হেগেল/মার্কস/গ্রীণ) (উ : মা : ১৯৭৯, ১৯৮৩)

৬। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা (হস্তান্তর যোগ্য/হস্তান্তর যোগ্য নয়)। (উ : মা : ১৯৭৯, ১৯৮১, ১৯৮৫)

৭। রাষ্ট্রের (কেবল বাহ্য/অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য উভয় প্রকার) সার্বভৌমিকতা থাকে। (উ : মা : ১৯৭৯)

৮। (রুশো/লক/হবস) 'লেভিয়াথান' গ্রন্থটির প্রণেতা। (উ : মা : ১৯৭৯)

৯। 'সামাজিক চুক্তি' গ্রন্থটির প্রণেতা (হবস/লক/রুশো/হেগেল)। (উ : মা : ১৯৮০, ১৯৮৪)

১০। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐশ্বরিক মতবাদ একটি (বৈজ্ঞানিক/অবৈজ্ঞানিক) মতবাদ। (উ : মা : ১৯৮১)

১১। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিক মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র (ঈশ্বরের সৃষ্টি/চুক্তির দ্বারা সৃষ্ট/মানব সমাজের বিরতিবিহীন ক্রমবিকাশের ফল)। (উ : মা : ১৯৮২)

১২। প্রতিটি জাতীয় জনসমাজের নিজস্ব (সরকার/রাষ্ট্র/জাতি) গঠনের অধিকারকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলে।

১৩। প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হওয়া (বাধ্যতামূলক/ বাধ্যতামূলক নয়)।

১৪। নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্যা সংখ্যা (5/11/15)। (উ : মা : ১৯৭৮)

১৫। নিরাপত্তা পরিষদের (সব সদস্যদের/কেবল অস্থায়ী সদস্যদের/কেবল স্থায়ী সদস্যদের) 'ভেটো' প্রয়োগের ক্ষমতা আছে। (উ : মা : ১৯৮০, ১৯৮৫)

১৬। বর্তমানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা (9/27/54)।

১৭। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯১৯/১৯৪২/১৯৪৫/১৯৪৭) সনে। (উ : মা : ১৯৮২)

১৮। অছি পরিষদ জাতিপুঞ্জের (অংশ/ অংশ নহে)। (উ : মা : ১৯৮৩)

১৯। আন্তর্জাতিক বিচারালয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি (অঙ্গ/অঙ্গ নহে)। (উ : মা : ১৯৮৪)

২০। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যদের মধ্যে (সকল/অধিকাংশ/দুই তৃতীয়াংশ) সদস্য সাধারণ সভার সদস্য)।

২১। কর্মের অধিকার একটি (রাজনৈতিক/অর্থনৈতিক) অধিকার। (উ : মা : ১৯৮০, ১৯৮৪)

২২। ভারতের সংবিধানে বর্তমানে সম্পত্তির অধিকার (একটি মৌলিক অধিকার/ মৌলিক অধিকার নয়)। (উ : মা : ১৯৮০, ১৯৮২)

২৩। ভোটদানের অধিকার একটি (সামাজিক/সাংস্কৃতিক/রাজনৈতিক/ পৌর/ আর্থনীতিক) অধিকার। (উ : মা : ১৯৮১, ১৯৮৫)

২৪। ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলো আদালত কর্তৃক (বলবৎ যোগ্য/বলবৎ যোগ্য নয়)।(উ : মা ১৯৮১, ১৯৮৫)

২৫। সম্পত্তির অধিকার একটি (রাজনীতিক/আর্থনীতিক) অধিকার। (উ : মা ১৯৮৩)

২৬। কর্মের অধিকার ভারতের সংবিধান কর্তৃক রক্ষিত (একটি মৌলিক অধিকার/ মৌলিক অধিকার নহে)। (উ : মা ১৯৮৩)

২৭। ভারতের সংবিধান শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার সুনিশ্চিত (করে/করে না)। (উ : মা ১৯৮৪)

২৮। ভারতের সংবিধানে শিক্ষার অধিকার একটি (মৌলিক অধিকার/নির্দেশমূলক নীতি)। (উ : মা ১৯৮৪)

২৯। 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' গ্রন্থটির রচয়িতা (মার্কস ও লেনিন/ মার্কস ও এঙ্গেলস)
৩০। (কার্ল মার্কস/জন স্টুয়ার্ট মিল/ জি·ডি·এইচ· কোল) গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের মুখ্য প্রবক্তা।

দ্বিতীয় পত্র

বন্ধনীর ভিতরে প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া সেই, উত্তর সহ, নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লিখ :

১। ভারতের সংবিধান কার্যকর করা হয়েছিল (১৫ই অগস্ট, ১৯৪৭/২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৯/২৬শে জানুয়ারী ১৯৫০/১লা মার্চ, ১৯৫২) হইতে। (উ : মা ১৯৭৯)

২। যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য (থাকে/থাকে না)। (উ : মা ১৯৮৪

৩। ভারতের শাসনব্যবস্থা (যুক্তরাষ্ট্রীয়/এককেন্দ্রিক/আধা যুক্তরাষ্ট্রীয়)। (উ : মা ১৯৮০)

৪। ভারতের শাসন ব্যবস্থা (রাষ্ট্রপতিশাসিত/সংসদীয়)। (উ : মা ১৯৮২)

৫। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (রাষ্ট্রপতি শাসিত/সংসদ শাসিত) সরকার আছে। (উ : মা: ১৯৮৪)

৬। ভারতে (২০/২২/২৪) টি অঙ্গরাজ্য আছে। (উ : মা : ১৯৮৩, ১৯৮৫)

৭। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সর্বপ্রধান প্রবক্তা ছিলেন (হবস/লক/মন্টেস্কু/রুশো)। (উ : মা ১৯৭৯)

৮। পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভবপর/সম্ভবপর নহে)। (উ : মা ১৯৮৩)

৯। ভারতে বর্তমান সংবিধানে 'শিক্ষা' বিষয়টি (কেন্দ্রীয় তালিকার/রাজ্য তালিকার/যুগ্ম তালিকার) অন্তর্ভূক্ত। (উ : মা ১৯৮৫)

১০। ভারতের রাষ্ট্রপতি (প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ)পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। (উ : মা ১৯৭৮)

১১। ভারতের রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করেন (পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সদস্যবৃন্দ/সকল রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর সকল সদস্য/পার্লামেণ্টের উভয়কক্ষের এবং সকল রাজ্য বিধানমণ্ডলীর সকল সদস্য/পার্লামেণ্টে উভয় কক্ষের এবং সকল রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ)। (উ : মা· ১৯৭৮)

১২। সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে বুঝায় এমন একটি শাসন ব্যবস্থা (যেখানে একটি পার্লামেন্ট (সংসদ) আছে/ যেখানে নির্বাচিত একটি আইনসভার নিকট দায়ী একটি মন্ত্রীসভা আছে/ যেখানে বংশানুক্রমে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত একটি রাজতন্ত্র ও একটি নির্বাচিত পার্লামেন্ট (সংসদ) আছে)। (উ : মা ১৯৭৮)

১৩। ভারতীয় পার্লামেণ্টের উর্ধ্বতন কক্ষের সভায় যিনি সভাপতিত্ব করেন তাঁকে বলা হয় (স্পীকার (অধ্যক্ষ)/ চেয়ারম্যান (সভাপতি)/রাষ্ট্রপতি/উপরাষ্ট্রপতি)। উ : মা ১৯৭৮)

১৪। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি (রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন/সংসদের উভয় কক্ষের এবং রাজ্য বিধানমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত হন/জনগণ কর্তৃক সরাসরি নির্বাচিত হন/সংসদের উভয়কক্ষের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন) (উ : মা ১৯৭৯)

১৫। লোকসভার কার্যকাল (পাঁচ বছর/ছয় বছর/চার বছর)। এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় (কেন্দ্রীয় সরকার/রাজ্যসরকার/নির্বাচন কমিশন) এর তত্ত্বাবধানে। (উ : মা ১৯৭৯)

১৬। ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ (প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিযুক্ত হন/রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন/সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত হন/ লোকসভার অধ্যক্ষ কর্তৃক মনোনীত হন)। (উ : মা : ১৯৭৯)

১৭। ভারতের রাজ্যসভা হইতেছে (অঙ্গরাজ্যগুলির একটি কক্ষ/রাজ্যপালগণের একটি কক্ষ/ভারতীয় পার্লামেণ্টের একটি কক্ষ। (উ : মা· ১৯৮১)

১৮। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হইতেছেন (কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একজন সদস্য/রাজ্যসভার সভাপতি/লোকসভার অধ্যক্ষ) (উ : মা ১৯৮১)

১৯। (ভারত/গ্রেট ব্রিটেন) একটি প্রজাতন্ত্র। (উ : মা· ১৯৮২)

২০। ভারতের প্রধানমন্ত্রী (সুপ্রীমকোর্ট/ রাষ্ট্রপতি/লোকসভা) দ্বারা নিযুক্ত হন। (উ : মা· ১৯৮২)

২১। ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় (কেন্দ্রীয় সরকার/রাজ্য সরকার/নির্বাচন কমিশন) এর তত্ত্বাবধানে। (উ : মা· ১৯৮২)

২২। ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁহার মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলিতে (বাধ্য/বাধ্য নহেন)। (উ : মা· ১৯৮৪)

২৩। (রাষ্ট্রপতি/উপরাষ্ট্রপতি/স্পীকার) রাজ্যসভার সভাপতিত্ব করেন। (উ : মা· ১৯৮৫)

২৪। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের (কেবলমাত্র মূল এলাকা/ কেবলমাত্র আপীল এলাকা নাই/ ও আপীল এলাকাই

আছে কিন্তু অপর কোন এলাকা নাই / মূল এলাকা, আপীল এলাকা এবং পরামর্শদান এলাকা) আছে। (উ : মা· ১৯৭৯, ১৯৮৫)

২৫। ভারতের যে কোন রাজ্যের রাজ্যপাল (রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন / ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হন/ঐ রাজ্যের মন্ত্রীসভা কর্তৃক মনোনীত হন)। (উ : মা· ১৯৭৯, ১৯৮৫)

২৬। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন (সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল/রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রী/রাজ্য আইনসভার সদস্যগণ) (উ : মা· ১৯৮০, ১৯৮৪)

২৭। পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা (এক কক্ষ/দ্বিকক্ষ) বিশিষ্ট। (উ : মা· ১৯৭৯, ১৯৮১)

২৮। ভারতবর্ষে (একদলীয় ব্যবস্থা/দ্বিদলীয় ব্যবস্থা/বহু দলীয় ব্যবস্থা) প্রচলিত আছে। (উ : মা· ১৯৮০)

২৯। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিগণ নিযুক্ত হন (পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী/পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল/ভারতের রাষ্ট্রপতি) কর্তৃক)

৩০। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার (অপ্রয়োজনীয়/একান্তভাবে প্রয়োজনীয়) (উ : মা ১৯৭৯, ১৯৮৪)

বিষয়মুখী প্রশ্নাবলীর সঠিক উত্তর

প্রথম পত্র

১। সামাজিক, ২। গতিশীল, ৩। বাংলাদেশ, ৪। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের, ৫। মার্কস, ৬। হস্তান্তরযোগ্য নয়, ৭। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য উভয় প্রকার, ৮। হবস, ৯। রুশো, ১০। অবৈজ্ঞানিক, ১১। মানব সমাজের বিরতিবিহীন ক্রমবিকাশের ফল। ১২। রাষ্ট্র, ১৩। বাধ্যতামূলক নয়, ১৪। 15, ১৫। কেবল স্থায়ী সদস্যদের, ১৬। 54, ১৭। ১৯৪৫, ১৮। অংশ, ১৯। অঙ্গ, ২০। সকল, ২১। অর্থনৈতিক, ২২। মৌলিক অধিকার নয়, ২৩। রাজনৈতিক, ২৪। বলবৎ যোগ্য নয়, ২৫। আর্থনীতিক, ২৬। মৌলিক আধিকার নহে, ২৭। করে, ২৮। নির্দেশমূলক নীতি, ২৯। মার্কস ও এঙ্গেলস, ৩০। জি· ডি· এইচ· কোল।

দ্বিতীয় পত্র

১। ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০, ২। থাকে, ৩। আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়, ৪। সংসদীয়, ৫। রাষ্ট্রপতি শাসিত, ৬। ২২, ৭। মন্টেস্কু, ৮। সম্ভবপর নহে ৯। যুগ্ম তালিকার, ১০। পরোক্ষ, ১১। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের এবং সকল রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ, ১২। যেখানে একটি নির্বাচিত আইনসভার নিকট দায়ী একটি মন্ত্রিসভা আছে, ১৩। চেয়ারম্যান (সভাপতি) ১৪। সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন, ১৫। পাঁচ বছর ও নির্বাচন কমিশন, ১৬। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন, ১৭। ভারতীয় পার্লামেন্টের একটি কক্ষ, ১৮। রাজ্যসভার সভাপতি, ১৯। ভারত, ২০। রাষ্ট্রপতি, ২১। নির্বাচন কমিশন, ২২। বাধ্য, ২৩। উপরাষ্ট্রপতি, ২৪। মূল এলাকা, আপীল এলাকা এবং পরামর্শদান এলাকা, ২৫। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্তহন, ২৬। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল, ২৭। এককক্ষ, ২৮। বহুদলীয় ব্যবস্থা, ২৯। ভারতের রাষ্ট্রপতি, ৩০। একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র

১৯৭৮

প্রথম পত্র

ক বিভাগ

যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কি? অর্থবিদ্যার সহিত ইহার কি সম্পর্ক?

২। রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? উদাহরণ সহ আলোচনা কর।

৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদটি ব্যাখ্যা ও সমালোচনা কর।

৪। 'জাতীয়তাবাদ' কথাটির অর্থ কি? ইহা কি আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী? যুক্তি দাও।

৫। ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা কর। এই নীতিগুলির তাৎপর্য কি?

৬। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান অঙ্গগুলি কি কি? উহার যে কোন একটির গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।

অথবা, 'আইন'-এর সংজ্ঞা দাও এবং আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।

খ বিভাগ

নিম্নোক্ত যে কোন দুইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর :

৭। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে কি বোঝ?

৮। নাগরিকতা অর্জন ও বিলোপের পদ্ধতিগুলি কি কি?

৯। ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের কি কি মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে?

১০। সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য কি কি?

গ বিভাগ

১১। বন্ধনীর ভিতরে প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে সঠিক উত্তরটি খুঁজে নাও এবং উহা লেখ :

(ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞান (সামাজিক, প্রাকৃতিক, নৈতিক) বিজ্ঞানের একটি শাখা।

(খ) ভোটাধিকার একটি (সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক) অধিকার।

(গ) নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা (5, 11, 15)।

(ঘ) ভারতের রাষ্ট্রপতি (প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ পদ্ধতিতে) নির্বাচিত হন।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা (এককক্ষ, দুইকক্ষযুক্ত) আইনসভা।

দ্বিতীয় পত্র

ক বিভাগ

যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

১। সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর এবং উভয়ের দোষ ও গুণাবলীর আলোচনা কর।

২। ভারতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। ইহার সুবিধা ও অসুবিধা কি কি?

৪। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ তত্ত্বটি আলোচনা ও বিচার কর।

৫। স্বাভাবিক অবস্থায় ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতাবলী আলোচনা কর।

৬। জনমত বলতে কি বুঝ ? গণতন্ত্রে ইহার গুরুত্ব কি ? কিভাবে জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হয়। অথবা, গণতন্ত্রে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ব্যবস্থার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলির আলোচনা কর।

খ বিভাগ

যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

৭। মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতা বলিতে কি বুঝ ? দৃষ্টান্তসহ উত্তর লিখ।

৮। 'প্রজাতন্ত্র' কাহাকে বলে ? নিম্নলিখিত দেশগুলির মধ্যে কোন কোনটি প্রজাতন্ত্র, তাহা কারণ সহ আলোচনা কর :

(ক) বৃটেন

(খ) ইউ· এস· এ

৯। ভারতীয় পার্লামেন্টের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।

১০। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার গুরুত্ব আলোচনা কর।

গ বিভাগ

১১। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া, সেই উত্তর-সহ নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লিখ :

(ক) ভারতের রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করেন

(i) পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের সদস্যবৃন্দ,

(ii) সকল রাজ্য বিধানমণ্ডলীর সকল সদস্য,

(iii) পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের সদস্যবৃন্দ এবং সকল রাজ্য বিধানমণ্ডলীর সকল সদস্য,

(iv) পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের এবং সকল রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ।

(খ) ভারতীয় পার্লামেন্টের উর্ধ্বতন কক্ষের সভায় যিনি সভাপতিত্ব করেন তাঁহাকে বলা হয় :

(i) স্পীকার (অধ্যক্ষ),

(ii) চেয়ারম্যান (সভাপতি),

(iii) রাষ্ট্রপতি,

(iv) উপ-রাষ্ট্রপতি।

(গ) সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে বুঝায় এমন একটি শাসন ব্যবস্থা :

(i) যেখানে একটি পার্লামেন্ট (সংসদ) আছে,

(ii) যেখানে নির্বাচিত একটি আইনসভার নিকট দায়ী একটি মন্ত্রিসভা আছে,

(iii) যেখানে বংশানুক্রমে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত একটি রাজতন্ত্র ও একটি নির্বাচিত পার্লামেন্ট (সংসদ) আছে,

(iv) যেখানে একটি মন্ত্রিসভার সহায়তায় এবং পরামর্শে একজন রাষ্ট্রপতি শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

(ঘ) ভারতের যে কোন রাজ্যের রাজ্যপাল :

(i) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন,

(ii) ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হন,

(iii) ঐ রাজ্যের মন্ত্রিসভা কর্তৃক মনোনীত হন।

(ঙ) ভারতের সুপ্রীম কোর্ট এমন একটি বিচারালয় যাহার :

(i) কেবলমাত্র মূল এলাকা আছে,

(ii) কেবলমাত্র আপীল এলাকা আছে,

(iii) মূল ও আপীল উভয় এলাকা আছে, কিন্তু অপর কোন এলাকা নাই,

(iv) মূল এলাকা, আপীল এলাকা ও পরামর্শদান এলাকা আছে।

১৯৭৯

প্রথম পত্র

ক বিভাগ

যে কোন চারিটি প্রশ্নের উত্তর দাও

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কি বিজ্ঞান বলা চলে ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ইতিহাসের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পার্থক্য কোথায় ?

২। রাষ্ট্র কাহাকে বলে ? রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য নিরূপণ কর।

৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে বিবর্তনবাদ আলোচনা কর এবং এই মতবাদ সম্পর্কে তোমার মতামত বিবৃত কর।

৪। জাতীয় জনসমাজ ও জাতির সংজ্ঞা নিরূপণ কর। এদের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে ? তোমার বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দাও। জাতীয় জনসমাজের প্রধান উপাদানগুলো উল্লেখ কর।

৫। সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ করার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি ? ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৬। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ কি ?

অথবা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলতে কি বুঝায় ?

খ বিভাগ

নিম্নোক্ত যে কোন দুইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৭। পশ্চিমবঙ্গ কি একটি রাষ্ট্র ? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কি একটি রাষ্ট্র ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৮। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যে ও নীতিসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, আইনের উৎসগুলো বর্ণনা কর।

৯। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কর্তব্যসমূহ আলোচনা কর।

১০। ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

গ বিভাগ

১১। বন্ধনীর ভিতরে প্রদত্ত বিকল্পগুলো থেকে সঠিক উত্তরটি খুঁজে নাও এবং তা লেখ—

(ক) রাষ্ট্রের (কেবল আভ্যন্তরিক, কেবল বাহ্য, আভ্যন্তরিক এবং বাহ্য উভয়প্রকার) সার্বভৌমিকতা থাকে।

(খ) (রুশো, লক, হবস) 'লেভিয়াথান' গ্রন্থটির প্রণেতা।

(গ) রাষ্ট্র শ্রেণী শাসনের যন্ত্র। কে বলেছেন ? (আরিস্টটল, রুশো, হেগেল, মার্কস, গ্রীণ)।

(ঘ) সার্বভৌমিকতা (হস্তান্তরযোগ্য, হস্তান্তরযোগ্য নয়)।

(ঙ) ভোটদানের অধিকার একটি (পৌর, রাজনৈতিক) অধিকার।

দ্বিতীয় পত্র

ক বিভাগ

যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

১। তুমি কি মনে কর যে ভারতের সংবিধান কেবলমাত্র গঠনের দিক হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কিন্তু কার্যত ইহা এককেন্দ্রিক ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তিগুলো আলোচনা কর।

২। রাষ্ট্রপতি-শাসিত ও পার্লামেন্ট-শাসিত শাসনব্যবস্থার পার্থক্য নির্দেশ কর এবং প্রথমটির দোষ ও গুণগুলো আলোচনা কর।

৩। গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তগুলো বিশদভাবে আলোচনা কর। এই শর্তগুলো বর্তমান ভারতে আছে কি ?

৪। আধুনিক রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের কার্যাবলী আলোচনা কর। বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা কিভাবে রক্ষা করা যায় ?

৫। বর্তমান ভারতে রাজ্যপালের পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও ভূমিকা আলোচনা কর।

৬। দ্বি-দল ও বহু-দল ব্যবস্থার দোষ ও গুণাবলীর তুলনামূলক আলোচনা কর।

অথবা, নারীজাতির ভোটাধিকারের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলো আলোচনা কর।

খ বিভাগ

যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

৭। দ্বি-কক্ষসম্পন্ন আইন সভার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

৮। ভারতে লোকসভার অধ্যক্ষের পদমর্যাদা ও ক্ষমতা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর।

৯। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ কিভাবে নিযুক্ত হন এবং কিভাবে তাঁহাদের পদচ্যুত করা যায় ?

১০। চরম ও শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য উপযুক্ত উদাহরণসহ আলোচনা কর।

গ বিভাগ

১১। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া, সেই উত্তর-সহ নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পুনরায় লিখ :

(ক) ভারতের সংবিধান কার্যকর করা হইয়াছিল।

(i) ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ (ii) ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৯ (iii) ২৬শে জানুয়ারি, ১৯৫০ (iv) ১লা মার্চ, ১৯৫২ হইতে।

(খ) ভারতের উপরাষ্ট্রপতি

(i) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন।

(ii) সংসদের উভয়কক্ষের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

(iii) সংসদের উভয়কক্ষের এবং রাজ্যবিধানমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

(iv) জনগণ কর্তৃক সরাসরি নির্বাচিত হন।

(গ) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সর্বপ্রধান প্রবক্তা ছিলেন

(i) হবস্, (ii) লক্ (iii) মণ্টেস্কু (iv) রুশো।

(ঘ) লোকসভার কার্যকাল

(i) পাঁচ বছর (ii) ছয় বছর (iii) চার বছর

এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়

(i) কেন্দ্রীয় সরকার (ii) রাজ্য সরকার (iii) 'নির্বাচন কমিশন'-এর তত্ত্বাবধানে

(ঙ) ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ

(i) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিযুক্ত হন। (ii) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। (iii) সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত হন। (iv) লোকসভার অধ্যক্ষ কর্তৃক মনোনীত হন।

১৯৮০

প্রথম পত্র

ক বিভাগ

যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। সমাজবিদ্যার সহিত ইহার কি সম্পর্ক ?

২। রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে বলপ্রয়োগ মতবাদ বিবৃত কর। মতবাদটির মধ্যে কোন সত্য নিহিত আছে কি ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

৪। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে কি বোঝায় ? আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির বিরুদ্ধে কি কি যুক্তি প্রদর্শন করা যায় ?

৫। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। সাধারণ সভার ভূমিকার মূল্যায়ন কর।

৬। ভারতীয় সংবিধানে সন্নিবিষ্ট রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের বর্ণনা দাও। মৌলিক অধিকারসমূহের সহিত নির্দেশমূলক নীতিসমূহের পার্থক্য দেখাও।

খ বিভাগ

নিম্নোক্ত যে কোন দুইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর

৭। সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য কি কি ?

৮। নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর।

৯। অছি পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।

১০। অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা কর।

গ বিভাগ

১১। বন্ধনীর ভিতরে প্রদত্ত বিকল্পগুলো থেকে সঠিক উত্তরটি খুঁজে নাও এবং তাহা লেখ :

(ক) একজন ব্যক্তি একই সঙ্গে একাধিক (রাষ্ট্রের, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের) সদস্য হতে পারে।

(খ) 'সামাজিক চুক্তি' গ্রন্থটির প্রণেতা (হবস, লক, রুশো)।

(গ) নিরাপত্তা পরিষদের (সব সদস্যের, কেবল অস্থায়ী সদস্যদের, কেবল স্থায়ী সদস্যদের) 'ভেটো' প্রয়োগের ক্ষমতা আছে।

(ঘ) কর্মের অধিকার একটি (রাজনৈতিক, আর্থনীতিক) অধিকার।

(ঙ) ভারতের সংবিধানে বর্তমানে সম্পত্তির অধিকার (একটি মৌলিক অধিকার, মৌলিক অধিকার নয়)।

দ্বিতীয় পত্র

ক বিভাগ

যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। সংবিধানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। কি ভাবে তুমি সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ করবে ?

২। যুক্তরাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা কর এবং ইহার গুণাগুণ আলোচনা কর

৩। একনায়কতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং ইহার গুণাগুণ বিশ্লেষণ কর।

৪। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ব্যাখ্যা কর। 'কঠোর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভবপর নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়।' উদাহরণ সহকারে উক্তিটি আলোচনা কর।

৫। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর।

৬। জনমত বলিতে কি বোঝায় ? গণতন্ত্রে ইহার গুরুত্ব নির্ধারণ কর।

খ বিভাগ

যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও

৭। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলিতে কি বোঝায় ? প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের গুণাগুণ বিশ্লেষণ কর।

৮। একক-পরিচালক ও বহু-পরিচালকবিশিষ্ট শাসনবিভাগ বলতে কি বোঝায় ?
৯। ভারতের রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
১০। লোকসভা ও রাজ্যসভার পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে যাহা জান লিখ।

গ বিভাগ

১১। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া, সেই উত্তরসহ নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লেখ।

(ক) ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা

(i) যুক্তরাষ্ট্রীয় (ii) এককেন্দ্রিক (iii) আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়।

(খ) রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন।

(i) সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল (ii) রাষ্ট্রপতি (iii) প্রধানমন্ত্রী।

(গ) পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা

(i) এককক্ষবিশিষ্ট (ii) দ্বিকক্ষবিশিষ্ট

(ঘ) ভারতবর্ষে

(i) একদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত আছে
(ii) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত আছে
(iii) বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত আছে

(ঙ) প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার।

(i) অপ্রয়োজনীয়
(ii) একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়।

১৯৮১

প্রথম পত্র

ক বিভাগ

যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু আলোচনা কর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান পদবাচ্য ?

২। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাষ্ট্রের উপাদান হিসাবে সার্বভৌমিকতার গুরুত্ব আলোচনা কর।

৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিবর্তনমূলক মতবাদ আলোচনা কর। তোমার কাছে এই মতবাদ কি গ্রহণযোগ্য ?

৪। জাতীয় জনসমাজ গঠনের উপাদানগুলি কি কি ? ভারতকে কি একটি জাতি বলা যায় ?

৫। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতি আলোচনা কর। ইহার উদ্দেশ্য কি ব্যর্থ হয়েছে ?

অথবা, আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক দেখাও।

৬। রাজনীতিক ও আর্থনীতিক অধিকার বলিতে কি বোঝায় ? ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত কয়েকটি রাজনীতিক অধিকারের উল্লেখ কর।

অথবা

খ বিভাগ

যে কোন দুইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর

৭। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ত্রুটিগুলো আলোচনা কর।

৮। জাতীয়বাদ ও আন্তর্জাতিকতার সম্পর্ক আলোচনা কর।

৯। রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য আলোচনা কর।

১০। কি কি কারণে নাগরিকতা বিলুপ্ত হয় ?

গ বিভাগ

১১। বন্ধনীর ভিতরে প্রদত্ত বিকল্পগুলো হইতে সঠিক উত্তরটি খুঁজিয়া বাহির কর এবং তাহা লিখ।

(ক) সার্বভৌমিকতা (হস্তান্তরযোগ্য, হস্তান্তরযোগ্য নয়)

(খ) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐশ্বরিক মতবাদ একটি (বৈজ্ঞানিক, অবৈজ্ঞানিক) মতবাদ।

(গ) বর্তমানে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা (১৫, ২৫, ২৭, ৩২)।

(ঘ) ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলো আদালত কর্তৃক (বলবৎযোগ্য, বলবৎযোগ্য নয়)।

(ঙ) ভোটদানের অধিকার একটি (সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, আর্থনীতিক) অধিকার।

দ্বিতীয় পত্র

ক বিভাগ

যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও

১। ভারতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।

২। সংসদ-শাসিত (পার্লামেন্টীয়) ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। সংসদ-শাসিত সরকারের সুবিধা ও অসুবিধা কি কি ?

৩। ভারতের পার্লামেন্টের গঠন ও কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর।

৫। রাজনৈতিক দল বলতে তুমি কি বোঝ ? গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

৬। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দাও।

খ বিভাগ

যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

৭। ভারতকে কি সাধারণতন্ত্র (রিপাবলিক) বলে অভিহিত করা যায় ? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দাও।

৮। দ্বি-কক্ষসম্পন্ন আইনসভার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৯। ভারতের কোন অঙ্গরাজ্যের মহাধর্মাধিকরণের ক্ষমতা বর্ণনা কর।

১০। ভারতের সংবিধানে বর্ণিত কোন রাজ্যের রাজ্যপালের ভূমিকা আলোচনা কর।

গ বিভাগ

১১। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া, সেই উত্তরসহ নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পুনরায় লেখ।

(ক) ভারতের রাজ্যসভা হইতেছে

(i) অঙ্গরাজ্যগুলোর একটি কক্ষ। (ii) রাজ্যপালগণের একটি কক্ষ।
(iii) ভারতীয় পার্লামেন্টের একটি কক্ষ।

(খ) ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হইতেছেন

(i) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একজন সদস্য। (ii) রাজ্যসভার সভাপতি।
(iii) লোকসভার অধ্যক্ষ।

(গ) ভারতের সুপ্রীম কোর্ট এমন একটি বিচারালয় যাহার

(i) কেবলমাত্র মূল এলাকা আছে। (ii) কেবলমাত্র আপীল এলাকা আছে। (iii) মূল ও আপীল উভয় এলাকাই আছে, কিন্তু অপর কোন এলাকা নাই। (iv) মূল এলাকা, আপীল এলাকা এবং পরামর্শদান এলাকা আছে।

(ঘ) ভারতের বর্তমান সংবিধানে 'শিক্ষা' বিষয়টি

(i) কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত। (ii) যুগ্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত। (iii) রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

(ঙ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলোর সংখ্যা হচ্ছে

(i) ২১ (ii) ২২ (iii) ২৩

— : —

১৯৮২

প্রথম পত্র

ক বিভাগ

যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত ইতিহাস ও অর্থবিদ্যার সম্পর্ক আলোচনা কর।

২। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বলপ্রয়োগ মতবাদটি আলোচনা কর।

৩। সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য কি কি ?

৪। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে কি বোঝায় ? আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির বিরুদ্ধে কি কি যুক্তি দেওয়া হয় ?

৫। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। সংক্ষেপে নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকার মূল্যায়ন কর।

৬। ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত যে কোন তিনটি মৌলিক অধিকার সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

খ বিভাগ

যে কোন দুইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও

৭। একজন নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

৮। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কর্তব্য সমূহ আলোচনা কর।

৯। জাতীয়তাবাদ কি আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী ? উত্তরের অনুকূলে যুক্তি দেখাও।

১০। ভারতীয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

গ বিভাগ

১১। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লিখ :

(ক) (পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ) একটি রাষ্ট্র।

(খ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯১৯, ১৯৪২, ১৯৪৫, ১৯৪৭) সালে।

(গ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান (সামাজিক, নৈতিক, প্রাকৃতিক) বিজ্ঞানের একটি শাখা।

(ঘ) সম্পত্তির অধিকার বর্তমানে ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত একটি (মৌলিক অধিকার, মৌলিক অধিকার নহে)।

(ঙ) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিক মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র (ঈশ্বরের সৃষ্টি, চুক্তির দ্বারা সৃষ্ট, মানবসমাজের বিরতিবিহীন ক্রমবিকাশের ফল)।

দ্বিতীয় পত্র

ক বিভাগ

যে কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও

১। 'সংবিধান' বলিতে কি বোঝায় ? লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের পার্থক্য যথোপযুক্ত উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর।

২। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি আলোচনা কর।

৩। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিপক্ষে কি কি যুক্তি দেখানো হয় ? গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলী কি কি ?

৪। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ব্যাখ্যা কর।

৫। পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার গঠন ও কার্যাবলীর বিবরণ দাও।

৬। আধুনিক গণতন্ত্রে জনমত গঠনের বিভিন্ন মাধ্যমের বিবরণ দাও।

খ বিভাগ

যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও

৭। ভারতীয় পার্লামেন্টে আইনপাশের পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

৮। দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থার গুণাগুণের তুলনামূলক আলোচনা কর।

৯। ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

১০। আধুনিক রাষ্ট্রে বিচারবিভাগের কার্যাবলী আলোচনা কর।

গ বিভাগ

১১। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পুনরায় লিখ :

(ক) ভারতের প্রধানমন্ত্রী (সুপ্রীমকোর্ট, রাষ্ট্রপতি, লোকসভা) দ্বারা নিযুক্ত হন।

(খ) ভারতের শাসনব্যবস্থা (রাষ্ট্রপতিশাসিত, সংসদীয়)।

(গ) লোকসভার কার্যকাল (চার, পাঁচ, ছয়) বছর।

(ঘ) (ভারতবর্ষ,গ্রেট বৃটেন). একটি প্রজাতন্ত্র।

(ঙ) ভারতবর্ষে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় (কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, নির্বাচন কমিশন) এর তত্ত্বাবধানে।

— : —

১৯৮৩
প্রথম পত্র
ক বিভাগ

যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত মনোবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক আলোচনা কর।

২। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ কর।

৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবর্তনমূলক মতবাদ ব্যাখ্যা কর। মতবাদটির কোন মূল্য আছে কি ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৪। রাষ্ট্রের সীমারেখা কি জাতীয় জনসমাজের সমানুপাতিক হওয়া উচিত ? তোমার বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দাও।

৫। জাতিপুঞ্জের (ইউনাইটেড নেশনস) সাধারণ সভার গঠন আলোচনা কর। সাধারণ সভার ভূমিকার মূল্যায়ন কর।

৬। ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের পার্থক্য দেখাও।

খ বিভাগ

যে কোন দুইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।

৭। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ত্রুটিগুলি আলোচনা কর।

৮। নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর।

৯। আর্থনীতিক ও সামাজিক অধিকার বলিতে কি বোঝায় ? কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থনীতিক ও সামাজিক অধিকারের উল্লেখ কর।

১০। অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা কর।

গ বিভাগ

১১। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লিখ :

(ক) একজন ব্যক্তি একই সঙ্গে একাধিক (রাষ্ট্রের, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের) সদস্য হইতে পারে।

(খ) (অ্যারিষ্টটল, রুশো, হেগেল, মার্কস, গ্রীণ) বলেন : "রাষ্ট্র শ্রেণী শাসনের যন্ত্র।"

(গ) সম্পত্তির অধিকার একটি (রাজনীতিক, আর্থনীতিক) অধিকার।

(ঘ) কর্মের অধিকার ভারতের সংবিধান কর্তৃক রক্ষিত (একটি মৌলিক অধিকার, মৌলিক অধিকার নহে)।

(ঙ) অছি পরিষদ জাতিপুঞ্জের একটি (অংশ, অংশ নহে)।

দ্বিতীয় পত্র
ক বিভাগ

কে কোনও চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। ভারতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর।

২। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর। ইহার সুবিধা ও অসুবিধা কি কি ?

৩। সংসদীয় পার্লামেণ্টীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। সংসদীয় সরকারের সুবিধা ও অসুবিধা কি কি ?

৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতা আলোচনা কর।

৫। ভারতীয় পার্লামেন্টের কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬। রাজনৈতিক দল বলতে কি বোঝায় ? গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

খ বিভাগ

যে কোন দুইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।

৭। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলতে কি বোঝায় ? প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের গুণাগুণ বিশ্লেষণ কর।

৮। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ কি ভাবে নিযুক্ত হন ? তাঁহাদের কিভাবে পদচ্যুত করা যায় ?

৯। ভারতীয় অংগ রাজ্যের রাজ্যপালের ভূমিকা আলোচনা কর।

১০। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বলতে কি বোঝায় ব্যাখ্যা কর। এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করা হয় কেন ?

গ বিভাগ

১১। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লিখ :

(ক) পূর্ণ ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ (সম্ভবপর, সম্ভবপর নহে)।

(খ) ভারতে (একদল ব্যবস্থা, দ্বিদল ব্যবস্থা, বহুদল ব্যবস্থা) আছে।

(গ) ভারতে (২০/২২/২৪টি) অংগ রাজ্য আছে।

(ঘ) ভারতের উপরাষ্ট্রপতি (রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত, পরোক্ষ ভাবে নির্বাচিত, প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত) হন।

(ঙ) কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদের সদস্যরা (রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, লোকসভা) কর্তৃক নিযুক্ত হন।

১৯৮৪

প্রথম পত্র

'ক' বিভাগ

যে-কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কি ? অর্থবিদ্যার সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা কর।

২। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বলপ্রয়োগ মতবাদটি আলোচনা কর।

৩। সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য কি কি ?

৪। জাতীয়তাবাদ বলিতে কি বোঝায় ? ইহা কি আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিপন্থী ?

৫। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (ইউনাইটেড নেশন্‌স) সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা কর।

৬। সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা কি ?ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

খ বিভাগ

যে-কোন দুইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও

৭। রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য সংঘের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

৮। "রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি" —এই ধারণা তোমার কতদূর গ্রহণযোগ্য মনে হয় ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৯। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্যসমূহ আলোচনা কর।

১০। ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখিত রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

'গ' বিভাগ

১১। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লিখ :

(ক) (হেগেল/রুশো/হব্‌স) "সামাজিক চুক্তি" গ্রন্থটির প্রণেতা।

(খ) আন্তর্জাতিক বিচারালয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি (অঙ্গ/ অঙ্গ নহে)।

(গ) কর্মের অধিকার একটি (রাজনীতিক/আর্থনীতিক) অধিকার।

(ঘ) ভারতের সংবিধান শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার সুনিশ্চিত (করে/করে না)।

(ঙ) ভারতের সংবিধানে শিক্ষার অধিকার একটি (মৌলিক অধিকার/নির্দেশমূলক নীতি)।

দ্বিতীয় পত্র

'ক' বিভাগ

যে-কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। দুষ্পরিবর্তনীয় ও সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের পার্থক্য নির্ধারণ কর এবং দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের দোষ ও গুণাবলীর আলোচনা কর।

২। "ভারতীয় সংবিধান আংশিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং আংশিকভাবে এককেন্দ্রিক" —এই মতবাদ পর্যালোচনা কর।

৩। একনায়কতন্ত্র বলিতে কি বোঝায় ? একনায়কতন্ত্রের গুণাগুণ আলোচনা কর।

৪। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ব্যাখ্যা কর। "পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভবও নহে, কাম্যও নহে"—এই মত কি তুমি সমর্থন কর ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৫। দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি পর্যালোচনা কর।

৬। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর।

'খ' বিভাগ

যে-কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

৭। ভারতের রাষ্ট্রপতি কিভাবে নির্বাচিত হন তাহা বর্ণনা কর।

৮। রাজ্যসভা ও লোকসভার গঠন আলোচনা কর।

৯। জনমত বলিতে কি বোঝায় ? গণতন্ত্রে ইহার গুরুত্ব কি ?

১০। দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থার সুবিধাগুলির তুলনামূলক আলোচনা কর।

'গ' বিভাগ

১১। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া বাক্যগুলি পুনরায় লিখ :

(ক) যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য (থাকে/থাকে না)।

(খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (রাষ্ট্রপতি শাসিত/সংসদ শাসিত) সরকার আছে।

(গ) ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁহার মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলিতে (বাধ্য/বাধ্য নহেন)।

(ঘ) ভারতের কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন (ভারতের রাষ্ট্রপতি/সেই রাজ্যের রাজ্যপাল/রাজ্য আইনসভার সদস্যগণ)।

(ঙ) প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার (অপ্রয়োজনীয়/একান্ত প্রয়োজনীয়)।

— : —

১৯৮৫
প্রথম পত্র
'ক' বিভাগ

যে কোনও চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি সংজ্ঞা দাও। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কি বিজ্ঞান বলিয়া গণ্য করা যায়? তোমার উত্তরের সমর্থনে কারণ দেখাও।

২। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিবর্তনমূলক মতবাদটি আলোচনা কর এবং এই মতবাদের মূল্যায়ন কর।

৩। জাতীয় জনসমাজ বলিতে কি বোঝায়? জাতীয় জনসমাজ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য উপাদানগুলি আলোচনা কর।

৪। নাগরিকত্ব বলিতে কি বোঝায়? যে সকল উপায়ে নাগরিকত্ব অর্জন করা যায় সেগুলি বর্ণনা কর।

৫। জাতিপুঞ্জের (ইউনাইটেড় নেশন্‌স্‌) উদ্দেশ্য ও নীতিগুলি আলোচনা কর। ইহার প্রধান অঙ্গগুলি কি কি?

৬। অধিকার বলিতে কি বোঝায়? আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকের পৌর ও রাজনীতিক অধিকারগুলি বর্ণনা কর।

'খ' বিভাগ

যে কোনও দুইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।

৭। ভারতীয় নাগরিকের অন্ততঃ চারটি মৌলিক অধিকার উল্লেখ কর। ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি কিভাবে সংরক্ষিত হয়?

৮। "অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত"— এই উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

৯। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদটি যে সকল কারণে সমালোচিত হইয়াছে সেই কারণগুলি বিবৃত কর।

১০। আইনসম্মত সার্বভৌমত্ব ও রাজনীতিক সার্বভৌমত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

অথবা

রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য বিবৃত কর।

'গ' বিভাগ

১১। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লিখ:

(ক) ভোট দানের অধিকার একটি (সামাজিক/রাজনীতিক/পৌর/অর্থনীতিক) অধিকার।

(খ) ভারতীয় সংবিধান অনুসারে বর্তমানে সম্পত্তির অধিকার একটি (মৌলিক অধিকার/মৌলিক অধিকার নহে)।

(গ) রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব (হস্তান্তরযোগ্য/হস্তান্তরযোগ্য নহে)।

(ঘ) ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক (বলবৎযোগ্য/বলবৎযোগ্য নহে)।

(ঙ) জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে (সকল সদস্য-রাষ্ট্র/কেবলমাত্র অস্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রগুলি/কেবলমাত্র স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রগুলি) ভিটো প্রয়োগের ক্ষমতা ভোগ করে।

যে কোনও চারিটি

১। ভারতীয় সংবিধা

২। সংসদীয় (পার্লামে
রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরব

৩। গণতন্ত্রের সাফল্যের শ

৪। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষ

৫। বর্তমান ভারতে রাজ্যপা

৬। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের

'খ' বিভাগ

যে কোনও দুইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।

৭। ভারতকে কি সাধারণতন্ত্র (রিপাব্লিক) বলিয়া অভিহিত করা যায় ? তোমার

৮। ভারতের রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা সংক্ষেপে আলোচন

৯। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার গুরুত্ব আলোচনা কর।

১০। ভারতের কোনও অংগরাজ্যের মহাধর্মাধিকরণের ক্ষমতা আলোচনা কর।

অথবা

আধুনিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কিভাবে রক্ষা করা যায় ?

'গ' বিভাগ

১১। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লিখ—

(ক) ভারতে (২০,২২,২৪)টি অংগরাজ্য আছে।

(খ) ভারতের যে কোনও রা হন/
নির্বাচিত হন/ঐ রাজ্যে

(গ) ভারতের বর্তমান স
অন্তর্ভুক্ত।

(ঘ) (রাষ্ট্রপতি/উপরাষ্ট্র

(ঙ) ভারতের সুপ্রীম
আছে কিন্তু অপ



